আল্লাহকে মানুন নিরাপদ থাকুন

ড. আয়েয আল করনী

আশরাফুল হক।

লেখালেখি করেন দীর্ঘ সময় ধরে। তার জন্ম ভোলা জেলার লালমোহনে, ১৯৯৫ সালে।

স্কুল-জীবনে প্রাইমারি শেষ করে আলেম বাবা-ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে মাদরাসায় ভর্তি হন। সানুভি প্রথম বর্ষ থেকে ঢাকার কোল ঘেঁষে মাদানীনগর মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন ২০১৩ সালে। এরপর উচ্চতর আরবী সাহিত্য চর্চা (আদব) এবং ইসলামী আইন গবেষণার (ইফতা) প্রাতিষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন মাদানীনগরেই।

ছাত্রজীবনেই আশরাফুল হক তার পরম উসতায মাদানীনগর মাদরাসার মুহাদ্দিস মুফতী আহসানুল্লাহ কাসেমী হাফিযাহুল্লাহ এর তত্ত্বাবধানে লেখালেখি শুরু করেন। মাদানীনগর মাদরাসার বার্ষিক ইসলাহী জোড় উপলক্ষে 'আজকের ইসলাহী জোড়', বিশ্ব ইজতিমা উপলক্ষে 'আজকের ইজতিমা' সাময়িকীতে আসাতিযা কিরামের তত্ত্বাবধানে সম্পাদনা বিভাগে দায়িত্বনিষ্ঠ কাজ আঞ্জাম দেন।

পাশাপাশি লেখালেখি করেন মাসিক রহমত, মাসিক ইসলামী পয়গাম-সহ আরো আরো পত্রিকায়। আরবী-উর্দু মিলিয়ে অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন ডজনখানেক বইয়ের। সম্পাদনা করেছেন একাধিক মৌলিক গ্রন্থেরও।

'আল্লাহকে মানুন নিরাপদ থাকুন' তার একক অনুবাদ। তিনি ছাত্রজীবনেই আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে আল্লাহকে পাওয়ার মতো কোন বইয়ে অবদান রাখার স্বপ্ন দেখেন এবং সেই স্বপ্ন থেকেই বক্ষমাণ বইটি সামনে পেয়ে পরামর্শক্রমে অনুবাদের নিয়ত করেন।

আশরাফুল হক ভ্রমণ পছন্দ করেন। বই পড়েন। প্রবন্ধ লিখেন। কবিতা কাটেন। গল্পের বাক্যে বাগান তৈরি করেন। সেসব প্রকাশ করেন, করেন না। কেন করেন না, তা নিজেই জানেন।

লেখালেখি করলেও প্রধান পেশায় তিনি একজন শিক্ষক। নিজের জন্য শিক্ষকতার পরিচয়ে তিনি ঔজ্জ্বল্যবোধ করেন। তিনি বর্তমানে বাঞ্ছারামপুরের মানিকপুর হাফেয মুহাম্মাদুল্লাহ ইসলামিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা করছেন।

আল্লাহ তাআলা তার কাজ ও সময়ে বরকত দান করুন।

মুহাম্মাদ দিলাওয়ার হোসাইন
পরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন

হুদহুদ
প্রকাশন
... নতুন দিগন্ত

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহকে মানুন নিরাপদ থাকুন

মূল

ড. আয়েয আল করনী

সৌদিআরব

ভাষান্তর

মুফতী আশরাফুল হক

হাফেয মুহাম্মাদুল্লাহ ইসলামিয়া মাদরাসা

বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়িয়া

আল্লাহকে মানুন নিরাপদ থাকুন

মূল

ড. আয়েয আল করনী

সৌদিআরব

ভাষান্তর ও সম্পাদনা

মুফতী আশরাফুল হক

প্রকাশনা

৮৯ [উনানব্বই]

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারী ২০২০

প্রকাশক

হুদহুদ প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫

প্রচ্ছদ

শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ

আফতাব আর্ট প্রেস

২৬ তণুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ৫০০ টাকা মাত্র

ইহদা

মুফতী আহসানুল্লাহ কাসেমী
মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ
মুফতী ফারুকুযযামান
মাওলানা মানযূর আহমাদ
হাফিযাহুমুল্লাহু।

–মুহাম্মাদ আশরাফুল হক

সূচি

আল্লাহকে মানুন নিরাপদ থাকুন

বিন্দু থেকে সিন্ধু হয়। একটি পুরনো প্রবাদ। তবে এর বাস্তবতা অন্তহীন। হাজার মাইলের যাত্রা শুরু হয় একটি পদক্ষেপের মাধ্যমেই। কোটি টাকার গণনার শুরুতেও আমরা পাই এক সংখ্যাকে।

আমাদের জীবনে এমন হাজারও কাজ আছে, যেগুলো দেখতে খুব ছোট; তবে সেগুলো সাফল্যের বুনিয়াদ। হেলা অবহেলায় সেগুলোর ওপর আমাদের নজর পড়ে না। ফলে নিজের অজান্তে মাশুল গুণতে হয় যাপিত জীবনে।

ডক্টর আয়েয আল করনী এমনই কিছু কাজের তালিকা তৈরি করেছেন এই পুস্তিকায়। সঙ্গো দিয়েছেন কিছু পরামর্শ। অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায়। দলিল-প্রমাণ দিয়ে। ফলে পুস্তিকাটি খুব সুখপাঠ্য হয়েছে। তিনি সেই পুস্তিকার নাম রেখেছেন 'ইহফাযিল্লাহ ইয়াহ ফাযকা'। আমরা অনুবাদের নাম দিলাম 'আল্লাহকে মানুন নিরাপদ থাকুন'।

একাধারে পড়ে ফেলার মত একটি মজার পুস্তিকা। আশা করি, আমাদের জীবনের গতিবিধি নির্ধারণে এটি বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

আল্লাহ ﷻ আমাদের এই প্রয়াস কবুল করুন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন

বিনীত
মুহাম্মাদ আবদুল আলীম
মহাপরিচালক
হুদহুদ প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা
৫ রবীউল আখার, ১৪৪০ হি. (১২/১২/১৮ ইং)

লেখকের ভূমিকা

রাসুল ﷺ আমাদের জীবন-সাফল্যের জন্য একটি সুসমৃদ্ধ নির্দেশনা দিয়েছেন– 'ইহফাযিল্লাহ, ইয়াহফাযকা'। 'তুমি আল্লাহর বিধান রক্ষা কর, আল্লাহ তোমার জীবনে সুরক্ষা দিবেন'।

কেয়ামত পর্যন্ত রাসুল ﷺ-র এই বাণী সত্য, সুপ্রতিষ্ঠিত। জীবনের পরতে পরতে পরিলক্ষিত, বাস্তবায়িত। মুসলমানের অন্তরে অন্তরে প্রোথিত, অনুরণিত। এ যেন ঈমানদারের নির্বিঘ্ন জীবন বাঁচার অনাদি আশা, অপার প্রেরণা।

আল্লাহ ﷻ-কে যে ভয় করবে, পরিশেষে সে প্রশংসিত হবে। সবল-দুর্বল সকলের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা পাবে। বিপদে আপদে যে আল্লাহ ﷻ-কে ভুলে যাবে, সে যেন মনে রাখে, আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্যসব সাহায্যকারী ব্যর্থ, অক্ষম। সুতরাং আল্লাহ ﷻ-র রজ্জু আঁকড়ে ধরো, পৃথিবীর সকল সাহায্যক্ষেত্র বিশ্বাসভঙ্গা করলেও আল্লাহ ﷻ আছেন বিশ্বাসের স্তম্ভ, আল্লাহ ﷻ আছেন সদা-সর্বত্র।

রাসুল ﷺ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما-কে নসিহত করেছিলেন–

> তুমি আল্লাহর বিধান রক্ষা করো, আল্লাহ তোমাকে সুরক্ষা দিবেন। তুমি আল্লাহর বিধান প্রতিপালন করো, আল্লাহকে তোমার কাছেই পাবে। তোমার কোন সাহায্যের কথা শুধু আল্লাহকেই বলো। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আল্লাহর কাছেই হাত তোলো। শোনো, পৃথিবীর সকল মানুষ তোমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হলেও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা তোমার কোন সাহায্য করতে পারবেনা। পৃথিবীর সকল মানুষ তোমার ক্ষতি করার জন্য প্রস্তুত হলেও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। মানুষের ভাগ্য সুস্থির, লিপিবদ্ধ। [তিরমিযি]

মুসনাদে আহমদে নসিহতপূর্ণ এই হাদিসে আরো কিছু বৃদ্ধি রয়েছে। বর্ণিত হয়েছে–

নিশ্চয় ধৈর্যের সাথেই রয়েছে সাহায্য। বিপদের মাঝেই রয়েছে লাঘব ও উপশম। কষ্টের পরেই রয়েছে সারল্য ও সহজ পথ। [মুসনাদে আহমদ]

রাসুল ﷺ এই নসিহত করেছেন অনাগতকালের সকলের জন্য। বুযুর্গগণ বলেন, তোমার সন্তানকে, ভাই-বন্ধুকে এই নসিহত অবশ্যই করো– ‘ইহফাযিল্লাহ, ইয়াফাযকা’। ‘তুমি আল্লাহর বিধান রক্ষা করো, আল্লাহ তোমার জীবনে সুরক্ষা দিবেন’।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, ‘এই হাদিসের অর্থ নিয়ে যতই গবেষণা করা হয়, এর সুসমৃদ্ধ অর্থ দেখে ততই আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য হতে হয়’।

সুলাইমান ইবনে দাউদ ﷺ বলেন, ‘মানুষ যেসব বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, আমরাও সেসব বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। মানুষ যেসব বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনা, সেসব বিষয় থেকেও আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। কিন্তু গোচরে-অগোচরে আল্লাহ ﷻ-র হেফাযতের চেয়ে উত্তম কিছু খুঁজে পাইনা’।

বক্ষমান বইটি সবার জন্য। যেমন পুরুষের জন্য, তেমনই নারীর জন্য। রাজা-বাদশাহ, আমলা-মন্ত্রী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং শাসকের জন্য, শাসিতের জন্য। ডাক্তার, অফিসার, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, কৃষক, মুনি-মূষী –সকল শ্রেণী-পেশার লোকদের জন্য। বইটির মাধ্যমে সকলের কাছে একটি বার্তা–

আসমানি ফয়সালা ছেড়ে দাও আসমানে।
তাকদিরি ফয়সালা ভেস্তে দিওনা তোমার ভঙ্গুর বেক্ষণে!
ওগো আল্লাহ আমার আশার আধার, লক্ষ-কোটি কৃপা তোমার,
আমায় রক্ষা করেছো।
অত্যাচারির নিনাদ ভারি, ধ্বংস হবো সমূল ছাড়ি;
তুমি রক্ষা করেছো।
তুমি আমায় রক্ষা করে জালিমমনে ভয়ের ভয়াল আঁধার দিয়েছো।

আল্লাহ ﷻ-কে ভালোবাসো

তুমি আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসা পেতে চাও?
আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও?
আল্লাহ ﷻ-র খাঁটি বান্দা হতে চাও?

ইসলামের সবচেয়ে বড় চাহিদা হলো, তুমি আল্লাহ ﷻ-র বন্ধু হও। আল্লাহ ﷻ-র অলি হও। আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্যভাজনদের অন্তর্ভুক্ত হও। আল্লাহওয়ালা হও।

রাসূল ﷺ আল্লাহর অলিদের দুই ভাগ করেছেন। এক, মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী; মুকতাসিদ। দুই, কল্যাণের পথে অগ্রগামী; সাবিকুন বিলখাইরাত।

আবু হোরায়রা ؓ থেকে হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

> মহান আল্লাহ বলেন, 'যে আমার কোন অলির সাথে শত্রুতা করল, সে আমার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। আমি বান্দার উপর যা ফরয করেছি, তার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন এবাদতদ্বারা বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারে না। আমার বান্দা সবসময় নফল এবাদতদ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে, একসময় আমি তাকে ভালোবাসবো। যখন আমি তাকে ভালোবাসবো, তখন আমি তার কান হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে চলে। বান্দা যদি আমার কাছে কিছু চায়, অবশ্যই আমি তাকে দান করবো। বান্দা যদি আমার কাছে আশ্রয় চায়, অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দিবো। [বুখারি : ৬৫০২]

এটি হলো বন্ধুত্বের পয়গাম। আল্লাহ ﷻ-র অলিদের জন্য সুসংবাদবাহী হাদিস। এটি ইসলামী জীবনব্যবস্থায় সবচেয়ে সুমহান একটি হাদিস। ব্যাখ্যাতারা এই হাদিসের গভীর ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম শাওকানী ﵀-ও তাঁর 'কুত্বুল ওয়ালিয়্যি ফী শারহি হাদীসিল ওয়ালিয়্যি' নামক গ্রন্থে এই হাদিসের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

আল্লাহ ﷻ এই হাদিসে মুমিনদের দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

এক. মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী; মুকতাসিদ।

দুই. কল্যাণের পথে অগ্রগামী; সাবিক্বুন বিলখাইরাত।

মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী, যিনি আল্লাহ ﷻ-র ফরযসমূহ যথাযথ আদায় করেন।

কল্যাণের পথে অগ্রগামী, যিনি নফল এবাদত করে আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্য অর্জন করেন। আল্লাহ বলেন–

> অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে, আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে অগ্রসর। [ফাত্বির: ৩২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, উল্লিখিত সকল দলই জান্নাতের অধিবাসী হবে।

আমরা যদি আয়াতে বর্ণিত 'নিজেদের প্রতি অত্যাচারী'দের থেকে নিজেদের সতর্ক রাখতে পারি, তাহলে এই আয়াতটি হবে আমাদের জন্য বড় একটি সুসংবাদ!

মাসরূক ﵀ আয়েশা ﵂-কে জিজ্ঞেস করেন, 'হে উম্মাহাতুল মুমিনীন! কল্যাণের পথে অগ্রসর ব্যক্তি কে?'

আয়েশা ﵂ উত্তর দেন, 'যারা রাসূল ﷺ-র সঙ্গ পেয়ে অতিবাহিত হয়েছেন, তারা হলেন কল্যাণের পথে অগ্রসর। আর যারা রাসূলের সহচরদের সঙ্গ পেয়েছেন বা সহচরদের অনুসরণ করেছেন, তারা হলেন মুকতাসিদ, মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। আর নিজের প্রতি অত্যাচারী হলাম আমি এবং তুমি!'

আয়েশা ﵂ 'নিজের প্রতি অত্যাচারী হলাম আমি এবং তুমি' –এই কথা বলে মূলত নিজের বিনয় প্রকাশ করেছেন।

আল্লাহর ভালোবাসার পাথেয় আল-কোরআন

আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসা অর্জিত হবে কিছু বিষয় অর্জনের মাধ্যমে। তন্মধ্যে ফায়েদা ও লাভ বিবেচনায় সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ ﷻ-র কাছে সর্বাধিক নৈকট্য ও মর্যাদাকর মাধ্যম হলো কোরআনুল কারীম।

কোরআনুল কারীম অতীব মহান এক কিতাব। রাসূল ﷺ কোরআনুল কারীমের ব্যাপারে আমাদের অসিয়ত করেছেন। আমাদের জীবনযাপনে কুরআনের গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত এবং গবেষণা ব্যতীত এই উম্মতের কোন সফলতা ও মুক্তি নেই। উম্মত কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে, কুরআনের বিকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহ ﷻ এই উম্মতকে ফাসাদে নিপতিত করবেন। হাদিসে এসেছে–

> কোন জাতি হিদায়াত পাওয়ার পর পথভ্রষ্ট হয়নি একমাত্র ঝগড়াটে জাতি ব্যতীত। (উক্ত হাদিসটি ইমাম তিরমিযী আহমদ থেকে আবু উমামার মারফূ সনদে বর্ণনা করেছেন।) [মুসনাদে আহমাদ : ২১৬৬]

অর্থাৎ, যখন একটি জাতি কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তখন সে জাতি বেঁচে থাকবে দুর্বল নীচ মূল্যবোধ নিয়ে। সে জাতি বেঁচে থাকবে তরল ও ভঙ্গুর আদর্শ এবং অনাদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। তাদের উদ্যোগ-আয়োজনগুলো হবে নিষ্ফল, ব্যর্থ, নিরর্থক। কোন মঙ্গল তাদের কাছে আসবে না। দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না।

যে জাতি কোরআন ছেড়ে অন্য কিছু থেকে তাদের জীবনাদর্শ গ্রহণ করবে, সে জাতি নির্বোধ। সে জাতির জীবন হবে উদ্ভ্রান্ত, অমর্যাদাকর। আমাদের পূর্ববর্তী মহান মনীষাগণ কোরআন-সুন্নাহকে জীবনভর কেমন আলিঙ্গান করে রেখেছিলেন! তাঁরা ছিলেন যুগের যোগ্যতম জাতি। এবাদত, দুনিয়াবিমুখতা এবং আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্যে তাঁরা ছিলেন প্রবাদপ্রতিম। সবচেয়ে মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠতম।

এর বিপরীতে আমরা যখনই কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি (আল্লাহ ﷻ-র রহমতে গোণা কয়েক ব্যতীত), তখন থেকেই আমাদের অন্তরগুলো

মরে গেছে। আমরা হারিয়ে ফেলেছি মহান মনীষাদের সেই নূর, সেই বিকির্ণ আলোকরশ্মি। হারিয়ে ফেলেছি আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্যের সেই জ্যোতি।

> মহান আল্লাহ রাসূল ﷺ-কে নির্দেশনা দিলেন, 'আর তুমি কোরআন পড়। [সূরা নামল : ৯২]

আয়াত থেকে বোঝা যায়, মানুষের কাছে কোরআন পড়া রাসূলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এজন্য রাসূল ﷺ তাঁর নবুওতের প্রাথমিক জীবনে সাহাবাদের হাদিস সংকলন করতে নিষেধ করেছিলেন, যেন তাঁরা কোরআন রেখে হাদিস নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে না যায়!

কোরআন মুসলমানের গর্বের বিষয়। কোন মুসলমান যখন গর্ব করে, সে যেন তার ইসলামি জীবনের কোন বিপদ ও পরীক্ষা নিয়ে গর্ব করে। সে যেন ইসলামের জন্য কোন খেদমত ও পদক্ষেপ নিয়ে গর্ব করে। সে যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উচ্চতা নিয়ে গর্ব করে। সর্বোপরি কোরআন এবং কোরআনি জীবন নিয়ে গর্ব করে।

বংশ ও পরিবার, পদ ও স্থিতি, পেশা ও প্রবৃত্তি গর্ব করার কোন বিষয় নয়। এই গর্ব, দম্ভ ও অহঙ্কার ফেরাউন ও তার দোসরদের দম্ভ-অহঙ্কারের মতো।

সাদ ইবনে হিশাম ইবনে আমের বলেন, "আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে রাসূল ﷺ-র স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'তাঁর স্বভাব-চরিত্র ছিলো কোরআন।" তিনি ছিলেন কুরআনের প্রতিবিম্ব।

রাসূল ﷺ-র বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-র এই বাণীটি আল্লাহর বাণীর পর সবচেয়ে সুসংক্ষিপ্ত-সুসমৃদ্ধ বাণী।

–রাসূল যেন কুরআনের প্রতীক ছিলেন! জীবন্ত কুরআনের মতই পৃথিবীতে তিনি বিচরণ করতেন!!

–কেউ যখন কোরআন পড়ে, সে যেন রাসূল ﷺ-র জীবনই পাঠ করে!!!

মহান আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে রাসূলের শানে ঘোষণা করেন–

> আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। [কালাম: ০৪]
>
> আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। [আলে ইমরান: ১৫৯]

আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও, মূর্খ-জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাক। [আ'রাফ: ১৯৯]

তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী। মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। [তাওবাহ: ১২৮]

রাসূল ﷺ সাহাবাদের কুরআনের আলোকে জীবন যাপনের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। সেসব হাদিস পড়লে যে কোন মুসলমানের অন্তর কুরআনের প্রতি অবশ্যই বিগলিত হবে।

আবু উমামা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

তোমরা কোরআন পড়ো। কারণ, কিয়ামাতের দিন এই কোরআন তার ধারক-বাহকদের জন্য শাফায়াতকারীরূপে আবির্ভূত হবে। [মুসলিম : ৮০৪]

কোরআন যদি কারো জন্য শাফায়াত করে, তাহলে সে তার সফলতা। তার পরম সুখ। সে কতো ভাগ্যবান!

উসমান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, যিনি কোরআন শিখেন এবং শিখান। [বুখারী : ৫০২৭]

আল্লাহর শপথ! আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান, সবচেয়ে সম্মানী সেই ব্যক্তি, যিনি কুরআনের সাথে জীবন কাটান!

কোরআন পৃথিবীর বুকে আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে অবতীর্ন হওয়া সুন্দরতম বস্তু। পৃথিবীর প্রায় অধিবাসীরা কিবা বস্তুবাদীরা মানুষকে তার পদ-পদবী, সন্তান-সন্ততি বিবেচনায় মর্যাদা দিয়ে থাকে। কিন্তু এসব পদমর্যাদা, সন্তান-সন্ততি আদৌ কোন সৌন্দর্যের বিষয়! কখনই নয়। বরং 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, যিনি কোরআন শিখেন এবং শিখান।'

এজন্যই রাসূল ﷺ মানুষের ততটুকু কাছে যেতেন, যতটুকু সে কুরআনের নিকটবর্তী হতো। রাসূল মানুষকে ততটুকু সম্মান করতেন, যতটুকু সে কোরআন শিখতো। যতটুকু সে কোরআন তেলাওয়াত করতো।

আনাস ﵁ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ একটি সারিয়্যা (যে যুদ্ধদলে রাসূল অংশগ্রহণ করেননি) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য পাঠালেন। পাঠানোর সময় তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কোরআন শিখেছে?'

সাহাবায়ে কেরাম চুপ রইলেন। রাসূল আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কোরআন শিখেনি?'

জনৈক সাহাবি বললেন, 'আমি শিখেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ।'

রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কুরআনের কী শিখেছ?'

সাহাবি বললেন, 'আমি সূরা বাকারা শিখেছি।'

রাসূল বললেন, 'ঠিক আছে, তুমিই দলের আমীর।'

এই হলো ইসলামের সনদ। লা ইলাহা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর সনদ। আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্যের সনদ। তুমি যখন শুধু সূরা বাকারা শিখলে, সূরা বাকারা তোমার বক্ষে ধারণ করলে, সূরা বাকারা দিয়ে তোমার জীবন সাজালে, তখন তুমিই হলে সৈন্যবাহিনীর আমীর!

জাবির ﵁ বলেন, রাসূল ﷺ অহুদ যুদ্ধে শহীদদের খবরাখবর নিচ্ছিলেন। তখন তিনি বলছিলেন, 'এদের মধ্যে যে কোরআন বেশি শিখেছে, তাকে আগে দাফন করো!'

কোরআন ছিলো সাহাবায়ে কেরামের নিত্যসঙ্গী। সাহাবাদের রাতবিরাতের সঙ্গী। মোহাজির হোক বা আনসার হোক, কারো ঘরে প্রবেশ করলেই তাকের উপর একটি কোরআন পাওয়া যেতো। আর কুরআনের পাশে ঝুলানো থাকতো তলোয়ার। তলোয়ার দিয়ে জয় হতো দেশ-দেশান্তর, কোরআন দিয়ে জয় হতো মানুষের অন্তর।

আবু মুসা আশ'আরী ﵁ এর হাদিসে পাওয়া যায়, রাসূল ﷺ এক রাতে আবু মুসার তেলাওয়াত শুনতে পেলেন। আবু মুসার তেলাওয়াত ছিলো অত্যন্ত সুললীত কণ্ঠের। তার কণ্ঠ মানুষের অন্তর ছুঁয়ে তরঙ্গায়িত হতো। যেনো প্রতিটি অন্তরকে সম্বোধন করেই তিনি তেলাওয়াত করতেন।
রাসূল মসজিদে এসে শরীর এলিয়ে একটু বিশ্রামে নিচ্ছেন। মসজিদটি ছিলো ঘরের পাশেই। আবু মুসা তেলাওয়াত করছেন। রাসূল মসজিদ থেকেই আবু

মুসার তেলাওয়াত শুনতে পেলেন। সকাল হল। রাসূল আবু মুসাকে বললেন, 'আমাকে দাউদের সুরেলাস্বরের একটি দেয়া হয়েছে!'

আবু মুসা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার তেলাওয়াত শুনেছেন!'

রাসূল বললেন, 'যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ! আমি তোমার তেলাওয়াত শুনেছি।'

আবু মুসা বললেন, 'যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ! যদি জানতাম আপনি আমার তেলাওয়াত শুনছেন, তাহলে আমি আপনার জন্য তেলাওয়াতকে আরও অলঙ্কৃত করতাম।'

অর্থাৎ, আমি তেলাওয়াতকে আরও বিশুদ্ধ ও সুন্দর করতাম, যেন তা অত্যধিক মনোহর ও চিত্তাকর্ষক হয়। আরও বেশি ভাবালু হয়। আরও বেশি মোহিত করে, তন্ময়ের সৃষ্টি করে।

কোরআন মানেই বিস্ময়াবিভোর কিছু। পুরো কোরআনই বিস্ময়ের। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> বলুন, আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে। অতঃপর তারা বলেছে, আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি। [আল-জিন: ০১]
>
> যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিলো। তারা যখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হলো, তখন পরস্পর বললো, চুপ থাক। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হলো, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেলো। তারা বললো, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শনেছি যা মুসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে।
>
> হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য কর এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ মার্জনা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদের রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে

আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরণের লোকই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। [আল-আহক্বাফ: ২৯-৩২]

এই ঘটনা ঘটেছিলো, যখন রাসূল তায়েফ থেকে ফিরেছিলেন, তখন। তায়েফ থেকে ফিরে এক খেজুর বিথিকায় রাসূল তেলাওয়াত করছিলেন। সেখানে জিনেরা রাসূলের তেলাওয়াত শুনলো এবং সাথেসাথে ঈমান আনলো। মুসলমান হয়ে গেলো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পতাকা উড্ডীন করে আপন কওমের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেলো।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

যার ভেতর কুরআনের একটু অংশ নেই, সে বিরাণ ঘরের মতো। [মুসনাদে আহমাদ : ১৯৪৮]

বিরাণ ঘর হলো, যে ঘরে কাক, সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদির বাস থাকে। হাদিসের অর্থ হলো, যে অন্তরে কুরআনের আভাস নেই, সে অন্তরে নিফাক, কুবুদ্ধি, কুমন্ত্রণা, সংশয়, অবৈধ প্রেম, উদ্ভ্রান্তি, উন্মত্ততা, নির্লজ্জ গান-বাজনা, কুদৃষ্টি ইত্যাদির বসবাস থাকে।

রাসূল ﷺ কুরআনের সাথে নৈকট্য ও সম্পর্ক অনুপাতে সাহাবাদের সুসংবাদ প্রদান করতেন।

উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ছিলেন কারীদের সর্দার। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, 'আল্লাহ আমাকে তোমার কাছে এই আয়াত পড়ার আদেশ করেছেন–

উবাই ইবনে কাব সকলের মতো একজন সাহাবি। কিন্তু মহান আল্লাহ সাত আসমান উপর থেকে তার নাম নিয়েছেন! কী এমন সম্মান তার?

উবাই আশ্চর্য হয়ে রাসূলকে বললেন, 'আল্লাহ আপনার কাছে আমার নাম নিয়েছেন!'

রাসূল ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি।'

এ কথা শুনে উবাইয়ের দুচোখে আনন্দের অশ্রু প্রবাহিত হলো। রাসূল তার কাছে সূরা বায়্যিনা তেলাওয়াত করলেন। [বুখারি : ৩৮০৯]

রাসূল ﷺ উবাই ইবনে কাব এর কুরআনের সাথে সম্পর্ক, কোরআন সংরক্ষণের প্রাচুর্য, কুরআনের গভীর বোধ ও জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আবুল মুনযির, কুরআনের সবচেয়ে মাহাত্ম্যময় আয়াত কোনটি?'

উবাই উত্তর করলেন, 'আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন।'

রাসূল পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কুরআনের সবচেয়ে সুমহান আয়াত কোনটি?'

উবাই উত্তর দিলেন–

﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾

রাসূল ﷺ তার বুকে হাত রেখে বললেন, 'আবুল মুনযির, তোমার ইলম বৃদ্ধি পাক।' [মুসলিম : ৮১০]

এই সেই ইলম, যার জন্য প্রতিযোগিতা করা হয়। এই ইলমই হলো মানুষের অর্থবহ ইলম। উপকারী ইলম। রাসূল ﷺ উবাই ইবনে কাবের ইলম বৃদ্ধির দোয়া করলেন।

উবাই কারীদের সর্দার ছিলেন। এমনকি রাসূল ﷺ যখন সালাতে কোন আয়াত ভুলে যেতেন এবং কোন একজন সাহাবি তাকে সেই আয়াত স্মরণ করিয়ে দিতেন, রাসূল সালাত শেষে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তা আবার উবাইয়ের কাছে জিজ্ঞেস করতেন। কুরআনের সাথে উবাইয়ের অত্যুচ্চ অবস্থানের কারণেই রাসূল উবাইকে তা জিজ্ঞেস করতেন।

রাসূল ﷺ কোরআন শুনে খুবই প্রভাবিত হতেন।

ইবনে আবী হাতেম তার তাফসীর গ্রন্থে সূরা গাশিয়াহর আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, রাসূল ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলা তখন তেলাওয়াত করছিল–

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾

(আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?) [গাশিয়া: ০১]

রাসূল মাথা উঁচিয়ে খেয়াল করে শুনলেন, মহিলা বারবার এই আয়াত তেলাওয়াত করছে। মহিলা কাঁদছে আর তেলাওয়াত করছে। টেরও করতে পারেনি যে, কেউ একজন তার তেলাওয়াত শুনছেন।

রাসূলও তার তেলাওয়াত শুনে কেঁদে ফেললেন আর বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, আমার কাছে (আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত) পৌঁছেছে। হ্যাঁ, আমার কাছে পৌঁছেছে।'

রাসূল কোরআনময় জীবন কাটিয়েছেন। কোরআনের আয়াতগুলো ধরে ধরে চলেছেন। রাসূলের এই কোরআনময় জীবন থেকে সাহাবায়ে কেরাম কোরআনের প্রভাব গ্রহণ করতেন।

ইবনে কাসীর ﵀ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া গ্রন্থে ওমর ﵁ এর জীবনীতে লিখেছেন, ওমর একটি আয়াত পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও সে আয়াতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে তার শুশ্রূষা করেছেন।

কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, সে আয়াতগুলো ছিলো–

﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۝ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۝ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ﴾

এবং তাদের থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের কী হলো যে তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? বরং তারা আজকের দিনে আত্মসমর্পনকারী। [আস-সাফফাত: ২৪-২৬]

বান্দা যতক্ষণ কোরআন ভালো না বাসবে, ততক্ষণ আল্লাহ ﷻ-কে ভালোবাসা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, 'তোমরা কেউ আল্লাহ ﷻ-কে ভালোবাসার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে না। জিজ্ঞাসিত হবে কোরআনকে ভালোবাসার ব্যাপারে। কারণ, তুমি যখন কোরআনকে ভালোবাসবে, তখনই আল্লাহ ﷻ-কে ভালোবাসতে পারবে। কুরআনের প্রতি তোমার ভালোবাসা যতটুকু হবে, আল্লাহ ﷻ-র প্রতিও তোমার ভালোবাসা ততটুকুই হবে।'

এক রাতে উসাইদ বিন হুযাইর ﵁ সালাতে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করছিলেন। হঠাৎ তার ঘোড়াটি ভীত হয়ে লাফিয়ে উঠলো এবং ছুটাছুটি শুরু করলো। তিনি সালাত ছেড়ে দিলেন। তার শিশু ছেলেটি তখন ঘোড়ার পাশেই

বসে ছিলো। উসাইদ আশঙ্কা করলেন, ঘোড়া হয়তো তার ছেলেকে পদদলিত করছে। এই ভয়ে তিনি সালাত ছেড়ে দিলেন। দেখলেন, একটি ঝুলন্ত ছায়ার নিচে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন!

রাসূলের কাছে তিনি এসে সংবাদ জানালেন। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সেই ছায়া দেখেছ।'

উসাইদ বললেন, 'জি, দেখেছি।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় ফেরেসতারা তোমার তেলাওয়াত শোনার জন্য নেমেছিলো। তুমি যদি ভোর পর্যন্ত তেলাওয়াত করতে, তারাও ভোর পর্যন্ত এখানে অবস্থান করতো এবং লোকেরা তাদের দেখতে পেতো।' [মুসলিম : ৭৯৬]

সাহাবায়ে কেরামের রাত কাটতো কুরআনের সাথে। অথচ আমাদের রাত কাটে কোরআন ছাড়া অন্যকিছুর সাথে। আমাদের রাত্রি জাগরণ হয় অনর্থক কাজে। বেহুদা কথাবার্তায়, বেফায়দা গালগল্পে। এমন আড্ডায় আমাদের রাত কাটে, যা দিয়ে আল্লাহ ﷻ-র সাথে আমাদের নৈকট্য অর্জন হয় না। যা আমাদের দুনিয়াতে কোন কাজে আসে না, আখেরাতেও কোন কাজে আসে না। এভাবে আমরা আল্লাহ ﷻ-র সাথে আমাদের নৈকট্য হারিয়েছি। আল্লাহ ﷻ-র মনোনীত বান্দাদের অবস্থান থেকে আমরা অনেক দূরে সড়ে এসেছি। আমাদের রাতগুলো কাটছে খেল-তামাশায়, আর তাদের রাতগুলো কেটেছিলো কুরআনের সাথে। কবি বলেন–

'নিশুতি!

এই যে প্রেমবাসরের গোপন কথা, অভেদ আলাপ; দীর্ঘ তোমার প্রহরগুলোয় কী এমন আছে মোহময়?' –বলো!

নিশুতি বলে– 'যখন হয়ে আসে ভোর, অবিরল ঝরে কেবল রহমধারা, তখন অঞ্জলি ভরে নিবেদন কর পবিত্র প্রেমের অশ্রুমালা!

–এই তো জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া!'

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, একদিন খালা মাইমুনার ঘরে আমি রাত কাটিয়েছিলাম। ইশার সালাতের পর রাসূল ﷺ ঘরে এলেন, তখন আমি বিছানার এক পাশে শুয়েছিলাম।

রাসূল ﷺ বললেন, 'এই ছোট্ট ছেলে ঘুমিয়ে গেছে?'

ইবনে আব্বাস তখন ঘুমানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু এখনও ঘুমাননি।

মাইমুনা উত্তর করলেন, 'হ্যাঁ, সে ঘুমিয়ে গেছে।'

অতঃপর রাসূল ﷺ বিছানার কাছে এলেন। আল্লাহ ﷻ-র নাম স্মরণ করে দোয়া করলেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন।

ইবনে আব্বাস বলেন, 'আমি তখন তাঁর গভীর ঘুমঘোরে নাক ডাকার আওয়ায শুনেছিলাম।'

একটু পর রাসূল উঠলেন। চোখ থেকে ঘুম তাড়ালেন। অতঃপর তেলাওয়াত করলেন–

> নিশ্চয় আসমান ও যমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও যমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে,) পরওয়ারদিগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদের তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। [সূরা আলে ইমরান: ১৯০, ১৯১]

–এভাবে রাসূল দশটি আয়াত পূর্ণ তেলাওয়াত করলেন।

এরপর রাসূল ﷺ ঘর থেকে বের হলেন। ইবনে আব্বাস একটি পাত্র এবং পানি নিয়ে দরজার কাছে রাখলেন।

রাসূল ﷺ যখন ফিরে এলেন এবং দরজার কাছে পানি দেখলেন, বললেন, 'আমার জন্য এই পানি কে রেখেছে?'

ইবনে আব্বাস তখন রাসূলের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ মুখস্থ করে রেখেছিলেন।

এরপর রাসূল ﷺ বললেন–

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ

> হে আল্লাহ, তাকে দীনের বুঝ দান করো। দীনের ব্যাখ্যা শিখাও। [মুসলিম : ১৪৭৭]

এটাই ছিলো ইবনে আব্বাসের ইলমপূর্ণ জীবনের সূচনা। অতঃপর রাসূল ﷺ কিবলার দিকে ফিরে দোয়া করলেন–

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ

আল্লাহ, তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর নূর। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর মালিক। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য। তোমার বাণী সত্য। জান্নাত সত্য। দোযখ সত্য। সকল নবী সত্য। মোহাম্মদ সত্য। আল্লাহ, তোমারই জন্য আমি সমর্পিত। তোমাতেই আমি বিশ্বাস রেখেছি। তোমারই উপর ভরসা করেছি। তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করেছি। তোমারই রাহে লড়াই করেছি। তোমরাই দরবারে বিচার চেয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার পূর্বাপর ক্ষমা কর। আমার প্রকাশ্য-গোপনীয় সবকিছু ক্ষমা কর। [বুখারি : ১১২০]

অতঃপর রাসূল ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন। ইবনে আব্বাসও তার সাথে দীর্ঘ রাত সালাত আদায় করলেন। [মুসলিম : ৭৬৩]

রাসূল ﷺ সালাতে দীর্ঘ কোরআন পড়তেন। সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁর সাথে কেউ কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه বলেন, ‘এক রাতে রাসূল সালাতে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। রাসূল ﷺ কোরআন পড়তে থাকলেন। আমি এক পর্যায়ে ভিন্ন কিছু ভাবলাম।’

ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘আপনি কী ভেবেছেন?’

তিনি বললেন, 'আমি ভাবলাম যে আমি বসে যাবো এবং তাকে ডাক দিবো!'[বুখারি : ১১৩৫]

হোযায়ফা ﵁ বলেন, 'আমি রাসূল ﷺ-র সাথে সালাত পড়েছিলাম। রাসূল সূরা বাকারা শুরু করলেন। আমি ভাবলাম, একশ আয়াত শেষে রাসূল রুকু করবেন। কিন্তু তিনি সূরা বাকারা শেষ করলেন সূরা নিসা শুরু করলেন (ইবনে মাসউদের সহীফার ক্রমানুসারে)। রাসূল ﷺ সূরা নিসা তেলাওয়াত করছেন। আমি ভাবলাম, সূরা নিসা শেষে বুঝি রুকু করবেন। রাসূল ﷺ সূরা নিসা শেষে আলে ইমরান শুরু করলেন এবং তা তেলাওয়াত করলেন। প্রত্যেক তাসবীহের আয়াতে তাসবীহ পাঠ করলেন। প্রত্যেক রহমতের আয়াতে আল্লাহ ﷻ-র অনুগ্রহ মাগলেন। প্রত্যেক আযাবের আয়াতে আল্লাহ ﷻ-র কাছে পানাহ চাইলেন।' [মুসলিম : ৭৭২]

এই ছিলো রাসূল ﷺ-র সালাত!

সবিশেষ, আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্য অর্জনে বান্দার জন্য প্রথম পাথেয় হলো কোরআন। কুরআনের ছায়ায় বান্দার জীবন যাপন। বান্দার জীবনব্যাপী কুরআনের বোধের উন্মেষ, কুরআনের প্রতিগমন, কুরআনের আমল।

আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসার পাথেয় দুনিয়া বিমুখতা

আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসা পাওয়ার জন্য দ্বিতীয় পাথেয় হলো দুনিয়াবিমুখ থাকা। দুনিয়া থেকে মুক্ত ও পৃথক থাকা। সাহল ইবনে সাদ রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিস এ কথার উপর ইঙ্গিত করে। তিনি বলেন, "এক লোক রাসূল ﷺ-র কাছে আসলেন। রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি আমল বলে দিন, যা করলে আল্লাহ ﷻ আমাকে ভালোবাসবেন। মানুষও আমাকে ভালোবাসবে।'

রাসূল ﷺ বললেন–

اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيما عِنْدَ النَّاس يُحِبَّكَ النَّاسُ

দুনিয়া বিমুখ হও, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের কাছে অমুখাপেক্ষী হও, মানুষও তোমাকে ভালোবাসবে। [ইবনে মাজাহ : ১৪০২]

যেসব আমল মানুষকে আল্লাহ ﷻ-র নিকটতর করে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমল হলো দুনিয়ার প্রেম অন্তর থেকে দূর করা। যার অন্তর থেকে দুনিয়ার

প্রেম দূর হবে এবং অন্তরে আল্লাহর প্রেম বসবে, আল্লাহ ﷻ তাকে ভালোবাসবেন।

আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসা তার সমর্পিত বান্দা বা গোলাম হওয়া ব্যতীত পাওয়া যায়না। গোলাম হওয়ার অর্থ হল, আল্লাহ ﷻ-র কাছে বিনীত ও নম্র হওয়া। আল্লাহ ﷻ-র কাছে নিজেকে সমর্পন করা।

আল্লাহ ﷻ রাসূল ﷺ-র ইসরার শুভাগমনের কথা এভাবে বলেছেন–

> পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। [সূরা বনী ইসরাঈল: ০১]

রাসূল ﷺ উম্মতের জন্য সতর্ককারী ছিলেন। আল্লাহ ﷻ তার এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রেও বলেছেন–

> আর যখন আল্লাহর বান্দা তাকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হলো, তখন অনেক জিন তার কাছে ভিড় জমালো। [জিন: ১৯]

রাসূলের উপর কোরআন অবতরণের বর্ণনায়ও আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

> পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তার বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়। [ফুরকান: ০১]

আমাদের সালফে সালেহীন, পূর্ববর্তী নেকবান্দারা দুনিয়া বিমুখ থাকতেন। দুনিয়া তাদের হাতে থাকতো, কিন্তু তাদের অন্তরে স্থান পেতো না। এজন্য আল্লাহ ﷻ-ও তাদের ভালোবাসতেন।

রাসূল ﷺ তাদের এবং আমাদের অর্থ-সম্পদের মোহ থেকে সতর্ক করেছেন। কারণ মানুষ সাধারণত অর্থ-সম্পদের মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে। চাদর ও শালের আয়েশী হয়ে থাকে। পদ-পদবীর লোভী হয়ে থাকে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

> দীনার দিরহামের গোলাম লাঞ্ছিত হোক। শাল ও চাদরের গোলাম লাঞ্ছিত হোক। সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। তার পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে কেউ তা খুলবেনা। [বুখারি : ২৮৮৭]

কিন্তু কেন?

কারণ, সে তার প্রবৃত্তির পূজা করেছে। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আপনি কি তার প্রতি লক্ষ করেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। [জাসিয়া: ২৩]

মোহাম্মদ বিন ওয়াসির একটি ঘটনা বহুল আলোচিত। তিনি কুতাইবা বিন মুসলিমের বাহিনীতে ছিলেন। পুরো বাহিনী ইসলামী রাষ্ট্রে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পতাকা উড্ডীন করছিলেন।

কুতাইবা বিন মুসলিম মোহাম্মদ বিন ওয়াসিকে নেতা-মন্ত্রীদের সামনে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তার হাতে সাওরশৃঙ্গের মতো একটি গনীমতের খাযানা ছিল। তিনি মন্ত্রীদের তা দেখিয়ে বললেন, 'তোমরা কি এমন একজন মানুষ দেখাতে পারবে, যার কাছে আমি এসব অর্পণ করলে সে এসব ফিরিয়ে দিবে!'

মন্ত্রীগণ বললেন, 'এতসব সম্পদ থেকে বিমুখ থাকার মতো কেউ আছেন বলে আমাদের মনে হয় না।'

কুতাইবা বললেন, 'তোমাদের আমি উম্মতে মোহাম্মদী থেকে এমন একজন লোক দেখাবো, যার কাছে স্বর্ণ মাটির মতো। তোমরা মোহাম্মদ বিন ওয়াসিকে উপস্থিত কর।'

মন্ত্রীগণ মোহাম্মদ বিন ওয়াসিকে উপস্থিত করার জন্য তার খোঁজে গেল। তারা মোহাম্মদকে আল্লাহ ﷻ-র তাসবীহ ও প্রশংসা, এসতেগফাররত অবস্থায় খুঁজে পেলেন।

সকলে মিলে কুতাইবার দরবারে উপস্থিত হলেন। কুতাইবা স্বর্ণগুলো মোহাম্মাদের হাতে দিলেন। মোহাম্মদও তা গ্রহণ করলেন।

চিন্তায় পড়ে গেলেন কুতাইবা। ঘটনা এমন হওয়ার কথা নয়। কুতাইবার ধারনা ছিলো, মোহাম্মদ তা ফিরিয়ে দিবে। সকল নেতা-মন্ত্রীর সামনে কুতাইবার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল।

মোহাম্মদ স্বর্ণগুলো সাথে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। কুতাইবা কজন সৈন্য নিয়োজিত করলেন মোহাম্মাদের গন্তব্য পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য। কুতাইবা আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, 'আল্লাহ, আমার ধারনা ভুল প্রমাণিত করো না।'

মোহাম্মদ বিন ওয়াসি স্বর্ণগুলো নিয়ে বাইরে চলে এলেন। বাহিনী থেকে একজন গরীব সৈন্য খুঁজে তাকে সবগুলো স্বর্ণ দিয়ে দিলেন।

মোহাম্মাদের পিছনে নিয়োজিত কুতাইবার সৈন্যরা যখন কুতাইবাকে এই ঘটনা জানালেন, কুতাইবা তার আশপাশের লোকদের বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি, উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে এমন একজন লোক আছেন, যার কাছে স্বর্ণ মাটিতুল্য!'

এই হলো দুনিয়া বিমুখতা।

এই ঘটনাটি মানুষের অন্তর পরিবর্তনে অনেক বেশি প্রভাবক। আমরা যেন এই ঘটানটি খোতবা, বয়ান, শিক্ষাদানের পাশাপাশি দীক্ষাদানের মজলিসেও এই ঘটনাটি বেশি বেশি আলোচনা করি। আজ অনেক মানুষ এমন পাওয়া যাচ্ছে, যারা দুনিয়ার সেবাদাস। ফলে মানুষ ইলম চর্চা করছে না। দাওয়াতে অংশগ্রহণ করছে না। আল্লাহ ﷻ-র যিকির এবং কোরআন তিলাওয়াতের জন্য সময় পাচ্ছে না। সুতরাং আমরা এই ঘটনাটি বেশি বেশি আলোচনা করবো। যেন আমাদের অন্তরগুলো পরিবর্তন হয়, উদাসীনতা থেকে ফিরে আসে।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه বলেন, "রাসূল ﷺ একদিন আমার উভয় কাঁধে হাত রেখে বললেন–

> দুনিয়ার জীবনে তুমি গরীবের মতো থাকো, অথবা পথযাত্রীর মতো থাকো। [বুখারি : ৬৪১৬]

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। এমনকি এ কারণে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব থেকেও মুক্ত ছিলেন। অথচ তিনি ইচ্ছা করলেই এর উপযুক্ত ছিলেন। সকলে তার ব্যাপারে ঐক্যমতে ছিলো। তথাপি তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। তিনি রাসূলের নসিহতের উপর আমল করেছেন।

দুনিয়াবিমুখতা, দুনিয়া থেকে মুক্ত ও পৃথক থাকার অর্থ হলো দুনিয়ার অর্থবহ বিষয়গুলো শুধু গ্রহণ করা। এমনভাবে গ্রহণ করা, যেন সেসব বিষয় আমাকে দুনিয়ার বিষয়ে মাশগুল না করে, বরং সেসব বিষয় আল্লাহ ﷻ-র এতায়াতের ক্ষেত্রে আমার জন্য সহায়ক হয়।

অনেকে মনে করেন, দুনিয়া থেকে মুক্ত থাকার অর্থ দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়া।

এই ভাবনা সঠিক নয়।

অনেকে বলেন, হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা হলো দুনিয়া থেকে মুক্ত থাকা। এই সংজ্ঞাটি ইমাম আহমদ ﷬ প্রদত্ত বলে বর্ণনা করা হয়।

কিন্তু এই সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষই দুনিয়াবিমুখ হিসেবে পরিগণিত হন।

ইবনে তাইমিয়া ﷬ বলেন, দুনিয়া থেকে মুক্ত থাকার অর্থ হল এমন বিষয়-আশয় থেকে মুক্ত থাকা, যা আখেরাতে কোন উপকারে আসবে না।

দুনিয়ার যা কিছু আখেরাতে উপকারে আসবে, তা থেকে বিরত থাকার নাম দুনিয়াবিমুখতা নয়।

আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসার পাথেয় কিয়ামুল লাইল

আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসা লাভের তৃতীয় পন্থা হলো কিয়ামুল লাইল। ইবাদাতে রাত্রি জাগরণ। রাত জেগে সালাত আদায় করা। রাতের কোলে আল্লাহ ﷻ-কে ডাকা। তাহাজ্জুদের মুসল্লায় আল্লাহ ﷻ-র দরবারে দুই হাত বিগলিত করে তোলা। রাতজাগা মুসল্লায় নিজের অবস্থাগুলো মিনতির সাথে আল্লাহ ﷻ-র কাছে ব্যক্ত করা।

আল্লাহ ﷻ তাঁর মনোনীত বান্দাদের গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেন–

> তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায়। এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি, তারা তা থেকে ব্যয় করে। [সূরা আস-সাজদা: ১৬]

আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ ﷻ তাদের প্রশংসা করে বলেন–

> তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে, যারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তারা সেজদা করে। [সূরা আলে ইমরান: ১১৯]

আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাদের প্রশংসা করেছেন এ জন্য যে, তারা রাতের গভীরে তেলাওয়াত করে। আল্লাহ ﷻ-কে সেজদা করে।

ফজরের আগে, রাতের অর্ধাংশে বা তৃতীয়াংশের কাছাকাছি যে কোন সময়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেই কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ অর্জন হবে।

আবু হোরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

> মহামহিম আল্লাহ প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, 'কে আছে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো। কে আছে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে তা দিবো। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো। [বুখারি : ১১৪৫]

আল্লাহ ﷻ নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন, তার মহত্ত্ব অনুযায়ী যেভাবে তা উপযুক্ত হয়, সেভাবেই তিনি অবতরণ করেন। আমরা এর কোন আকৃতি অবস্থা দৃষ্টান্ত কিছুই উপস্থিত করবো না।

রাতের পুণ্যময় এ অংশটি অনেকেরই হাতছাড়া হয়ে যায়। যার থেকে রাতের এ অংশটি ছুটে যায়, সে বঞ্চিত। সে পরিত্যক্ত। অবশ্য কেউ যদি সফরে থাকে, অসুস্থ থাকে, অত্যাবশ্যকীয় কোন কাজে ব্যস্ত থাকে, তাহলে তার কথা ভিন্ন। সে বঞ্চিতদের দলে নয়।

রাসূল ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

> হে আব্দুল্লাহ, এমন ব্যক্তির মতো হয়ো না, যে রাত জেগে এবাদত করতো, পরে রাত জেগে এবাদত করা ছেড়ে দিয়েছে। [বুখারি : ১১৫২]

ইবনে ওমর رضي الله عنه বলেন, রাসূলের যুগে কোন সাহাবি স্বপ্ন দেখলে তা রাসূলের কাছে বর্ণনা করতো। আমারও মনে আকাঙ্ক্ষা জাগল, যদি একটি স্বপ্ন দেখি, তাহলে রাসূলের কাছে বর্ণনা করবো।

আমি তখন অবিবাহিত যুবক ছিলাম। আমার কোন পরিবার ছিল না। মসজিদে ঘুমাতাম আমি।

একদিন মসজিদে ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, দুই ব্যক্তি এসে আমার হাত ধরল। তারা আমাকে একটি বাঁধানো কূপের দিকে নিয়ে গেল। আমি কূপে নামলাম। ভয় পেয়ে গেলাম। ফেরেশতা দুজন আমাকে বলল, 'ভয় পেওনা।'

আমি রেশমের একপ্রস্ত কাপড় নিলাম। সেই কাপড় দিয়ে সবুজ বাগানের যে দিকেই ইঙ্গিত করছি, আমাকে সেদিকেই উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সকালে আমার বোন হাফসাকে আমি স্বপ্নের কথা বললাম। হাফসা রাসূলের পত্নী। সে রাসূলের কাছে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করল। রাসূল বললেন–

আব্দুল্লাহ কত ভালো লোক! যদি সে রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করতো! [বুখারি : ১১২২, ১১৫৭]

নাফে বলেন, এরপর থেকে ইবনে ওমর ﵁ রাতে অল্পই ঘুমাতেন।

তিনি যখন সফরে যেতেন, রাতভর সালাত আদায় করতেন। এরপর বলতেন, 'হে নাফে, ফজর উদিত হয়েছে কি?' নাফে যদি বলতেন, না, এখনও ফজর উদিত হয়নি, তাহলে ইবনে ওমর আবার সালাত পড়তেন। আর যদি বলতেন, হ্যাঁ, ফজর উদিত হয়েছে, তাহলে ইবনে ওমর বিতর আদায় করতেন। এরপর ফজর আদায় করতেন।

কিয়ামুল লাইলের জন্য সহায়ক কিছু পাথেয়:

১. দিনের বেলা আল্লাহ ﷻ-র অবাধ্যতা কমিয়ে দেয়া।

জনৈক ব্যক্তি হাসানকে বললেন, 'হে সাঈদের বাবা, আমি যে কিয়ামুল লাইল করতে পারি না!'

হাসান উত্তর দিলেন, 'কাবার প্রভুর কসম! তোমার অবাধ্যতা তোমাকে কয়েদ করে রেখেছে।'

২. একটি পাথেয় হল তাসবীহে ফাতেমী পাঠ করা, যা রাসূল ﷺ আলী এবং ফাতেমাকে শিখিয়েছিলেন। অর্থাৎ, সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার, আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার পাঠ করা। [বুখারি : ৩১১৩]

৩. আরও একটি পাথেয় হল অযথা রাত না জাগা। আল্লাহ ﷻ-র রহমতপ্রাপ্ত বান্দাগণ ছাড়া এখনকার মানুষ আল্লাহ ﷻ-র অসন্তুষ্ট কাজকর্মে রাত জেগে থাকে। আল্লাহ ﷻ আমাদের হেফাযত করুন।

৪. আরও একটি পাথেয় হল দিনে কাইলূলা করা। দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম গ্রহণ করা। এতে রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায় এবং আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি অর্জন করা সহজ হয়।

কিয়ামুল লাইল রাসূল ﷺ-র সুন্নত। ইসলামের একটি নিদর্শন। আমরা যেদিন থেকে কিয়ামুল লাইল ছেড়ে দিয়েছি, সেদিন থেকে ঈমানের উষ্ণতা হারিয়ে ফেলেছি। মন নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের থেকে আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্য হারিয়ে গেছে।

আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসার পাথেয় তাঁর কর্মকুশল নিয়ে চিন্তা করা

আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসা অর্জনে চতুর্থ করণীয় হল আল্লাহর সৃষ্টিকূলের ভিতর চিন্তা-গবেষণা করা। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> নিশ্চয় আসমান ও যমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও যমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার, এসব তুমি অনর্থ সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই। আমাদের তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। [সূরা আলে ইমরান: ১৯০, ১৯১]

কবি বলেন–

সবকিছুতেই আছে আল্লাহ ﷻ-র পরিচয়, তা বুঝায় আল্লাহ ﷻ-র একত্ব।

কীভাবে খেলাফ করা হয় আল্লাহর! কীভাবে অবিশ্বাসী করে যে অস্বীকার!! হতে হয় বড় আশ্চর্য!!!

প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি পলকে, প্রতিটি গাছে, পাহাড় আর ফুলে ফুটে আছে আল্লাহ ﷻ-র নিদর্শন। কত নিদর্শন আমরা দেখি, কিন্তু আল্লাহ ﷻ-র তাওফীকপ্রাপ্ত বান্দাগণ ব্যতীত আমরা সেসবে চিন্তা-গবেষণা করিনা। আল্লাহ বলেন–

> তারা কি উটের প্রতি লক্ষ করে না, তা কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং আকাশের প্রতি লক্ষ করে না, তা কীভাবে সুউচ্চ করা হয়েছে! পাহাড়ের

দিকে লক্ষ করে না, তা কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে! এবং পৃথিবীর দিকে লক্ষ করে না, তা কীভাবে সমতল বিছানো হয়েছে! [গাশিয়াহ: ১৭-২০]

চিন্তা-গবেষণা মানুষকে ইবাদাতের প্রতি বেশি উদ্দীপনা যোগায়। চিন্তা-গবেষণা নেককারদের একটি এবাদত, তারা আল্লাহ ﷻ-র সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-গবেষণা করেন। আল্লাহ ﷻ-র সৃষ্টিকূলে চিন্তা-গবেষণা করেন। আল্লাহ ﷻ-র সৃজিত আশ্চার্যাবলী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। এভাবে তারা ঈমান ও স্থীর বিশ্বাসের পথে গমন করেন।

আমরা যদি আমাদের ভ্রমণগুলো, আমাদের ফূর্তিগুলো আল্লাহ ﷻ-র নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-গবেষণার নিয়তে করি, তাহলে একজন মানুষ যখন কোন গাছের পাশ দিয়ে হাঁটবে, গাছ যেন তার সাথে কথা বলবে। বলে উঠবে– লা ইলাহা ইল্লাহু...

চিন্তা-গবেষণা আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসা প্রাপ্তির অন্যতম একটি পাথেয়। আল্লাহ ﷻ সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যেন আমরা চিন্তা-গবেষণা করি, আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করি।

কবির ভাষায়–

ডাক্তার! খোয়া গেলো তোমার হাত বিনাশবনে! কে সে করেছে রুগ্ন তোমায় তার ডাক্তারি বিদ্যা দিয়ে!

ও রুগী, মুক্ত হয়েছো! সুস্থ হয়েছো! কে দিলো সে পরিত্রাণ, যবে হার মেনেছিলো সব চিকিৎসা-জ্ঞান!

মৌমাছি, উড়ছো তুমি উপত্যকায়, বলো, কে করেছে তোমায় মধুর এতো, দিয়েছে এই মধু তোমায়!

অজগর! শ্বাস ছাড়ো! শ্বাসে শ্বাসে বিষ ছাড়ো!! কে বানিয়েছে তোমায় বিষধর!

কীভাবে তুমি আছো বেঁচে বিষ রেখে মুখভর! আল্লাহ, প্রশংসা শুধু তোমারই।

কোন প্রশংসা তুমি ছাড়া নাই আর কারোরই।

তারাই যথার্থ সফলকাম

সকল প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-র জন্য। আমরা আল্লাহ ﷻ-র কাছে ক্ষমা চাই। তারই কাছে হেদায়াত চাই। তারই কাছে আশ্রয় চাই আমাদের নফসের ধোঁকা থেকে। আশ্রয় চাই আমাদের খারাপ সকল আমল থেকে, আমলসমূহের বিচ্যুতি থেকে। আল্লাহ ﷻ যাকে হেদায়াত দেন, তাকে ভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ ﷻ যাকে পথহারা করেন, তাকে হেদায়াত দানকারী কেউ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ﷻ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মোহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। মোহাম্মাদের উপর বর্ষিত হোক অগুণতি দুরূদ ও সালাম।

মহান আল্লাহ বলেন—

> আলিফ লাম মীম। এ সেই কিতাব, যাতে কোনই সন্দেহ নেই, পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য। যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযি দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম। [বাকারা: ০১-০৫]

সূরা বাকারার ফযীলত :

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, এই সূরায় একশটি আদেশ, একশটি নিষেধ এবং আরো একশ বার্তা রয়েছে।

যে ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত হয়, সে ঘর থেকে শয়তান বিতাড়িত হয়।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

তোমরা কোরআনের দুই কুসুমাংশ তেলাওয়াত করো– সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান। সূরা দু'টি কেয়ামতের দিন মেঘের দু'টুকরো ছায়া হয়ে অথবা সারিবদ্ধ কোন পাখির ঝাঁকের মতো আত্মপ্রকাশ করে তার তেলাওয়াতকারীকে ছায়া দান করবে। [মুসলিম : ৮০৪]

আনাস ﷺ বলেন, কোন সাহাবি যদি সূরা বাকারা মুখস্থ করতো, সে অন্যদের চেয়ে অগ্রজ, দলপতি ও ইমাম হওয়ার যোগ্যতা রাখতো।

রাসূল ﷺ একটি সারিয়্যা (যে যুদ্ধদলে রাসূল অংশগ্রহণ করেননি) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য পাঠালেন। পাঠানোর সময় তাদের আমির নির্ধারণ করার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কোরআন বেশি শিখেছে কে?'

জনৈক সাহাবি বললেন, 'আমি সূরা বাকার শিখেছি।'

রাসূল বললেন, 'তুমি সূরা বাকারা শিখেছ?'

সাহাবি বললেন, 'জী, আল্লাহর রাসূল!'

রাসূল বললেন, 'ঠিক আছে, তুমিই দলের আমির।' [মুস্তাদরাকে হাকিম : ১৬২২]

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

তোমরা তোমাদের ঘরগুলো কবরে পরিণত করোনা। যে ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত হয়, সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করেনা। (তিরমিযী গ্রন্থে হাসান সনদে বর্ণিত) [মুসলিম : ৭৮০]

এক নেককার বান্দা তার ঘরে জিনের উপদ্রব পেয়েছিল। ওলামায়ে কেরাম তাকে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করতে বললেন। তিনি যখন সূরা বাকারা তেলাওয়াত করলেন, আল্লাহ ﷻ-র হুকুমে তার ঘর থেকে জিন তাড়িত হল।

আয়াতগুলোর গভীর বার্তা

আলিফ লাম মীম; এ হরফগুলোর কী এমন তাৎপর্য, যা দিয়ে আল্লাহ ﷻ সূরা বাকারা শুরু করেছেন!
এগুলো সেই মুজিযা, যা দিয়ে আল্লাহ ﷻ আরবের কবি-সাহিত্যিকদের চ্যালেঞ্জ করেছেন। আল্লাহ ﷻ তার কিতাব দিয়ে কাফেরদের অহঙ্কার মলীন

করেছেন। শ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের মুখে কুলুপ লাগিয়েছেন। বড় বড় কবিদের বাকহারায় পরিণত করেছেন।

প্রত্যেক উম্মতের কিছু বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য থাকে। আল্লাহ ﷻ সমকালীন নবীদের সেই বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্রেরণ করেছেন।

মুসা ﷺ-র উম্মত যাদুবিদ্যায় অনেক কৌশলবাজ হয়ে উঠেছিল। আল্লাহ ﷻ মুসা ﷺ-কে এক জিয়নকাঠি দান করলেন। উম্মত যা কিছু যাদুকুশল অর্জন করেছিল, মুসা ﷺ-র জিয়নকাঠির এক ঝলকে সব এক নিমিষে হাওয়া হয়ে গেল।

ঈসা ﷺ-র উম্মত চিকিৎসা ও টেকনোলজিতে কালের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেছিল। আল্লাহ ﷻ ঈসা ﷺ-কে কুষ্ঠ ও অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দানের অলৌকিকতা দান করেছিলেন। মৃতকে জীবিত করার মুজিযা দান করেছিলেন।

প্রসঙ্গাত আমার কসীদায়ে বুরদার মতো একটি কবিতা বানানোর শখ হল–

তোমার ভাই ঈসা ডাকল এক মৃতকে, অমনি সে উঠে দাঁড়ালো!

আর তুমি জীবিত করেছ কতো প্রজন্মকে, কালের ক্ষয় আর পচন থেকে!

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আর যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে; –সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে, সেখান থেকে বেরুতে পারছে না! [আন'আম: ১২২]

মক্কার কাফেররা রাসূলের তেলাওয়াত শুনতো। তারা আরবী ভাষার অলঙ্কার শৈলী ভালোই জানতো। এজন্য কোরআনের ভাষাশৈলী এবং মুজিযা তারা বুঝতো। তারা ভয় পেয়ে গেল, কোরআন অবশ্যই আমাদের প্রভাবিত করবে।

তুফাইল ইবনে আমর বলেন, 'আমি তখনও মক্কার কাফের ছিলাম। আমি আমার কানে তুলা বুজে রাখতাম। একদিন রাসূল ﷺ কাবার পাশে তিলাওয়াত করছেন। আমি যখন তার কাছাকাছি আসলাম এবং তার তিলাওয়াতের আওয়ায স্পষ্ট শুনলাম, মনে মনে ভাবলাম– আশ্চর্য! আমি

একজন কবি ও সাহিত্যিক। আমি কেন তার তেলাওয়াত শুনছি না! আমি তার তেলাওয়াত শুনবো। তেলাওয়াত যদি আমাকে আচ্ছন্ন করে, তবে তো বেশ! আর যদি আচ্ছন্ন না করে, তাহলে বুঝবো কোরআন আসলে যাদু।'

আমি তার তেলাওয়াত শুনতে লাগলাম। আমার আরও শুনতে মন চাইল। কান থেকে তুলা ফেলে দিলাম। আল্লাহর কসম, তখন কোরআন আমার অন্তরে অঙ্কিত হয়ে গেল।

অতঃপর আমি রাসূলের কাছে গেলাম। রাসূলের সামনে বললাম, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল।' [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/৯৯]

জুবাইর ইবনে মুতঈম ﵁। তিনি ছিলেন মক্কার নেতৃস্থানীয় একজন। তিনি কসম করেছিলেন, কোরআনের একটি আয়াতও তিনি শুনবেন না।

সব আল্লাহরই ইচ্ছা। আল্লাহ ﷻ যুবাইরকে দোযখ থেকে নিষ্কৃতি দিতে চাইলেন। একদিন রাসূল ﷺ হারামের ভিতর কোরআন তেলাওয়াত করছেন। যুবাইর শুনলেন। রাসূল ﷺ মাগরিবের সালাত আদায় করছেন। তার তিলাওয়াতের আওয়াযও ছিলো সজোরে—

> وَالطُّوْرِ ﴿١﴾ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ﴿٢﴾ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ﴿٣﴾ وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ﴿٤﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ﴿٥﴾
>
> শপথ তূর পর্বতের, এবং লিখিত কিতাবের, প্রশস্ত পত্রে, কসম বাইতুল মামুরের তথা আবাদ গৃহের, এবং সমুন্নত ছাদের ...' [সূরা আত-তূর: ০১-০৫]

যুবাইর বলেন, তেলাওয়াত শুনে আমার অন্তর যেন উড়ে উড়ে যাচ্ছিল! রাসূলের তেলাওয়াত শুনে যুবাইর সাথে সাথে ঈমান আনলেন।

হারেস ইবনে কালাদা। বিচক্ষণ একজন দার্শনিক। বে-ঈমান। সে কোরআনের মতো একটি কিতাব রচনায় উদ্যোগ নিল।

হীতাকাঙ্ক্ষীরা তাকে এ কাজ থেকে বারণ করেছিল। হারেস কারও কথা শোনেনি। সে তার একগুয়েমিতে অটল রইল।

কোরআনের মত আরেকটি কিতাব রচনা শুরু করল। উদ্যত হারেসের তার দৃষ্টি পড়ল সূরা মায়েদার এই আয়াতের উপর–

> মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত। কিন্তু ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন। [মায়েদা: ০১]

হারেস এই আয়াত দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। সে বলল, এ কেমন আয়াত! একই আয়াতে প্রথমে আহ্বান, অতঃপর আদেশ! আবার আদেশ থেকে ব্যতিক্রম বিধান! প্রশংসা! বৈশিষ্ট্য বর্ণনা! একই আয়াতে এতকিছু!

হারেস বোকা বনে গেল। এক পর্যায়ে তার অর্ধেক শরীর অবস হয়ে গেল। এটি ছিল তার দুনিয়ার শাস্তি। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> নিশ্চয় আখিরাতের শাস্তি আরও লাঞ্ছনাকর, আর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। [ফুসসিলাত: ১৬]

আবুল আলা আল-মারি। অত্যন্ত বিচক্ষণ একজন লোক। ঈমান গ্রহণের তাওফিক হয়নি তার। সে কোরআনকে পরীক্ষা ও যাচাইবাচাই করতে উদ্যত হয়েছিল।

আবুল আলা আল-মারির মৃত্যু হল। দাফনের পর কোন এক কারণে তার কবর খোলার প্রয়োজন হল। কবর খুলতেই দেখা গেল তার মুখের উপর একটি সাপ, লেজ দিয়ে তার দুই পা পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে!

'আলিফ লাম মীম'

আয়াতে এ হরফগুলোর উদ্দেশ্য নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরাম মতভিন্নতা করেছেন। মূলত আল্লাহ ﷻ-ই এর উদ্দেশ্য সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন।

নব-আবিস্কৃত কিছু দল এ হরফগুলোর উদ্দেশ্য নির্ণয়ে বলে থাকে–

ألف : أَلَّفَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا فَبَعَثَهُ نَبِيًّا

আলিফ অর্থ আল্লাহ মোহাম্মদকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর তাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

لام : لَامَ اللّٰهُ الْمُشْرِكِيْنَ

লাম অর্থা আল্লাহ মুশরিকদের ধিকৃত করেছেন।

ميم : مَقَتَ اللهُ مَعَادِيْهِ

মীম অর্থ আল্লাহ তার বিরোধীদের তিরস্কার করেছেন।

এসব ব্যাখ্যা মূলত নির্বোধদের নিরর্থক ব্যাখ্যা। এসব ব্যাখ্যার কোন ভিত্তি নেই।

অনেকে বলেন, আলিফ লাম মীম হরফগুলো একত্র করলে অসংখ্য অর্থবোধক শব্দ প্রমীত হয়। এই ব্যাখ্যাটি ইবনে আব্বাস ﷻ থেকে বর্ণনা করা হয়।

মূল কথা হল, এসব হরফ আল্লাহ ﷻ আরবদের সামনে রেখেছেন তাদেরকে অবাক করার জন্য। আল্লাহ ﷻ হরফগুলো তাদের সামনে রেখে বলেছেন, তোমরা সাধ্য থাকলে কোরআনের অনুরূপ কিছু তৈরি কর। যোগ্যতা থাকলে কোরআনের ছাঁচে কিছু রচনা কর।

কোরাইশের অন্যতম সাহিত্যিক ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা। একবার সে কোরআন শুনে বলল, 'আল্লাহর কসম, এই কোরআনের উপরিভাগ প্রাচুর্যপূর্ণ, আর নিম্নভাগ হল পল্লবিত। এই কোরআনে রয়েছে বিশেষ মিষ্টতা, রয়েছে বিশেষ মাধুর্যতা। এই বৈশিষ্ট্যগুলো মহান এই কিতাবের মুজিযা। যিনি এই কিতাব নাযিল করছেন, তিনি কতো মহান!'

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ

এ সেই কিতাব। [বাকারা: ০২]

আয়াতাংশ মূলত কোরআনের প্রশংসা।

আল্লাহ ﷻ এখানে 'এ সেই কোরআন' বলেননি, 'এ সেই কিতাব' বলেছেন। কেমন যেন এটাই শুধু কিতাব, অন্য কিতাব কোন কিতাবই নয়। যেমন আমরা কারো প্রশংসায় বলে থাকি, 'এ সেই ব্যক্তি' 'এ সেই সাহসী'। অর্থাৎ এই ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তির মত নয়।

لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ

যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। [বাকারা: ০২]

সুতরাং এই কিতাবে কোন যালিম ব্যতীত আর কেউ সন্দেহ করতে পারে না। মহান আল্লাহ ﷻ বলেন–

> এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। [ফুসসিলাত: ৪২]

যে ব্যক্তি কোরআনের উপর আমল করল, সে প্রতিদানপ্রাপ্ত হল। যে ব্যক্তি কোরআন অনুযায়ী বিচার করল, সে ইনসাফ করল। যে ব্যক্তি কোরআন অনুযায়ী চলল, সে সরল-সঠিক পথের উপর চলল।

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢﴾

> এই কিতাব পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য। [বাকারা: ০২]

কুরআন মানুষের পথ প্রদর্শনকারী, হেদায়াতের বাহন। এই পথ প্রদর্শনের দুটি পর্যায় রয়েছে। একটি হল শুধুই পথ দেখানো। যা রাসূল ﷺ-র মাধ্যমে হয়েছে, এবং দীনের প্রত্যেক দাঈর মাধ্যমে হচ্ছে।

অপরটি হলো হেদায়াতের তাওফিক। বান্দার হেদায়াত গ্রহণ। এটি শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। যেমন কোরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে সে সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন। [কাসাস: ৫৬]

আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢﴾

> এই কিতাব পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য। [বাকারা: ০২]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ ﷻ মুসলমানদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী না বলে পরহেযগারদের বা মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী বলেছেন। কারণ মুসলমানদের অনেক স্তর রয়েছে। অনেক মুসলমান কবিরা গোনাহে লিপ্ত থাকে। কোরআন তাদের জন্য ব্যাপক ও পরিপূর্ণ হেদায়াত নয়। অনেক মুসলমান আবার হরহামেশাই আল্লাহ ﷻ-র অবাধ্যতায় মত্ত থাকে। কোরআনের ব্যাপক হেদায়াতে তারা অন্তর্ভুক্ত নয়। এজন্যই আল্লাহ ﷻ মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী বলেছেন। কোরআন তাদেরকেই সবচেয়ে

বেশি হেদায়াত দিয়ে থাকে। মুত্তাকীগণ নিজেদের কোরআনের আলোকে যাচাই করে চলেন। কোরআনের আদেশসমূহ পালন করেন, নিষেধসমূহ থেকে বেঁচে থাকেন। কোরআনের স্পষ্ট বিষয়াদিতে ঈমান রাখেন, অস্পষ্ট বিষয়সমূহ আল্লাহ ﷻ-র কাছে সমর্পন করেন।

পরহেযগার বা মুত্তাকীর উদ্দেশ্য হল যারা তাকওয়া অর্জন করেছেন। আল্লাহ ﷻ-র এক নূরকে তারা ভয় করেছেন। নূরের রশ্মি ধরে আল্লাহ ﷻ-র রহমতের আশা রেখেছেন। নূরের জ্যোতি ধরে নেক কাজ করেছেন, সাওয়াবের আশা রেখেছেন। নূরের তাজাল্লীতে পাপকাজ থেকে বেঁচে রয়েছেন, আল্লাহ ﷻ-র আযাব ও গযবকে প্রাণপণে ভয় করেছেন।

তাকওয়ার অর্থ হল আদিষ্ট দায়িত্ব পালন করা। নিষিদ্ধ পথ পরিহার করা। আল্লাহ ﷻ-র বাণীসমূহে অন্তরমম বিশ্বাস রাখা।

তাকওয়ার অর্থ হল আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যসহ নেককাজ করা এবং পাপকাজ ত্যাগ করা।

আলী رضي الله عنه বলেন, মহামহিম আল্লাহ ﷻ-র ভয়, তার অবতীর্ণ বিষয়ে আমল, অল্পেতুষ্টি এবং মৃত্যুর প্রস্তুতির নাম হল তাকওয়া।

ইবনে মাসউদ رضي الله عنه বলেন, কখনও আল্লাহ ﷻ-কে না ভুলে তার স্মরণে নিজেকে উজ্জীবিত রাখা। আল্লাহ ﷻ-র অবাধ্য না হয়ে তার আনুগত্যে সদা নীত থাকা। আল্লাহ ﷻ-র নেয়ামতের অস্বীকার না করে তার কৃতজ্ঞতায় সর্বদা নুয়ে থাকা।

তাকওয়ার অর্থ হল আল্লাহ ﷻ-র আযাব ও বান্দার মাঝে একটি আড় তৈরি করা।

ওমর رضي الله عنه উবাই ইবনে কাবকে বললেন, 'আমাকে তাকওয়ার পরিচয় শোনাও।'

উবাই বললেন, 'আপনি কাঁটা বিছানো রাস্তায় হেঁটেছেন কখনও?'

ওমর বললেন, 'হ্যাঁ, হেঁটেছি।'

উবাই বললেন, 'কীভাবে হেঁটেছেন?'

ওমর বললেন, 'খুব সতর্ক হয়ে কাপড় গুটিয়ে হেঁটেছি।'

অদৃশ্যে ঈমান আনাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে অদৃশ্যে ঈমান আনবে না, তার থেকে আল্লাহ ﷻ কোন কিছুই কবুল করবেন না। তার দিকে আল্লাহ ﷻ ফিরেও তাকাবেন না। তাকে পরিশুদ্ধও করবেন না। তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ

যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে। [বাকারা:০৩]

সালাত প্রতিষ্ঠা করা মুত্তাকীদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ ﷻ যেখানেই মুমিনদের কথা আলোচনা করেছেন, সেখানেই সালাত প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। আর যেখানে মুনাফিকদের কথা বলেছেন, সেখানে বলেছেন সালাত পড়ার কথা।

সালাত আদায়কারী ব্যক্তি দুই ধরণের হয়ে থাকে। এক ধরণের লোক সালাত প্রতিষ্ঠা করে। আরেক শ্রেণীর লোক সালাত শুধু আদায় করে। যারা সালাত শুধু আদায় করে, সালাত তাদেরকে গর্হিত ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে না। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, তাদের সালাত তাদেরকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ ﷻ বলেন–

নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। [আনকাবূত: ৪৫]

অনেকেই আশ্চর্য প্রকাশ করেন, কোন ব্যক্তি সালাতও পড়ছেন, খারাপ কাজও করছেন! কোন ব্যক্তি সালাতও পড়ছেন, আবার যিনা-চুরির মতো অপরাধও করছেন! এর কারণ হলো, তিনি সালাত শুধু আদায় করছেন, প্রতিষ্ঠা করছেন না। সালাত তাদেরকেই অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে, যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

সালাত প্রতিষ্ঠার অর্থ হল, সালাতের খুশূ-খুযূর প্রতি গুরুত্ব রাখা। অযু, এখলাস, রুকূ, সেজদা, সালাতের সকল যিকির-আযকারের প্রতি গুরুত্বশীল থাকা।

وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾

আর আমি তাদেরকে যে রুযি দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। [বাকারা: ০৩]

এটি মুত্তাকীদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য।

অর্থাৎ, আমি যা রিযিক দিয়েছি, তা থেকে সব নয়, কিছু কিছু খরচ করে। আল্লাহ ﷻ যদি বলতেন, 'আমি যা রিযিক দিয়েছি, তাই ব্যয় করে' –তাহলে বান্দার উপর সাধ্যাতীত কষ্ট হয়ে দাঁড়াতো। কারণ, কোন মানুষের পক্ষেই সকল রুযি আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় খরচ করা সম্ভব নয়।

আয়াতে বেশি বেশি খরচ করার প্রশংসা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ﷻ বলেন–

> যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোনই আশঙ্কা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। [বাকারা: ২৬২]

> বলুন, আমার পালনকর্তা তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত পরিমাণে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিযিকদাতা। [সাবা: ৩৯]

> এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না, এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। [ফুরকান: ৬৭]

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদের রুযি হিসেবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর। [বাকারা: ১৭২]

> তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী, এবং শেষরাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী। [আলে ইমরান: ১৭]

অনেক সাহাবি এমন আছেন, যারা আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় বিপুল পরিমান খরচ করেছিলেন। আবু বকর, উসমান, আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ رضي الله عنهم বলতে গেলে তাদের সকল সম্পদই আল্লাহ ﷻ-র জন্য খরচ করেছিলেন।

আবু বকর رضي الله عنه তার সকল সম্পদ, শরীরের রক্ত, চেষ্টা ও মেহনত, সময়, সবকিছু আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় খরচ করেছিলেন। বিনিময়ে আল্লাহ ﷻ-ও তাকে নবী-রাসূলদের পরে সবচেয়ে কাছের বন্ধু বানিয়েছেন।

উসমান ﷺ 'রূমার কূপ' মুসলমানদের অবাদে ব্যবহারের জন্য নিজ অর্থে ক্রয় করে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাবুক যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য নিজ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে সামানা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। তখন রাসূল ﷺ বলেছিলেন–

> আজকের পরে উসমান যে আমলই করুক না কেন, তা তাকে কোন ক্ষতি করবে না। [মুসনাদে আহমাদ : ২০১০৭]

(রাসূল ﷺ যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন মদীনার কোথাও সুপেয় মিঠাপানি পাওয়া যেত না। শুধু একটি কূপেই সুপেয় মিঠাপানি ছিলো। সেই কূপটি হল রূমার কূপ। রাসূল ﷺ তখন বলেছিলেন, যে রূমার কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের অবাদে ব্যবহারের জন্য ওয়াকফ করে দিবে, বিনিময়ে সে বেহেশতে তদপেক্ষা উত্তম কূপ লাভ করবে। অতঃপর উসমান ﷺ একান্ত ব্যক্তিগত অর্থে কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। দ্র. মানাকিবে উসমান, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, মেশকাত। –অনুবাদক)

আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ ﷺ এক মুহূর্তে গদি ও পালানযুক্ত সাতশ উট খাদ্যসহ আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় খরচ করেছিলেন।

কবি বলেন–

'কোন প্রয়োজনের খোঁজে তারা কাঠ পুড়ে মাটি খুঁড়তেন না। তারা শুধু আপন চেহারা উদ্ভাসিত করে তুলতেন; দেখতেন তাদের প্রয়োজনগুলো ধারণ করেছে সর্বোত্তম রঙ-বেরঙ!'

তিন ধরনের মানুষ আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় খরচ করে। প্রথমত, এক শ্রেণীর মানুষ লোক দেখানোর জন্য এবং প্রশংসা কুড়ানোর জন্য খরচ করে। এদের জন্য কোন সাওয়াব থাকবে না। বরং দোযখের আগুন সর্বপ্রথম এদের দ্বারা প্রজ্বলিত হবে।

দ্বিতীয়ত এক শ্রেণীর মানুষ, যারা চক্ষুলজ্জায় বা অভ্যাসবসে খরচ করে। এরা আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় খরচের প্রতিদান পাবে।

তৃতীয়ত এক শ্রেণীর মানুষ ইখলাসের সাথে আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির জন্য খরচ করে। এরাই হলো আল্লাহ ﷻ-র কাছে সর্বাধিক প্রতিদানপ্রাপ্ত বান্দা।

এদের জন্যই আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ *

তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত। [বাকারা : ৫]

পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট হেদায়াতপ্রাপ্ত। এমন নয় যে, তাদের কেউ হেদায়াত পেয়েছেন আর কেউ পাননি, বা তারা হিদায়াতের রাস্তায় চলছেন এখনও গন্তব্যে পৌঁছুননি। বরং তারা সকলে হেদায়াত পেয়ে গেছেন।

এজন্য কেউ এসকল আমলগুলো না করলে সে হেদায়াতের সামান্যই পেয়ে থাকে।

মানুষকে একমাত্র ঈমান এবং উল্লিখিত আমলগুলোই হেদায়াতের পথে অবিচল রাখতে পারে। আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অন্য কেউ মানুষকে হেদায়াতের পথে অটল রাখতে পারে না। অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে ফেরাতে পারে না। আল্লাহ ﷻ ইউসুফ ﷺ-র ব্যাপারে ইরশাদ করেন–

নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিলো এবং সে-ও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করতো, যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করতো। এমনিভাবে হয়েছে, যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। [ইউসুফ: ২৪]

অর্থাৎ, ইউসুফ যেহেতু হেদায়াতপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, এ জন্য আল্লাহ ﷻ তার উপর থেকে মন্দ ও অশ্লীল কাজ সরিয়ে নিয়েছেন।

সুতরাং, একমাত্র আল্লাহ ﷻ-ই মানুষকে মন্দ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখেন।

أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ *

তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত। [বাকারা: ০৫]

আল্লাহ ﷻ শুধু তারা সুপথপ্রাপ্ত বলেননি। বরং নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত বলেছেন। কারণ, পথপ্রদর্শনের অনেক প্রকার থাকে। যেমন শয়তানের পক্ষ থেকেও একটি পথপ্রদর্শন আছে। কিন্তু উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ

শয়তানের পথে প্রদর্শিত নয়, বরং তারা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথপ্রদর্শিত।

আয়াতাংশে আরো লক্ষ্যণীয় হলো, আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে হেদায়াতপ্রাপ্ত না বলে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে হেদায়াতপ্রাপ্ত বলা হয়েছে। এরূপ বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছ এমন সত্ত্বার পক্ষ থেকে, যিনি তোমাদের প্রতিপালনও করেন। এটিও তদ্রূপ একটি নেয়ামত। আর নিয়ম হলো, আল্লাহ ﷻ যেখানে নেয়ামতের উল্লেখ করেছেন, সেখানে প্রতিপালনের কথা উল্লেখ করেছেন। আর যেখানে কোরআনের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে ইলাহ হওয়ার কথা বলেছেন।

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

আর তারাই যথার্থ সফলকাম। [বাকারা: ০৫]

আল্লাহ ﷻ কোরআনের অনেক জায়গায় সফলতার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে–

যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। [হাশর: ০৯]

আল্লাহ ﷻ ধৈর্যের সাথে সফলতার কথা উল্লেখ করেছেন। যিকিরের সাথে সফলতার কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় কষ্ট স্বীকার এবং খরচ করার সাথেও সফলতার কথা উল্লেখ করেছেন।

সফলতার অর্থ হল, উর্ধ্বে আরোহণ করা। তাহলে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সফল হওয়ার অর্থ হল দুনিয়া এবং আখিরাতে তারা অন্যদের উর্ধ্বে আরোহণ করেছে।

আর তারাই যথার্থ সফলকাম; অর্থাৎ তারা বিজয়ী হয়েছে। তাদের বাহ্যিক অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা অন্তঃকরণসহ পরিশুদ্ধ হয়েছে।

আমরা আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করি, আল্লাহ ﷻ আমাদের সফলদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আল্লাহ ﷻ আমাদের সালাত প্রতিষ্ঠাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। অদৃশ্যের উপর ঈমান আনার তাওফিক দিন। আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় খরচ করার তাওফিক দিন।

মুমিনের দশ গুণ

সকল প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-র জন্য। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম শ্রেষ্ঠতম নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের জন্য।

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন–

> যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে, তারা দোযখ থেকে দূরে থাকবে। তারা দোযখের অস্ফুট শব্দও শুনবে না, এবং তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে। মহাত্রাস তাদের চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদের অভ্যর্থনা করবে– আজ তোমাদের দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিল। সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নিবো, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে। আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে। [আম্বিয়া: ১০১-১০৫]

আয়াতে যাদের অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী বলা হয়েছে, তারা হলেন আল্লাহ ﷻ-র বন্ধু। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

> মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে; যারা ঈমান এনেছে এবং ভীত রয়েছে। [ইউনুস: ৬২, ৬৩]

> আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে আর আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আল্লাহ ক্ষমাকারী, করুণাময়। [বাকারা: ২১৮]

আল্লাহর বন্ধু কারা?

লম্বা জুব্বা পরলেই সে আল্লাহর বন্ধু!

আলখাল্লা গায়ে জড়ালেই সে আল্লাহর বন্ধু!

শূন্য প্রান্তরে ঘুমোনোর সাধনা করলেই সে আল্লাহর বন্ধু!

কে আসলে আল্লাহর বন্ধু?

জনাকীর্ণ সৌধে গমন করে হাতে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চুম্বন পেলেই সে আল্লাহর বন্ধু!

মাথায় পাগড়ি পেচালেই সে আল্লাহর বন্ধু!

লাল-সাদা রুমালে ঘুতরা বেঁধেই কেউ আল্লাহর বন্ধু হতে পারে!

উঁচু কোন পদ-পদবী, উন্নত বাহন বা সুশোভিত ভিলার অধিকারী হওয়া কি আল্লাহর বন্ধু হওয়ার পরিচায়!

না, এসবের কোনটিই আল্লাহর বন্ধুত্বের পরিচায়ক নয়।

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের দশটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবরণ অনেক বিস্তর। খুবই সাধারণ ও সংক্ষেপাকারে সেগুলো তুলে ধরছি। এই বৈশিষ্ট্যগুলো আল্লাহর বন্ধু হওয়ার পরিচায়ক। যার ভেতর বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যাবে, সে যেন আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করে। আর কারো ভেতর না পাওয়া গেলে সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে। কবির ভাষায়–

গভীর প্রেমের এই অশ্রু যখন প্রবাহিত হয় অপাত্রে; সেই অশ্রু অপব্যয়িত, সেই অশ্রু অপব্যয়িত।

প্রথম বৈশিষ্ট্য

আল্লাহর বন্ধুদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো এখলাস। আল্লাহর জন্য সকল কাজের একনিষ্ঠতা। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি

> ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। বরং আল্লাহরই এবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন। [যুমার: ৬৫, ৬৬]

উক্ত আয়াত আমাদের সকল কাজে একনিষ্ঠতার বার্তা দেয়। নিষ্ফল ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অন্য কাউকে দেখানোর জন্য আমল করে। আমরা লোক দেখানো আমল এবং প্রচারপ্রিয় আমল থেকে আল্লাহর পানাহ চাই।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

> যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য আমল করে, আল্লাহ তার বদলে তাকে (কিয়ামতের দিন) শুনিয়ে দিবেন। আর যে লোক দেখানোর জন্য আমল করে, আল্লাহ তার বদলে তাকে (কিয়ামতের দিন) দেখিয়ে দিবেন। [বুখারি: ৬৪৯৯]

সুতরাং আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুগণ প্রচারপ্রিয় আমল করতে পারেন না। তারা আমল করেন একমাত্র আল্লাহ ﷻ-র জন্য।

ইবনে সীরীন ؒ-কে একবার লোকেরা বলল, ‘আমাদের সাথে নিয়ে সালাত পড়ুন।’

তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি ভয় করি, তোমাদের সাথে নিয়ে সালাত পড়লে লোকেরা আমার সালাত প্রচার করবে। তারা বলাবলি করবে, ইবনে সীরীন আমাদের সাথে নিয়ে সালাত পড়েছেন। আমি তোমাদের সাথে নিয়ে সালাত পড়বো না।’

এভাবে তিনি প্রচার-প্রসিদ্ধির ভয়ে মানুষের সাথে নফল সালাত পড়া থেকে বিরত থাকতেন।

ইবরাহীম নাখঈ ؒ এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তার আশপাশে চারজন লোক বসলেই তিনি সেখান থেকে উঠে যেতেন এবং বলতেন, ‘আমি ভয় করি, আমার চারপাশে লোকজন জড়ো হয়ে যায় কিনা!’

তারা আমাদের পূর্বসূরি। তারা আমাদের চেয়ে অধিক মুত্তাকী ছিলেন। অধিক সম্মানী ছিলেন। আল্লাহ ﷻ-র নিকটভাজন পবিত্র মানব ছিলেন। তাদের আমল ছিল আমাদের চেয়ে এখলাসপূর্ণ। আমাদের আমল হয় এমন আয়োজনপূর্ণ, চারপাশে লোক জড়ো হয়ে যায়!

শপথ!

বংশমান নয় কভু সম্মানের পথ

দুনিয়ায় আছে বহু সম্মানী।

কেঁপে উঠবে যখন দেশ-দেশান্তর,

শুকিয়ে যাবে সব তরুলতা;

মান-সম্মান হবে তখন শুষ্ক একটু তৃণখানি!

রাসূল ﷺ বলেন–

> জাহান্নামের আগুন সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হবে। এমন কারী, যিনি কুরআন পড়েন। আল্লাহ তাকে বলবেন, 'আমি কি তোমাকে কুরআন পড়াইনি? আমি তোমাকে ইলম শিখাইনি? তুমি এসব দিয়ে কী করেছো?
>
> সে বলবে, 'হে আল্লাহ, আমি জাহেলকে শিখিয়েছি।'
>
> আল্লাহ বলবেন, 'কসম, আমি জানি, তুমি মিথ্যা বলেছো।'
>
> ফেরেশতারাও বলবে, 'তুমি মিথ্যা বলেছো।'
>
> আল্লাহ বলবেন, 'তুমি ইলম শিখিয়েছ যেন তোমাকে আলেম বলা হয়। পৃথিবীতে তোমাকে আলেম বলা হয়েছে। (হে ফেরেশতারা) তোমরা তাকে আগুনে নিক্ষেপ কর।'
>
> অতঃপর তাকে চেহারা উল্টিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। ধনীদের এবং বীরদের সাথেও এমনই আচরণ হবে। [মুসলিম : ১৯০৫]

এর কারণ, আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের প্রথম বৈশিষ্ট্যই হলো এখলাসপূর্ণ আমল। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> জেনে রাখ, নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদত আল্লাহরই জন্য। [যুমার: ০৩]
>
> তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে। [বায়্যিনাহ: ০৫]

আর যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে –সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে, সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এমনিভাবে কাফেরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। [আনয়াম: ১২২]

এসব আয়াত ও হাদিস আমাদের এক আল্লাহ ﷻ-র জন্য আমলের প্রতি আহ্বান করে।

আবু ইসহাক সিরাজী ﵀। শাফেঈ মাযহাবের পঞ্চম শতাব্দীর প্রখ্যাত আলেম। তিনি কোন কথা বলার সময় বা পাঠদানের সময় দুই রাকাত সালাত পড়তেন এবং আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করতেন– ‘হে আল্লাহ, তুমি আমার এ কথা, আমার এ পাঠদান কবুল করো!’

ইবনুল জাওযি ﵀ বিশ্ব বিখ্যাত একজন ওয়ায়েয ছিলেন। তিনি যখনই মানুষকে কোন নসীহত করতেন, আগে বিনীত হয়ে মাটিতে লুটোপুটি খেতেন, ক্রন্দন করতেন, দোয়া করতেন– ‘আল্লাহ, তুমি আমাকে গোপন রেখো। আমার এ নসীহত কবুল করো।’

এটিই হল মূলত আহলুস সুন্নাহর বৈশিষ্ট্য। অন্যদের থেকে আহলুস সুন্নাহর বিশেষত্ব। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

আল্লাহ যেদিন বান্দাদের আমলের প্রতিদান দিবেন, সেদিন প্রচারপ্রিয় এবাদতকারীদের বলবেন, তোমরা যাদের দেখানোর জন্য এবাদত করেছো, তাদের কাছে যাও। দেখ, তাদের কাছে কোন প্রতিদান পাও কিনা। [মুসনাদে আহমাদ : ২৩১১৯]

এখলাসের পরিচয়

এখলাস বলা হয় কোন কাজে আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কাছে নাম-প্রতিদানের আশা না রাখা।

বান্দা এবং আল্লাহ ﷻ-র মাঝে সৃষ্টিকূলের কোন পর্দা না থাকা।

মানুষের গোচরে-অগোচরে একই অনুভূতিতে এবাদত করা।

একাকী এমনভাবে সালাত পড়া, যেন মানুষের সামনে সালাত পড়ছি। মানুষের সামনে এমনভাবে সালাত পড়া, যেন আমি একাই সালাত পড়ছি।

আহলুস সুন্নাহর বৈশিষ্ট্যগুলোর অনন্য একটি হল এখলাস। এখলাস আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের সকল বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের সকল এবাদত আল্লাহ ﷻ-র জন্য। তাদের সকল চাওয়া-পাওয়া আল্লাহ ﷻ-র জন্য। তাদের কথা-বার্তা উপদেশ সবই আল্লাহ ﷻ-র জন্য।

আইয়ূব ইবনে তাইমিয়া সিখতিয়ানী ﵀ ছিলেন আল্লাহ ﷻ-র একনিষ্ঠ বন্ধু। তার সামনে উপদেশমূলক হাদিস পাঠ করা হলে তিনি কেঁদে ফেলতেন। তার কাছে মৃত্যুর কথা আলোচনা হলেও তিনি কেঁদে ফেলতেন। অতিরিক্ত ক্রন্দনে তিনি নাক ধরতেন আর বলতেন, 'উফ! কী প্রচণ্ড সর্দি!'

অনেকেই নিজেকে মানুষের কাছে দুনিয়াবিমুখ হিসেবে পরিচিত করতে চায়। ছেঁড়া-তালির জামা পরে। অথচ তার অন্তরে ছেয়ে থাকে দুনিয়ার ছায়া। তার অন্তরে লিপ্সা জাগে রাজত্বের। মনে মনে বাসনা থাকে বাড়ি-গাড়ি আর দোকান-পাটের।

কিন্তু ছেঁড়া-তালি জামার মধ্যে দুনিয়াবিমুখতা নয়। বরং অন্তরের সততা, হারামের অনীহা, অল্পে তুষ্টির মধ্যেই হলো দুনিয়াবিমুখতা।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, তারা রাসূল ﷺ-কে নিজেদের নেতা এবং ন্যায়বিচারক হিসেবে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে। আল্লাহ ﷻ-র রাসূল তাদের কাছে নিজ নিজ ইন্দ্রিয় থেকেও প্রেমানুভূত হয়। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> অতএব তোমার পালনকর্তার কসম! সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। [নিসা: ৬৫]
>
> যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।' [আহযাব: ২১]

ইমাম মালিক رحمه الله মসজিদে নববীতে মুয়াত্তার পাঠদান করতেন। একদিন তিনি হাদিস পড়াচ্ছেন, এমতাবস্থায় একটি বিচ্ছু তার পায়ে দংশন করতে লাগলো। বিচ্ছুটি একে একে তাকে তেরটি কামড় দিল, কিন্তু তিনি সামান্য নড়াচড়া করলেন না।

হাদিস পাঠদান শেষে তিনি পায়ের নলায় বিচ্ছুর আঘাতগুলো দেখে বিষ প্রতিষেধক দিয়ে ক্ষতস্থানগুলো মুছে নিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, 'এতগুলো দংশনের পরও আপনি হাদিসের পাঠদানে বিরতি দিলেন না!'

তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ, একটি বিচ্ছুর দংশনে আমি হাদিসের পাঠদানে বিরতি দিবো!'

রাসূলের প্রতি এ কেমন ভালোবাসা!

রাসূলের হাদিসের প্রতি এ কেমন অনুরাগ!

ইবনুল মুসাইয়িব رحمه الله অসুস্থ ছিলেন। তাকে একটি হাদিস জিজ্ঞেস করা হল। তিনি তখন শুয়ে ছিলেন। বললেন, 'তোমরা আমাকে বসাও। আমি শুয়ে শুয়ে রাসূলের হাদিস বর্ণনা করবো! এটি হাদিস বর্ণনার আদর্শ নয়।'

সাহাবায়ে কেরাম মদিনায়, মদিনার আশপাশে রাসূলের কোন স্মৃতিচিহ্ন দেখলে চোখের পানি ছেড়ে দিতেন। কান্না করতেন। তাহলে তারা রাসূলকে দেখলে যেন কেমন করতেন! এ যেন কবির সেই কাব্য–

'লায়লার বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে হাঁটছি আমি

এই দেয়ালে ওই দেয়ালে খাচ্ছি চুমি

দেয়ালের প্রেমে পড়ে খাইনি চুমি

দেয়ালের ভেতর আমার জীবন-প্রেমী'

রাসূল ﷺ মক্কা থেকে হিজরতে বের হচ্ছেন। বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন আর বলছেন–

> উহুদ পাহাড় আমাদের ভালোবাসে, আমরাও উহুদ পাহাড়কে ভালোবাসি।
> [বুখারি : ৪৪২২]

সুবহানাল্লাহ, পাহাড়ও রাসূলকে ভালোবাসে!

মসজিদে নতুন মিম্বার স্থাপিত হয়েছে। রাসূল ﷺ সে মিম্বারে প্রথম খোতবা প্রদান করবেন। এতদিন মিম্বার হিসেবে ব্যবহার হওয়া পুরতান খেজুরদণ্ডটি আজ থেকে পরিত্যক্ত। রাসূল ﷺ নতুন মিম্বারে দাঁড়ালেন। পরিত্যক্ত খেজুরদণ্ডটি আবেগাপ্লুত হয়ে উঠল! দশমা উটের মতো অনুভূতিশীল হয়ে উঠল! খেজুরদণ্ডটি থেকে শিশুর মতো কান্নার আওয়ায শুরু হয়ে গেল!

> রাসূল ﷺ মিম্বর থেকে নেমে এসে খেজুরদণ্ডের উপর হাত রাখলেন। খেজুরদণ্ডের কান্না থামালেন। রাসূলের স্পর্শে খেজুরদণ্ডটি শান্ত হল।

হাসান বসরি বলেন, 'তোমাদের উপর বড়ই আশ্চর্য হতে হয়। একটি খেজুরদণ্ড রাসূলপ্রেমে আপ্লুত হয়ে ওঠে, অথচ তোমাদের কোন ভাবাবেগ নেই!'

উল্লেখ্য, রাসূলপ্রেমে দীনের দাঈ এবং ইলম অন্বেষী এবং আমি নিজেকেও একটি ব্যাপারে সাবধান করছি। অনেকে তাদের অনুসৃত বিভিন্ন মানুষকে ভালোবাসার আতিশয্যে রাসূলের স্থান দিয়ে থাকে। এটি সুস্পষ্ট বাড়াবাড়ি। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> হে আহলে কিতাব, তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। [নিসা : ১৭১]

এমনও অনেক মানুষ আছেন, যারা রাসূলের চেয়ে অন্যদের স্মরণই বেশি করে থাকে। অনেক বেদয়াতপন্থী প্রেম নিবেদন এবং নেতা মনোনয়নে রাসূলের পরিবর্তে স্বীয় নেতাদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তাদের কথাবার্তায় কাজেকর্মে রাসূল ভিন্ন অন্যের প্রতি বেশি ভক্তি প্রকাশ পায়। তাদের ভালোবাসা রাসূল ছাড়া নিজ নিজ নেতাদের প্রতি একটু বেশিই!

কিছু আছে দলান্ধ। যারা কথায়-কাজে রাসূলের চেয়ে দলকে প্রাধান্য দেয়। তারা আপন দলমতের বিরোধীতার অযুহাতে রাসূলের হাদিসও পরিত্যাগ করে।

এই সব ধরণের সীমালঙ্ঘনকারীদের থেকে সাবধান।

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুগণ এক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তারা রাসূল ﷺ-কে নিজেদের ইমাম বানিয়েছেন। আমরা যেন আমাদের কথায় কাজে বিশ্বাসে

সর্বাবস্থায় রাসূলেরই অনুসরণ করি। দীন প্রচরের ক্ষেত্রে আমরা যেন রাসূল ﷺ ছাড়া আর কাউকে মাধ্যম না বানাই।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য– তাদের রাগ-অনুরাগ সব আল্লাহ ﷻ-র জন্য হয়ে থাকে। আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুগণ মানুষকে ভালোবাসেন আল্লাহ ﷻ-র সাথে মানুষের সম্পর্ক বিবেচনা করে। কারো সাথে দূরত্ব রাখেন আল্লাহ ﷻ-র সাথে তার দূরত্ব বিচার করে। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। [মায়িদা: ৫৫]

রাসূল ﷺ বলেন–

> যে আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য কারো প্রতি বিরাগভাজন হয়, আল্লাহর জন্য কাউকে কিছু দান করে, আল্লাহর জন্যই কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকে, সে অবশ্যই তার ঈমান পরিপূর্ণ করে নিল। [আবু দাউদ : ৪৬৮১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৩০৫১৯]

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুগণ কারো বংশ মর্যাদায় প্রভাবিত হয়ে তাকে ভালোবাসেন না। কারো বিপুল পরিচিতিতে আকৃষ্ট হয়ে ভালোবাসেন না। কাউকে নিজের মতের, নিজের পথের বা একই শামিয়ানাতলের বলে ভালোবাসেন না।

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ নিয়মিত ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ-এর সাথে দেখা করতে যেতেন। কারণ, তারা পরস্পরকে আল্লাহ ﷻ-র জন্য ভালোবাসতেন।

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ-কে একদিন বলা হলো, আহমদ তো আপনার চেয়ে ছোট। আপনি বড় হয়েও তাকে দেখতে যান!

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বললেন–

'লোকে বলে, আহমদ আপনাকে দেখতে আসবে, আপনি কেন?

আমি বলি, সম্মান তার উঁচু মাকাম ছাড়বে না কখনো।'

সে আমাকে দেখতে আসুক; তারই মহত্ব

আমি তাকে দেখতে যাই; তারই মহত্ব

সে আসুক বা আমি যাই,

সব তারই মহত্ব।

ইমাম শাফেঈ ﵀ আরো বলেন–

আমি নই সৎলোক, ভালোবাসি সৎলোক,

কেয়ামত দিবসে পাবো বলে শাফায়াত।

উভয়ের পণ্য যত হোক বরাবর,

ঘৃণা করি তার যত পঙ্কিল তেজারত।

ইমাম শাফেঈ ﵀-র এই কাব্য যেন আল্লাহ ﷻ-র এই বাণীর জীবন্ত অনুভূতি–

বন্ধুরা সেদিন এক অপরের শত্রু হবে, তবে খোদভীরুরা নয়। [যুখরুফ: ৬৭]

অনেকে নিয়মিত সালাত পড়েন, সওম রাখেন, হজ্জ আদায় করেন, তথাপি তারা পাপাচারীকে ভালোবাসেন। পাপাচারীদের আড্ডা পছন্দ করেন। তাদের রাত্রিজাগরণ, রাতের আলাপন সবই আল্লাহ ﷻ-র দুশমনদের সাথে হয়ে থাকে। আফসোস তাদের জন্য।

মানুষ আল্লাহ ﷻ-কে ভালোবাসে, আল্লাহ ﷻ-র শত্রুকেও ভালোবাসে!

মানুষের অন্তরে এমন অসার অনুভূতি কিভাবে জাগে!

আল্লাহর কসম! এমনটা হতেই পারে না। যারা আল্লাহ ﷻ-কে ভালোবাসে, তারা আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদেরও ভালোবাসে। তারা আল্লাহ ﷻ-র দুশমন পাপচারীদের ঘৃণা করে।

ইমাম আহমদ ﵀ বলেন, আমি যখন দেখি কোন বৃদ্ধলোক তার দাড়ি মেহেদিরাঙ্গা করেছেন, তখন আমার খুব খুশি লাগে। আমি তাকে ভালোবাসি। কারণ, সে রাসূলের একটি সুন্নত পালন করেছে।

কী আশ্চর্য কথা! শুধু দাড়িতে মেহেদি রাঙ্গানোর সুন্নত পালন করাতেই ইমাম আহমদ একজন লোককে ভালোবেসে ফেলেছেন! তাহলে যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ে, রমযানে রোযা রাখে, রাসূলের বিরোধীদের শায়েস্তা

করে, রাসূলের সকল সুন্নত আদায় করে, সেই ব্যক্তির প্রতি কতটুকু ভালোবাসা জাগতে পারে!

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল– তাদের অন্তরগুলো অপর মুসলমানের জন্য নিরাপদ আশ্রয় হয়ে থাকে! আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের অন্তরে অপর মুসলমানের প্রতি কোন হিংসা, বিদ্বেষ, ক্লেদ, বক্রতা, ধোঁকা, প্রতারণা কিছুই থাকে না।

অনেকের অন্তরে এসব গোপন রোগ বাসা বাধে। তারা সামান্য কোন অপ্রাসঙ্গিক বা প্রশাখাগত ভেদাভেদ নিয়েও অপরের সাথে হিংসা বিদ্বেষ করে থাকে। আল্লাহ ﷻ আমাদের এসকল গোপন রোগ থেকে মুক্ত রাখুন।

একদিন রাসূল ﷺ মসজিদে একটি মজলিসে বসলেন। একজন লোক অজু করে মসজিদে প্রবেশ করল। আগন্তুকের বাঁ হাতে জুতা। দাড়ি থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় অজুর পানি ঝরছে। লোকটি ভিতরে প্রবেশের পূর্বেই রাসূল ﷺ উপস্থিত সাহাবাদের বললেন, 'এই দরজা দিয়ে তোমাদের কাছে একজন জান্নাতী লোক প্রবেশ করবেন।'

রাসূলের এ কথার পর লোকটি প্রবেশ করলেন এবং দুই রাকাত সালাত পড়লেন।

দ্বিতীয় দিনেও রাসূল ﷺ মজলিসে বসে বললেন, 'এখনই তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী লোক উপস্থিত হবেন।'

তৃতীয় দিনেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো।

সেই মজলিসে ইবনে ওমর رضي الله عنهما উপস্থিত ছিলেন। তার মনে কৌতুহল জাগল, কী এমন এবাদত করে এই ব্যক্তি দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেলেন! উৎসুক হয়ে ইবনে ওমর জান্নাতী ব্যক্তির এবাদতের খোঁজখবর নেয়ার জন্য তার কাছে গেলেন। কিন্তু তাকে খুব বিশেষ এবাদত করতে দেখলেন না। খুব বেশি সওম রাখার বা রাত জেগে সালাত পড়ার চিহ্নও লোকটির ভিতর পেলেন না।

ইবনে ওমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কী এমন এবাদত করেন? আমি রাসূল ﷺ-কে আপনার ব্যাপারে এই কথা বলতে শুনেছি– 'এই দরজা দিয়ে তোমাদের কাছে একজন জান্নাতী লোক প্রবেশ করবেন!'

লোকটি বলল, 'আমার যা কিছু এবাদত; সালাত, সওম, তাহাজ্জুদ, সবই তো দেখলেন। এরপরও আপনি কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবো, আমার রাতদিন কেটে যাচ্ছে, কিন্তু আমার অন্তরে কখনও কোন মুসলমানের প্রতি ধোঁকা, বিদ্বেষ, হিংসাত্মক মনোভাব থাকে না।' [মুসনাদে আহমাদ : ১১২৮৬]

লোকটির এই অবস্থান হল কুরআনে বর্ণিত জান্নাতের সেই সুউচ্চ অবস্থানের প্রতিচিত্র–

> তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেবো। তারা ভাই ভাইয়ের মতো সামনা-সামনি আসনে বসবে। [হিজর: ৪৭]

মুমিনের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ-বৈরিতা থাকে না। এটি মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ মুমিনদের ভাষ্য বর্ণনা করে বলেন,

> এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখোনা। [হাশর: ১০]

(অর্থাৎ মুমিনগণ যেন আল্লাহ ﷻ-র কাছে এই দোয়া করে।)

হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত আল্লাহ ﷻ-র এই বন্ধু কারা?

আল্লাহ ﷻ-র এই বন্ধুরা কখনও কোন মজলিসে, আলাপ-আলোচনায় কারো দোষ-ত্রুটি আলাপ করে না। মানুষের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করে। কবির ভাষায়,

তোমার মুখে গোপন কোন আলাপ না হোক কারও।
তোমার গোপন কথা আছে, মুখটি আছে তারও।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তোমরা কেউ কারো গীবত করোনা। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা একে ঘৃণাই করো। [হুজুরাত: ১২]

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য– আল্লাহ ﷻ-র ফরযসমূহ আদায়ে যথাতৎপর হওয়া এবং অধিকহারে নফল আদায়ে আন্তরিক হওয়া।

ফরযসমূহ যথাসময়ে আদায় করে অধিকহারে নফল ইবাদত করলে, হারামসমূহ থেকে বেঁচে থাকলে সে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-র বন্ধু বলে পরিগণিত হয়। তার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ সুসংবাদ দিয়েছেন–

> মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভীত রয়েছে– তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। [সূরা ইউনুস: ৬২-৬৪]

রাসূল ﷺ বলেন–

> মহান আল্লাহ বলেছেন, '... আমি বান্দার উপর যা ফরয করেছি, তার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন এবাদত দ্বারা বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারে না। আমার বান্দা সবসময় নফল এবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে, একসময় আমি তাকে ভালবাসবো। যখন আমি তাকে ভালবাসবো, আমি তার কান হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে চলে। [সহিহ বুখারি : ৬৫০২]

আল্লাহ ﷻ এই হাদিসে অলিদের দুই ভাগ করেছেন।

এক. মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী; মুকতাসিদ।

দুই. কল্যাণের পথে অগ্রগামী; সাবিক্কুন বিলখাইরাত।

মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী– যিনি আল্লাহ ﷻ-র ফরযসমূহ আদায় করেন। কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন।

কল্যাণের পথে অগ্রসর– যিনি ফরযসমূহ আদায় করার পাশাপাশি অধিকহারে নফল এবাদত করে আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্য অর্জন করেন। কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচার পাশাপাশি সগীরা গুনাহ এবং মাকরূহ গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকেন।

এক যুবক রাসূল ﷺ-র কাছে এসে বলল, 'আল্লাহর রাসূল, আমি বেহেশতে আপনার সঙ্গা চাই।'

রাসূল বললেন, 'আর কিছু?'

যুবক বলল, 'এটাই।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'বেশি বেশি সেজদা কর।' [সহিহ মুসলিম : ৪৮৯]

অর্থাৎ, বেশি বেশি নফল এবাদত কর। আল্লাহ ﷻ-র বন্ধু হতে পারবে। জান্নাতেও যেতে পারবে।

নফল এবাদত বিভিন্নভাবে করা যায়। সালাত, সওম, যিকর, দান-সদকা, সবকিছুতেই নফল এবাদত রয়েছে। কার জন্য কোন এবাদত বেশি উপকারী, অন্তরকে বেশি বিগলিত করে, আল্লাহ ﷻ-র বন্ধু হওয়ার মতো বান্দা বানাতে পারে, তা সে নিজেই ভালো জানে। যার জন্য যে এবাদতটি বেশি উপকারী, সে যেন সেই এবাদতটিই বেশি বেশি করে।

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের বৈশিষ্ট্য হল– নফল এবাদতে অধিক গুরুত্ব দেয়। আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুরা সকালে সালাতে থাকে। দ্বিপ্রহরে রোযারত থাকে। আবার রাতে জেগে এবাদত করে।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য– এতেকাদ ও বিশ্বাস লালনে সালাফের অনুসরণ করেন। পূর্ববর্তীদের মধ্যে যারা কুরআন-হাদিসের সঠিক ধারণকারী, তাদের অনুগমন করেন। শরীয়তের চাহিদা বিরোধী কোন বিদয়াত পন্থার আবিষ্কার বা অনুসরণ করে না।

অনেকে দৈনিক পাঁচশ রাকাত নফল সালাত পড়ে, কিন্তু মত ও পথে তারা বিদয়াতী। দীনের চাহিদা বিরোধী নতুন কোন মত ও পথের আবিষ্কারক। দীনের ভুল ব্যাখ্যা প্রদানকারী, বিকৃতকারী। পথচ্যুত, মতভ্রষ্ট।

আল্লাহ ﷻ-র কাছে গ্রহণযোগ্য এবাদতের জন্য চেতনায় ও বিশ্বাসে নিরাপদ, খাঁটি, অক্ষত ও পূর্ণাঙ্গা হতে হয়। রাসূল ﷺ তাওহিদের যেসব পয়গাম

দিয়েছেন; আল্লাহ ﷻ-র নাম-ধাম, কেয়ামতের বিশ্বাস ইত্যাদিতে আহলুস সুন্নাহ ওয়ালজামায়াতের অনুসারী হতে হয়ে।

এই বৈশিষ্ট্যটি আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের গূঢ় মহত্বময় একটি বৈশিষ্ট্য। যারা বিদয়াতী, যুগে যুগে রাসূলের পথ ও পদ্ধতির বিরোধীতা করে, চেতনা ও বিশ্বাসে রাসূলের আদর্শের বাইরে চলে, এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তাদের মাঝে এবং আল্লাহ ﷻ-র খাঁটি বান্দাদের মাঝে পার্থক্য নিরূপিত হয়। আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুগণ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তাদের আকীদা-বিশ্বাস স্থির করেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়ালজামায়াতের কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যামূলক নির্ভরযোগ্য রচনাবলী থেকে নিজেদের চেতনা ও চৈতন্য স্থাপন করেন। আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপনে বৈজ্ঞানিক অসার কল্পকথা অথবা আহলে কালামের উদ্ভট বেহুদা বকওয়াস থেকে আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুরা দূরত্ব বজায় রাখেন।

আল্লাহর বন্ধুরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে অর্জিত আকীদা-বিশ্বাস ও তাওহিদের মর্মকথার দাওয়াত প্রচার করেন। তারা মানুষের জীবনে তাওহিদ স্থাপন এবং দুনিয়াপন্থী সকল বিদয়াত বর্জনের দাওয়াত দিয়ে থাকেন নবী-রাসূলদের মতো। বক্তৃতায় লিখনীতে এই হয়ে থাকে তাদের আলোচনার আধ্যেয়।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের সপ্তম বৈশিষ্ট্য– সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করা। মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহ প্রদান করা। ইলম ও জ্ঞান নিয়ে অকৃপণ থাকা।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হল সফলকাম। [আলে ইমরান: ১০৪]
>
> তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে, অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। [আলে ইমরান: ১১০]

যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? [হা-মীম সিজদাহ: ৩৩]

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করতো না, যা তারা করতো। তারা যা করতো তা অবশ্যই মন্দ ছিল। [মায়িদাহ: ৭৮, ৭৯]

কসম যুগের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে গুরুত্ব দেয় সত্যের এবং গুরুত্ব দেয় সবরের। [আসর : ১-৩]

এই উম্মতের ওলামায়ে কেরাম সাধারণ মানুষের মতই। আহলে সুন্নাহ ওলামায়ে কেরাম কখনও ঘরে বসে থাকেন না। দীন প্রচারের অবারিত দরজা বন্ধ রেখে ঘরকুণে হয়ে থাকেন না। তারা দীনের প্রচার নিয়ে ঘুরতে থাকেন মসজিদে-মসজিদে, রাস্তাঘাটে, অলিতে-গলিতে, সহকর্মীদের সাথে, সভা-সঙ্ঘে, আড্ডায়-সেমিনারে, শিক্ষাঙ্গানে।

আহলে সুন্নাহ ওলামায়ে কেরাম মানুষকে দীন শিখান। আল্লাহ ﷻ তাদের যে ধন-সম্পদ দেন, দীন শিখানোর জন্য তা ব্যয় করেন। ইলম নিয়ে কার্পণ্য করেন না। বনী ইসরাঈলের মতো ঘরে বসে থাকেন না। বনী ইসরাঈলের অবস্থা আল্লাহ ﷻ স্বয়ং বর্ণনা করেন–

এবং তারা গোপন করে সেসব বিষয়, যা আল্লাহ তাদের দান করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে। [নিসা: ৩৭]

ইমাম যুহরী رحمه الله। তিনি মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতেন। মানুষকে হাদিস শিখাতেন।

ওরওয়া ইবনে যুবাইর رحمه الله। তিনি মানুষকে স্বর্ণ-রূপা, টাকা-পয়সা দান করতেন আর বলতেন, 'লোকসকল! এসো, আমার কাছে হাদিস শোনো।'

তিনি মানুষকে হাদিয়া প্রদান করতেন হাদিস শোনানোর জন্য।

যারা মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মাসআলা প্রদানের জন্য মানুষের পিছু পিছু কষ্ট স্বীকার করে, তাদের অবস্থান কেমন হতে পারে!

অষ্টম বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের অষ্টম বৈশিষ্ট্য– তারা জামায়াত ভালোবাসেন। ঐক্য ভালোবাসেন। বিচ্ছিন্নতা ঘৃণা করেন। বিচ্ছিন্নতা দূর করে একতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

যেসব সংকীর্ণমনা দল-বল উম্মতের মাঝে অনৈক্যের সৃষ্টি করে, উম্মতের মাঝে বিবাদ-বিক্ষিপ্ততা উস্কে দেয়, তাদের কোন তৎপরতা বা উদ্যোগ দীনের উদ্যোগ নয়। দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুরা আহলে সুন্নাহর অনুসৃত পথ ভালোবাসেন। তাদের মাঝে কোন পার্থক্য করন না। এমন নয়, যে আমার মত গ্রহণ করবে, তাকে ভালোবাসবো। যে আমার মতবিরোধী হবে, তাকে প্রত্যাখ্যান করবো।

সকল মুসলমান মূলত একই জামায়াত। তাদের মাঝে বিক্ষিপ্ততা অগ্রহণযোগ্য। দীনকে একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে সীমাবদ্ধ করা অগ্রহণযোগ্য। নির্দিষ্ট কোন গবেষণায় আটকে রাখা অগ্রহণযোগ্য।

আহলে সুন্নাহর অনুপম বৈশিষ্ট্য– তারা ঐক্যে প্রত্যাশী।

বিদয়াতীদের বৈশিষ্ট্য– তারা আলেমদের অপবাদযুক্ত করতে খুব তৎপর। এসব করে তারা খুব খুশি। বিদয়াতীরা ঐক্য অপছন্দ করে। বিক্ষিপ্ততা ভালোবাসে। আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের অর্থাৎ আহলুসসুন্নাহ ওয়ালজামায়াতের বিরোধিতার প্রয়াশে আনন্দ পায়।

নবম বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের নবম বৈশিষ্ট্য– পরস্পর মতভিন্নতার সময় তারা কুরআন-সুন্নাহয় মনোনিবেশ করে। কোন মাসআলায় মতবিরোধ হলে কিতাব এবং সুন্নাহ থেকেই এর সমাধান বের করার প্রয়াশ পায়। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ। [শূরা: ১০]

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুরা বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো আল্লাহর কাছেই সমর্পণ করেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করেন–

> اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
>
> হে জিবরাইল মিকাইল ইসরাফীলের প্রভু, আসমান ও যমিনসমূহের সৃষ্টিকর্তা, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ের সর্বজ্ঞাতা, আপনি আপনার বান্দাদের বিবাদমান বিষয়ে ফায়সালা করুন। আমাদের বিবাদমান বিষয়ে আপনার নির্দেশনায় হকের সন্ধান দিন। আপনিই সরল পথের দিকে পৌঁছান। [সহিহ মুসলিম : ৭৭০]

দশম বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুরা সদা হক কথা বলেন। প্রবৃত্তির কোন চাহিদা তাদের মুখের হক কথা বারণ করতে পারে না।

বর্ণিত হয়েছে–

> রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলতেন, ‘হে আল্লাহ, আমি প্রকাশ্যে গোপনে (সর্বাবস্থায়) অন্তর জুড়ে তোমার ভয় প্রার্থনা করি। আমি রাগে সন্তোষে (সর্বাবস্থায়) হক কথা বলার তওফিক প্রার্থনা করি।’ [নাসাঈ : ১৩০৫, ১৩০৬]

মানুষ ভাই, বন্ধু, সহপাঠীর সাথে রাগ হয়। প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে তাদের অবান্তর ও অনুপস্থিত দোষত্রুটি চর্চা করে। আবার যখন তার উপর সন্তুষ্ট থাকে, তখন তার ভিতর উপস্থিত ও উল্লেখ্য দোষত্রুটিও ভুলে যায়।

কবির ভাষায়–

প্রেমের চোখে ঢাকা পড়ে দোষগুলো তার; রাতের মতো।
রাগের চোখে প্রকাশ করে দোষগুলো তার শত শত।

আমরা আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করি মধ্যমপন্থার। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গাত সাক্ষ্যদান কর। [নিসা : ১৩৫]

আল্লাহ ﷻ বলেন–

আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। [আনয়াম: ১১৫]

এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর। এটাই আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী।' [মায়েদা: ০৮]

তোমরা কারো উপর রাগান্বিত থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে অন্যায় ও মিথ্যা ফায়সালা গ্রহণ করো না। তোমরা ন্যায়বিচারক হও।

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুদের দশটি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। একটু চিন্তা করলেই এই দশ বৈশিষ্ট্যের আড়ালে আরও অনেক বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসবে।

আল্লাহ ﷻ-র কাছে আমার জন্য এবং আপনাদের জন্য দোয়া করি, আমরা যেন এই দশ বৈশিষ্ট্যে নিজের জীবন শোভামণ্ডিত করতে পারি। বৈশিষ্ট্যগুলোর দাবি জীবনভর পালন করতে পারি। নিজেদের যেন আল্লাহ ﷻ-র বন্ধু বানাতে পারি।

সুখী মানুষ দুঃখী মানুষ

সর্বমহিমাময় আল্লাহ; যিনি বান্দার সবকিছু দেখেন, সবকিছু শোনেন। সর্বকল্যাণময় আল্লাহ; যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র, তাতে রেখেছেন জ্বলজ্বলে সূর্য, রেখেছেন দীপ্তিময় চন্দ্র।

আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ ﷻ-ই আমার একমাত্র ইলাহ। আমি বিশ্বাস রাখি, মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমার এ বিশ্বাস সেদিনের পারাপারের জন্য, যেদিন কাজে আসবে না কোন ধন-সম্পদ। কাজে আসবে না কোন পরিবার-পরিজন। কাজে আসবে শুধু সেই, যে আল্লাহ ﷻ-র কাছে আসবে শুদ্ধচিত্ত নিয়ে।

আল্লাহ! ফুল যেমন মন-প্রাণ মোহিত করে সুরভী ছড়ায়, বৃষ্টি যেমন ঝরে-ঝরে মুষলধারে বর্ষিত হয়, তেমনই তুমি দুরূদ-সালাম বর্ষণ করো মোহাম্মদ ﷺ-এর উপর। বন্ধু যেমন আলিঙ্গানে একাত্মা হয়ে হারিয়ে যায়, পুণ্যাত্মারা পবিত্র আবহে যেভাবে মিলিত হয়, রাতের পরে যেমন দিন আসে আবার দিনের পরে রাত, তেমনই তুমি দুরূদ-সালাম বর্ষণ করো তোমার রাসূল মোহাম্মদের উপর। দুরূদ-সালাম বর্ষিত করো মোহাম্মদের পরিজনের উপর। বর্ষিত করো মুহাজির-আনসার সকল সাহাবার উপর। কেয়ামত পর্যন্ত তার দেখানো হেদায়াতের রাহে সকল মুসাফিরের উপর।

সুখী মানুষ, দুঃখী মানুষ

মানুষ দুই প্রকার।

সুখী মানুষ, দুঃখী মানুষ। সৌভাগ্যবান, দুর্ভাগ্যবান। সৌভাগ্যবান মানুষ জান্নাতে যাবে, দুর্ভাগ্যবানরা যাবে জাহান্নামে। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> এই দুই বাদী-বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। [হাজ্জ: ১৯]

মানুষের চোখ দুই প্রকার

কিছু চোখ আল্লাহ ﷻ-কে চিনে। আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝরিয়ে কাঁদে। আল্লাহ ﷻ-র নিদর্শনাবলী দেখে তাতে চিন্তা করে। সৃষ্টিকূল থেকে অমুখাপেক্ষী থাকে।

কিছু চোখ হারামের দিকে দৃষ্টি দেয়। পৃথিবীর সর্বসেরা মানুষের প্রদর্শিত রাস্তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। গোনাহের রাস্তা খুঁটিয়ে আবিস্কার করে। নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ উঁকি মেরে দেখে। এই চোখ কাঁদবে, কেয়ামতের হিসাবে আল্লাহ ﷻ-র কাছে আফসোস করে খুব কাঁদবে।

মানুষের মন দুই প্রকার

কিছু মন আছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সুধায় তৃপ্ত। সে অন্তর আল্লাহ ﷻ--কে চিনে। সে হৃদয় রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসে। রাসূলের পথ ও পাথেয় অনুসরণ করে। সেই মন হল সুখী মন। সেই অন্তর সমৃদ্ধ অন্তর। সেই হৃদয় সৌভাগ্যবান হৃদয়।

কিছু মন আছে আল্লাহ ﷻ-র যিকির থেকে গাফেল থাকে। কোরআন তিলাওয়াত বিতৃষ্ণ লাগে। সালাতে অলসতা লাগে। আল্লাহ ﷻ-র প্রেম, রাসূলের সরল পথ, রাসূলের পবিত্র জীবনদর্শন অপ্রিয় লাগে। সেই মন পরাজিত মন। সে অন্তর ভঙ্গুর অন্তর। সেই হৃদয় অধঃপতিত হৃদয়।

মানুষের কান দুই প্রকার

কিছু কান আছে, আল্লাহ ﷻ-র বাণী শোনে। কোরআনের তিলাওয়াত শোনে। রাসুলের বাণী শোনে। আল্লাহ ﷻ-র যিকির, সদুপদেশ ইত্যাদি শোনে। সেই কান স্বার্থক কান। সৌভাগ্যশীল কান।

কিছু কান আছে, কোরআন-হাদীস শোনা থেকে বিরত থাকে। গান-বাজনা, অশ্লীল অন্যায় কথাবার্তা শোনে। এমন কথাবার্তা শুনতে পছন্দ করে, যা রবের রাগের উদ্রেক করে। সেই কান নিস্ফল কান। দুর্ভাগ্যবান কান।

মানুষের যবান দুই প্রকার

কিছু যবান প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলে। মঙ্গলজনক কথা বলে। আল্লাহ ﷻ-র যিকির করে। সৎকাজে আদেশ করে। অসৎকাজে নিষেধ করে। সেই যবান লাভবান যবান। সেই যবান সাফল্যে আরোহিত যবান।

কিছু যবান মানুষের গীবত করে। মিথ্যা বলে। ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অপরকে লানত, চোগলখুরি, দায়িত্বজ্ঞানহীন কথাবার্তা বলে। সেই যবান ক্ষতিগ্রস্ত যবান। সেই যবান ধ্বংসে লিপ্ত যবান।

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুই দুই প্রকারের মধ্য দিয়ে মানুষেরও দুটি শ্রেণী সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সৌভাগ্যবান, দুর্ভাগ্যবান। সুখী মানুষ, দুঃখী মানুষ। এই দুই শ্রেণীর মানুষের কিছু উপদেশমূলক ঘটনা ও আলোচনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

ইবরাহিম عليه السلام ও নমরূদ

কী চমৎকার আল্লাহ ﷻ-র হেদায়াতের বাণী!

আল্লাহ ﷻ-র পরিচয়ের কী মনোহর উপস্থাপন!

এক আল্লাহ ﷻ-কে চেনার জন্য এরচেয়ে সুষম বার্তা ও আহ্বান আর হতে পারে!

সুবাহানাল্লাহ! মানুষের মন এমন মনোহর আহ্বান থেকে কীভাবে বিমুখ হতে পারে!

আল্লাহ ﷻ মানুষকে তার পরিচয়ের প্রতি আহ্বান করছেন—

> তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহিমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন? ইবরাহিম যখন বললেন, 'আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।' সে বলল, 'আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি।' ইবরাহিম বললেন, 'নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।' তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না। [বাকারা: ২৫৮]

ইবরাহিম ﷺ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর দাওয়াতী দায়িত্ব বহন করেছিলেন। অগ্রদায়িত্ব পালন করেছিলেন এই দাওয়াতী কাজের। মানুষের কাছাকাছি গিয়েছেন। পাপাত্মাদের আড্ডায় আল্লাহ ﷻ-র বাণী নিয়ে পা রেখেছেন। আল্লাহদ্রোহীদের প্রাসাদে গিয়ে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন।

ইবরাহিম ﷺ-র দাওয়াতের ময়দানে এই অগ্রণী তৎপরতায় বর্তমানে আলেম, দাঈ, শাহাদাতের ঝাণ্ডাবাহী, শিক্ষাঙ্গানের ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য মহান এক গুরুদায়িত্বের বার্তা রয়েছে। অর্থাৎ তারাও যেন মানুষের কাছাকাছি যায়। তারাও যেন ময়দানে, মানুষের সামনে অবতীর্ণ হয়। মানুষের মজলিস এবং বয়ানের মিম্বার ব্যবহার করে।

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহিমের সাথে। [সূরা বাকারা : ২৫৮]

আল্লাহ ﷻ-র আযমত নিয়ে কে আর বাদানুবাদ করতে পারে!

আল্লাহ ﷻ-র আযমত নিয়ে নাস্তিক-মুলহিদরাই বাদানুবাদ করে।

নবিদের পন্থা ও কার্যক্রম নিয়ে কে আর বাদানুবাদ করতে পারে!

নবিদের পন্থা ও কার্যক্রম নিয়ে অবিশ্বাসী যিনদীকরাই বাদানুবাদ করে।

ইবরাহিম ﷺ সেই অবিশ্বাসী মুলহিদ যিনদীককে বললেন, 'আমার প্রভু যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান'। মানুষের অস্থিগুলো যখন বিচূর্ণ হয়ে যায়, আমার প্রভু আল্লাহ ﷻ সেগুলো একত্র করে জীবন দান করেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> সে (অবিশ্বাসী) আমার সম্পর্কে এক অদ্ভূত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে, যখন সেগুলো পঁচে-গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। [সূরা ইয়াসীন: ৭৮,৭৯]

তাইতো!

কে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ করান?

কান্নারত শিশু; কিছুই বোঝে না। কিছুই জানে না। কিছুই চিনে না। আল্লাহ ﷻ তাকে বুঝ দেন। আল্লাহ ﷻ তাকে সবকিছু দেখান। তার জীবন বাঁচান। তার পানাহারের বন্দোবস্ত করেন।

কে একটি মৌমাছিকে ঘর নির্মাণের শিল্প শিখান? তাকে রিযিকের পথ দেখান? পাহাড়-পর্বত, শূন্য ভূমি-নিম্নভূমি উড়ে বেড়ানোর নির্দেশ দেন?

কে একটি শৃগালকে স্থান পরিবর্তনের বুদ্ধি দেন? এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাত্রা করার নির্দেশ দেন?

কে একটি পিঁপড়াকে, একটি পতঙ্গকে আপন বাসার পথনির্দেশ করেন?

তিনি আল্লাহ ﷻ।

সকল বস্তুর স্রষ্টা আল্লাহ ﷻ।

সকল বস্তুর সুবিন্যস্তকারী আল্লাহ ﷻ।

সকল বস্তুর সুপরিমিতকারী আল্লাহ ﷻ।

সকল বস্তুর পথনির্দেশক আল্লাহ ﷻ।

কবির ভাষায়–

ডাক্তার! খোয়া গেলো তোমার হাত বিনাশবনে!

কে সে করেছে রুগ্ন তোমায় তার ডাক্তারি বিদ্যা দিয়ে!

ও রুগী! মুক্ত হয়েছ! সুস্থ হয়েছ!

কে দিলো সে পরিত্রাণ, যবে হার মেনেছিল সব চিকিৎসা-জ্ঞান!

মৌমাছি! উড়ছো তুমি উপত্যকায়,

বলো, কে করেছে তোমায় মধুর এতো,

দিয়েছে এই মধু তোমায়!

অজগর! শ্বাস ছাড়ো! শ্বাসে শ্বাসে বিষ ছাড়ো!

কে বানিয়েছে তোমায় বিষধর!

কীভাবে তুমি আছো বেঁচে বিষ রেখে মুখভর!

আল্লাহ ﷻ।

সব করেছেন আল্লাহ ﷻ, প্রশংসা শুধু তারই।

কোন প্রশংসা আল্লাহ ﷻ ছাড়া নেই আর কারোরই।

ইবনুল জাওযী رحمه الله বর্ণনা করেন, জনৈক লোক দেখলেন, ছোট্ট একটি চড়ুই পাখি, প্রতিদিন শহরের প্রান্ত থেকে এক টুকরো গোশত কুড়িয়ে একটি খেজুর গাছের মাথায় গিয়ে বসে। চড়ুইয়ের কাণ্ড দেখে লোকটি উৎসুক হল। চড়ুই পাখি তো খেজুর গাছে বাসা বুনে না। তাহলে কী করছে চড়ুইটি? দেখা দরকার!

যেই ভাবা, সেই কাজ। লোকটি গাছে উঠল। দেখল, গাছের মাথায় বিড়া বানিয়ে বসে আছে ভারি বয়সের একটি অন্ধসাপ। সাপটি যখনই কিছু খেতে চাচ্ছে, চড়ুইটি সাপের মুখে গোশতের লোকমা তুলে দিচ্ছে! সাপটি আবার কিছু খেতে চাচ্ছে, চড়ুইটি কাছে গিয়ে সাপের মুখে গোশতের লোকমা তুলে দিচ্ছে।

সুবহানাল্লাহ! চড়ুই পাখিকে অন্ধ এই সাপের সংবাদ কে জানাল! কাঁটাপাতার খেজুর শাখে অন্ধ সাপের আহারের ব্যবস্থা কার নির্দেশনায়!

ইবরাহিম বললেন–

আমার প্রভু যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। [সূরা বাকারা : ২৫৮]

নমরূদ ইবরাহিমের যুক্তি চেলেঞ্জ করল। কেমন মিথ্যুক ছিল নমরূদ, তাই লক্ষণীয়। কীভাবে অভিশপ্ত দাজ্জাল সীমালঙ্ঘন করে চলল! পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নিদর্শন হল জীবন-মৃত্যু; নমরূদ তাতেও কীভাবে তর্ক জুড়ে দিল! সে অবিশ্বাস করল! বাদানুবাদে লিপ্ত হল! আল্লাহ ﷻ-র একত্ববাদে, প্রতিপালনে সন্দেহ করল!

বড় আশ্চর্যের বিষয়, কীভাবে এই নিদর্শন সে অস্বীকার করল! বড় আফসোসের বিষয়, কীভাবে এই জলজ্যান্ত নিদর্শন পেয়েও সে ঈমান থেকে বিমুখ রইল!

আল্লাহ ﷻ-কে নিয়েও সন্দেহ?

আল্লাহ ﷻ-র নিদর্শনসমূহেও সংশয়? অস্পষ্টতা?

এই সন্দেহ-সংশয় থেকেই নমরূদরা, নমরূদের প্রেতাত্মারা আল্লাহ ﷻ-র দীন, কিতাব, সুন্নাহ নিয়ে ঠাট্টা করে।

নমরূদ দাবি করল, সে-ই জীবন-মৃত্যুর মালিক। তার দাবি প্রমাণ করার জন্য জেলখানা থেকে একজন কয়েদী বের করে এনে মুক্তি দিয়ে দিল আর বলল, এই দেখ! তোমাদের সামনে আমি এই লোকটিকে জীবন দান করলাম। এরপর সে আরেকজন লোক ধরে এনে যবাই করে দিল এবং বলল, দেখ! আমি এই লোকটিকে মৃত্যু দিলাম।

হায়রে বোকা! নির্বোধ! অজ্ঞ! যিনদীক! মিথ্যুক!

ইবরাহিম ﷺ তাকে এবারে এমন সমুচিত জবাব ও অকাট্য যুক্তিতে পরাভূত করলেন, যার পরে আর কিছু বলা যায় না। প্রতিউত্তরের আর কোন পথ খোলা থাকে না। ইবরাহিম তাকে বললেন, তুমি যদি তোমার প্রভুত্বের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে শোন–

> নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। [সূরা বাকারা : ২৫৮]

অর্থাৎ সে পরাজিত হল। নিন্দিত, অপদস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হল।

> আর আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না। [সূরা বাকারা : ২৫৮]

ইবরাহিম ﷺ-র অকাট্য দলীল উপস্থাপনের পরও নমরূদ তার গোঁয়ার্তুমি থেকে একটু নড়ল না। নির্লজ্জ তামাশা আর মিথ্যাচার থামাল না। সে আরও একরোখা সিদ্ধান্ত নিল। লাকড়ির স্তুপ জমিয়ে তাতে আগুন উত্তপ্ত করল। তার বাহিনী ইবরাহিমকে ধরে আনল। তাকে দ্রুত আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য তড়িঘড়ি করল। ইবরাহিম তখন নিরুপায়। সে এখন কোথায় আশান্বিত মুখ ফিরাবে! কার কাছে সাহায্য চাইবে!

ওগো আল্লাহ আমার আশার আধার, লক্ষ-কোটি কৃপা তোমার,

আমায় রক্ষা করেছ।

অত্যাচারীর নিনাদ ভারি, ধ্বংস হবো সমূল ছাড়ি;

তুমি রক্ষা করেছ।

তুমি আমায় রক্ষা করে জালিম-মনে ভয়ের ভয়াল আঁধার দিয়েছ।

ইবরাহিম ﷺ-কে জালিমদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহই বাঁচিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, 'তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর।' তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী!
>
> অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলনা। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট। [আলে ইমরান: ১৭৩, ১৭৪]

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه একটি দোয়া বর্ণনা করেন, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ 'হাসবুনাল্লাহু ওয়ানি'মাল ওয়াকীল'।

অর্থ, 'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ঠ, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহী!'

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, "এই দোয়াটি ইবরাহিম عليه السلام অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় পড়েছিলেন। আর রাসুল ﷺ পড়েছিলেন, যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জমায়েত হওয়ার সংবাদ এসেছিল। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> যখন তাদেরকে লোকে বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর। কিন্তু এ কথা তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক। [আলে ইমরান, ১৭৩] [বুখারি : ৪৫৬৩]

নমরূদের বাহিনী যখন ইবরাহিমকে গ্রেফতার করল, আগুন উত্তপ্ত করে ইবরাহিমকে একটি নিক্ষেপনযন্ত্রে বসাল, সেই বিপদকালে জিবরাঈল এলেন ইবরাহিমের কাছে। জীবনের জটিলতম পরীক্ষা এবং সবচেয়ে বিপদসংকুল ঘূর্ণিপাকে নিপতিত হওয়ার সেই সময়টি যে কোন মানুষের জন্য ভয়াবহ একটি সময়। ইবরাহিমেরও ঠিক তাই।

জীবরাঈল আসলেন, ইবরাহিম তখন রশিবন্ধ। জিবরাঈল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে কি আপনার কোন প্রয়োজন আছে?'

ইবরাহিম ﷺ আল্লাহ ﷻ-র সাহায্যে ভরসা করে, আল্লাহ ﷻ-র কুদরতের প্রবল আস্থায় বলীয়ান হয়ে ধৈর্যশীল এক সতর্ক মুমিনের মত উত্তর দিলেন, 'তোমার পক্ষ থেকে হলে প্রয়োজন নেই। আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে হলে প্রয়োজন আছে!'

অতঃপর নমরূদ বাহিনী ইবরাহিম ﷺ-কে নিক্ষেপ করল। ইবরাহিম ﷺ বলে ওঠলেন, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ 'হাসবুনাল্লাহু ওয়ানি'য়মাল ওয়াকীল। আল্লাহই আমার যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক।'

ইবরাহিম ﷺ যখন আগুনে পতিত হলেন, আগুন তখন শীতল, আরামদায়ক, শান্তিপ্রদ... আল্লাহ কতো মহান! তিনি ইবরাহিমকে নাজাত দিয়েছেন। জ্বলন থেকে রক্ষা করেছেন। পোড়ন থেকে বাঁচিয়েছেন। কারণ, ইবরাহিম ছিলেন সৌভাগ্যবান। সুখী মানুষ। আল্লাহ কতো মহান! তিনি নিকৃষ্ট নমরূদকে ব্যর্থ করেছেন। খবিস নমরূদকে নিষ্ফল ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। কারণ, সে ছিল দুর্ভাগ্যবান। দুঃখী মানুষ।

আল্লাহ নমরূদকে শাস্তি দিয়েছেন।

মজার ব্যাপার হল– সে শাস্তিটি কী ছিল?

ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন, একদিন একটি মশা তার নাকে প্রবেশ করল। মশাটি মাথায় পৌঁছে মগজ খেতে শুরু করল। খেতে খেতে মশাটি চড়ুই পাখির মতো হয়ে গেল। এবার চড়ুই পাখির মতো ডানা ঝাপটাতে শুরু করল নমরূদের মাথার ভিতর। নমরূদের মাথায় শুরু হয়ে গেল ধড়ক। অসহনীয় শাস্তি, দুঃসহনীয় কষ্ট। এই কষ্ট আর প্রশমিত হচ্ছে না। স্থির হতে পারছে

না নমরূদ। একপর্যায়ে একটু স্বস্তির জন্য চাবুক বা জুতা দিয়ে তার মাথায় আঘাত শুরু হল। আঘাত পেতে পেতে তার মাথার মগজ শেষ হয়ে গেল।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আর পরকালের আযাব তো আরও লাঞ্চনাকর এমতাবস্থায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। [ফুসসিলাত: ১৬]

> এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে। আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করবো।

> সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাবো। [সূরা ত্বাহা: ১২৪-১২৬]

আজ যারা ঈমানহীন হয়ে আকাশচুম্বি ভবনে আড়ম্বরে জীবন কাটাচ্ছে, প্রাণোচ্ছল অভিযাত্রীর মতো স্বাধীন দিন কাটাচ্ছে বাড়িঘরে, তারা সেদিন এসব আর পাবে না। তাদের জন্য থাকবে সংকীর্ণ জীবিকা।

তাই বলা হয়, প্রকৃত অন্ধত্ব বাহ্যচোখের অন্ধত্ব নয়, যদিও সে বাহ্যচোখে অন্ধ থাকে। বরং প্রকৃত অন্ধ হলো যার অন্তর অন্ধ। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়। [হাজ্জ: ৪৬]

অনেকেরই ষাঁড়ের মতো বড় বড় চোখ আছে, কিন্তু সে দেখে না। তার আল্লাহ ﷻ-র ভয়ে কম্পিত অন্তর নেই। তার উদাহরণ আবু জাহলের মতো। আবু জাহল সব দেখতো। সব অনিষ্ট সে দেখতো, শুধু মঙ্গলজনক কিছু দেখতো না। অথচ উম্মে মাকতূম رضي الله عنه এর চোখ অন্ধ ছিল। কিছু দেখতেন না। কিন্তু তার অন্তঃচক্ষু ছিল। পবিত্র আত্মা ছিল। শুদ্ধ হৃদয় আর নিষ্কলুষ মন ছিল।

ইবরাহিম عليه السلام তার আল্লাহভীতি ও তাকওয়ার ফলাফল পেয়েছেন। দুর্ভাগ্যবান নমরূদের সাথে সুদৃঢ় বিশ্বাসে অটল থেকে বিতর্ক করেছিলেন। তাই তিনি দুনিয়াতে মুক্তি পেয়েছেন। আখেরাতেও সফল হয়েছেন। কিন্তু এই দুর্ভাগ্যবান নমরূদ, আল্লাহ ﷻ তাকে দুনিয়াতে লাঞ্চিত করেছেন। আখেরাতেও অপদস্থ

করবেন। কারণ, সে হেদায়াত গ্রহণ করেনি। সে আল্লাহর নূরের আবহে নিজেকে আনতে পারেনি।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয়, রুটি-পানি, খাদ্যাহার না থাকলে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। আমাদের ক্ষতি হবে হেদায়াত না থাকলে। আল্লাহ ﷻ-র তাওফিক আমাদের সহায় না হলে। এজন্য আমাদের প্রয়োজন একদল দাঈ, যারা রাস্তাঘাটে ঘুরবেন, মানুষকে আল্লাহ ﷻ-র পথে এবং রাসূলের সুন্নতে আহ্বান করবেন।

ইমাম শাফেঈ رحمه الله বলেন–

‘মেষের গোশত খেয়ে বেড়ায় কুকুরে, অজগর ঐ মরছে ক্ষুদায় বাঁদাড়ে।’

এমনই আমরা কাউকে ক্ষুদার তাড়নায় মরতে শুনি না, কিন্তু অন্তরগুলো ক্ষুদার তাড়নায় মরে যায়। যেন দুর্ভিক্ষের কবলে হীন দরিদ্র দুর্বল হয়ে মরে যায়।

এই মৃতপ্রায় অন্তরের কোন সঞ্জীবনী আছে কি?

হ্যাঁ, আছে। কোরআন আর সুন্নাহ হল এই মৃতপ্রায় অন্তরের সঞ্জীবনী।

মুসা عليه السلام ও ফেরাউন

ফেরাউনের সাথে মুসা عليه السلام-র বাদানুবাদ, সে এক পরমাশ্চর্য বাদানুবাদ।

মুসা عليه السلام ছিলেন একজন রাখাল। কিন্তু তিনি আল্লাহ ﷻ-কে চিনতেন, জানতেন।

মুসা عليه السلام-র ছিল একটি লাঠি। নানা অলৌকিককতা ও বাজিমাত ছড়ানোর লাঠি। মুসা عليه السلام সে লাঠিতে ভর করতেন। ছাগপালের জন্য গাছ থেকে পাতা ঝরাতেন।

আর ফেরাউন!

ফেরাউন ছিল একটা দাজ্জাল। মতিভ্রম, বুদ্ধিভ্রষ্ট, বিকারগ্রস্ত, দাজ্জাল।

ফেরাউন মানুষের সমাবেশ ঘটিয়ে বলতো–

> তোমাদের জন্য আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। [কাসাস : ৩৮]

আবার মিসরবাসীকে একত্র করে বলতো–

আমি তোমাদের বড় রব। [নাযিয়াত: ২৪]

আল্লাহ ﷻ মুসা ﷺ-কে বললেন–

ফেরাউনের কাছে যাও। সে দারুণ উদ্ধত হয়েছে। [ত্বাহা: ২৩]

মুসা দায়িত্বের কথা শুনে প্রথমেই বললেন–

হে আমার রব, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। [ত্বাহা: ২৪]

আল্লাহ ﷻ মুসা ﷺ-র বক্ষ প্রশস্ত করে দিলেন। দারুণ উদ্ধত ফেরাউনের মোকাবেলার জন্য তাকে প্রস্তুত করলেন।

একটি বিষয় হলো, মানুষ জীবনে অনেক কিছুর স্বাদ আস্বাদন করে। কিন্তু তারা কখনও ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না। ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করতে পারে না। তাদের বক্ষগুলো, অন্তরগুলো ঈমানের নূর আরোহণের জন্য প্রশস্ত নয়। রাসূলের সুন্নতের জন্য উন্মুক্ত নয়।

মুসা ﷺ বললেন–

হে আমার রব, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। [ত্বাহা: ২৩-২৮]

মুসা ﷺ চেয়েছেন তিনি একজন দাঈ হবেন। একজন সদুপদেশদানকারী ও নসীহতকারী হবেন। যেন মানুষ আল্লাহ ﷻ-কে চিনে। আল্লাহ ﷻ-র দিকে মনোনিবেশ করে। এজন্য তিনি এমন দোয়া করেছিলেন।

মুসা ﷺ ছোট বেলায় আগুনের কয়লা মুখে পুরেছিলেন। সে থেকে তার মুখে জড়তা ছিল। তিনি মুখের জড়তা দূর হওয়ার দোয়াও করলেন। আল্লাহ ﷻ তার দোয়া কবূল করলেন। তার মুখের জড়তা দূর করে দিলেন।

মুসা ﷺ-র এই দোয়ায় সকল জায়গার সকল আলেম ও মুসলিমের জন্য পয়গাম রয়েছে, তারা যেন মানুষের মাঝে হেদায়াত বুঝানোর জন্য, মানুষকে নবির পথে ফিরিয়ে আনার জন্য বক্তৃতা শিখে, লিখনী শিখে। তদ্রূপ সকল

আলেম এবং মুসলিমের জন্য এই পয়গামও রয়েছে, তারা যেন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখানোর জন্য, ভ্রষ্টতা থেকে হেদায়াতের পথে উত্তরিত করার জন্য ভাষাশৈলী, বিতর্কের চাতুর্য ও বিচক্ষণতা এবং হালাল কৌশল আয়ত্ত করে।

মুসা ﷺ আরও বললেন–

> এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন; আমার ভাই হারুনকে। [ত্বাহা: ২৯, ৩০]

আল্লাহ ﷻ মুসা ﷺ-র এই দোয়াও কবূল করলেন। হারুনকে তার সহযোগী বানালেন। বললেন,

> হে মুসা, তোমাকে তোমার চাওয়াগুলো দেয়া হয়েছে। [ত্বাহা: ৪৪]

মুসা এবং হারুন ﷺ ফেরাউনের দরবারে গেলেন। আল্লাহ মুসা এবং হারুনকে পথিমধ্যে সতর্ক করে বললেন–

> তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও। সে দারুণ উদ্ধত হয়েছে।' [ত্বাহা: ৪৩] অর্থাৎ সে সীমালঙ্ঘন করেছে। বাড়াবাড়ি করেছে। তার রবের উপর অহঙ্কার ও দম্ভ করেছে। কিন্তু 'তোমরা তাকে নম্র কথা বলো, হয়তো সে চিন্তাভাবনা করবে অথবা ভীত হবে। [ত্বাহা: ৪৪]

মধুর কথাবার্তা এবং অনুপম উপস্থাপন দ্বারা মানুষের অন্তর কোমল হয়। হৃদ্যতাপূর্ণ প্রেমময় কথা শুনতে মানুষ পছন্দ করে। পজ্ঞাপূর্ণ কৌশলী কথাবার্তায় মানুষ আত্মসমর্পণ করে। এজন্য আল্লাহ ﷻ তাদের এই নির্দেশনা দিয়ে দিলেন।

সুফিয়ান সাওরি ﵀ বলেন, 'তোমরা তাকে নম্র কথা বলো, হয়তো সে চিন্তাভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।' অর্থাৎ, তাকে তার উপনামে সম্বোধন করবে।

বাস্তবেই যখন কাউকে মূল নামে না ডেকে উপনামে সম্বোধন করা হয়, তখন সে খুশী হয়। প্রফুল্ল ও আনন্দিত হয়। সহাস্য ও হর্ষোৎফুল্ল হয়। আকর্ষিত ও উৎসাহিত হয়। কবি বলেন–

উপনাম ধরে ডাকি আমি তারে, ডাকি তারে মান ভরে

উপাধী নয় কোন খারাপ উপাধী; ওভাবে ডাকিনা তারে।
যে আদব আমি শিখেছি, সে আদব বনে গেছে অভ্যাস
চরিতের মূলে শিকড়ে শিখরে সে আদবেরই শুধু প্রকাশ।

মুসা এবং হারুন ﷺ ফেরাউনের প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। ফেরাউনের উপনাম ছিলো 'আবু মাররা'। (আবু আইয়ূব আনসারী এবং সুফিয়ান সাওরী ﷺ এর বর্ণনা এরূপ) মুসা ﷺ তাকে বললেন, 'হে আবু মাররা, তুমি যদি তোমার যৌবন, ধন-সম্পদ, রাজত্ব, প্রসিদ্ধির স্থায়িত্ব চাও, তাহলে এক আল্লাহর বিশ্বাস গ্রহণ করো।'

ফেরাউন বলল–

> হে মুসা, তোমাদের প্রভু কে? [ত্বাহা: ৪৯]

ফেরাউন আল্লাহ ﷻ-র অস্তিত্বই অস্বীকার করে বসল!

আল্লাহ বলেন–

> হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। তিনি তোমাকে তার ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। [ইনফিত্বার: ৬-৮]

ফেরাউন পালনকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের প্রভু কে?'

মুসা ﷺ এখন কী উত্তর দিবেন? যদি বলেন, আমার প্রভু আল্লাহ। ফেরাউন বলবে, আমিই আল্লাহ। যদি বলেন, আমার প্রভুই আমার প্রভু। ফেরাউন বলবে, আমি তোমার প্রভু।

তাহলে মুসা এখন কী বলবেন?

মুসা ﷺ আল্লাহর ইশারায় অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তর দিলেন। বললেন–

> আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। [ত্বাহা: ৫০]

মুসা ﷺ প্রভুর পরিচয়ে এমন বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিলেন, যা শুধু এক আল্লাহ ﷻ-র মধ্যেই পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলো একমাত্র মূর্খ ভ্রষ্ট অবিশ্বাসীরাই অস্বীকার করতে পারে।

ইবনুল কায়্যিম ﷬ বলেন, ফেরাউন যে বলতো, 'আমি ছাড়া তোমাদের কোন প্রভু আছে বলে জানি না', এটি ছিলো তার মুখের কথা। সে আসলে জানতো, মহান একজন প্রভু আছেন। সে জানতো, যিনি আসমান ও যমিনসমূহ সৃষ্টি করেছেন, তিনি সর্বসক্ষম। তিনি স্বয়ম্ভু বিধাতা। তিনি দৃশ্য অদৃশ্য সবই জানেন।

মুসা ﷺ ফেরাউনকে বললেন–

> তুমি জান যে আসমান ও যমিনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফেরাউন, আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছ। [ইসরা: ১০২]
>
> আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। [ত্বাহা: ৫০]

সৃজিত সকল প্রাণবান বস্তুকে জীবনোপকরণ শিখিয়েছেন। কল্যাণ ও মঙ্গালের পথ দেখিয়েছেন। পিপিলিকাকে আপন গর্তে গরমকালে শীতের শষ্য সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। মৌমাছিকে মাইলের পর মাইল উড়ে গিয়ে মধু সংগ্রহ করে চাকে আহোরিত করার নির্দেশনা দিয়েছেন।

সুবাহানাল্লাহ! আল্লাহ কতো মহান! যে আল্লাহকে চিনল না, আল্লাহ থেকে দূরে রইল, সে কতই না ক্ষুদ্র! কতই না নগণ্য!

ফেরাউন রেগে জিজ্ঞেস করল–

> তবে পূর্ববর্তীদের কী অবস্থা? [সূরা ত্বাহা: ৫১]

আদম থেকে আমাদের বাপ-দাদা পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, আমাদের কাছে আর ফিরে আসেননি, তাদের কী অবস্থা?

এমনই হয়ে থাকে কাফের অবিশ্বাসীদের কথাবার্তা।

মুসা ﷺ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ফেরাউনের এ কথার সুন্দর সাবলীল উত্তর প্রদান করলেন। বললেন–

তাদের খবর আমার পালনকর্তার কাছে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা ভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন না। [ত্বাহা: ৫২]

মুসা ﷺ এভাবেই আল্লাহর নির্দেশনায় ফেরাউনকে খণ্ডন করলেন। তাকে পরাস্ত করলেন। তার উপর বিজয়ী হলেন বৈঠকে, ময়দানে। কারণ, মুসা ﷺ ছিলেন মুত্তাকী, আল্লাহভীরু। পাপিষ্ঠ ও দুর্ভাগ্যবান ছিল ফেরাউন। এজন্যই আল্লাহ ﷻ ফেরাউনের উপর মুসাকে বিজয় দান করলেন।

রাসূল ﷺ এবং বাতেল ফেরকা

১. ইহুদীদের সাথে রাসূলের কথাবার্তা:

রাসূলের জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, রাসূল কখনও ইহুদীদের সম্মুখীন হতেন, কখনও খৃষ্টানদের সম্মুখীন হতেন। কখনও মুনাফিকদের আবার কখনও মুশরিকদের সম্মুখীন হতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এর যবানে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে—

রাসূল ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন, মানুষ তার আশপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমিও মানুষের সমাবেশে উপস্থিত হলাম। আমি তার মুখাবয়ব দেখেই বুঝলাম, এটা কোন মিথ্যাশ্রয়ীর মুখাবয়ব হতে পারে না। তার মুখাবয়ব ছিল চৌদ্দতম রাতের চাঁদের মতো উজ্জ্বল! [তিরমিযি : ২৩৮৫]

কবি বলেন,
তার যদি না থাকতো স্পষ্ট কোন নিদর্শন,
চেহারাই তার বলে দিতো— এ যে নবুওয়াতের জীবন্ত দর্পণ!

রাসূলের চেহারা ছিল সত্যাশ্রয়ী, নিষ্ঠাপূর্ণ।

ইবনে সালাম বলেন, আমি তার চেহারা দেখলাম, তাকে নসিহত করতে শুনলাম—

'ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও। সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাও। স্বজন-বন্ধন অটুট রাখো। রাতে যখন সকলে ঘুমায়, তখন শয্যাত্যাগ করে সালাতে দাঁড়াও। এভাবে সালামের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ছিলেন তাওরাতের গভীর আলেম। ইহুদী ধর্মগুরুদের একজন। তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করবো। এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর নবিগণ ছাড়া আর কেউ জানে না। আপনি যদি প্রশ্নগুলোর উত্তর দানে সক্ষম হন, তাহলে আমি ঈমান গ্রহণ করবো। ইসলামে সমর্পিত হবো।'

রাসূল জিজ্ঞেস করলেন– 'কী তোমার প্রশ্ন?'

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রশ্ন শুরু করলেন–

'–জান্নাতে প্রবেশ করলে জান্নাতবাসীদের সর্বপ্রথম কী খেতে দেয়া হবে?

–সন্তান কখন বাবার আকৃতি পায় আর কখন মায়ের আকৃতি পায়?

–কেয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত কী?'

রাসূল ﷺ প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বললেন– 'জান্নাতবাসীদের প্রথমে খেতে দেয়া হবে মাছের ভূনা কলিজা।'

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন– 'আপনি সত্য বলেছেন।'

রাসূল দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'পুরুষের শুক্র অধিকতর প্রবল হলে সন্তান পিতার মতো হয়। আর মহিলার শুক্র প্রবলতর হলে সন্তান মায়ের মতো হয়।'

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন– 'আপনি সত্য বলেছেন।'

রাসূল ﷺ পরের প্রশ্নের উত্তর দিলেন, 'কেয়ামতের প্রথম নিদর্শন হবে একটি আগুন। যা মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে পূর্ব থেকে পশিচমে।'

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন– 'আপনি সত্য বলেছেন।'

অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ঈমান এনে ঘোষণা দিলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল।'

'হে আল্লাহর রাসূল, ইহুদীরা হলো মিথ্যুক জাতি। তারা যদি জানে আমি ঈমান গ্রহণ করেছি, তাহলে আমাকে অপবাদ দিবে। আপনি তাদেরকে আমার

ঈমানের কথা যেন না বলেন। আপনি আমাকে পিছনের এই রুমে গোপন রেখে তাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করুন।'

রাসূল ﷺ তাকে রুমে প্রবেশ করিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ইহুদীদের ডেকে সমাবেশ ঘটালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন– 'আব্দুল্লাহ তোমাদের মধ্যে কেমন লোক।'

তারা বললো, 'আব্দুল্লাহ আমাদের সর্দার। তার বাবাও আমাদের সর্দার ছিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে ভালো একজন মানুষ, তার পূর্বপুরুষগণও ভালো মানুষ। তিনি আমাদের মধ্যে একজন বিচক্ষণ আলেম, তার পূর্বপুরুষগণও ছিলেন বিচক্ষণ আলেম।'

রাসূল বললেন– 'সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তোমরা কী বলো?'

তারা বললো– 'আল্লাহ তাকে ইসলাম থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।'

এ কথোপকথেনর পর আব্দুল্লাহ দরজা খুলে বের হলেন এবং সকলের সামনে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মোহাম্মদ নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল।'

আব্দুল্লাহর এ ঘোষণা শুনে সকলে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, 'আব্দুল্লাহ আমাদের মধ্যে খারাপ নিকৃষ্ট কমীনা এক লোক। তার পিতৃপুরুষরাও খারাপ, নিকৃষ্ট এবং কমীনা ছিলো।' [সহিহ বুখারি : ৩৩২৯]

এই ঘটনার সূত্রে আল্লাহ ﷻ বলেন–

> বলো– তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি এই কোরআন আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর তোমরা এতে অবিশ্বাস করো, উপরন্তু বনী ইসলাঈলের একজন এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে; আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো, তাহলে তোমাদের পরিণাম কী হবে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেমদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।' [আহক্বাফ: ১০]

মুফাসসিরগণ বলেন, আয়াতে উল্লিখিত বনী ইসরাঈলের যে ব্যক্তি কোরআনের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম رضي الله عنه।

২. আস ইবনে ওয়ায়েলের সাথে কথোপকথন

আস ইবনে ওয়ায়েলের উপনাম আবু আমর। সে ছিলো গোত্রের প্রধান। রেশমের কাপড় পরিধান করে স্বর্ণাবরণে সেজে থাকতো সবসময়। কিন্তু তার এই স্বর্ণভরণ আর রেশমীসাজ কোনই লাভে আসেনি। সে বরং পরকালের অগ্নিবাসী। অগ্নিসাজ হবে তার। চিরস্থায়ী নিকৃষ্টতর জাহান্নামী সে। কারণ সে আল্লাহ ﷻ-কে চিনেনি। আল্লাহ ﷻ-কে সেজদা করেনি। সে আল্লাহ ﷻ-র ইবাদাতের আস্বাদ গ্রহণ করেনি।

আস একদিন রাসূলের কাছে আসল। এক টুকরো হাড্ডি ভেঙ্গো পিষে বিচূর্ণ করে রাসূলের সামনে উড়িয়ে দিল আর বলল, 'মোহাম্মদ! তোমার রব এই হাড্ডির টুকরোটিও জীবিত করতে পারবেন?'

রাসূল বললেন, 'হাঁ, তা করবেন এবং তোকে জাহান্নামে ফেলবেন।'

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> সে (অবিশ্বাসী) আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে, যখন সেগুলো পঁচে-গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। [ইয়াসীন: ৭৮, ৭৯]

আল্লাহ ﷻ কতো মহান! এক ফোঁটা তুচ্ছ পানি থেকে তিনি মানুষের অস্তিত্ব দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি দিয়েছেন। এরপরও মানুষ আল্লাহকে অস্বীকার করে! আল্লাহ ﷻ বলেন–

> মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ! [আবাসা: ১৭]

[হাকিম : ৩৬৫৪, হারেস : ৭২৯]

হাবিব ইবনে যায়েদ এবং মুসায়লামা কাযযাব

মুসায়লামা কাযযাব নিজেকে নবি দাবি করল। রাসূল ﷺ যখন জানলেন, হাবিব ইবনে যায়েদকে তার কাছে পাঠালেন। হাবিব তখন ত্রিশ বছরের বীর সাহাবি। সে বেড়ে উঠেছিল কোরআনের ছায়ায়। দুনিয়াতে তার সম্পদ বলতে

একটি তলোয়ার আর কোরআনই ছিল। তলোয়ার দিয়ে শত্রুর আস্ফালন স্তিমিত করতো। কোরআন দিয়ে আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রেমের আকুতি জানাতো। প্রত্যুষে সিজদায় অবনমিত হয়ে প্রেম নিবেদন করতো। তার অন্তরে কোরআন ধারণ করতো।

রাসূল ﷺ বললেন–

> লোকসকল! আমি তোমাদের বিভিন্ন রাজাদের কাছে পাঠাচ্ছি। তোমরা কেউ বিরোধিতা করো না। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/২৬৮]

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।'

রাসূল ﷺ বললেন–

> হে হাবিব ইবনে যায়দ! দাঁড়াও। তুমি মুসায়লামা কাযযাবের কাছে যাও।

হাবিব মুসায়লামার কাছে রওয়ানা হচ্ছেন। তার মা তাকে বিদায় জানালেন এবং বিদায় জানানোর সময় খুব কাঁদলেন। কিন্তু তার মা জানতেন, রাসূলের নির্দেশে হাবিব রওয়ানা হয়েছে। তিনি জানতেন, যদিও তার সন্তান এখনই তার থেকে বিচ্ছেদ হচ্ছে, অচিরেই তার সাথে আসমান-যমিনের মতো প্রসস্ত জান্নাতে দেখা হবে। তার অবস্থা হয়েছিল ইবনে যায়দূনের এই কবিতার মতো–

> আমাদের বিচ্ছেদ শেষে; যদিও কাঁদিনি দেখেছ তুমি পার্শদেশ লুটিয়ে, তবুও আমার কপোলদেশ যায়নি বন্ধু শুকিয়ে।
>
> বুকফাটা শোক ছাড়া আর কিছু নেই এই কপালে, যদিও গো তুমি দেখনি আমায় দুঃখিত বিহ্বলে।
>
> যদিবা হয় সাক্ষাত এই দুনিয়ার ভালোবাসা, হাশরের দিনে হবে সাক্ষাত –এই মোর প্রেমাশা।

হাবিব মুসায়লামার কাছে আসলেন।

মুসায়লামা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'
: 'আমি হাবিব ইবনে যায়দ।'

মুসায়লামা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সাথে কী এসেছে?'

: 'রাসূল ﷺ-র পক্ষ থেকে রিসালাতের দাওয়াত নিয়ে এসেছি।'

: 'তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ, মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল?'

: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর রাসূল।'

: 'তুমি কি সাক্ষ্য দাও, আমিও আল্লাহর রাসূল?'

: 'তুই কি বলছিস, আমি কিছু শুনছি না।'

মুসায়লামা আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সাক্ষ্য দাও, মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল?'

হাবিব আগের মতোই উত্তর দিলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।'

মুসায়লামা আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সাক্ষ্য দাও, আমিও আল্লাহর রাসূল?'

হাবিব একই উত্তর দিলেন, 'আমি কিছু শুনছি না।'

মুসায়লামা রেগে গেল। তার এক সৈন্যকে বলল, হাবিবের শরীর থেকে একটু গোশত কেটে ফেল।

আদেশ অনুযায়ী মুসায়লামার এক সৈন্য হাবিব رضي الله عنه এর শরীর থেকে একটু গোশত কেটে ফেলল।

মুসায়লামা আবার আগের মতো প্রশ্ন করতে থাকল। হাবিব رضي الله عنه ও আগের মতো উত্তর দিতে থাকলেন। মুসায়লামা রাগে ক্ষোভে তার শরীর থেকে আরও গোশত কাটতে থাকল। এক পর্যায়ে হাবিব ইবনে যায়দ رضي الله عنه এর রূহ আল্লাহ ﷻ-র কাছে চলে গেল। হাবিব رضي الله عنه শহীদ হলেন।

> হে প্রশান্ত মন তুমি, তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। [ফাজর: ২৭-৩০]

খুবাইব ইবনে আদী এবং কোরাইশ কাফেররা

কাফেররা খুবাইব ইবনে আদী ﵁-কে ফাঁসির মঞ্চে উপস্থিত করে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার শেষ আশা কী, খুবাইব?'

খুবাইব বললেন, 'আমি দুই রাকাত সালাত পড়তে চাই।'

তাকে দুই রাকাত সালাত পড়ার সুযোগ দেয়া হল। তিনি অযু করে দ্রুত দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে বললেন, 'তোমরা হয়ত মনে করবে আমি মৃত্যুকে ভয় পেয়েছি। তোমরা যদি এই কথা না বলতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ধীরে ধীরে সালাত পড়ছি, তাহলে আমি সালাত আরো ধীরে পড়তাম।'

কাফেররা তাকে আবার ফাঁসির মঞ্চে উঠাল। তিনি তখন আল্লাহর কাছে বললেন,

اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا

> আল্লাহ, তুমি তাদের গুণে রেখো। তাদের ভয়ঙ্করভাবে ধ্বংস করো। তাদের কাউকে ছেড়ো না।

কাফেররা তখন বলল, 'খুবাইব! তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদের জন্য ছেড়ে দিয়ে যদি মোহাম্মদকে তোমার স্থানে নিয়ে আসি, তাহলে তুমি কী বল?'

খুবাইব উত্তর দিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি আমার পরিবার-সম্পদের জন্য বেঁচে থাকবো, রাসূলুল্লাহর গায়ে একটি কাঁটা ফুটবে, এমনটা কখনও হতে পারে না।'

অতঃপর কাফেররা তাকে শহীদ করে ফেলল।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে খুবাইব ﵁ আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমি যে সুশান্তি পাবো, রাসূলকে তা দিও। হে আল্লাহর রাসূল, সুখের ছটা আপনাকে ছেয়ে নিক। হে আল্লাহর রাসূল, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহর রাসূল, আপনাকে ঘিরে প্রশান্তির নির্ঝরিণী প্রবাহিত হোক।'

খুবাইব মক্কা থেকে এই দোয়া করছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তখন মদীনায়। রাসূল মদীনা থেকে বললেন, 'খুবাইব, সুখের ছটা তোমাকেও ছেয়ে নিক। খুবাইব, তোমার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। খুবাইব, তোমাকে ঘিরেও প্রবাহিত হোক প্রশান্তির অবিরল নির্ঝরিণী...'

খুবাইব ﵁ শহীদ হওয়ার পূর্বে এই কবিতাও পাঠ করেছিলেন–

> যেহেতু আমি মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করছি, তাই আমার কোন শঙ্কা নেই;
>
> আল্লারহ সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে যে কোন পার্শে আমি ঢলে পড়ি।
>
> আমি যেহেতু আল্লাহর পথেই মৃত্যুবরণ করছি,
>
> তিনি ইচ্ছা করলে আমার ছিন্নভিন্ন প্রতিটি অঙ্গো বরকত দান করতে পারনে। [সহিহ বুখারি : ৩৯৮৯]

আবু মুসলিম খাওলানি এবং আসওয়াদ আনাসি

আসওয়াদ আনাসি আবু মুসলিম খাওলানিকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি আমার উপর ঈমান রাখ? আমাকে নবি মান?'

আবু মুসলিম মিথ্যায় অভিযুক্ত করে বললেন, 'তুমি কী বলেছ, আমি শুনিনি।'

আবু মুসলিমের উত্তর শুনে আসওয়াদ কিছু লাকড়িতে আগুন জ্বালাল এবং আবু মুসলিমকে সে আগুনে নিক্ষেপ করল।

আবু মুসলিম বললেন, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।' 'আল্লাহই আমার যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কর্মবিধাতা।'

তার দোয়ায় আল্লাহ ﷻ আগুনকে শীতল ও আরামদায়ক বানিয়ে দিলেন। তিনি যখন মদীনায় ফিরে এলেন, ওমর ﵁ খুশি হয়ে তার সাথে মুয়ানাকা করলেন এবং বললেন, 'এই উম্মতের খলীলকে স্বাগতম। ইবরাহিম ﵇-র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিকে স্বাগতম।'

রবি ইবনে আমের এবং রুস্তম

কাদিসিয়ার যুদ্ধে রবি ইবনে রুস্তম ছিলেন মুসলমানদের শীর্ষব্যক্তি। তিনি যখন বন্দি হয়ে রুস্তমের সামনে উপস্থিত হলেন, রুস্তম তাকে দম্ভভরে হুঙ্কার ছেড়ে বলল, 'কী এসেছে তোমাদের সাথে?'

রবির সাথে ছিল তখন ভাঙ্গা তীর, ছিন্নভিন্ন কাপড়, আহত ঘোড়া। এই নিয়ে রবি প্রতিউত্তর করলেন, 'আল্লাহ ﷻ আমাদের পাঠিয়েছেন মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বে মুক্তি দানের জন্য। পার্থিব সঙ্কীর্ণতা থেকে আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে ধাবিত করার জন্য। মিথ্যা ধর্মের যাঁতাকল থেকে সত্য ধর্ম ইসলামের ন্যায়নীতি দান করার জন্য।'

দুর্ভাগ্যবান রুস্তম বলল, 'তুমি আমার প্রাসাদ থেকে মুখে-মাথায় মাটি লেপে বের হও।'

রবি ইবনে আমের মাটি নিলেন এবং সাথীদের বললেন, 'এটা হল তোমাদের জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ আমাদের এই মাটির মালিক বানাবেন।'

পরবর্তীতে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه সেখানে অভিযান করে বিজয়ী হয়েছিলেন। রুস্তমের প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন এবং পারস্যদের সব আড্ডাখানা গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। তখন তিনি এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করছিলেন–

> 'তারা ছেড়ে গিয়েছিলো কত উদ্যান আর প্রস্রবণ, কত শষ্যক্ষেত্র আর সুরম্য স্থান, কত সুখের স্থান যাতে তারা সুখগল্প করতো,
>
> এমনই হয়েছিলো এবং আমি এগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে, তাদের জন্য ক্রন্দন করেনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তারা অবকাশও পায়নি।' [দুঃখান: ২৫-২৯]

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর

যেসব মুসলিম ইসলামের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তেমনই একজন। তার প্রসিদ্ধ অনেক ঘটনা রয়েছে, যেসব ঘটনার কারণে সে নিজের বড়ত্ব ও মহত্ব অনুভব করতো।

তাউস ইবনে কায়সান (রহ.)। তিনি ছিলেন ইয়েমেনের প্রখ্যাত একজন আলেম। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন–

একবার আমি ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে হারামে প্রবেশ করি। মাকামে ইবরাহিমে দুই রাকাত সালাত শেষে একটু বসি। সেখানে মানুষ আসছে, তাওয়াফ করছে, আমি বসে বসে মনোহর সে দৃশ্য দেখছি। হঠাৎ সেখানে মানুষের শোরগোল শুনতে পাই। চারদিকে অস্ত্র; তলোয়ার ঢাল আর বল্লমধারীর সমাবেশ। খোঁজ নিয়ে দেখি, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এসেছে সেখানে। তার দেহরক্ষী আর স্তর-স্তর নিরাপত্তার জন্যই এই অস্ত্র আর সৈন্য সমাগম।

আমি আমার মতই বসে থাকি। এমতাবস্থায় ইয়েমেনের এক দুনিয়াবিরাগ আবেদ বাইতুল্লাহয় তাওয়াফ শুরু করলেন। আবেরদ তাওয়াফ করতে করতে এক পর্যায়ে হাজ্জাজের গায়ের উপর পড়লেন। হাজ্জাজ এতে রেগে গেলো। আবেদকে থামিয়ে দিলো। নিক্ষিপ্ত বল্লমের মত দু'টি শব্দ ছুঁড়ে দিয়ে আবেদকে হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলো, 'কোথা থেকে এসেছো তুমি?'

আবেদের নিস্পৃহ জবাব, 'ইয়েমেন থেকে।'

তেজালো হাজ্জাজ জ্বালাভরা চোখে বাষ্পের মতো তাকিয়ে আছে। তখন ইয়েমেনের বাদশাহ ছিলো হাজ্জাজের আরেক ভাই মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ। আবেদের বাড়ি ইয়েমেনে শুনে হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলো, 'আমার ভাই কেমন আছে?'

আবেদ জিজ্ঞেস করলেন, কে আপনার ভাই?

হাজ্জাজ বললো, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আমার ভাই।

মোহাম্মদ বিন ইউসুফও হাজ্জাজের মতো জালিম ছিলেন। আবেদ অবলা উত্তর দিলেন, 'বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর সুঠাম দেহ নিয়ে ভালই আছেন।'

হাজ্জাজ রেগে গিয়ে বললো, 'তোমাকে তার শারীরিক খবর জিজ্ঞেস করিনি। তার ন্যায়নীতি আর বিচারব্যবস্থা কেমন, তা জিজ্ঞেস করেছি।'

আবেদ কোন রাখঢাক না করে ধাম করে বলে ফেললেন, 'শাসনব্যবস্থায় সে তো ভয়ানক জালিম!'

হাজ্জাজ বাঁজখাই কণ্ঠে হুঙ্কার ছেড়ে বললো, 'তুমি কি ভুলে গেছো, সে আমার ভাই?'

আবেদ সাহসভরা কণ্ঠে বললেন, 'আপনি কি মনে করেন, আল্লাহ– আমার যত বড় শক্তি, সে আপনার আরো বড় শক্তি?'

তাউস বলেন, আবেদের উত্তর আর সাহসিকতা দেখে আমি অবাক হলাম। ভীত হলাম। আমার শরীরে একটি কাঁপুনি খেলে গেলো। আল্লাহই জানেন, হাজ্জাজ আবেদকে কী না করে ফেলেন। ভয়ে আমার শরীরের লোমগুলো পলায়মান হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলাম, হাজ্জাজ লোকটিকে ছেড়ে দিলো। আমি আরো একবার অবাক হলাম।

সাঈদ ইবনে জুবাইরের সাথে তার ঘটনা অনেক দীর্ঘ এবং শিক্ষণীয়।

হাজ্জাজ দীর্ঘ প্রায় আট বছর সাঈদ ইবনে জুবাইরের পিছনে লেগে ছিলো। এক পর্যায়ে সাঈদ ইবনে জুবাইর তার কাছে ধরা পড়লেন। সাঈদ ইবনে জুবাইর যখন তার দরবারে প্রবেশ করলেন, হাজ্জাজ তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কী?'

হাজ্জাজ সাঈদ ইবনে জুবাইরের নাম জানতো, তবু জিজ্ঞেস করলো। সাঈদ ইবনে জুবাইর উত্তর দিলেন, 'আমার নাম সাঈদ ইবনে জুবাইর।' (সাঈদ অর্থ সৌভাগ্যবান)

হাজ্জাজ বললো, 'না, তোমার নাম শাকী ইবনে কাসীর।' (শাকী অর্থ দুর্ভাগ্যবান)

সাঈদ বললেন, 'আমার মা যখন আমার নাম রেখেছেন, তখন তিনি এর অর্থ ভালোই জানতেন।'

হাজ্জাজ বললো, 'তুমি দুর্ভাগ্যবান। তোমার মা দুর্ভাগ্যবান। কসম! আমি দুনিয়াতেই তোমাকে লেলীহান আগুনে জ্বালিয়ে দিবো!'

সাঈদ বললেন, 'আমি যদি জানতাম তুমি একাজ করতে সক্ষম, তাহলে তোমাকে ইলাহ বানাতাম।'

হাজ্জাজ ভাবলো, আমার অনেক স্বর্ণ-রূপা আছে। এই ভেবে সাঈদ ইবনে জুবাইরকে পরীক্ষা করার জন্য হাজ্জাজ স্বর্ণ-রূপার পাত্র এনে তার সামনে ছড়িয়ে দিলো।

সাঈদ এসব দেখে বললেন, 'হাজ্জাজ, তুমি যদি এগুলো লোক দেখানোর জন্য অহঙ্কার বসত ছড়িয়ে থাকো, তবে মনে রেখো, আল্লাহ থেকে তুমি কখনও অমুখাপেক্ষী নও।'

হাজ্জাজ এবার ভাবলো, আমার তো নর্তকী আছে! সাঈদ ইবনে জুবাইরকে পরীক্ষা করার জন্য নর্তকীকে নাচ-গান করার নির্দেশ দিলো।

ঘটনাচিত্রে সাঈদ কাঁদতে শুরু করলেন। তার কান্না দেখে হাজ্জাজ বললো, 'সাঈদ! তুমি কি আনন্দে কান্না করছ!'

সাঈদ উত্তর দিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি আনন্দে কান্না করছিনা। আমি কান্না করছি এই নর্তকীর জন্য। এই নর্তকী এমন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ তাকে নাচ-গানের জন্য সৃষ্টি করেননি।'

হাজ্জাজ তার পেয়াদাদের বললো, 'তোমরা ওকে কেবলার দিক থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরাও। আল্লাহর কসম সাঈদ! তোমাকে আমি এমনভাবে হত্যা করবো, যেভাবে কাউকে হত্যা করা হয়নি।'

সাঈদ বললেন, 'হাজ্জাজ! যেভাবে ইচ্ছা হত্যা কর। আল্লাহর কসম! আমাকে তুমি যেভাবে হত্যা করবে, আল্লাহ ﷻ তোমাকে সেভাবে হত্যা করে শাস্তি দিবেন।'

হাজ্জাজ পেয়াদাদের বললো, 'কেবলার দিক থেকে ওর মুখ ফিরিয়ে দাও।'

সাঈদ বললেন, 'তোমরা যেদিকেই ফির, সেদিকেই রয়েছেন আল্লাহ!' [বাকারা: ১১৫]

হাজ্জাজ বললো, 'তোমরা ওকে মাটিতে নামাও।'

সাঈদ বললেন, 'এই মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি। এতেই তোমাদের ফিরিয়ে দিবো। এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদের উত্থিত করবো।' [সূরা ত্বাহা: ৫৫]

হাজ্জাজ বললো, 'তোমরা ওকে মেরে ফেলো!'

আল্লাহ যখন বান্দাকে ভালোবাসেন ...

সকল প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-র জন্য। দুরূদ ও সালাম নবি-রাসূলদের শ্রেষ্ঠতম মোহাম্মদের জন্য। তার পরিবার-পরিজন, সাহাবি-সহচরদের জন্য।

আল্লাহর পরম বন্ধুদের জন্য সুসংবাদসম্বলিত একটি হাদিসে কুদসি রয়েছে। আল্লাহর বন্ধুদের জন্য আল্লাহর পয়গাম। ইমাম শাওকানি রহ. কুত্বরুল ওয়ালিয়্যি ফী শারহি হাদিসিল ওয়ালিয়্যি নামক গ্রন্থে উক্ত হাদিসের সবিস্তার ব্যাখ্যা করেছেন। এ হাদিসের কিছু দিক আছে, সাধারণ মানুষ বা শিক্ষানবিস দূরের কথা, শীর্ষ ওলামায়ে কেরামও সেগুলোর রহস্য উদ্ঘাটনে গলদঘর্ম হয়েছেন।

আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

> মহান আল্লাহ বলেন, 'যে আমার কোন অলির সাথে শত্রুতা করল, সে আমার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। আমি বান্দার উপর যা ফরয করেছি, তার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন এবাদতদ্বারা বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারে না। আমার বান্দা সবসময় নফল এবাদতদ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে, একসময় আমি তাকে ভালবাসবো। যখন আমি তাকে ভালবাসবো, তখন আমি তার কান হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে চলে। বান্দা যদি আমার কাছে কিছু চায়, অবশ্যই আমি তাকে দান করবো। বান্দা যদি আমার কাছে আশ্রয় চায়, অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দিবো। আমি যে কোন কাজ করতে চাইলে কোন সংকোচ করি না, মুমিন বান্দার প্রাণ হরণে যতটা দ্বিধা সংকোচ করি। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আমি তার কষ্ট অপছন্দ করি। [বুখারি : ৬৫০২]

রাসূল ﷺ সমবেত নবিদের সবচে মর্যাদাবান। শীর্ষ। সকল নবির নেতা ও খতীব। সকলের প্রতিনিধি নির্বাচনে তিনি মুখপাত্র। নবিদের সমাবেশে তিনি ইমাম। কেয়ামতের দিন সুপারিশকারী। তিনিই সর্বপ্রথম কড়া নাড়বেন বেহেশতের দরজায়! আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালাম।

আল্লাহ ﷻ-র সকল বন্ধুর সেরা বন্ধু আবু বকর رضي الله عنه। নবিদের পর তার চেয়ে সুমহান, তার চেয়ে মর্যাদাবান আর কোন আল্লাহওয়ালা নেই। তার চেয়ে আল্লাহর নিকটভাজন কোন বন্ধু নেই। খিজির عليه السلام যদি আল্লাহ ﷻ-র নবি না হয়ে আল্লারহ নৈকট্যপ্রাপ্ত বন্ধু হয়ে থাকেন, তাহলে তার চেয়েও মর্যাদাবান আবু বকর رضي الله عنه।

রাসূল ﷺ বলেছেন–

> مَاطَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ عَلَى أَفْضَلِ مِنْ أَبِيْ بَكْرٍ
>
> নবি-রাসূলদের পর আবু বকরের চেয়ে মর্যাদাবান কোন ব্যক্তির উপর সূর্যের উদয়-অস্ত হয়নি! [আবু নুয়াইমের আল-হিলয়াহ : ৩/৩২৫]

সুতরাং আবু বকর হলেন আল্লাহর সকল বন্ধুর প্রিয় বন্ধু। এই উম্মতের মধ্যে তার চেয়ে মর্যাদাবান কোন আল্লাহওয়ালার আগমন নেই। তার চেয়ে প্রেমময় সালাত, ত্যাগসম্পন্ন সওম, ভক্তিমনা হজ্জ, কষ্ট-মোজাহাদা আর কারও নেই। প্রতিটি এবাদতে তিনি অর্জন করেছেন প্রথম স্তর।

রাসূল ﷺ বলেন–

> যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে– 'হে আল্লাহর বান্দা! এটাই উত্তম।' অতএব যে সালাত আদায়কারী, তাকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রাইয়ান দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সদকাকারী, তাকে সদকার দরজা থেকে ডাকা হবে।

আবু বকর رضي الله عنه বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান; সকল দরজা থেকে কাউকে কি ডাকা হবে?'

রাসূল ﷺ মুচকি হেসে বললেন–

> হাঁ, আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে হবে! [সহিহ বুখারি : ১৮৯৭]

আল্লাহওয়ালা বা আল্লাহর বন্ধুর পরিচয়

আল্লাহওয়ালা কে?

আল্লাহর বন্ধু কে?

সুফিদের একটি অংশ আল্লাহওয়ালা বা আল্লাহর বন্ধুদের পরিচয় প্রদানে বাড়াবাড়ি করে। আল্লাহওয়ালার পরিচয় দিয়ে বলে– 'যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ জগত ছেড়ে আল্লাহর ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেই আল্লাহওয়ালা।'

তারা আরও বলে, আল্লাহ ﷻ বলেছেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ "যখন আপনি ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন।' [কাহফ: ২৪] যখন তুমি নিজেকে ভুলে গেলে, নিজের আশপাশ ভুলে গেলে, তখনই তুমি আল্লাহকে স্মরণ করলে!"

আয়াতের এ ব্যাখ্যা ভুল। তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত।

এই শ্রেণীর সুফিরা আরও বলে, আল্লাহ বলেছেন, مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ "তোমাদের একদল ইহকাল চায়, আর তোমাদের একদল আখেরাত চায়'। [আলে ইমরান: ১৫২] যখন একদল ইহকাল চায়, আরেকদল পরকাল চায়, তাহলে যারা আল্লাহকে চায় তারা কোথায়?"

তাহলে যারা আখেরাত চায়, তারা কি আল্লাহকে চায় না?

আয়াতাংশে মূলত উহুদ যুদ্ধের একটি দৃশ্যপটের আলোচনায় বলা হয়েছে, 'তোমাদের একদল ইহকাল চায়, আর তোমাদের একদল আখেরাত চায়'। যারা গনিমত কুড়ানোর জন্য পাহাড় থেকে নেমে এসেছিল, তাদের এ উদ্যোগকে আল্লাহ অযাচিত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, তারা রাসূলের সহচর। রাসূলের সহচর হিসেবে এ কাজটি তাদের শোভা পায়নি। এ বিষয়টি আল্লাহ ﷻ এভাবে বলেছেন, مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا 'তোমাদের একদল ইহকাল চায়'।

সেখানে সবাই সাহাবি। যাদের ব্যাপারে বলেছেন, 'তোমাদের একদল ইহকাল চায়' –তারাও সাহাবি। আর যাদের ব্যাপারে বলেছেন, 'তোমাদের একদল পরকাল চায়' –তারাও সাহাবি। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং রাসূল ﷺ।

উক্ত সুফিদের ভাষ্য অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের এ উভয় দলই ভুল করেছেন!

সুফিরা আরও বলে, 'যে পরিশুদ্ধ হল, অন্যায়-কঠোরতা থেকে বেঁচে রইল, সকল হক আদায় করল, সেই সুফি। সেই আল্লাহওয়ালা, আল্লাহর বন্ধু।'

ইত্তিহাদিয়া নামক একটি দল বলে, ''পৃথিবীর সকলেই আল্লাহওয়ালা। সকলেই আল্লাহর বন্ধু। কারণ আল্লাহ ﷻ বলেছেন, ﴿سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا﴾ 'তিনি নেহায়াত পবিত্র ও মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা থেকে বহু উর্ধ্বে।'' [বনী ইসরাঈল: ৪৩]

আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহওয়ালা বা আল্লাহর বন্ধুর পরিচয় সাত আসমান উপর থেকে আল্লাহ ﷻ নিজেই বলেছেন–

﴿اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ﴾
মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত; যারা ঈমান এনেছে এবং ভীত রয়েছে। [ইউনুস: ৬২, ৬৩]

অর্থাৎ, যাদের তাকওয়া রয়েছে, যারা আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করে, তারাই আল্লাহওয়ালা। তারাই আল্লাহর বন্ধু।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তার রাসূল এবং মুমিনবৃন্দ, –যারা সালাত কায়েম করে যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ, তার রাসূল এবং বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী। [মায়েদা: ৫৫, ৫৬]

সাহাবায়ে কেরামের কাছে আল্লাহ ﷻ-র বন্ধু হওয়ার পদ্ধতি ছিল আল্লাহ ﷻ-র দাসত্ব করা এবং তার এবাদতে মগ্ন থাকা। সাহাবায়ে কেরাম ভিন্ন অন্যদের কাছে পদ্ধতি ছিলো তিনটি। নিজ নিজ রুচি, তাত্ত্বিক যুক্তি-তর্ক, চিন্তা ও গবেষণা।

কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এভাবে আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুত্বের পথে হাঁটেননি। বরং তাদের মধ্যে আল্লাহ ﷻ-র অত্যধিক নৈকট্যভাজন তিনিই ছিলেন, যিনি আল্লাহ ﷻ-র এবাদত ও দাসত্বে অগ্রসর ছিলেন।

আবু বকর رضي الله عنه সবচে মর্যাদাবান আল্লাহওয়ালা ছিলেন, কারণ তিনি সবচেয়ে বেশি এবাদতগুযার ছিলেন। তিনি হজ্জ করেছেন, জিহাদ করেছেন, সওম রেখেছেন, নিজেকে পরিশুদ্ধ রেখেছেন, আল্লাহ جل جلاله-র কাছে দোয়া-কান্নাকাটি করেছেন, ইসলামের জন্য আপন জান-মাল সব উৎসর্গ করেছেন। আল্লাহভীরুতায়ও তিনি অগ্রণী ছিলেন।

ইমাম আহমদ رحمه الله কিতাবুয যুহদ-এ লিখেন, আবু বকর رضي الله عنه অত্যধিক সন্তাপে কান্নাকাটি করতেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলতেন, আমি যদি গাছ হতাম! তিনি বলতেন, আমি যদি পাখি হতাম! পাখির মতো উড়ে বেড়াতাম! ও পাখি, তোমার জন্য সুসংবাদ! তুমি গাছে গাছে উড়ে বেড়াও, পানিতে চঞ্চু খাও। মৃত্যুর পর তোমার কোন হিশাব-নিকাশ নেই। তোমার জন্য সুসংবাদ!

আবু বকর رضي الله عنه যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, আয়েশা رضي الله عنها তাকে বললেন, ‘কবি সত্য বলেছেন–

যখন মৃত্যু আসবে;

গলা ভেঙ্গে শব্দ উঠবে গড়গড়

সঙ্কোচনে ভেঙ্গে আসবে বক্ষ-পাঁজর

তখনও নিঃশেষ হয় না কতক যুবকের প্রাচুর্য!’

আবু বকর رضي الله عنه বলে উঠলেন, “আয়েশা, এ কথা বলো না। বরং বলো–

> মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে। এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন। প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে, তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। [কাফ: ১৯-২১]

অতপর তিনি আল্লাহ جل جلاله-র রহমতের ছায়ায় চলে গেলেন। রেখে গেলেন তার পরনের কাপড়, ব্যবহারের খচ্চর এবং অল্প কিছু সম্পদ। অথচ তিনি ছিলেন একজন শির্ষ ব্যবসায়ী। তিনি তার সকল সম্পদ আল্লাহ جل جلاله-র রাস্তায় ব্যয় করে গেছেন। কেয়ামতের দিন আল্লাহ جل جلاله উত্তমরূপে সেসব ফিরিয়ে দিবেন।

সুতরাং আল্লাহওয়ালা বা আল্লাহর বন্ধু তিনিই, যিনি আল্লাহকে ভয় করবেন। তাকওয়া অর্জন করবেন। নেক আমল করবেন।

আবু উসমান সাবূনি রহিমাহুল্লাহ লিখেন, আল্লাহর অলি বা বন্ধু সেই ব্যক্তি, যিনি ফরযসমূহ যথাযথভাবে আদায় করেন, হারাম থেকে বেঁচে থাকেন, বেশি বেশি নফল আদায় করেন। যার হৃদয়খানি নির্মল। চরিত্র সুষমাভরা। যিনি রাত জেগে এবাদত করেন। নফসের সাথে মোজাহাদা করেন। মানুষের সাথে হাসিমাখা আচরণ করেন। সততা বজায় রাখেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা-র গোলামীতে উবু হয়ে থাকেন...

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ মাদারিজুস সালিকীন কিতাবে লিখেন, আল্লাহর অলি বা বন্ধুদের নির্দিষ্ট কোন পোষাক-পরিচ্ছদ নেই, যেমনটা অনেক সুফি দাবি করে। বরং অপরাপর মানুষের মতই তারা পোষাক পরিধান করেন। পানাহার করেন। তাদের বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয় আমল ও তাকওয়ার মাধ্যমে।

কবি বলেন–

আলখিল্লা পরিধান করেন কত আল্লাহর অলি
আড়ালে তার লুকিয়ে থাকে কতশত যিনদীক...

খারেজিরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা-র এবাদতে জন্য নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো পথ ও পন্থা আবিষ্কার করে নিয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে তারা ইলম ও ফিকহ পরিহার করেছে। দীনের চাহিদাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে। এরা হলো জাহান্নামের কুকুর।

একদিন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু খারেজিদের কাছে আসলেন কিছু আলাপ-সালাপ করার জন্য। আসার সময় তিনি গোসল করলেন। দামি একটি পোষাক পরে সুগন্ধি মাখলেন।

এদিকে খারেজিরা ছেঁড়া তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করত। তারা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর গায়ে দামি পোষাক দেখে আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনি ইবনে আব্বাস এই পোষাক পরিধান করেছেন!

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'রাসূল সম্বন্ধে তোমরা বেশি জান, নাকি আমি বেশি জানি!'

লোকেরা বলল, 'আপনি বেশি জানেন।'

ইবনে আব্বাস বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে লালরঙ্গা এমন পোষাক পরতে দেখেছি, যা ছিলো অনেক পোষাকের অন্যতম!'

এই ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হল, পোষাক-পরিচ্ছদের সাথে আল্লাহওয়ালা হওয়া না হওয়ার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহর অলিদের চেনার বিশেষ কোন ইউনিফর্ম নেই।

একদিন আয়েশা رضي الله عنها দেখলেন, কিছু লোক মরার মতো ভান ধরে হাঁটছে। আয়েশা رضي الله عنها জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কারা?'

আয়েশাকে উত্তর দেয়া হল, 'এরা আল্লাহর এবাদতকারী।'

আয়েশা رضي الله عنها বললেন, 'এক আল্লাহর কসম! ওমর رضي الله عنه আল্লাহকে তাদের চেয়ে অধিক ভয় করতেন। তাদের চেয়ে অধিক আল্লাহর জন্য সাধনা ও এবাদত করতেন। তিনিও যখন হাঁটতেন, দ্রুতগতিতে হাঁটতেন। যখন কথা বলতেন, মানুষ যেন শুনতে পায়, এতটুকু জোরে কথা বলতেন। যখন প্রহার করতেন, প্রহারিত ব্যক্তিকে ব্যথা দিয়ে প্রহার করতেন।' [তাফসিরে তবারি : ২/৫৭২]

আল্লাহওয়ালাদের স্তর

ওলামায়ে কেরাম আল্লাহওয়ালাদের দুটি স্তর বলে থাকেন। একটি সাধারণ স্তর, অপরটি বিশেষ স্তর।

ইবনে তাইমিয়া رحمه الله-র দৃষ্টিতে মানুষ তিন প্রকার। যেমনটা আল্লাহ ﷻ নিজেই বলেছেন–

> অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদের আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। [সূরা ফাত্বির: ৩২]

আয়াতে উল্লিখিত নিজের উপর অত্যাচারী হলো সেই ব্যক্তি, যে মাঝেমধ্যে ওয়াজিব ছেড়ে দেয়। মাঝেমধ্যে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয়।

মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী– যিনি আল্লাহর ফরয ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করেন। কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকেন। তবে কখনও কখনও মুস্তাহাব আমল তার থেকে ছুটে যায় এবং মাকরূহ বিভিন্ন কাজে তিনি লিপ্ত হয়ে পড়েন।

কল্যাণের পথে অগ্রসর– যিনি ফরয ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করার পাশাপাশি মুস্তাহাব এবাদত করে আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্য অর্জন করেন। কবীরা গোনাহ থেকে বাঁচার পাশাপাশি সগীরা গোনাহ এবং মাকরূহ গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকেন।

ইবনুল কাইয়ূম رحمه الله এর দৃষ্টিতে তিনিই কল্যাণের পথে অগ্রসর ব্যক্তি, যিনি ঘুমিয়ে গেলে তার অন্তর আরশের পাশে প্রদিক্ষণ করে। তার অন্তর সবসময় আল্লাহ ﷻ-র স্মরণে জাগ্রত থাকে। গভীর রাতে ঘুম থেকে জাগেন। অজু করেন। আল্লাহ ﷻ-র জন্য ভীত অন্তরে ত্রস্ত হয়ে পড়েন। সালাত পড়েন। নিভৃতে আল্লাহ ﷻ-র কাছে মনের আলাপন তুলে ধরেন। তার ইচ্ছা ও ভালোবাসার সকল অভিসার, অন্তর ও অঙ্গা-প্রত্যঙ্গোর সকল মিনতি আল্লাহর কাছে ঝরে পড়ে। নিজের জন্য তার কোন চাওয়া-পাওয়া থাকে না।

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ ﷻ বলেন–

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْحَرْبِ

> যে আমার কোন অলির সাথে শত্রুতা করল, সে আমার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। [সহিহ বুখারি : ৬৫০২]

কোন মুসলমানের সাথে শত্রুতা, রাগ-গোস্বার পর দুজন আন্তরিক বন্ধু হয়ে গেলেও কি শত্রুতা বলে বিবেচিত হবে!

কিছু ঝগড়া-বিবাদ, বিতর্ক-বিরোধিতা শত্রুতার মধ্যে গণ্য নয়। আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুত্বের টানে পারস্পরিক তর্ক-বিবাদ শত্রুতার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন আবু বকরের প্রতি রাফেযিদের শত্রুতা, আলীর প্রতি নাসেবিদের শত্রুতা, মুমিনদের সাথে কাফের-মুনাফেকদের শত্রুতা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ, আহলে সুন্নাতের সাথে বিদয়াতপন্থীদের শত্রুতা রয়েছে। কিন্তু এগুলো আবু বকর, আলী, মুমিন ও আহলে সুন্নতের দিক থেকে শত্রুতা নয়। কারণ, এগুলো হয়েছে আল্লাহ ﷻ-র সাথে তাদের বন্ধুত্বের খাতিরে।

তদ্রূপ আলেমদের পরস্পর বিতর্ক ও মতানৈক্য, সহজাত পরমত-অসহিষ্ণুতা মূলত আল্লাহওয়ালাদের সাথে শত্রুতা নয়।

> যে আমার কোন অলির সাথে শত্রুতা করল, সে আমার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। [সহিহ বুখারি : ৬৫০২]

আল্লাহ ﷻ-র সাথে যুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার অর্থ– বান্দা এমন অবস্থার সম্মুখীন হবে, যাতে তার ধ্বংস অনিবার্য। বান্দা আল্লাহ ﷻ-র সাথে এমন আচরণ করবে, যাতে আল্লাহ ﷻ রাগ হন। আল্লাহ ﷻ তাকে ধ্বংস করে দেন।

বান্দা সবসময় নফল এবাদতদ্বারা আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে, একসময় আল্লাহ ﷻ তাকে ভালবাসবো।

ফরয বিধান নফলের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ। তবু নফলকে আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসা ও নৈকট্যলাভের পন্থা হিসেবে নির্ণয় করা হয়েছে। কারণ নফল আদায়ে ঐ ব্যক্তিই আন্তরিক ও ব্রতী হন, যিনি ফরযসমূহ যথাযথভাবে পালন করেন। আল্লাহর ভয়েই শুধু নয়, আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা লাভের চেষ্টায় ফরযসমূহ আদায় করেন।

নফল দ্বারা যে কোন নফলই উদ্দেশ্য। সালাতের মধ্যে তাহাজ্জুদ, ইশরাক, সুন্নত, বিতর ইত্যাদি।

সালাত ছাড়াও সওম, হজ্জ, দান-সদকা ইত্যাদি।

অনেকে মনে করে, ফরযের অতিরিক্ত যেসব এবাদত রয়েছে, সেসব আদায় করলেই সে নফল আদায়কারী হয়ে গেল। যেমন ফজরের সালাত কাযা আদায় করে ইশরাকের দুই রাকাতের প্রতি খুবই গুরুত্ব দেখাল। এশার ফরয সালাত আদায় না করে তারাবির প্রতি খুবই আন্তরিকতা দেখাল। এগুলো ভুল।

যেমন হাদিসে কুদসিতে আছে–

> كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا
>
> আমি তার কান হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে চলে। [সহিহ বুখারি : ৬৫০২]

ওলামায়ে কেরাম হাদিসের এই অংশের একাধিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

কারো মতে হাদিসে মূলত একটি তুলনামূলক বক্তব্য বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ, এই বান্দা আমার নৈকট্য ও আনুগত্য খুব ভালোবাসে, যেমন সে নিজের কান চোখ পা ভালোবাসে।

অনেকে ব্যাখ্যা প্রদান করেন– তার প্রতিটি অঙ্গা আমার সন্তুষ্টির চাদরে চলে আসে। তখন তার কান দিয়ে আমার সন্তুষ্টির কথাবার্তাই শোনে। তার চোখ দিয়ে আমার সন্তুষ্টির বস্তুই শুধু দেখে। তার পা দিয়ে আমার সন্তুষ্টির পথেই হাঁটে।

অনেকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আল্লাহ ﷻ তার চোখ কান পায়ের হেফাযতকারী হয়ে যান।

সর্বপ্রাণিধানযোগ্য ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ ﷻ তাকে প্রতিটি অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা দিয়ে আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি অর্জন করার তাওফিক দান করেন।

হাদিসের এই অংশের দু'টি ভুল ব্যাখ্যাও রয়েছে। একটি হলো সুফিদের গান-বাজনা সমর্থক গোষ্ঠি। তারা বলে, আল্লাহ ﷻ যখন বান্দার কান হয়ে যাবেন, তখন বান্দা আর নিজ ইচ্ছায় গান-বাজনা শোনে না। আল্লাহ তাকে গান-বাজনা শোনান। তাকে গান-বাজনা শোনার সামর্থ্য দান করেন।

অপর একটি ব্যাখ্যা আহলে হুলূলদের। তাদের মতে, আল্লাহ ﷻ কিছু বান্দার মধ্যে মিশে যান। আল্লাহ ﷻ নিজেই সেই বান্দার মধ্যে মিশে তার কান চোখ পা ইত্যাদি হয়ে যান।

এ ধরণের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট কুফর ও অবিশ্বাসের নামান্তর। আল্লাহ ﷻ আমাদের হেফাযত করুন।

إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ

> বান্দা যদি আমার কাছে কিছু চায়, অবশ্যই আমি তাকে দান করবো। [সহিহ বুখারি : ৬১৩৭]

বাস্তবতা হল, এমন অনেক আল্লাহওয়ালা পাওয়া যায়, যারা আল্লাহ ﷻ-র কাছে কিছু চেয়েছেন, কিন্তু দুনিয়াতে তা পাননি।

এই দ্বিবিধ ভাষ্যের মীমাংসা হল বান্দার দোয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ ﷻ কখনও তাকে দুনিয়াতে যা ইচ্ছা, দান করেন। আবার কখনও বান্দার দোয়া গচ্ছিত রাখেন এবং দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতে তাকে দ্বিগুণ দান করেন। আবার কখনও কখনও এই দোয়ার উসিলায় দুনিয়ার অনেক বিপদাপদ তার থেকে দূর করে দেন। আমরা জানি না, এসবের কোনটা আমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহই সকল কর্মের কল্যাণদর্শী বিধায়ক।

وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ

আমি যে কোন কাজ করতে চাইলে কোন সংকোচ করি না, মুমিন বান্দার প্রাণ হরণে যতটা দ্বিধা সংকোচ করি। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আমি তার কষ্ট অপছন্দ করি। [সহিহ বুখারি : ৬৫০২]

স্বাভাবিক দৃষ্টিতে কোন কাজে সংকোচ করা কর্তার অপূর্ণতা এবং দুর্বলতার প্রমাণ। কবি বলেন–

কথা বলো দৃঢ়তর,
দ্বিধা-সংকোচে থাকে না কথার ভার।

প্রশ্ন হল আল্লাহ ﷻ কি কোন কাজ করতে সংকোচ করতে পারেন! আল্লাহ ﷻ-র কি কোন দুর্বলতা আছে! অপূর্ণতা আছে! এ তো অসম্ভব!

হাদিসে উক্ত কাজে আল্লাহ ﷻ-র সংকোচ করার অর্থ–

১. মুমিন কোন আকস্মিকতায় যখন বিপদে পতীত হয়, বিপদ তার জুতার ফিতার চেয়েও কাছে থাকে, আল্লাহ ﷻ তখন তার থেকে মৃত্যুদূত ফিরিয়ে রাখেন। এই মৃত্যুসদৃশ বিপদেও মুমিন থেকে মৃত্যুদূত ফিরিয়ে রাখার বিষয়টিকে সংকোচের সাথে তুলনা করা হয়েছে।
২. সংকোচটি হয়ে থাকে মৃত্যুর ফেরেসতা এবং মুমিনের মাঝে। যেমনটি মুসা عليه السلام-র সাথে হয়েছিল। মৃত্যুর ফেরেসতা যখন তার রূহ নেয়ার জন্য আগমন করলেন, তিনি ফেরেসতাকে একটি থাপ্পর মারলেন। এতে তার এক চোখ নষ্ট হয়ে যায়। ফেরেসতা আল্লাহ ﷻ-র কাছে গেলে আল্লাহ ﷻ তার চোখ ফিরিয়ে দেন। এরপর তিনি আবার এসে মুসা عليه السلام-র রূহ নিয়ে যান।
৩. এই হল মৃত্যুর ফেরেসতা এবং মুমিনের মাঝে সংকোচের স্বরূপ। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি নিতান্তই দুর্বল।
৪. আল্লাহ ﷻ মুমিনের রূহ নেয়ার সময় মুমিনের সাথে খুব দয়ার আচরণ করেন। তার প্রাণবিয়োগ সহজতর হয়ে যায়। আল্লাহ ﷻ-র এই দয়ার আচরণ প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ ﷻ মুমিনের রূহ নিতে চান না।

৫. তিনি এ-ও জানেন যে বান্দা মৃত্যুর শাস্তি ও কষ্ট অপছন্দ করে। আল্লাহ ﷻ বান্দাকে কষ্টও দিতে চান না। মুমিন বান্দার প্রতি এই ভালোবাসা এবং তাকে কষ্ট দিতে না চাওয়াকেই সংকোচ বলা হয়েছে।

মূলত আল্লাহ ﷻ-র ক্ষমতায় বা কার্য নির্বাহে কোন সংকোচ বা দ্বিধা নেই। আল্লাহ ﷻ যা চান, তাই হয়। আল্লাহ ﷻ-ই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

পরিশেষে, হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুর প্রতি আল্লাহ ﷻ-র অগাদ ভালোবাসার কথা ফুটে উঠেছে। তদ্রূপ আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণের ব্যাপারেও কঠোর হুমকি দেয়া হয়েছে। যে আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, সে যেন আল্লাহ ﷻ-র সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আল্লাহ ﷻ তাকে পরাজিত করেন, স্মরণকালের পরাজয়।

আল্লাহ ﷻ আমাদের সকলকে তার একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করুন।

আল্লাহ আছেন তোমার সাথে ...

আল্লাহ ﷻ আমাদের শ্রেষ্ঠ হেফাযতকারী। প্রতিটি বস্তুরই হেফাযতকারী। তিনি দয়ালুদের সেরা দয়ালু। প্রতিটি বিষয়ের বিধায়ক। তিনিই তার নির্বাচিত খাঁটি বান্দাদের বিপদাপদে সুরক্ষা দান করেন।

ইয়াকুব عليه السلام প্রিয় পুত্র ইউসুফকে হারালেন। ইউসুফের ভাইয়েরা ইয়াকুবকে এসে বলেছিল– 'ইউসুফকে বাঘে খেয়েছে।'

ইয়াকুব বুঝেছিলেন ইউসুফকে বাঘে খায়নি।

ভাইয়েরা বলেছিল, 'ইউসুফ শূন্য মাঠে হারিয়ে গেছে।'

ইয়াকুব عليه السلام-র বিশ্বাস ছিল ইউসুফ হারায়নি।

ভাইয়েরা বলেছিল, 'ইউসুফ আমাদের সাথে রাগ করে গন্তব্যহীন কোথায় যেন চলে গেছে'।

ইয়াকুবের মন বলছিল এমন কিছুই হয়নি।

ইয়াকুব তখন অবচেতনে একটাই কথা বলেছিলেন–

﴿فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَـٰفِظًا﴾

আল্লাহই শ্রেষ্ঠ হেফাযতকারী। [সূরা ইউসুফ: ৬৪]

অতএব ইউসুফকে আল্লাহই হেফাযত করবেন। ইউসুফ আল্লাহর হেফাযতে আছে। আল্লাহ ﷻ তার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তাই হবে।

আল্লাহ ﷻ-ই হেফাযতকারী। তিনি যুগে যুগে মনোনীত বান্দাদের হেফাযত করেছেন। আসহাবে কাহফ; গুহার অধিবাসী যুবকরা তাদের সুরম্য অট্টালিকা ছেড়ে যখন পাহাড়ের গুহা বেছে নিলেন, তখন আল্লাহ ﷻ-ই তাদের হেফাযত করেছিলেন।

মুসা ﷺ-র প্রতি আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহ

মুসা ﷺ। একটি নাম। যে নামের সাথে স্মরিত হয় বীরত্বগাঁথা এক অসম সাহসিকতার গল্প। আমানত রক্ষার নিষ্ঠাপূর্ণ অনুপম উপাখ্যান। অন্তরে জেগে উঠে ভক্তি ও শক্তির অসামান্য কাহিনী। আল্লাহ ﷻ-র পথে জীবন বিছিয়ে দেয়ার, প্রাণ উৎসর্গ করার সৌষ্ঠব আলেখ্য।

পৃথিবীর বর্বরোচিত ইতিহাসের শীর্ষ হোতার নাম ফেরাউন। আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক ফেরাউন বর্বরের উপর। একদিন সে স্বপ্নে দেখল বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে একটি আগ্নেয়গিরি মিসরের দিকে ধেয়ে আসছে। ছাইভস্ম করে জ্বালিয়ে দিচ্ছে মিসরের উঁচু-উঁচু অট্টালিকা আর স্থাপত্যগুলো।

অশুভ এই স্বপ্ন দেখে বিষণ্ণ হয়ে উঠল ফেরাউন। সকালে খাসকামরা থেকে যখন বেরিয়ে এল, চেহারায় তখন মেঘখেলা খেলছে চিন্তা আর পেরেশানি। জ্যোতিষী, গণক, যাদুকর, বাজিকর, ভেলকিবাজ সকলকে ডেকে স্বপ্নের বর্ণনা শোনাল। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল। তারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা শোনাল– বনী ইসরাঈলের এক ছেলে তোমার রাজত্বে হামলা করবে। শেষ করে দিবে তোমার শাসন আর কর্তৃত্ব।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে ফেরাউন আরো চিন্তিত হল। ভেতরের পশু চরিত্র পিশাচের মতো আরও বর্বর হয়ে ওঠল। সিদ্ধান্ত নিল, রাজত্ব ও কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য এই সিজনের সকল নবজাতক ছেলেকে হত্যা করা হবে!

ফেরাউন তার গুপ্তচর ছড়িয়ে দিল কোথায় কার ছেলে সন্তান ভূমিষ্ট হচ্ছে, জানার জন্য। বনী ইসরাঈলের সকল নবজাতক ছেলে হত্যা করার জন্য তার বাহিনী লেলিয়ে দিল। শুরু হল শিশুহত্যা। রক্তের স্রোত বয়ে গেল বনী ইসরাঈলের অলিতে-গলিতে। ফুলেল শিশুগুলোর অপাপ আত্মা উড়ে গেল বেহেসতের আকাশে। নিষ্পাপ প্রাণগুলো আল্লাহর কাছে তুলে ধরল শিশুহত্যার অভিযোগ।

আল্লাহ! তুমি এই ফেরাউনি যুগেই মুসাকে দুনিয়ায় পাঠালে!

আল্লাহ! একজন দিশেহারা অসহায় মা পোষাক মুড়িয়ে ছেলেকে আগলে রাখছে ঐ জল্লাদ হায়েনাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য! তাহলে এই এতীম মুসাকে এখন কে হেফাযত করবে!

আল্লাহ! মুসার মত শত-সহস্র শিশু যখন নিহত হয়েছে, তখন মুসাকে তো তুমিই বাঁচাবে! তোমারই অনুগ্রহে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে! তোমারই প্রতিপালনে তাকে বড় করবে!

মুসা ﷺ-র পুরো কাহিনী জুড়ে রয়েছে ভয় আর আতঙ্ক। আছে সাহসের সমাচার। বিপদ থেকে উত্তরণের অবিশ্বাস্য দৃশ্য। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> ﴿طسٓمٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣﴾ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَ يَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ﴾
>
> ত্বা সীন মীম। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত আমি আপনার কাছে মুসা ও ফেরাউনের বৃত্তান্ত সত্যসহ বর্ণনা করছি ঈমানদারদের জন্য। ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্রসন্তানদের হত্যা করতো এবং নারীদের জীবিত রাখতো। নিশ্চয় সে ছিলো অনর্থ সৃষ্টিকারী। [সূরা কাসাস: ০১-০৪]

ফেরাউন ছেলে সন্তানদের হত্যা করে মেয়ে সন্তানদের জীবিত রাখতো। এভাবে সে তার দেশের একটি দলকে দুর্বল করতে চাইল। কিন্তু আল্লাহ ﷻ মুসা ﷺ-কে অলৌকিকভাবে রক্ষা করলেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> ﴿وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ﴾
>
> আমি মুসা জননীকে আদেশ পাঠালাম যে তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশঙ্কা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কছে ফিরিয়ে দিবো এবং তাকে পয়গম্বরদের একজন বানাবো। [সূরা কাসাস: ০৭]

সুবহানাল্লাহ! মানুষ যখন কোন জিনিস খোয়া যাওয়ার ভয় করে, তখন তা গুরুত্বের সাথে হেফাযত করে। নিজের কাছে আগলে রাখে। অথচ আল্লাহ ﷻ মুসা ﷺ-কে হেফাযত করতে বলেননি। নিজের কাছে আগলে রাখতেও বলেননি। বলেছেন, বিপদের আশঙ্কা করলে তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর!

আল্লাহ শুরু থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন, মুসার মাধ্যমে ফেরাউনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাবেন। আল্লাহ ﷻ নিজেই তাকে হেফাযত করবেন। তাই মুসা জননীকে আদেশ করেছেন– তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর, আল্লাহ ﷻ তাকে প্রতিপালন করবেন। আল্লাহ ﷻ তাকে ফেরাউনের বিরোধিতার জন্য সক্ষম করে তুলবেন। আল্লাহই ﷻ তাকে হেফাযত করবেন।

এই যে পাখ-পাখালি, নিজের ভালো-মন্দের মালিক তারা নয়, কে তাদের পালন করছে! কে তাদের আহার যুগিয়ে পরিতৃপ্ত করছে! বন-বাঁদাড়ে পশুগুলোকে কে হেফাযত করছে! কে নিঃস্ব অসহায় এতীমদের লালনপালন করছে! তিনিই আমাদের আল্লাহ!

মুসা عليه السلام-র মা তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহর তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করলেন। তিনি আল্লাহর ওয়াদায় আস্থা রাখলেন। আল্লাহ ﷻ তার কাছে ইলহামের মাধ্যমে প্রত্যাদেশ জানিয়েছেন, তিনি তার উপর ভরসা করলেন। তা কেমন দৃশ্য! একজন অসহায় মা। দুঃখীনী মা। তিনি তার সন্তানকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করলেন! তিনি জানতেন, মুসা দরিয়ায় ডুববে না। আল্লাহ যার হেফাযত করেন, সে ডোবে না। মুসার কোন ক্ষতি হবে না। আল্লাহ যার তত্ত্বাবধান করেন, তার কোন ক্ষতি হয় না। মুসা নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ যার সহায়, সে কখনও নিঃশেষ হয় না।

মুসার মা তাকে পানিতে ভাসমান কোন বস্তুর উপর রেখে দিলেন। পানি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু কোথায় কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে? মিসরে বন-বাগানের অভাব নেই। বাগানের পর বাগান। ঐ তো সামনে একটি বাগান। এই বাগানের কাছেই মুসা ঠেকবে! এটি যে ফেরাউনের বাগান! হাঁ, মুসা ফেরাউনের সুরম্য অট্টালিকার পাশে এসেই ঠেকলেন!

ফেরাউনের অত্যাচারী জালিম বাহিনী মুসাকে দেখে বুঝল এটি বনী ইসরাঈলের শিশু। তারা খুব খুশি হয়ে গেল। শিশু মুসাকে ফেরাউনের কাছে নিয়ে আসল। ফেরাউন তাকে যথারীতি হত্যা করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু এখানেও আল্লাহর অনুগ্রহ আরেকবার প্রকাশ পেল। আল্লাহই শিশু মুসাকে হেফাযত করবেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾

আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিবো এবং তাকে পয়গাম্বরগণের একজন বানাবো। [সূরা কাসাস: ০৭]

আল্লাহ ﷻ সেখানে ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়াকে উপস্থিত করালেন। আসিয়া এসে বলল–

﴿قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ﴾

এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি। তাকে হত্যা করো না।

[সূরা কাসাস: ০৯]

কেমন ছিল আসিয়ার বক্তব্য! কেমন ছিল আল্লাহর অনুগ্রহ! ঘটনার আকস্মিকতা ও পরম্পরা! আসিয়া তার জালিম বর্বর স্বামীকে বলছে, 'এ শিশু আমার-তোমার নয়নমণি।' এ শিশুকে আমরা লালনপালন করবো। আল্লাহ ﷻ এর দ্বারা আমাদের লাভবান করবেন।

কসম আল্লাহর! মুসার দ্বারা আসিয়া লাভবান হয়েছিলেন। দুনিয়াতে মুসার মাধ্যমে ঈমান আনার তাওফিকপ্রাপ্ত হয়েছেন। আখেরাতে জান্নাতের অধিবাসী হয়েছেন। এই তো আল্লাহর সেই বাণী–

﴿وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ﴾

আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফেরাউনপত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন। আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন। [সূরা তাহরীম: ১১]

আসিয়া স্বামী ফেরাউনের কাছে শিশু মুসাকে ছেড়ে দেয়ার বায়না ধরল। ফেরাউন তার বায়না পূর্ণ করল। শিশু মুসাকে ছেড়ে দিল।

আল্লাহ শিশু মুসাকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে আনবেন। অচিরেই মুসাকে তার কোলে ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

মুসাকে স্তন্যদানের জন্য ফেরাউনের রাজদরবারে স্তন্যদানকারী মহিলারা আসতে শুরু করল। কিন্তু মুসা কারও স্তন্য পান করছেন না। একজন

মহিলারও দুগ্ধ পান করলেন না। মুসা ﷺ-র বোনও সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন–

﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ﴾ '

আমি কি তোমাদের বলবো, কে তাকে লালনপালন করবেন? [সূরা ত্বাহা: ৪০]

কে তাকে হেফাযত করবেন? কে তাকে দুধ পান করাবেন? কে তাকে কোলেকাঁখে বড় করে তুলবেন?

সবাই খুশি হল। মুসার বোনের কথা অনুযায়ী মুসার মা-কে ডাকা হল। তার কাছে মুসাকে সোপর্দ করা হল। মুসার মা মুসাকে নিয়ে গেলেন। আদরে সোহাগে যতনে তাকে লালনপালন করলেন। দুধ পান করানোর জন্য ফেরাউন থেকে পারিশ্রমিকও গ্রহণ করলেন। অবস্থা এমন ছিল যে– যেন তিনি মুসার মা-ই নন!

দুগ্ধপান শেষে মুসা আবার ফেরাউনের দরবারে ফিরে এলেন।

মুসা ﷺ ধীরে ধীরে বড় হচ্ছেন। তার বিবেক-বুদ্ধি বাড়ছে। বয়সের সাথে সাথে চোখও খুলছে। এই ছোট বয়সেই তিনি এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। প্রায় সময় তিনি ফেরাউনের গালে কষে থাপ্পর দিচ্ছেন। যেন তাকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন, এই হাতেই তোমার সিংহাসন উপড়ে পড়বে। এই হাতেই তোমার সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়বে। এই হাতেই মানবতার মুক্তি মিলবে, মানুষকে অন্যায়ভাবে দাস বানিয়ে রাখার প্রভুত্ব খতম হবে।

শিশু মুসার থাপ্পর খেয়ে খেয়ে একসময় ফেরাউনের খুব রাগ হল। দুঃখে ক্ষোভে অপমানে ফেটে পড়ল ফেরাউন। শিশু মুসাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হল। কিন্তু গোল বাধালো ফেরাউনের স্ত্রী। স্ত্রী আসিয়া আবার ফেরাউনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। স্বামীর বিবেকের কাছে প্রশ্ন রেখে বললেন, 'এ তো শিশু। কিছু জানে না, বুঝে না। কেন হত্যা করবে এই শিশুকে!'

আসিয়া মুসাকে পরীক্ষা করে দেখার বুদ্ধি দিলেন। বললেন, 'তার সামনে আগুনের অঙ্গার এবং খেজুর রেখে দেখ। সে যদি খেজুর গ্রহণ করে, তাহলে সে বুঝবুদ্ধির ছেলে হয়েছে। তখন তাকে হত্যা করো। আর যদি অঙ্গারে হাত দেয়, তাহলে সে বুঝবুদ্ধির ছেলে হয়নি। তাকে ছেড়ে দাও।'

স্ত্রীর বুদ্ধি ধরে ফেরাউন তাই করল। শিশু মুসার সামনে খেজুর ও অঙ্গার রাখল। আল্লাহর কুদরত তখনও তাকে পাহাড়া দিচ্ছে। আল্লাহ তখনও তাকে হেফাযত করছেন। কেউ কিছু বুঝতে পারল না। মুসা عليه السلام আগুনের অঙ্গারে হাত বাড়ালেন। একটি অঙ্গার তুলে মুখে পুরলেন। কিন্তু মুসা মুখে কাঁচা খেজুরের মিষ্টি স্বাদ অনুভব করলেন!

ফেরাউন তাকে এই যাত্রায়ও ক্ষমা করলেন। ছেড়ে দিলেন মুসাকে। মুসা عليه السلام ফেরাউনের রাজদরবারেই আল্লাহর প্রতিপালনে বেড়ে ওঠলেন।

মুসা عليه السلام একদিন ফেরাউনের প্রাসাদ ছেড়ে বেরুলেন। কেন বের হয়েছেন সেই বর্ণনা কোরআনে নেই। কোরআনে যে কোন ঘটনার অত্যাবশ্যকীয় নসীহতপূর্ণ অংশটুকুই শুধু অবতীর্ণ হয়েছে। মুসা عليه السلام রাস্তায় বের হয়ে হাঁটছেন। মানুষের সাথে মিশছেন, সময় দিচ্ছেন, দিন কাটাচ্ছেন।

একদিন এক কাঠুরিয়া মুসা عليه السلام-র কাছে এলেন। কাঠুরিয়া ছিলো বনী ইসরাঈলের লোক। সে জনৈক মিসরির কাজ করত। মিসরি তার সাথে অহঙ্কার, দর্প ও অন্যায়সূলভ আচরণ দেখাত। কারণ মিসরির পেছনে ফেরাউন আছে। তার একটা শক্তি আছে। এই শক্তির উপর ভর করে সে বনী ইসরাঈলের কাঠুরিয়াকে প্রহার করল। কাঠুরিয়া মুসার কাছে সব বলল। মুসার কাছে এর একটা বিহিত চাইল। এই জালেমের কবল থেকে নিষ্কৃতি চাইল। মুসা عليه السلام ছিলেন সুঠাম শক্তিশালী পুরুষ। তিনি এসে মিসরিকে শক্ত এক ঘা আঘাত বসিয়ে দিলেন। মুসার আঘাত খেয়ে মিসরি নিষ্প্রাণ দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মিসরির দিন এখানেই শেষ। মরে গেল বেচারা।

মুসা কর্তৃক মিসরি হত্যার ঘটনা ফেরাউনের কানে গেল। আবার রেগে উঠল ফেরাউন। মুসাকে এবার হত্যা করতেই হবে। স্থির সিদ্ধান্ত।

জনৈক ব্যক্তি মুসা عليه السلام-র কাছে সংবাদ নিয়ে আসল—

﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾

মুসা, রাজ্যের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। [সূরা কাসাস: ২০]

তারা তোমাকে গ্রেফতার করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করছে। গুপ্তচর ছড়িয়েছে। সুতরাং তুমি এ শহর ছেড়ে চলে যাও। পালাও, পালাও, মুক্তির পথে পালাও।

মুসা ﷺ ঘটনার আকস্মিকতা বুঝতে পারলেন। কৃত হত্যার ঘটনার জন্য আল্লাহর কাছে অনুতাপ প্রকাশ করলেন–

> হে আল্লাহ, আমাকে মার্জনা কর। [সূরা আরাফ: ১৫১]

আল্লাহ তাকে মার্জনা করলেন।

কুরআনের ব্যাখ্যাকাররা বলেন, এটি একটি অতি প্রেমাবহী তত্ত্বকথা যে আল্লাহ ﷻ গোনাহ এবং ক্ষমার মাঝে কোন দূরত্ব রাখেননি। মানুষ যখন অন্যায়ের ময়লা গায়ে মাখে, গোনাহের আবর্জনায় কলঙ্কিত হয়, অতঃপর দোষ স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ ﷻ তখন তার দিকে মনোনিবেশ করেন। আল্লাহ ﷻ তাকে ক্ষমার জলে ধুয়ে পরিচ্ছন্ন করে দেন। আল্লাহ বলেন–

> তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করেনা এবং জেনে শুনে তাই করতে থাকেনা। [সূরা আলে ইমরান: ১৩৫]

মুসা ﷺ শহর থেকে বের হবেন। কিন্তু কোথায় যাবেন? শহরের সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফেরাউনের বাহিনী তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। পথে পথে ওঁৎ পেতে খুঁজছে। ফেরাউন নিজেই তাকে খুঁজছে। দুপুরের পর মানুষ যখন বিশ্রামে থাকে, এমন এক সময় মুসা আলাইহিস সালাম শহর থেকে কৌশলে বের হলেন। পথ চলা শুরু করলেন অজানা গন্তব্যে...

মুসা ﷺ মাদয়ানের দিকে পথ চলতে শুরু করলেন। আল্লাহ ﷻ বলছেন–

> যখন তিনি মাদয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। [সূরা কাসাস:২২]

আল্লাহ ﷻ তাকে সরল পথ দেখালেন। শূন্য প্রান্তরে তাকে বড় একটি পানিময় উপাত্যকায় নিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে পানির কাছে অনেক রাখাল। অনেক মানুষ পানি সংগ্রহ করছে। দু'টি মেয়েও তাদের ছাগপালকে পানি খাওয়ানোর চেষ্টায় দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের ভীড় কমবে, সকলে চলে যাবে, তখন তারা নিজেদের ছাগপালকে পানি পান করাবে।

মুসা عليه السلام মেয়ে দু'টির প্রয়োজন অনুমান করে তাদের কাছে আসলেন। তাদের ছাগপাল নিয়ে আসলেন। শক্তি খাটিয়ে মানুষের ভীড় কমালেন। পানি পান করিয়ে ছাগলগুলো তাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। মুসা আলাইহিস সালাম তখন নিজে অনেক ক্ষুধার্ত ছিলেন, আল্লাহ ছাড়া তা আর কেউ জানতো না। মুসা আলাইহিস সালাম অনেক দরিদ্র ও অসুস্থ ছিলেন, আল্লাহ ছাড়া তা আর কেউ জানতো না। ইমাম আহমদ রাহি. তার কিতাবুয যুহদ-এ উল্লেখ করেন, মুসা عليه السلام পানির কাছে ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে বললেন, 'আল্লাহ, আমি অসুস্থ। গরীব। ক্ষুদার্ত। ফকীর।' আল্লাহ বললেন, 'মুসা! ফকীর ঐ ব্যক্তি, আমি যার দারিদ্র বিমোচনকারী নই। অসুস্থ ঐ ব্যক্তি, আমি যার ডাক্তার নই। গরীব ঐ ব্যক্তি, আমি যার বন্ধু নই। ক্ষুদার্ত ঐ ব্যক্তি, আমি যার ক্ষুদা নিবারণকারী নই।'

মুসা عليه السلام একটি গাছের ছায়ায় বসলেন। আল্লাহর কাছে বললেন–

> আল্লাহ, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী। [সূরা কাসাস: ২৪]

আল্লাহ ﷻ তার উপর আরেকবার অনুগ্রহের খোলা দরজা দিয়ে বাতাস প্রবাহিত করলেন। মেয়ে দুজনের একজন বাবার কাছে এল। বাবাকে পানির ঘাটে যা ঘটেছে, সব খুলে বলল।

বাবার নির্দেশে মেয়ে লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে মুসা عليه السلام-কে খুঁজতে আসলেন, বাবার পক্ষ থেকে মুসা عليه السلام-কে তার প্রাপ্য পরিশোধ করবেন। মুসার কাছে এসে মুসাকে সালাম জানালেন। বাবার নির্দেশ শোনালেন। মুসা عليه السلام তার বাবার সাথে দেখা করার জন্য রওয়ানা করলেন। মুসা عليه السلام মেয়ের আগে হাঁটছেন, যেন মেয়ের উপর তার চোখ না পড়ে।

মুসা ﷺ মেয়েদের বাবাকে সালাম দিয়ে নিজের রহস্যজনক এবং ভীতিপ্রদ সকল কাহিনী খুলে বললেন। ফেরাউনের ত্রাস সঞ্চারী সকল তৎপড়তার কথাও খুলে বললেন। মেয়ের বাবা সব শুনে বললেন–

> ভয় পেওনা, তুমি জালেম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা পেয়েছ। [সূরা কাসাস: ২৫]

তোমার অন্তর প্রশান্ত ও নির্ভয় হোক। তুমি আল্লাহর হেফাযতে আছ। ভয় পেওনা। তোমার আর কিছু হবেনা। তুমি জালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি পেয়েছ।

এই মেয়ের বাবা হলেন মহান নবী শোয়াইব ﷺ।

শোয়াইব মুসার সাথে একটি চুক্তি করলেন। মুসা ﷺ শোয়াইব ﷺ-র এক মেয়ে বিয়ে করবেন। বিনিময়ে নির্দিষ্ট একট সময় মুসা শোয়াইবের (ﷺ) ছাগল চড়াবেন। তিনি চাইলে আট বছরও চড়াতে পারেন, দশ বছরও চড়াতে পারেন। শোয়াইব ﷺ বললেন–

> আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার বিবাহে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে। যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে। [সূরা কাসাস: ২৭]

তুমি ইচ্ছা করলে তোমার উদারতা প্রদর্শন করে দশ বছর থাকতে পার। এটা তোমার উপর আবশ্যক নয়। ইনশাআল্লাহ, তুমি আমাকে সৎ লোক হিসেবেই পাবে।

মুসা ﷺ নিজ ইচ্ছায় দশ বছরই থাকলেন। শোয়াইব ﷺ-র ছাগল চড়ালেন। ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, 'মুসা ﷺ ইচ্ছাধীন দুই চুক্তির সবচেয়ে উত্তম এবং সম্মানজনক চুক্তিটিই পূর্ণ করেছেন।'

দশ বছর শেষ। মুসা ﷺ শোয়াইব ﷺ-র ছাগপাল চড়ানোর কাজে নিরত ছিলেন। এরপর তিনি স্ত্রী এবং কিছু বকরিসহ আপন ভূমির উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। আসার সময় শোয়াইব ﷺ তাকে একটি লাঠি উপহার দিলেন। চূড়ান্ত বিপ্লবের এই তো সূচনা...

এই লাঠি দিয়েই মুসা عليه السلام জালেমের দুনিয়াকে ওলট-পালট করে দিবেন। এই লাঠি দিয়েই ফেরাউনের সাথে বোঝাপড়া, যাদুকর ও অবাধ্যদের পরাস্ত করা, কুরআনে বর্ণিত আরও নানা ঘটনা...

মুসা عليه السلام মাদয়ান থেকে বের হয়ে বিস্তীর্ণ মরুভূমি পারি দিলেন। এখানে প্রকাশ পেল আল্লাহর আরেক অনুগ্রহ। আল্লাহ ﷻ-ই ভাল জানেন কখন তার রিসালাত অর্পণ করবেন। আল্লাহ তাকে এ পথে আনলেন। চলতে চলতে দিন পেরিয়ে রাতের পথ। রাতটি ছিল ঘনান্ধকারের পর্দায় ঘেরা। কোন আলো নেই। অন্ধকার দূর করে সামান্য আলোর কোন ব্যবস্থাও নেই। সেই ঘোরতর পরিস্থিতে হঠাৎ দূরে সামান্য আলোর আভাস দেখলেন, মিটমিট জ্বলছে।

স্ত্রীর কাছে ভালোবাসাপূর্ণ বাচনে অনুমতি চেয়ে বললেন, ‘তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি, যেন তোমরা আগুন পোহাতে পার।’

মুসা عليه السلام আগুনের কাছে গেলেন। তার পায়ে জুতা ছিল। আল্লাহ তাকে বললেন, ‘তোমার জুতা দুটি খোল’। সেটি ছিল পবিত্র স্থান। এবাদতের স্থান। মর্যাদ ও মাহাত্বপূর্ণ স্থান। এই পবিত্র স্থানে তোমার পায়ে জুতা থাকবে না। জুতা খুলে সামনে অগ্রসর হও।

মুসা عليه السلام এমন একটি আওয়ায শুনলেন, যে আওয়াযের ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না। কোথা থেকে আসছে এই আওয়ায! আল্লাহর পক্ষ থেকে! আল্লাহ কথা বলছেন এই বান্দার সাথে! যে মুসাকে পানির কোলে রেখে এসেছিল তার মা, আল্লাহ কথা বলছেন সে মুসার সাথে! যে মুসা ছাগল চড়াতো, সে মুসার সাথে! যে মুসা মরুভূমিতে ঘুরঘুর করেছে অসহায় মনে, দুর্বল শরীরে, সাথে কিছু নেই, পাশে কেউ নেই, আল্লাহ ﷻ কথা বলছেন সেই মুসার সাথে!

আল্লাহ মুসা عليه السلام-কে বললেন–

﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا﴾

আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। [সূরা ত্বাহা: ১৪]

মুসার অন্তরে প্রথম পয়গাম অনুরণিত হলো– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ধ্বনিতে মুসার অন্তর কেঁপে ওঠল। অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা দুলে ওঠল। শিহরিত হল তার আস্তিত্ব। তিনি চিন্তা করছেন, কে এই কথা বললেন– 'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই'! তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, সেখানে আল্লাহর কুদরত! যমিনে দেখলেন, সেখানেও আল্লাহর সৃজন! যেদিকেই তাকালেন, প্রতিটি বস্তুতে আল্লাহর অপার মহিমা। প্রতিটি বস্তুই বলছে, আল্লাহ এক। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই।

আল্লাহ মুসাকে আবার বললেন–

﴿أَلْقِ عَصَاكَ﴾

তোমার হাতের লাঠিটি নিক্ষেপ করো। [সূরা আরাফ: ১১৭]

মুসা عليه السلام লাঠিটি নিক্ষেপ করলেন। এ কি! যে লাঠি দিয়ে তিনি ছাগল চড়াতেন, সেই লাঠিটিই দেখছি জীবন্ত সাপ! তিরতির করছে! ছোটাছুটি করছে! মুসা عليه السلام ভয় পেলেন। পিছু হটলেন, সেখান থেকে দৌড়ে পালাবেন। কোন কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না। আয় আল্লাহ! যে লাঠি দিয়ে আমি ছাগল চড়াতাম, শৃগাল তাড়াতাম, সে লাঠিই কিনা...! এই রাতের আঁধারে এসব কেমন খেলা! এই অন্ধকার চাদরে এসব কেমন ঘটনা! কে আমি! আমি তো এক রাখাল! তাহলে এসব কী?

অমনি আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক আসল–

﴿يَٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾

মুসা! ভয় করবে না। আমি যে রয়েছি, আমার কাছে পয়গম্বরগণ ভয় করে না। [সূরা নমল: ১০]

মুসা عليه السلام সাহস পেলেন। সামনে আগালেন। সাপের মুখে হাত বাড়ালেন। সাপটি পূর্ববৎ অবস্থায় ফিরে এল। ঈষৎ কাঁপুনি খেলল মুসার হাতে।

আল্লাহ মুসাকে আবার ডাকলেন। বললেন–

﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾

তোমার হাতটি বগলে রাখ। [সূরা নমল: ১২]

মুসা عليه السلام হাত বগলে রাখলেন। বগল থেকে হাত বের করে দেখলেন, তার হাত উজ্জ্বল, সুশুভ্র! হাতে তো কোন রোগ নেই, তবু সাদা হয়ে জ্বলজ্বল করছে!

অতঃপর আল্লাহ ﷻ বললেন–

﴿اِذۡهَبۡ اِلٰی فِرۡعَوۡنَ اِنَّهٗ طَغٰی﴾

ফেরাউনের কাছে যাও, সে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে। [সূরা ত্বাহা: ২৪]

ঘটনাগুলো কেমন অবিশ্বাস্য! মুসা عليه السلام ভাবছেন, সব ঠিক আছে তো! আমিই তো ছাগল চড়াতাম! আমিই অন্ধকারে একটু আলো খুঁজছিলাম! আমিই এখন ফেরাউনের কাছে যাবো! কে আমাকে ফেরাউনের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন? কে আমাকে ফেরাউনের প্রাসাদ অতিক্রম করার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন? ফেরাউনের ভূখণ্ডে নিয়ে যাচ্ছেন? কে আমাকে ফেরাউনের সাথে কথা বলার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন? আমি তো তাদের এক লোক হত্যার অপরাধে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম! তারা আমাকে সামনে পেলেই তো তিল-তিল করে মারবে!

মুসা عليه السلام আল্লাহর কথার উপর কোন কথা বললেন না। শুধু আবেদন করলেন, আল্লাহ, কাজটি অনেক কঠিন। দায়িত্বটি অনেক গুরুভার। অতএব–

﴿قَالَ رَبِّ اشۡرَحۡ لِیۡ صَدۡرِیۡ ﴿۲۵﴾ وَ یَسِّرۡ لِیۡۤ اَمۡرِیۡ﴾

হে আল্লাহ, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। আমার কাজ সহজ করে দিন। আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। [সূরা ত্বাহা: ২৫, ২৬]

মুসা عليه السلام শিশুকালে যে অঙ্গার মুখে দিয়েছিলেন, তার একটা প্রভাব মুখে রয়ে গিয়েছিল। কথা বলার সময় মুখ জড়িয়ে আসে। কথা সুস্পষ্ট হচ্ছে না। মুসার ভাবা যদি স্পষ্ট না হয়, তাহলে ফেরাউন বলবে–

﴿اَمۡ اَنَا خَیۡرٌ مِّنۡ هٰذَا الَّذِیۡ هُوَ مَهِیۡنٌ ۬ۙ وَّ لَا یَکَادُ یُبِیۡنُ﴾

আমি যে উত্তম এই ব্যক্তি থেকে, যে নীচ এবং সুস্পষ্ট কথা বলতেও সক্ষম নয়। [যুখরুফ: ৫২]

মুসা عليه السلام-র দোয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তার মুখের জড়তা দূর করে দিলেন। ভাষা স্পষ্ট করে দিলেন। তবে হারুনের মতো অনর্গল ও সুস্পষ্ট ভাষী হননি।

মুসা عليه السلام আল্লাহর কাছে আরও দোয়া করলেন–

﴿وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾ هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهٖ اَزْرِيْ﴾

এবং আমার পরিবারের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন। আমার ভাই হারুনকে। তার মাধ্যমে আমার কোমর মযবুত করে দিন। [সূরা ত্বাহা: ২৯-৩১]

﴿وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْۤ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ﴾

আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে প্রাঞ্জলভাষী। অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন। সে আমকে সমর্থন জানাবে।

[সূরা কাসাস: ৩৪]

অর্থাৎ, হারুন আমার চেয়ে স্পষ্ট ও অনর্গল ভাষী। বিতর্ক-বাদানুবাদে আমার চেয়ে শক্ত বাগ্মী। মুসা ﷺ আরও দোয়া করলেন–

﴿كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا﴾

যেন আমরা বেশি করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি। [সূরা ত্বাহা: ৩৩]

কারণ দুজন একজনের চেয়ে বেশি তাসবীহ পাঠ করতে পারে। একজন অপরজনের তাসবীহ করার জন্য উৎসাহিত করে। এজন্য সফর করলে সাথে কোন সঙ্গী রাখতে হয়। রাসূল ﷺ-ও সফরকালে সঙ্গী রাখতে বলেছেন।

الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ

একাকী সফরকারী শয়তান। [সুনানে তিরমিযি : ৮৮৪৯]

মুসা ﷺ ফেরাউনের প্রাসাদে পৌঁছুলেন। তার গায়ে একটি পশমী জুব্বা ছিল। প্রাসাদের দরজায় তার লাঠি দিয়ে সাড়া দিলেন। ফেরাউনের লোকজন বেরিয়ে এল। মুসা ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, 'কী চান আপনি?'

মুসা ﷺ বললেন, 'আমি ফেরাউনের মোকাবেলায় এসেছি। তাকে আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করবো।'

ফেরাউনের লোকজন বলল, 'তিনিই তো আল্লাহ!' (নাউযুবিল্লাহ)

তারা ফেরাউনের কাছে মুসার আগমনের সংবাদ জানাল। ফেরাউন মুসাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলেন। ফেরাউন তখন মনে করছিলেন, মুসা ﷺ হয়তো পাগল। এই বুঝে ফেরাউন সভাসদের উদ্দেশে বলল–

﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾

তোমাদের কাছে প্রেরিত তোমাদের রাসূলটি নিশ্চয় বদ্ধ পাগল। [সূরা শুয়ারা: ২৭]

ফেরাউন মুসা ﷷ-র উদ্দেশে বলল–

﴿لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾

তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবো। [সূরা শুয়ারা: ২৯]

মুসা ﷷ বললেন, আমি যদি সুস্পষ্ট কোন নিদর্শন দেখাই?

অতঃপর মুসা ﷷ নিদর্শনাবলী দেখালেন। হাতের মুজিযা দেখালেন। লাঠির মুজিযা দেখালেন। কিন্তু খবীস ফেরাউন মুজিযার বিরুদ্ধে উত্তর প্রদানের জন্য উদ্যত হল। শুক্রবারে তার সকল যাদুকরকে একত্র করল। মানুষের কানে কানে ঘোষণা পাঠাল, সকলেই যেন শুক্রবার সকালে উপস্থিত থাকে। মুসা ﷷ মনে মনে মানবিক দুর্বলতায় সামান্য ভয়ের আঁচ করলেন। আল্লাহ ﷻ অহি নাযিল করলেন– 'মুসা! ভয় পেওনা। আমি আছি তোমার পাশে। আমি আছি তোমার সাথে। আমি আছি তোমার পিছনে। তুমি ভয় করো না।'

শুক্রবারের নির্ধারিত সকালে সমবেত সাধারণ মানুষ। উপস্থিত আমন্ত্রিত যাদুকররা। শুরু হল যাদুর খেলা। যাদুকররা তাদের হাতের রশিগুলো ছেড়ে দিল। অমনি রশিগুলো ছুটাছুটি শুরু করল। উড়ে উড়ে ছুটতে শুরু করল। মুসা ﷷ-র তখনকার অবস্থা–

﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ﴾

অতঃপর মুসা মনে মনে কিছুটা ভীতির আঁচ করলেন। আমি বললাম, ভয় করো না। তুমিই বিজয়ী। [সূরা ত্বাহা: ৬৭, ৬৮]

তুমিই বিজয়ী। তুমি এখনই দেখবে, কে জয়ী হয়, আর কে পরাজিত হয়! মুসা আলাইহিস সালাম তার হাতের লাটি নিক্ষেপ করলেন। মুসার লাঠি যাদুকরদের রশিগুলো গিলতে শুরু করল। আল্লাহর ইচ্ছা কতো অজেয়! কতো অসীম! মুসার লাঠি যাদুকরদের রশিগুলো গিলে এবার ফেরাউনের দিকে ফিরল তাকেও গিলবে বলে! ফেরাউন এ দেখে ত্রস্ত হয়ে গেল।

হাসান বসরি ﷺ বলেন, ফেরাউন মূলত ছিল ভারহীন, সাহসহীন, উদ্দেশ্যহীন। কবি বলেন–

তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে হরীণী দেখে সুখ পাও।

পাখির ডানায় উড়ে যায় তোমার অন্তর।

আমাকেই শুধু অবরোধ; যুদ্ধের কতো আনন্দ–

সেনাপতির হুইসেলে উটপাখিও উড়ে যায়...

মুসা ﷺ-র রোমাঞ্চকর কাহিনীর শেষে আল্লাহ ﷻ মুসাকেই জয়ী করেন। ফেরাউনকে পরাজিত করেন। ফেরাউন মুসার পশ্চাদ্ধাবন করে। তারা সমুদ্র সামনে রেখে আগাতে থাকে।

সামনে সমুদ্র। মুসা ﷺ সমুদ্র দেখে দাঁড়িয়ে যান। আল্লাহ ﷻ তখন মুসা ﷺ-কে বলেন, 'তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রবুকে আঘাত কর'। মুসা তাই করলেন। সমুদ্র চিরে দুই খণ্ড হয়ে যায়। মাঝখানে প্রশস্ত ও নির্বিঘ্ন রাস্তা। মুসা এবং তার কওম সেই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যান।

ফেরাউনও সামনে অগ্রসর হয়। রাস্তায় উঠার মনস্থ করে। কিন্তু মনে মনে ভয় পেয়ে যায়। সে তার বাহন নিয়ে পিছু হটতে চায়। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তার বাহনকে পিছু হটতে বারণ করেন।

একটি ইসরাঈলি বর্ণনায় পাওয়া যায়, সেখানে জিবরাইল ﷺ অবতীর্ণ হন। জিবরাইলের বাহন ছিলো একটি খচ্চরী। ফেরাউনের কাছে ছিলো একটি ঘোড়া। ঘোড়া সবসময় খচ্চরীর প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে। জিবরাইল তার খচ্চরীসহ সমুদ্রের রাস্তায় উঠলে খচ্চরীর প্রতি আসক্ত হয়ে ফেরাউনের ঘোড়াও সমুদ্রপথে প্রবেশ করে। ফেরাউনের সাথে তার বাহিনীও প্রবেশ করে। ব্যাস!

এটি একটি ইসরাঈলি বর্ণনা। সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে।

ফেরাউন তার বাহিনীসহ সমুদ্রের মাঝামাঝি যায়। ও পর্যন্তই তার জীবন শেষ। দুই থেকে মিলে যায় সমুদ্র। গভীর জলরাশিতে পরিণত হয় সমুদ্রবুকের অলৌকিক রাস্তা।

মুসা ﷺ সমুদ্র পার হয়ে চলে আসেন। আল্লাহর কথা অনুযায়ী মুসাই হন সেদিনের বিজয়ী। আল্লাহর অনুগ্রহ এভাবেই তার প্রিয় বান্দাদের সাথে থাকে। দুনিয়াতেও থাকে, আখেরাতেও থাকে।

রাসূল ﷺ-র প্রতি আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহ

রাসূল ﷺ-কে গুপ্তহত্যার সিদ্ধান্ত নিল মক্কার কাফেররা। গোত্রপতিরা বিষমাখানো ধারালো তরবারি তুলে দিল প্রত্যেক গোত্রের সাহসী যুবকদের হাতে। টগবগে কম্পমান যুবকরা তরবারি হাতে রাসূলের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, কখন রাসূল বের হবেন সেই অপেক্ষায়।

আল্লাহ ﷻ মহান রাসূলকে সংবাদ জানিয়ে দিলেন, কোরাইশ কাফেররা ঘরের চারদিক ঘিরে নিয়েছে। ফাঁদ পেতে আছে তোমাকে হত্যার জন্য। সুতরাং তুমি ঘর থেকে বের হও।

রাসূল ﷺ এক মুঠো ধুলোমাটি হাতে বের হলেন। ধুলোমাটি ছড়িয়ে দিলেন যুবকদের চোখেমুখে। নিরাপদে ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেলেন পাহাড়ের গুহায়। কাফের যুবকদের তো মাথায় হাত!

কাফের যুবকরা তরবারি হাতে রাসূলের পশ্চাদ্ধাবন করল। যে গুহায় রাসূল অবস্থান করেছেন, সে গুহাটির প্রবেশমুখে আনাগোনা করছে। কে এখন রক্ষা করবে রাসূলকে?

রাসূলের সাথে ছিলেন আবু বকর رضي الله عنه। তিনি ভয়ে শঙ্কায় কাঁপছেন, রাসূলের না জানি কী হয়ে যায়! রাসূল দৃপ্তভরে বললেন,

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

ভয় পেওনা। নিশ্চয় আল্লাহ রয়েছেন আমাদের সাথে। [সূরা তাওবা: ৪০]

আল্লাহর কী কুদরত! একটি কবুতর এসে বাসা বানাল রাসূলের গুহার মুখে! মাকড়শা এসে জাল বুনলো রাসূলের গুহার মুখে। গুহার মুখে এতকিছু দেখে কেউ কি ধারণা করতে পারে, এখানে কোন লোক আছে!

কবির ভাষায়–

ভাবলো তারা মাকড়শায় কবুতরে কী হবে!

ওরা জাল বুনে বাসা বুনে রাসূলকে বাঁচাবে?

কিন্তু কী হবে তীর-বর্শায় কী হবে কেল্লা বা দুর্গে?

আল্লাহর কারিশমা এসব কিছুর ঊর্ধ্বে, বহু ঊর্ধ্বে!

কাফের সুরাকা রাসূলের খোঁজে বাজবেগে ছুটল মরুর বুকে। কখন পাবে কাঙ্ক্ষিত শিকারী! কখন ধরবে মোহাম্মদকে! কিন্তু আল্লাহর সাথে রাসূলের এক গোপন কথায় সব শেষ! রাসূল আল্লাহর কাছে বললেন–

اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ

তুমি যেভাবে চাও, আমাদের পক্ষে ওর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও। [বুখারি : ৫৬০৭]

রাসূলের এক কথায় খেল খতম। কোন কষ্ট ছাড়া, অবরোধ ছাড়া রাসূল ﷺ নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। আল্লাহ ﷻ-ই রাসূলের পক্ষে সুরাকার জন্য যথেষ্ট হলেন। তার ঘোড়া পা গেরে মরুর বালিতে বসে পড়ল। সে নিজেও ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ল। গুপ্তহত্যার এত চেষ্টার পর আল্লাহই রাসূল ﷺ-কে বিজয়ী করলেন।

আল্লাহ তার বন্ধুদের কারামাত দিয়ে শক্তিশালী করেন

আল্লাহ ﷻ তার বন্ধুদের কারামাত বা অলৌকিকত্ব দিয়ে শক্তিশালী করেন। মুজিযা দিয়ে শক্তিশালী করেন। রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ অসংখ্য মুজিযা দিয়ে শক্তিশালী করেছিলেন।

একদিন রাসূল ﷺ সাহাবিদের সামনে দাঁড়ালেন তাদের সাথে কথা বলার জন্য। মসজিদে মিম্বার স্থাপন করা হয়েছে। এতদিন মিম্বার হিসেবে ব্যবহৃত হতো একটি খেজুর গাছের কান্ড। রাসূল নতুন মিম্বারে দাঁড়াতেই পরিত্যক্ত শুকনো খেজুর গাছের কান্ডটি আবেগাপ্লুত হয়ে উঠল। প্রিয় বন্ধুর বিচ্ছেদে অনুভূতিশীল হয়ে উঠল। একটি খেজুর গাছের কান্ড, যেটির কোন লাভ-ক্ষতির হিসাব নেই, কথা নেই, বাকশক্তি নেই, সেটি কিনা সকলের সামনে কেঁদে ওঠল!

জাবির رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা খেজুর গাছের কান্ডের কান্না শুনেছি দশমা উটের কান্নার মতো।

রাসূল ﷺ মিম্বর থেকে নেমে আসলেন খেজুর গাছের কান্ডের সান্ত্বনার জন্য। খেজুর গাছের কান্ডের উপর ভালোবাসার পবিত্র হাত রাখলেন। খেজুর গাছের কান্ডের কান্না থামালেন। খেজুর গাছের কান্ডটি শান্ত হল। [বুখারি : ৩৫৮৫]

এটি ছিল রাসূলের মুজিযা।

কারামাত হল শক্তি, সাহসিকতা ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে প্রিয় কোন মুমিন বান্দাকে অলৌকিক কিছুর প্রদান। রাসূলদের মুজিযার মতো আল্লাহ তার প্রিয় অনেক বন্ধুকে কারামাত বা অলৌকিকত্ব দান করেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ভাষ্য– যখন কোন মুমিন বান্দা এবাদতের এমন চূড়ায় অবস্থান করে, যেখানে অগ্রগামীরাই শুধু অবস্থান করতে পারে, তাহলে আল্লাহ তাকে কিছু কারামাত দিয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেন–

﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾

তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে অগ্রসর। [সূরা ফাত্বির: ৩২]

আলা হাযরামির কারামাত

আলা হাযরামি ছিলেন রাসূলের একজন সাহাবি। একবার তিনি যুদ্ধের একটি বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন। তিনি ছিলেন দলনেতা। চলতে চলতে বাহিনী পথ ভুলে গেল। একবার ডানে, আবার বামে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে লাগল। পথের কোন কিনারা খুঁজে পেল না।

তাদের সাথে পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল। আশপাশেও পানি পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে পুরো বাহিনী এতটাই তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ল, তা শুধু আল্লাহই জানেন। কোন মানুষের পক্ষে সে তৃষ্ণা অনুধাবন করার নয়। বাহিনীর লোকেরা বলল, আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদির মধ্যে ভালো কিছুর ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর কাছে বলুন। তিনি আল্লাহর দিকে ঝুঁকলেন। আল্লাহকে ডাকলেন কায়মনোবাক্যে। ছোট্ট একটু দোয়া করলেন– 'ইয়া হাকীমু, ইয়া আযীমু, ইয়া আলীমু, ইয়া হাকীমু, ইয়া আলীমু, ইয়া আযীমু, আগিছনা। আমাদের সাহায্য করুন।'

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম! তার দোয়া শেষ হতেই একখণ্ড মেঘ উড়ে সাহাবিদের মাথার উপর চলে এল। মাথার উপর আকাশ ছেয়ে নিল। বজ্রধ্বনি

করে মুষলধারে বৃষ্টি ঝরাল। সাহাবায়ে কেরাম তৃপ্তিভরে পানি পান করলেন। অজু করলেন। মেঘখণ্ডটি উড়ে গেল!

আবু মুসলিম খাওলানির কারামাত

আবু মুসলিম খাওলানি ছিলেন একজন তাবেঈ। ভণ্ডনবি আসওয়াদ আনাসির কাছে তিনি হাযির হলেন।

আসওয়াদ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি মুহাম্মাদের উপর ঈমান রাখ?'

আবু মুসলিম উত্তর দিল, 'আমি মোহাম্মদ ﷺ-র উপর ঈমান এনেছি।'

আবু মুসলিমের উত্তর শুনে আসওয়াদ রেগেমেগে বলল, তোমাকে আমি এমনভাবে হত্যা করবো, যেভাবে কাউকে হত্যা করা হয়নি। আসওয়াদ কিছু লাকড়িতে আগুন জ্বালাল এবং আবু মুসলিমকে সে আগুনে নিক্ষেপ করল।

আবু মুসলিম ইবরাহিম عليه السلام-র দোয়াটি পড়লেন–

حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

আল্লাহই আমার যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কর্মবিধাতা।

তার দোয়ায় আল্লাহ আগুনকে শীতল ও আরামদায়ক বানিয়ে দিলেন। তিনি যখন মদীনায় ফিরে এলেন, ওমর রাযি. খুশি হয়ে তার সাথে দীর্ঘ মুয়ানাকা করলেন এবং বললেন, 'এই উম্মতের খলীলকে স্বাগতম। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিকে স্বাগতম।'

ওমর رضي الله عنه তাকে আবু বকর رضي الله عنه এর কাছে নিয়ে গেলেন। তাকে আবু বকর এবং নিজের মাঝখানে বসিয়ে বললেন, 'আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, তিনি উম্মতে মোহাম্মদির মধ্যে এমন লোক দেখিয়েছেন, যার সাথে কৃত অনুগ্রহ ইবরাহিম عليه السلام-র সাথে কৃত অনুগ্রহের মতো।'

উম্মতে মোহাম্মদির মধ্যে এমন অনেক বড় বড় দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেগুলো আল্লাহর বন্ধুদের সাথে তার অপার অনুগ্রহ, বন্ধুদের সুরক্ষা এবং হেফাযতের প্রমাণ। আল্লাহই তো মানুষকে হেফাযত করবেন। এজন্যই ঘুমানোর সময় দোয়া পড়তে হয়–

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ

হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার কাছে অর্পণ করেছি, তোমার কাছেই আমার সকল বিষয় সমর্পণ করেছি, তোমার দিকেই আমার চেহারা ফিরিয়েছি, তোমার কাছেই আমার পিঠ ঠেকিয়েছি; এসব তোমারই ভয়ে এবং তোমারই অনুগ্রহের আশায়। তুমি ব্যতীত কোন ঠিকানা আর আশ্রয়স্থল নেই। [বুখারি : ৬৩১১]

যে সকল আমল মানুষকে সুরক্ষা দান করে

কিছু আমল মানুষকে বিপদাপদ থেকে হেফাযত করে। আল্লাহর হুকুমে মানুষকে সুরক্ষা দান করে।

১. অজু

অজুকে বলা হয় মুমিনের হাতিয়ার। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلْوَضُوْءُ صِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

অজু মুমিনের হাতিয়ার। [আহমাদ : ২১৯৩০]

কেউ অজু করলে আল্লাহর হুকুমে সন্দেহ-সংশয় থেকে সুরক্ষা পায়। আল্লাহ তাকে খারাপ আত্মা থেকে হেফাযত করেন। হিংসা, চক্রান্ত, গাদ্দারির অশুভ দৃষ্টিপাত থেকে আল্লাহ তাকে হেফাযত করেন।

২. হদিসে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যার কিছু যিকির।

যেমন–

- আয়াতুল কুরসি। আয়াতুল কুরসির ব্যাপারে অনেক বিস্ময়কর হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এর এমন কিছু প্রভাব রয়েছে, এর নিয়মিত আমলকারীগণ ব্যতীত আর কেউ তা বোঝে না। ইবনুল কায়্যিম রাহি. বলেন, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ যেন আমাকে এই আয়াতের তাফসির এবং এর ভিতর লুকায়িত নানা রত্নভাণ্ডার উন্মোচন করে কিছু রচনা করতে পারি।' কিন্তু তিনি এই রচনার আগেই ইন্তিকাল করেছেন। আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

- সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ। আলি ﵁ বলেন, 'যে মুসলমান ঘুমানোর আগে বাকারার শেষ আয়াতগুলো না পড়ে, তার ব্যাপারে খুব আশ্চর্য বোধ হয়!'
- মুয়াওওয়াযাত। সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস। রাসূল ﷺ এক সাহাবিকে বলেন, 'তুমি সকাল-সন্ধ্যা সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস তিনবার পাঠ কর। এটা তোমার সকল কাজের জন্য যথেষ্ট হবে।'
- আরেকটি দোয়া–

  لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

  আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তার কোন শরীক নেই। তিনি জীবন দেন, মৃত্যু দান করেন। তিনি সকল বিষয়ে সক্ষম।

এই দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যা একশ বার পাঠ করা। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দোয়া একশ বার পাঠ করবে, আল্লাহ তার সাথে চারটি ওয়াদা করেছেন। যা অবশ্যই পূরণ হবে এবং পরিপূর্ণভাবে পূরণ হবে, আল্লাহ তা ভুলবেন না। তার জন্য একশটি পুণ্য লেখা হবে, একশটি গোনাহ মাফ হবে। তাকে দশটি সৎ গোলাম আযাদের সাওয়াব দেয়া হবে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে সে মুক্ত থাকবে। কেয়ামতের দিন তার মতো মর্যাদা নিয়ে অনুরূপ আমলকারী বা ততোধিক আমলকারী ব্যতীত আর কেউ আসবে না।

৩. লাভজনক আমল হলো কোরআন

মানুষের জন্য সবচেয়ে লাভজনক আমল হলো কোরআন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! মানুষ কুরআন ছাড়া এই পৃথিবীতে কীভাবে বাঁচতে পারে! মানুষের দিন-রাত্রি কুরআন ছাড়া কীভাবে কাটতে পারে!

ইমাম যাহাবি ﵀ ইবনে ওমর ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, ঘরে তার একটি কোরআন শরিফ ছিল। তিনি যখনই ঘরে যেতেন, কোরআন খুলে পড়া শুরু করতেন।

নাফে বর্ণনা করেন, অজু করা এবং কোরআন পড়া ছাড়া ইবনে ওমরের ঘরে আর কোন ব্যস্ততা ছিল না।

৪. মন প্রশান্ত করার মতো আরেকটি আমল

মুমিনের মন প্রশান্ত করার মতো আরেকটি আমল– শেষ রাতে আযানের কয়েক মিনিট পূর্বক্ষণে হলেও দুরাকাত সালাত আদায় করা। রাতের সেই শান্ত মূহুর্তে যখন মানুষ প্রশান্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকে, আল্লাহ তখন নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন। আল্লাহ বান্দাদের ডেকে ডেকে বলেন, 'কেউ আমাকে ডাকবে? আমি সাড়া দিবো। কেউ আমার কাছে কিছু চাইবে? আমি দান করবো। কেউ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি ক্ষমা করবো।'

আল্লাহ আমাকে ডেকে বলছেন! বিষয়টি কেমন মনে হয়!

আল্লাহ বলছেন, 'কেউ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে?'

আমি তখন বলছি, 'আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর!'

আল্লাহ বলছেন, 'কেউ আমাকে ডাকবে? আমি সাড়া দিবো।'

আমি তখন বলছি, 'আল্লাহ আমার এই কাজে সাড়া দাও। আমাকে ঐ সাফল্য দান কর।'

এটাই তো একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় সাফল্য!!!

৫. বেশি বেশি নফল এবাদত

আরেকটি আমল– বেশি বেশি নফল এবাদত করা। আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা সবসময় নফল এবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে, একসময় আমি তাকে ভালবাসবো। যখন আমি তাকে ভালবাসবো, তখন আমি তার কান হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাবো, যা দিয়ে সে চলে।'

আল্লাহ ﷻ আমাদের বেশি বেশি নফল এবাদত করার তাওফিক দিন।

আল্লাহই সবকিছুর হেফাযতকারী

আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকারী। আল্লাহই সবকিছুর হেফাযতকারী। আল্লাহই সব। সকল সৃষ্টির অভিভাবক তিনিই। সকল জীবের রিযিকদাতাও তিনিই। রক্ষণাবেক্ষণে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনিই দয়ালুদিগের সেরা দয়ালু।

ছোট্ট একটি চড়ুই পাখি, কর্তালী ফলিয়ে উড়ছে এ গাছ থেকে ও গাছে। চড়ুইয়ের মুখে এক লোকমা গোশত। পাখিটি উড়ে উড়ে উঁচু একটি খেজুর গাছের মাথায় গিয়ে বসলো। চড়ুইয়ের কাণ্ড দেখে নিচ থেকে উৎসুক হলেন এক লোক। কী করছে চড়ুইটি, দেখা দরকার!

যেই ভাবা, সেই কাজ। লোকটি গাছে উঠলেন। দেখলেন, গাছের মাথায় বিড়া বানিয়ে বসে আছে ভারি বয়সের একটি অন্ধসাপ। চড়ুই পাখি সাপের সাথে কানেমুখে কিচিরমিচির রবে কী যেনো বললো! সাপটি মুখ হাঁ করলো। চড়ুইটি সাপের মুখে গোশতের লোকমা তুলে দিলো!

সুবহানাল্লাহ! চড়ুই পাখিকে অন্ধ এই সাপের সংবাদ কে জান লো! কাঁটাপাতার খেজুর শাখে অন্ধ সাপের আহারের ব্যবস্থা কার নির্দেশনায়! চড়ুই পাখির কিচিরমিচির ভাষা বুঝে সাপটি চোয়াল খুললো কোন কারিশমায়! তিনি আল্লাহ। এক আল্লাহ। তিনি চড়ুই পাখির রব, আল্লাহ। তিনি অন্ধ সাপের প্রভু, বিশ্ববিধাতা আল্লাহ। তিনি বলেছেন, 'পৃথিবীর সকল জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনিই জানেন সকল জীবের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থান।' তিনি বলেছেন–

সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে। [সূরা হূদ: ৬]

জীবনের অসংখ্য অনুষঙ্গে মানুষ আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করে। যে আল্লাহকে স্মরণ করে জীবনের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি অবস্থায়, আল্লাহ ﷻ তাকে সমাধান দেন উত্তম রূপে, কল্পনার উর্ধ্বে। আল্লাহ ﷻ তাকে আনুকূল্য দেন জীবনের পরম আরাধ্য ধর্ম বিষয়ে। আল্লাহ ﷻ তাকে পরিত্রাণ দেন পার্থিব সব প্রতিকূল বিষয়ে। আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহানুভব। কোরআনের ভাষায়–

﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ﴾

রক্ষণাবেক্ষণে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ। তিনিই দয়ালুদের সেরা দয়ালু। [ইউসুফ: ৬৪]

ধর্ম মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। জীবনের গভীরে মহত্ত্বময় পটভূমি। যদিও মানুষের কাছে ধর্মই আজ আপেক্ষিক, আনুষ্ঠানিক, উপেক্ষিত। কিছু মানুষ আছে, যাদের জীবনে আল্লাহ ﷻ ধর্মপালনের সকল আনুকূল্য দান করেন। তাদেরকে সঠিক দিশায় অটল রাখেন। ধর্মের সাড়ম্বর মঞ্চে জীবনানুষ্ঠান পরিচালনা করেন নির্বিঘ্ন গতিময় নিয়মে। আল্লাহ ﷻ তাদের অন্তরকে ভ্রান্তি ও দ্বিধা থেকে মুক্ত ও সুস্থির রাখেন। তাদের অন্তর থেকে শিরক ও নিফাক দূর করেন। সন্দেহ সংশয়ের দোলাচল থেকে উত্তরণ ঘটান। যেসব মানুষ লক্ষ্যহীন উদ্ভ্রান্ত জীবনে ভূপাতিত, আল্লাহ ﷻ তাদের সকল বিনাশ থেকে আশুমুক্তি দান করেন। আল্লাহই তাকে হেফাজত করেন। আল্লাহ ﷻ-র কৃপাতেই মানুষ সফলতার রাজতোরণ দর্শন করে।

মানুষ যখন মরণকালের সঙ্গিন সময়ে উপনীত হয়, শয়তান তখন মনুষ্যশিকারে লোভাতুর হয়ে ওঠে। শয়তান তখন মানুষকে কুফরির মহাধ্বংশে ধরাশায়ী করতে উন্মাতাল হয়ে ওঠে। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তখনও কিছু মানুষের সহায় হন। কুফরির মহাধ্বংশ থেকে মানুষের রক্ষাকবচ হন। মৃত্যুর বিভীষিকাময় অবস্থাতেও আল্লাহ ﷻ কিছু মানুষকে সরল পথে জিইয়ে রাখেন। তার মুখে মহাসত্যের উচ্চারণ ঘটান– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ!

এরা সেই সে সৌভাগ্যবান, যারা আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করেছে তাদের অহর্নিশ জীবনে। স্মরণ করেছে জীবনের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি অবস্থায়, প্রতিটি প্রসঙ্গে।

অনেক মানুষ আছে, যারা আল্লাহ ﷻ-র বিধান অমান্য করে। জীবন চলার পথে আল্লাহ ﷻ-র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে। সেসব মানুষ পরাজিত হয়, লজ্জিত হয়। মৃত্যুর সময় সেসব মানুষের যবানও তাদের সাথে বেইমানি করে। মৃত্যুমুখে তারা কালিমাহ উচ্চারণে হোঁচট খায়। তারা স্তব্ধ হয়ে যায়। অনুতাপে ভোগে। পরকালে তারা পরিতাপের করুণ পাঁচালী বহন করে। তারা দুনিয়াতে আল্লাহর সীমা রক্ষা করেনি, আল্লাহও তাদের সফলতার রাজমুকুট সুরক্ষিত রাখেননি। তারা দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত। আখিরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই মহাকালের ক্ষতিগ্রস্ত।

আল্লাহর বিধান রক্ষার প্রতিদান

(১) শত্রুর চক্রান্ত থেকে সুরক্ষা

ইবরাহিম ﷺ-র ঘটনা। তিনি যখন স্বজাতিকে এক আল্লাহর পথে অবিরাম ডাকতে থাকেন, তখন তাঁর জাতি পৌত্তলিকতার অভিশপ্ত তেজস্ক্রিয়ায় আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। তারা ইবরাহিমকে কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি। ইবরাহিমের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইবরাহিমকে মেরে ফেলার চক্রান্ত আঁটে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার অভিপ্রায়ে ইবরাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্তে ঐক্যমত হয়।

ইবরাহিমের জন্য প্রজ্জ্বলিত হলো দাউদাউ অগ্নিকুণ্ড। বিক্ষুব্ধ অগ্নির উত্তপ্ত তেজক্রিয়ায় অগ্নিকুণ্ডের কাছে ভীড়া অসম্ভব। একটি নিক্ষেপনযন্ত্রে চড়িয়ে ইবরাহিমকে দূর থেকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার প্রস্তুতি সম্পন্ন, এই মুহূর্তে জীবরাইল এলেন ইবরাহিমের কাছে। ইবরাহিমকে বললেন, 'আপনার কোন সহযোগিতায় আসতে পারি কি?' ইবরাহিম আল্লাহর নবি। তিনি উত্তর করলেন, 'তোমার সহযোগিতা নয়, আমি আল্লাহর সহযোগিতার অপেক্ষায় আছি!' [ইবনে কাছির : ৩/২৯৪]

ইবনে আব্বাস ﵄ একটি দোয়া বর্ণনা করেন–

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ঠ, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহী! [বুখারি : ৪৫৬৩]

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন– "এই দোয়াটি ইবরাহিম ﷺ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় পড়েছিলেন। আর রাসুল ﷺ পড়েছিলেন, যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জমায়েত হওয়ার সংবাদ এসেছিল। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> যখন তাদেরকে লোকে বলেছিলো, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর। কিন্তু একথা তাদের বিশ্বাস

দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক। [আলে ইমরান, ১৭৩]

ইবরাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো। তিনি তখনও শূন্যে উড়ছেন, অগ্নিকুণ্ডে পতিত হওয়ার আগেই তিনি বলে উঠলেন, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল'। তখনই আল্লাহ অগ্নিকে বললেন, 'হে অগ্নি, তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল হয়ে যাও, আরামদায়ক হয়ে যাও'। [আম্বিয়া: ৬৯]

এভাবে ইবরাহিম ﷺ কাফেরদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষা পেলেন। আল্লাহই তাঁকে মুক্তি দান করলেন।

সুতরাং রক্ষণাবেক্ষণে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ। তিনিই দয়ালুদের সেরা দয়ালু। তিনিই ইবরাহিমের অগ্নি নির্বাপিত করেছেন। তিনিই ইউনুসকে সমুদ্রে সহযোগিতা করেছিলেন। তিনিই দাউদের জন্য কঠিন লোহকে মমের মত সহজ তরল করেছিলেন। তিনিই মরিয়মের গর্ভে, নিঃসন্তান বৃদ্ধা সারার গর্ভে সন্তান দান করেছিলেন।

মানুষ আল্লাহর কাছে বিপদে সাহায্য চায়, বিপদমুক্ত হলে কৃতঘ্নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

সমুদ্রযাত্রায় মানুষ আল্লাহকে ডাকে– 'আল্লাহ, আমাদের কূলে ভিড়াও'। কূলে ভিড়ে মানুষ আল্লাহর অবাধ্য হয়।

স্থলযাত্রায়ও মানুষ আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহই মানুষকে বিপদমুক্ত রাখেন।

(২) অত্যাচারী শাসকের শোষণ থেকে সুরক্ষা

মুসা ﷺ-র ঘটনা। আল্লাহ তাঁকে ফেরাউনের কাছে তাওহিদের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য মনোনীত করলেন। ফেরাউন ছিলো স্বেচ্ছাচারী আল্লাহদাবিদার বাদশাহ। আল্লাহ ﷻ মুসাকে আদেশ করলেন সেই স্বৈরাচার ফেরাউনের সামনে গিয়ে একত্ববাদের সাহসী ঘোষণার জন্য।

মুসা জানতেন, ফেরাউন হলো একনায়ক বাদশাহ। রক্তখেকো অস্ত্রধারী ঘাতক বাদশাহ। ফেরাউনের প্রাসাদ হলো একটি নিশ্চিত মৃত্যুকূপ। তবু মুসা প্রস্তুত হলেন। ফেরাউনকে তাওহিদের দাওয়াত দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। মুসা

মুসা জাদুকরদের হেঁয়ালখেয়াল আর গায়ে মাখলেননা। আল্লাহর সাহায্যে ফেরাউনের জাদুকরদের পরাজিত করে সেখান থেকে আসলেন।

পরম উসতায সাইয়িদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ। তিনি সুরা আলে ইমরানের (১৩৯নং) আয়াত– 'তোমরা হীনবল হয়োনা এবং দুঃখিত হয়োনা। বিশ্বাসী হলে তোমরাই শ্রেষ্ঠ।' এর তাফসিরে লিখেছেন, 'হীনবল হবেনা, কারণ তোমাদের বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ শাশ্বত প্রবল বিশ্বাস। তোমরাই বিশ্বাসী, কারণ তোমরা সেজদা কর আল্লাহকে, আর অবিশ্বাসীরা সেজদা করে আল্লাহর সৃষ্টিকে। তোমাদের মত-পথ অত্যুচ্চ, শিখরসম, কারণ তোমাদের অনুসৃত মত-পথ আল্লাহ প্রদত্ত, আর অবিশ্বাসীদের মত-পথ আল্লাহর কোন এক সৃষ্টির প্রদত্ত। হীনবল হবেনা। তোমরাই যুগপৎ। তোমরাই পৃথিবীর সত্ত্বাধিকারী। তোমরাই একমাত্র প্রতাপশালী।' [তাফসির ফি যিলালিল কুরআন : ১/৪৮০]

জনৈক ইয়েমেনি আবেদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন স্বৈরাচারী এক খুনী বাদশাহ। খুনের সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। প্রখ্যাত সাঈদ ইবনে জুবাইর রাযি. এর হন্তারকও তিনি। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি, পৃথিবীতে যত হত্যা করেছি, প্রতিটি হত্যার শাস্তিতে আল্লাহ আমাকে একবার একবার হত্যা করেছেন। কিন্তু সাঈদ ইবনে জুবাইরের হত্যার শাস্তিতে আমাকে সত্তরবার হত্যা করা হয়েছে, ঠিক যেভাবে তাকে হত্যা করেছি সেভাবেই!'

তাউস ইবনে কায়সান রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ইবনে আব্বাস ﵄ এর শিষ্য। বুখারি এবং মুসলিমের হাদিস বর্ণনাকারী। তিনি উক্ত নির্দয় খুনী হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাথে জনৈক ইয়েমেনবাসীর প্রত্যক্ষ একটি ঘটনা বর্ণনা করেন–

একবার আমি ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে হারামে প্রবেশ করি। দুই রাকাত সালাত শেষে মাকামে ইবরাহিমে একটু বসি। হঠাৎ সেখানে মানুষের শোরগোল শুনতে পাই। চারদিকে অস্ত্র; তলোয়ার ঢাল আর বল্লমধারীর সমাবেশ। খোঁজ নিয়ে দেখি, সেখানে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এসেছেন। তার দেহরক্ষী আর স্তর-স্তর নিরাপত্তার জন্যই এই অস্ত্র আর সৈন্য সমাগম।

আমি আমার মতই বসে থাকি। এমতাবস্থায় ইয়েমেনের এক দুনিয়াবিরাগ আবেদ বাইতুল্লাহয় তাওয়াফ শুরু করলেন। যথারীতি তাওয়াফ শেষ করে দুই

রাকাত সালাত আদায়ে দাঁড়ালেন। ঘটনাচক্রে এক বল্লমধারীর বল্লমের সাথে আবেদের চাদর পেঁচিয়ে গেলো। আবেদ সেজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় চাদরের ক্ষিপ্রতায় বল্লমটি হাজ্জাজের গায়ে পড়লো। হাজ্জাজ রেগে গেলেন। আবেদকে সালাতরত অবস্থায় থামিয়ে দিলেন। নিক্ষিপ্ত বল্লমের মত দু'টি শব্দ ছুঁড়ে দিয়ে আবেদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তুমি?'

আবেদ অসহায়ের মতো উত্তর করলেন, 'আমি একজন মুসলিম।'

হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথা থেকে এসেছো তুমি?'

আবেদের নিস্পৃহ জবাব, 'ইয়েমেন থেকে।'

তেজালো হাজ্জাজ জ্বালাভরা চোখে বাঘের মতো তাকিয়ে আছেন। তখন ইয়েমেনের বাদশাহ ছিলো হাজ্জাজের আরেক ভাই মোহাম্মদ বিন ইউসুফ। আবেদের বাড়ি ইয়েমেনে শুনে হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের বাদশাহ কেমন আছেন?'

আবেদের অবলা উত্তর, 'বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর সুঠাম দেহ নিয়ে ভালই আছেন।'

হাজ্জাজ রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমাকে তার শারীরিক খবর জিজ্ঞেস করিনি। তার ন্যায়নীতি বিচারব্যবস্থা কেমন, তা জিজ্ঞেস করেছি।'

আবেদ কোন রাখঢাক না করে ধাম করে বলে ফেললেন, 'শাসনব্যবস্থায় সে তো ভয়ানক জালিম!'

হাজ্জাজ বাঁজখাই কণ্ঠে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'তুমি কি জানো, সে আমার ভাই?'

আবেদ আতঙ্কিত গলায় খেই হারিয়ে বললেন, 'তাহলে আপনি কে!'

হাজ্জাজ সদম্ভে আপন পরিচয় বললেন, 'আমি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।'

আবেদ এবার সাহসভরা কণ্ঠে বললেন, 'আপনি কি মনে করেন, আল্লাহ আমার যত বড় শক্তি, সে আপনার আরো বড় শক্তি?'

আবেদের উত্তর আর সাহসিকতা দেখে আমি অবাক হলাম। ভীত হলাম। আমার শরীরে একটি কাঁপুনি খেলে গেলো। আল্লাহই জানেন, হাজ্জাজ

আবেদকে কী না করে ফেলেন। ভয়ে আমার শরীরের লোমগুলো পলায়মান হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলাম, হাজ্জাজ লোকটিকে ছেড়ে দিলেন। আমি আরো একবার অবাক হলাম।

আবেদকে কে বাঁচালেন? কেন হাজ্জাজ আবেদকে ছেড়ে দিলেন? কারণ আবেদ আল্লাহর শক্তির উপর ভরসা রেখে আস্থা প্রকাশ করেছে। আল্লাহই আবেদকে বাঁচিয়েছেন।

ইমাম আওযায়ি رحمه الله

আব্দুল্লাহ বিন আলি আব্বাসি। তিনি ছিলেন আবু জাফর মনসুরের চাচা। সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল আশ্চর্য এক পুন ঋঁবুষ। আব্দুল্লাহর জন্য নিয়োজিত নিরাপত্তাকর্মী ছিলো প্রায় ত্রিশ হাজার।

আব্দুল্লাহ বিন আলি ছিলেন দামেস্কের বিজেতা। দামেস্ক জয় করে ছত্রিশ হাজার মুসলমান একত্রে হত্যা করেছিলেন। প্রলয়ঙ্কারী এই হত্যাযজ্ঞ শেষে আব্দুল্লাহ তার খচ্চর আর অশ্বদলের জন্য উমাইয়াদের কেন্দ্রীয় মসজিদকে আস্তাবল বানিয়ে নিলেন। একদদিন তার সভাকক্ষে এসে মন্ত্রীদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার বিরোধিতা করার মতো কেউ আছে কি?'

মন্ত্রীগণ বললেন, 'না।'

আব্দুল্লাহ বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মত কোন তরবারি আছে কি?'

মন্ত্রীগণ জানালেন, 'এমন কেউ নেই। তবে আমরা আবু আমর আওযায়ির ব্যাপারে আশঙ্কা করছি।'

আবু আমর আওযায়ি رحمه الله বুখারি-মুসলিমের হাদিস বর্ণনাকারীদের একজন। তিনি অতি উঁচুমানের একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদিসের জগতে তিনি আমিরুল মুমিনিনের খেতাবপ্রাপ্ত ছিলেন।

আব্দুল্লাহ বিন আলি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠলেন। সাথে সাথে আওযায়িকে গ্রেপ্তার করার জন্য সৈন্য পাঠালেন। সৈন্যরা আওযায়ির দরবারে উপস্থিত হলো। কিন্তু আওযায়ি তাদের দেখেও নিশ্চিন্ত বসে রইলেন। সৈন্যরা তাঁকে আব্দুল্লাহর পক্ষ

থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানার কথা জানালো। আওযায়ি তাদের মুখের উপর বলে দিলেন, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।' 'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ঠ, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহী!'

ইমাম আওযায়ি আল্লাহর উপর স্থির ভরসা প্রকাশ করলেন। তিনি জানতেন, আব্দুল্লাহর আস্তানা হলো নিশ্চিত মৃত্যুর রক্তভরা গভীর গহ্বর। সৈন্যদের কাছে একটু সময় চেয়ে নিয়ে গোসল করলেন ইমাম আওযায়ী ﵀। স্বাভাবিক পোষাকের নিচে পরিধান করলেন কাফনের কাপড়। নিজকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আওযায়ি, সত্য বলার সময় এসেছে। কোন নিন্দুকের কথা শোনার সুযোগ নেই।'

আল্লাহর ভরসায় বলীয়ান হয়ে ইমাম আওযায়ি অত্যাচারী আব্দুল্লাহর আস্তানায় উপস্থিত হলেন। আব্দুল্লাহর আস্তানায় প্রবেশপথের দুই পার্শ্বে কোষমুক্ত তরবারি আক্রমণভাগে উঁচিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে দুই সারি সামন্ত। আব্দুল্লাহ বিন আলি একটি লাঠি হাতে সদম্ভে বসে আছেন রক্তধোয়া সিংহাসনে। ইমাম আওযায়ি তরবারির নিচে হেঁটে হেঁটে আব্দুল্লাহর সামনে পৌঁছলেন। আব্দুল্লাহ তখন ক্রোধে কপাল কুঁচকে চটে আছেন। আওযায়ি সামনে দাঁড়িয়ে স্থির কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল; আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ঠ, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহী!'

ইমাম আওযায়ি ﵀ নিজের এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি যখন প্রথম আব্দুল্লাহর সামনে এই দোয়া পড়েছি, তখন তার মতো শক্তিশালী জালেমকে আমার কাছে একটি মাছির মত দুর্বল মনে হয়েছিলো। আমার তখন পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ কোন কিছুর ভরসা মনে হয়নি। এক আল্লাহর উপরই তখন ভরসা করেছিলাম।'

আব্দুল্লাহর টগবগে চোখ থেকে ক্রোধের বাষ্প ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে বেরুচ্ছে। রাগতস্বরে আওযায়িকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি এ যাবৎ যত হত্যা করেছি, রক্তরাঙা হয়েছি, এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী?'

আওযায়ির মনে হলো, সত্য উচ্চারণের এই তো মাহেন্দ্রক্ষণ। সৎসাহসে তিনি ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে একজনের সূত্রে একটি হাদিস শুনিয়ে দিলেন–

> রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘এমন কোন ব্যক্তির প্রাণবধ বৈধ নয়, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আর আমি (মুহাম্মাদ) নিশ্চয় আল্লাহর রাসুল। অবশ্য তিন প্রকার লোকের প্রাণ বধ করা বৈধ। তারা হলো, বিবাহিত ব্যভিচারী, প্রাণের বদলে প্রাণ, মুসলমানের জামাত থেকে বিচ্ছিন্নবাদী ধর্মত্যাগী। [বুখারি : ৬৮৭৮]

সুতরাং হে আব্দুল্লাহ, এসব কোন কারণে যদি তুমি হাজার মানুষের প্রাণ বধ করে থাক, তবে তুমি সঠিক কাজ করেছ। অন্যথা তুমি এসব হত্যার দায় এড়াতে পারবেনা।”

একথা বলে আওযায়ি নিজ ঘাড়ে তরবারির আঘাতের অপেক্ষা করতে থাকলেন। কিন্তু ঘটনা ঘটলো উল্টো। আব্দুল্লাহর হাত থেকে লাঠিটি পড়ে গেলো। আব্দুল্লাহর হাত থেকে লাঠি পড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে উপস্থিত মন্ত্রীবর্গ আর সামন্তরাও নিজেদের গুটিয়ে রাখলো।

আব্দুল্লাহ আওযায়ি ﵀-কে নতুন প্রসঙ্গো জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমার অঢেল ধন-সম্পদের ব্যাপারে তোমার মতামত কী?’

আওযায়ি আবারও অকুতোভয় উত্তর উচ্চারণ করলেন। বললেন, ‘তোমার সম্পদ হালাল পথে উপার্জিত হলে আল্লাহর কাছে এর ব্যয়ের হিসাব দিতে হবে। আর হারাম পথে উপার্জিত হলে এর শাস্তি ভোগ করতে হবে।’

আব্দুল্লাহ আওযায়ির উত্তর শুনে অনেকটা চুপষে গেলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতে কর্তব্য স্থির করতে না পেরে আওযায়িকে বশে আনার জন্য ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। বড় একটি স্বর্ণভর্তি পাত্র উপহার দিলেন আওযায়িকে। কিন্তু আওযায়ি এবারও তার অত্যুচ্চ দিয়ানতদারির প্রকাশ ঘটালেন। আব্দুল্লাহর প্রদত্ত স্বর্ণের পাত্র গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন।

আওযায়ির এমন সাহসিকতা প্রদর্শনে পুরো মহল থমথমে হয়ে গেলো। কোন কোন আমলা চোখের ইশারায় তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলো, আব্দুল্লাহ কাউকে হত্যা করার জন্য সামান্য বাহানা খুঁজে বেড়ায়। তোমার এ অস্বীকৃতিজ্ঞাপন তার আত্মমর্যাদায় আঘাত হানবে। না জানি এটাই তোমাকে হত্যা করার কোন বাহানা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আব্দুল্লাহর উপহার গ্রহণ করে নাও।

আওযায়ির উপহার গ্রহণের অস্বীকৃতি আব্দুল্লাহর আত্মমর্যাদায় প্রবল আঘাত হানলো। আব্দুল্লাহ রাগ প্রকাশ করে উপস্থিত সকলের মাঝে স্বর্ণগুলো বণ্টন করে খালি পাত্র ছুঁড়ে ফেললেন। রাগে গদগদ করে সিংহাসন ছেড়ে উঠে গেলেন। আব্দুল্লাহ চলে গেলে আওযায়ি আবারও স্থির কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল; আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ঠ, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহী!'

আওযায়ি ﷺ বিজয়ীবেশে সেখান থেকে চলে এলেন।

> তারপর তারা আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিলো। কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি। এবং আল্লাহ যেভাবে সন্তুষ্ট হন, তারা সেভাবেই অনুসরণ করেছিলো। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল। [সূরা আলে ইমরান: ১৭৪]

জনৈক বুযুর্গ তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে এমন একটি শক্তির সন্ধান দিবো, যা কখনও ক্ষয় হওয়ার নয়? পরাস্ত হওয়ার নয়?'

ছেলে বললো, 'অবশ্যই বলুন।'

বুযুর্গ বললেন, 'আল্লাহর উপর ভরসা করো।'

ইবনে আবি যিব ﷺ

খলিফা মাহদি আব্বাসি। একবার তিনি মসজিদে নববিতে এলেন। তখন সেখানে পাঁচশতাধিক হাদিসের ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। মালেক বিন আনাসও তাদের একজন। সকলে হাদিস অন্বেষে কালি ও কলম নিয়ে ব্যস্ত। খলিফা মাহদি আব্বাসি সেখানে প্রবেশ করতেই সকলে খলিফার সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ইবনে আবি যিব ﷺ। বিদগ্ধ হাদিসবিশারদ। বুখারি ও মুসলিমে তাঁর থেকে হাদিস বর্ণিত রয়েছে। তিনিও খলিফার আগমনকালে মসজিদে নববিতে হাদিসের ছাত্রদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু খলিফার আগমনে সকলে দাঁড়িয়ে গেলেও তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত। আপন মনে বসে রইলেন। খলিফা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইবনে আবি যিব, আমার আগমনে সকলে দাঁড়ালো, তুমি দাঁড়ালে না যে!'

ইবনে আবি যিব বললেন, "আল্লাহর কসম, আমিও দাঁড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু যেই না দাঁড়াবো, অমনিতেই কোরআনের একটি আয়াত মনে পড়লো—

﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِينَ﴾

> যেদিন সকল মানুষ দাঁড়াবে জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে। [সূরা মুতাফফিফিন: ৬]

এ আয়াত স্মরণ হওয়ায় আমি আর দাঁড়াইনি। আমি আয়াতের উদ্দিষ্ট দিনে দাঁড়ানোর অপেক্ষায় রইলাম!"

ইবনে শিহাব যুহরি رحمه الله

মোহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরি رحمه الله। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত আলেম, বিদগ্ধ মুহাদ্দিস। একবার কোন এক কাজে হিশাম ইবনে আব্দুল মালেকের কাছে উপস্থিত হলেন। হিশাম ছিলেন উমাইয়া খেলাফতের একজন শাসক। তখন তার দরবারে আরো অনেক আলেম উপস্থিত ছিলেন। খলিফা হিশাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়েশা رضي الله عنها এর ইফকের ঘটনায় কোরআনে বর্ণিত হয়েছে—

> তাদের (ঘটনা রটনাকারীদের) মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। [সূরা নূর: ১১]

উক্ত আয়াতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণকারী দ্বারা উদ্দেশ্য কে?"

উপস্থিত সোলাইমান ইবনে ইয়াসার বললেন, 'সে হলো আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই।'

হিশাম সোলাইমান ইবনে ইয়াসারের উত্তর প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ, হিশাম বিশ্বাস করতেন, ইফকের ঘটনা রটনাকারীদের প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন আলি ইবনে আবি তালিব رضي الله عنه!

সোলাইমান হিশামের মনোভাব বুঝে বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন যা বলেছেন, তা নিজেই ভালো জানেন!'

হিশাম আরেকজন আলেমকে জিজ্ঞেস করলে তিনিও সোলাইমানের মতই উত্তর দেন। হিশাম তার উত্তরও প্রত্যাখ্যান করে তাকে মিথ্যাবাদী দাবি করেন।

এরপর হিশাম প্রসঙ্গটি তুলে ধরেন ইবনে শিহাব যুহরির কাছে। যুহরিও খুব শক্তি দিয়ে বলেন, 'ইফকের ঘটনায় প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল।'

হিশাম তাঁর জবাবও প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ।'

ইবনে শিহাব যুহরি হিশামকে ভর্ৎসনা করলেন। তাঁর সংহত কণ্ঠ থেকে ঝেঁকিয়ে বেরিয়ে এলো, "আমি মিথ্যা বলছি! আল্লাহর কসম, আকাশ থেকে যদি ঘোষণা আসে যে মিথ্যা বলা বৈধ, তবুও আমি মিথ্যা বলবোনা। আল্লাহর কসম, আমার কাছে সাঈদ, ওরওয়াহ, ওবাইদ, আলকামা বিন ওয়াক্কাস আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণনা করেছেন, 'ইফকের ঘটনায় প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল।"

যুহরির সংহত বাচন দেখে হিশাম প্রচণ্ড ভীত হলেন। থরোথরো কণ্ঠে নত হয়ে বললেন, 'ভুল হয়ে গেলো। আমি আপনাকে উত্তেজিত করে তুলেছি। আমাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দেখুন!'

ইমাম যুহরিকে সংহত করে তুলেছেন আল্লাহ ﷻ। তাঁর ভেতর শক্তিশালী প্রতিবাদী সত্তার উদ্বোধন ঘটিয়েছেন আল্লাহ ﷻ। হিশাম ইবনে আব্দুল মালেকের অন্যায় উত্তাপ থেকে ইমাম যুহরি رحمه الله-কে প্রভাবমুক্ত রেখেছেন আল্লাহ। আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনিই সকল দয়ালের সেরা দয়ালু।

(৩) শত্রুর বিরুদ্ধে সহযোগিতা

আল্লাহ ﷻ তাঁর প্রিয় বান্দাদের শত্রুর চক্রান্ত থেকেও সুরক্ষা দেন। শত্রুর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ করে তোলেন। শত্রুর বিরুদ্ধে আসমান থেকে অদৃশ্য সহযোগিতাও করেন।

খালিদ বিন ওয়ালিদ رضي الله عنه

খালিদ বিন ওয়ালিদ رضي الله عنه। দি সোর্ড অব আল্লাহ খালিদ। আল্লাহর তলোয়ার খালিদ। তলোয়ারের ধারালো বজ্রে মুশরিকদের কুপোকাত করেছিলেন খালিদ। কে না চিনে খালিদকে! কে না জানে আল্লাহর তলোয়ার আবু সুলাইমান খালিদকে!

রোমের বিরুদ্ধে রণাঙ্গানে অবতীর্ণ হয়েছেন খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.। তাঁর সৈন্যসংখ্যা বত্রিশ হাজার। ধারণা ছিলো রোমের সৈন্যসংখ্যাও এমনই হবে। কিন্তু না, রোমের সংখ্যা ধারণাতীত। দুই লক্ষ আশি হাজারের সুবিশাল বহর।

যুদ্ধের দিন সকালে সূর্য উঠতেই ঝাঁকেঝাঁকে রণাঙ্গানে বেরিয়ে এলো রোমসৈন্য। সূর্যের বিকিরণে প্রজ্বলন্ত হয়ে উঠলো রোমকদের তরবারি। দলেদলে কৌশলে আক্রমনাত্মক হয়ে দাঁড়ালো রোম ব্যাটেলিয়ন। প্রতিটি ব্যাটেলিয়নে এক হাজার সৈন্যের বিন্যাস। ব্যাটেলিয়নের পর ব্যাটেলিয়ন। রেজিমেন্টের পর রেজিমেন্ট।

এভাবে সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র, পাহাড়-সমতল-নিম্নভূমি সবখানে সৈন্য সমাবেশ করে প্রভুত্বের উত্তাপে বুকের ছাতি ফুলিয়ে আস্ফালন দেখাচ্ছে রোমকরা। খালিদ এখন কী করবে! কার কাছে দিশা খুঁজবে! কার কাছে সাহায্য চাইবে! কোনো জনসঙ্ঘ জাতিগোষ্ঠির কাছে! কোনো কমিটি সংস্থা পরিষদের কাছে! না, খালিদ ঝুঁকেছেন আল্লাহর দিকে। সাহায্য চেয়েছেন আল্লাহর কাছে। খালিদের মনে হলো আল্লাহ ﷻ-র সে বাণী–

> তোমরা তাদের বধ করনি, আল্লাহই তাদের বধ করেছেন। তুমি তখন নিক্ষেপ করনি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। এটি বিশ্বাসীদের উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সূরা আনফাল: ১৭]

সুতরাং আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনিই সকল দয়ালের সেরা দয়ালু।

যুদ্ধের পূর্বক্ষণ। খালিদের এক সহচর মুসলিম প্রস্তাব দিলেন, কাফেরদের সংখ্যা দৃষ্টির শেষ পর্যন্ত, আমাদের সংখ্যা অতি নগণ্য! আজ আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করি।

এই প্রস্তাব শুনে খালিদের বুক চুরচুর করে মুচড়ে উঠলো। দুচোখ ভাসিয়ে অশ্রু গলে পড়লো চিকচিকিয়ে। বুকের রক্তরোদন মুখের রেখায় রেখায় জেগে উঠলো। ধারালো কণ্ঠে প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন খালিদ– 'পাহাড় নয়, আল্লাহর কাছেই আমাদের আশ্রয়'। আল্লাহর ঈমানে, আল্লাহর ভরসায়, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার উদ্দীপনা জাগালেন সকলের ভেতর। তেজালো কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, "ওরা বেশি, আমরা কম' এভাবে বলোনা। বরং এভাবে বলো,

'আমরা কতো বেশি! ওদের সংখ্যা নগণ্য।' আমার ঘোড়া যতক্ষণ অক্ষত থাকবে, কাফেরদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান কমতে থাকবে।"

খালিদ তলোয়ার উন্মুক্ত করলেন। তাঁর দেখাদেখি সকল মুসলিম উন্মুক্ত করলেন নিজ নিজ কোষমুক্ত তলোয়ার। দুই বাহিনী মুখোমুখি, লড়াইরত, আক্রমনাত্মক। দিন গড়াচ্ছে। যুদ্ধও চলছে। তিন দিন না যেতেই কাফেররা ভয়ানক বিপাকে পড়ে গেলো। এরপর কীভাবে তারা পরাজিত হলো, নিশ্চিহ্ন হলো, তা শুধু আল্লাহই জানেন। আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্য করলেন। কাফেরদের পরাজিত করলেন। কাফেরদের সমূলে কর্তিত করলেন। আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনিই দয়ালুদিগের সেরা দয়ালু। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।

মোহাম্মদ বিন ওয়াসি আযদি رحمه الله

দুঃসাহসী সেনাপতি কুতাইবা বিন মুসলিম। তিনি একবার কাবুল আক্রমণ করেছিলেন। চারদিক থেকে ঘেরাও করে রেখেছিলেন দিনের পর দিন। উদ্ধত তরবারি হাতে যখন কাবুলকে জনশূন্য করবেন, তখনই আল্লাহর সাহায্য প্রকাশ পেলো। আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত বান্দাকে কে পরাস্ত করতে পারে! [আলে ইমরানের ১৬০ নং আয়াতের আলোকে।]

ঘটনা ছিলো এমন, কাবুলের বিখ্যাত এবং মান্য বুযুর্গ ছিলেন মোহাম্মদ বিন ওয়াসি আযদি رحمه الله। কুতাইবা জয়ের নেশায় বিভোর হয়ে মোহাম্মদ বিন ওয়াসিকে হত্যার জন্য খুঁজলেন। সৈন্য পাঠালেন মোহাম্মদ বিন ওয়াসির খোঁজে। সৈন্যরা তাঁকে খুঁজে পেলো। দেখলো, মোহাম্মদ বিন ওয়াসি সালাত আদায় করছেন। সালাত শেষে হাতের বর্শা মাটিতে পুঁতে টেক লাগিয়ে বসেছেন। মনের সকল মমতা, ভক্তি ও বিশ্বাস বিগলিত করে দুচোখ ভরে কান্না ঝরিয়ে আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করছেন–

يَا حَيُّ يَاقَيُّوْمُ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نَصْرُكَ الَّذِيْ وَعَدْتَنَا.

> হে চিরঞ্জীব অনাদি স্বাধিষ্ঠ বিশ্বধাতা! হে মহিমাময় মহানুভব! তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্যের দিকে তাকিয়ে আছি...'

কুতাইবার কানে সংবাদ গেলো, মোহাম্মদ বিন ওয়াসি কাঁদছেন। বুকের টাটকা নোনাজল ঝরিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন কুতাইবার অনিষ্ট থেকে

'আমরা কতো বেশি! ওদের সংখ্যা নগণ্য।' আমার ঘোড়া যতক্ষণ অক্ষত থাকবে, কাফেরদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান কমতে থাকবে।"

খালিদ তলোয়ার উন্মুক্ত করলেন। তাঁর দেখাদেখি সকল মুসলিম উদ্ধত করলেন নিজ নিজ কোষমুক্ত তলোয়ার। দুই বাহিনী মুখোমুখি, লড়াইরত, আক্রমনাত্মক। দিন গড়াচ্ছে। যুদ্ধও চলছে। তিন দিন না যেতেই কাফেররা ভয়ানক বিপাকে পড়ে গেলো। এরপর কীভাবে তারা পরাজিত হলো, নিশ্চিহ্ন হলো, তা শুধু আল্লাহই জানেন। আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্য করলেন। কাফেরদের পরাজিত করলেন। কাফেরদের সমূলে কর্তিত করলেন। আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনিই দয়ালুদিগের সেরা দয়ালু। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।

মোহাম্মদ বিন ওয়াসি আযদি رحمه الله

দুঃসাহসী সেনাপতি কুতাইবা বিন মুসলিম। তিনি একবার কাবুল আক্রমণ করেছিলেন। চারদিক থেকে ঘেরাও করে রেখেছিলেন দিনের পর দিন। উদ্ধত তরবারি হাতে যখন কাবুলকে জনশূন্য করবেন, তখনই আল্লাহর সাহায্য প্রকাশ পেলো। আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত বান্দাকে কে পরাস্ত করতে পারে! [আলে ইমরানের ১৬০ নং আয়াতের আলোকে।]

ঘটনা ছিলো এমন, কাবুলের বিখ্যাত এবং মান্য বুযুর্গ ছিলেন মোহাম্মদ বিন ওয়াসি আযদি رحمه الله। কুতাইবা জয়ের নেশায় বিভোর হয়ে মোহাম্মদ বিন ওয়াসিকে হত্যার জন্য খুঁজলেন। সৈন্য পাঠালেন মোহাম্মদ বিন ওয়াসির খোঁজে। সৈন্যরা তাঁকে খুঁজে পেলো। দেখলো, মোহাম্মদ বিন ওয়াসি সালাত আদায় করছেন। সালাত শেষে হাতের বর্শা মাটিতে পুঁতে টেক লাগিয়ে বসেছেন। মনের সকল মমতা, ভক্তি ও বিশ্বাস বিগলিত করে দুচোখ ভরে কান্না ঝরিয়ে আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করছেন–

يَا حَيُّ يَاقَيُّوْمُ، يَاذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نَصْرُكَ الَّذِيْ وَعَدْتَنَا.

হে চিরঞ্জীব অনাদি স্বাধিষ্ঠ বিশ্বধাতা! হে মহিমাময় মহানুভব! তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্যের দিকে তাকিয়ে আছি...'

কুতাইবার কানে সংবাদ গেলো, মোহাম্মদ বিন ওয়াসি কাঁদছেন। বুকের টাটকা নোনাজল ঝরিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন কুতাইবার অনিষ্ট থেকে

বাঁচার ফরিয়াদ নিয়ে। এ খবর শুনে কুতাইবা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আল্লাহর কাছে তার জুলুমের বিচার দেয়া হয়েছে! কুতাইবার স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে এলো। ভয় আর আতঙ্ক লেপ্টে ধরলো তাকে। চৈতন্য ফিরে এলো কুতাইবার। কেঁদে ফেললেন কুতাইবা। আল্লাহ তাকে রহম করুন। কুতাইবা বলে উঠলেন, 'আল্লাহর কাছে উত্তোলিত মোহাম্মদের দোয়ার অঙ্গুলি আমার কাছে শতসহস্র তরবারি আর অযুতনিযুত তাগড়া সেনার চেয়েও উত্তম!'

আল্লাহ মোহাম্মদ বিন ওয়াসি আযদিকে বাঁচিয়েছেন। আল্লাহই কাবুলবাসীদের সুরক্ষা দান করেছেন। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ সুরক্ষাদানকারী। তিনিই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দয়াবান।

(৪) প্রিয় বান্দাদের পরিবার সন্তানের সুরক্ষা

আল্লাহ جل جلاله তাঁর প্রিয় বান্দাদের সন্তান-সন্ততিকেও হেফাযত রাখেন। প্রিয় বান্দাদের পরিবার-পরিজনকে বিপদাপদে সুরক্ষা দান করেন। প্রিয় বান্দাদের মৃত্যুর পর তাদের রেখে যাওয়া সন্তানের অভিভাকত্ব পালন করেন।

নবি ইয়াকুব عليه السلام

ইয়াকুব عليه السلام-র ঘটনা। পুত্র ইউসুফ যখন তাঁর হাতছাড়া হয়ে যান, তিনি যখন বুঝতে পারেন তাঁর পুত্রকে বাঘে খাওয়ার ঘটনা সাজানো হবে, তখন তিনি বলেছিলেন, 'রক্ষণাবেক্ষণে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ। তিনিই দয়ালুদের সেরা দয়ালু।'

যখন তিনি কল্পনা করতেন, তাঁর প্রিয় পুত্র তাঁকে দেখছেনা, তখনও তিনি বিচ্ছেদ ব্যথায় কুঁকড়ে উঠে বলতেন, 'রক্ষণাবেক্ষণে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনিই দয়ালুদের সেরা দয়ালু।'

যখন তিনি বুঝতে পেরেছেন, প্রিয় পুত্রের বিচ্ছেদ অচিরেই ঘুচবে, তখনও তিনি বলেছিলেন, 'রক্ষণাবেক্ষণে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনিই দয়ালুদের সেরা দয়ালু।'

হাসান বসরি رحمه الله বর্ণনা করেন, 'পুত্র ইউসুফের সাথে বিচ্ছেদকালীন সুদীর্ঘ আশি বছর ইয়াকুব عليه السلام তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেননি। সুদীর্ঘ

আশি বছর ইয়াকুবের কপোল বেয়ে গড়িয়েছিল তপ্ত নোনাজল।' [জামিউল বায়ান]

সুদীর্ঘকাল পর আল্লাহ ইউসুফকে আবার ইয়াকুবের বুকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এটি আল্লাহই করেছেন। আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ। তিনিই দয়ালুদের সেরা দয়ালু।

পিতৃহীন দুই কিশোর

মুসা এবং খিজির ﷺ-র ঘটনা। মুসা যখন খিজিরের সাথে শিক্ষাসফর করছিলেন, এক পর্যায়ে উভয়ে এক গ্রামে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে খিজির গ্রামবাসীর কাছে কিছু খাদ্য চাইলেন। কিন্তু তারা মুসা এবং খিজিরকে আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করলো। মুসা এবং খিজির সেখান থেকে চলে আসার সময় দেখলেন, পুরাতন একটি প্রাচীর পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে আছে। খিজির ﷺ পতনোন্মুখ প্রাচীরটি পুনঃস্থাপন করে দিলেন। পরবর্তীতে খিজির মুসা ﷺ-কে প্রাচীর পুনঃস্থাপনের রহস্য জানিয়ে বলেন−

> ঐ প্রাচীরটি ছিলো নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের। প্রাচীরের নিম্নদেশে তাদের গুপ্তধন ছিলো। তাদের পিতা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে তারা বয়োপ্রাপ্ত হোক এবং তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক।' [সূরা কাহাফ: ৮২]

পিতৃহীন দুই কিশোরের গুপ্তধন আল্লাহই সংরক্ষণ করেছেন। পিতার সৎকর্মের প্রতিদানে আল্লাহ ﷻ এতিম সন্তানের অভিভাবকত্ব নির্বাহ করেছেন। আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ। তিনিই দয়ালুদের সেরা দয়ালু।

ওমর ইবনে আব্দুল আযিযের চৌদ্দ সন্তান

ওমর ইবনে আব্দুল আযিয ﵀। কে না চিনে তাঁকে! তিনি ছিলেন উমাইয়া খেলাফতের একজন খলীফা। সাত ছেলে এবং সাত মেয়ের জনক ছিলেন তিনি। কিন্তু জীবনের উপার্জিত সব ধনসম্পদ তিনি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছিলেন। সন্তানদের জন্য কিছু রেখে যেতে পারলেননা। মৃত্যুর সময় রিক্তহস্তে কেঁদে ফেললেন। কেঁদে কেঁদে সন্তানদের বললেন, "আমি

তোমাদের জন্য কিছু রেখে যেতে পারিনি। তোমাদের জন্য এক আল্লাহকে রেখে গেলাম।

﴿إِنَّ وَلِيِّىَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ﴾

আমার অভিভাবক তো আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন। [সূরা আরাফ: ১৯৬]

তোমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করো, তাহলে আল্লাহই তোমাদের হেফাযত করবেন। আর যদি অবাধ্য হয়ে পড়ো, তাহলে আল্লাহর অবাধ্যতায় আমি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারলামনা।"

এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সন্তানদের কোন পিছুটান ছিলোনা। বরং তাঁর সন্তানরা প্রাচুর্যময় জীবনযাপন করেছিলো। তৎকালীন লেখকদের বইপুস্তকে পাওয়া যায়, খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আযিযের সন্তানগণ তৎকালে উল্লেখযোগ্য ঐশ্বর্যশীল ছিলেন।

(৫) প্রিয় বান্দাদের শারীরিক নিরাপত্তা

আল্লাহ ﷻ তাঁর প্রিয় বান্দাদের শারীরিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন। প্রিয় বান্দাগণ বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলেও আল্লাহ ﷻ তাঁদের শরীর শক্তিতে সৌষ্ঠব রাখেন। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষময় শক্তির প্রতিফলন ঘটান শরীরের অঙ্গো-প্রত্যঙ্গো।

আসমা رضي الله عنها। তিনি ছিলেন আবু বকর رضي الله عنه এর কন্যা। তাঁর স্বামী ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের رضي الله عنه। তিনি মক্কাতেই প্রাথমিককালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আপন দেহ-মন আল্লাহর রাহে সমর্পণ করেছিলেন। আল্লাহও তাঁর দেহ-মনে স্থায়ী সুরক্ষা দান করেছিলেন। ওরওয়া ইবনে যোবায়ের رضي الله عنه বর্ণনা করেন, 'আসমা رضي الله عنها এর একশত বছর বয়সেও একটি দাঁত পড়েনি। তখনও তাঁর জ্ঞানবুদ্ধির এতটুকু লোপ পায়নি।'

ইমাম তাবারি رحمه الله

ইসলামের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাবারি رحمه الله। তাঁর বয়সের সত্তরতম বর্ষের ঘটনা। একদিন তিনি নৌকাযোগে নদী পাড় হচ্ছিলেন। নৌকাতে আরো কয়েকটি

যুবক ছিলো। তাদের নৌকা যখন কূলে এসে একটু তটে ভিরলো, তাবারি নৌকা থেকে লাফিয়ে নামলেন। তাঁর দেখাদেখি যুবকরাও লাফিয়ে নামার ব্যর্থ কসরত করলো। যুবকরা আশ্চর্য হয়ে তাবারিকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি বৃদ্ধ মানুষ লাফিয়ে নামলেন, অথচ আমরা যুবক হয়েও লাফিয়ে নামতে পারিনি!'

তাবারি ﵀ স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, 'যুবাবয়সে এ শরীরকে গোনাহ থেকে হেফাযত রেখেছিলাম, তাই আল্লাহ বৃদ্ধবয়সেও বার্ধক্যের ভার থেকে হেফাযত রেখেছেন।'

যে চোখ আল্লাহর বিধান দর্শন করে, আল্লাহ সে চোখের দৃষ্টিশক্তি বার্ধক্যেও আলোকিত রাখেন। যে কান আল্লাহর বিধান শ্রবণ করে, আল্লাহ সে কানের শ্রবণশক্তি বার্ধক্যেও সচকিত রাখেন। যে হাত-পা আল্লাহর বিধান মান্য করে, আল্লাহ সে হাত-পায়ের শক্তি বার্ধক্যেও পেশিবহুল করে রাখেন।

(৬) হিংস্র পশুর অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা

যারা আল্লাহ ﷻ-র আদেশ-নিষেধ রক্ষা করেন, জীবন চলার পথে আল্লাহর নির্ধারিত বিধিবিধান রক্ষা করেন, আল্লাহ হিংস্র প্রাণীকেও তাঁর বশীভূত করে দেন। হিংশ্র প্রাণীর অনিষ্ট থেকেও তাঁকে হেফাযত করেন। হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দান করেন।

ওকবা ইবনে নাফে ফাহরি ﵀

ওকবা ইবনে নাফে ফাহরি ﵀। মোয়াবিয়া ﵁ তাঁকে আফ্রিকা অভিযানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি আফ্রিকা জয় করে সেখানে বড় একটি শহর আবাদ করার উন্নয়নপরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। কিন্তু পরিকল্পিত স্থানটি ছিলো ভয়াল বাগান, গভীর বনবাঁদার। বিস্তৃত জায়গাজুড়ে ঘণ গাছগাছাড়ি, মাথায়-মাথায় পাতায়-পাতায় মিশামিশি হয়ে অনন্ত সমুদ্রের মত বয়ে চলেছে। কত শত প্রকারের পশু পাখি সাপ বিচ্ছুর অভরায়ণ্য, তা কল্পনাতীত। শহর আবাদ করে মানুষের বাসোপযোগী করা তো দূরের কথা, সেখানে কোন মানুষের প্রবেশই অসাধ্য।

ওকবা ইবনে নাফে ফাহরি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। কায়মনোবাক্যে কাঁদলেন। আল্লাহর উপর ভরসা করে বাগানের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন।

মুহূর্তেই বনের পশু-পাখি আপন বাসা থেকে, সাপ-বিচ্ছু আপন গর্ত থেকে দলেদলে বেড়িয়ে চলে গেলো। ওকবা ইবনে নাফে সে জায়গা শহর বানিয়ে আবাদ করে নিলেন। কবি ইকবাল বলেন–

শহরগুলো বিজিত হয়নি তখনো; আযানে আযানে উচ্চকিত ইয়োরোপের সব উপাসনালয়, আফ্রিকা কখনো ভুলবেনা অগ্নিদ্গোরিত ভূমিতে বিশ্বাসীর সেজদার কথা।

মাথা পেতে দিলাম, ভয় নেই কোন অত্যাচারীর, ভয় নেই কোন তলোয়ারের, কোন জালিম বাদশাহর।

ওকবা ইবনে নাফে ফাহরি ﵀-ও কোনো হিংস্র পশুকে ভয় পাননি। তিনি তার পার্থিবজীবনে আল্লাহকে ভুলেননি। আল্লাহও তার বিপদাপদে তাকে ভুলেননি। আল্লাহই সর্বোত্তম হেফাযতকারী। তিনিই সর্বোত্তম দয়ালু।

সিলা বিন উসাইম ﵀

সিলা বিন উসাইম ﵀। খোরাসানের এক জানবায সৈনিক। একবার তিনি কুতাইবা বিন মুসলিমের নেতৃত্বে যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন। ধনবান বিলাসী বিনোদীরা যুদ্ধক্ষেত্রে সচরাচর রাতভর শোরগোলে হৈ-হুল্লোড়ে মত্ত থাকে, কিন্তু সিলা বিন উসাইম তাদের মত নন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেও প্রতিদিন এশার সালাত আদায় করে ফজর পর্যন্ত নফল সালাতে রাত কাটাতেন। আল্লাহ ﷻ-কে ডাকতেন। কান্না করতেন। গভীর এবাদতে মগ্ন থাকতেন।

'নিশুতি!

এই যে প্রেমবাসরের গোপন কথা, অভেদ আলাপ; দীর্ঘ তোমার প্রহরগুলোয় এসব কী এমন বিশেষণ?' –বলো!

'যখন ভোর হয়ে এলো, অবিরল ঝরবে কেবল রহমধারা,

তখন অঞ্জলি ভরে নিবেদন করো পবিত্র প্রেমের অশ্রুমালা!'

নিশুতি বলে– 'এই তো জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি!'

সিলা বিন উসাইমও সারারাত জেগে থাকতেন। আল্লাহ ﷻ-র অবিরল রহমধারায় অবগাহন করতেন। আল্লাহর কাছে দোয়ার দু'হাত ভরে পবিত্র প্রেমের অশ্রুমালা নিবেদন করতেন।

কুতাইবা বিন মুসলিম সিলা বিন উসাইমের এই গোপন ভেদ অবগত হলেন। অভিভূত হয়ে তাঁকে বললেন, 'এই বিশাল সৈন্যবহরে তোমার মত একজন পেয়ে আমি আল্লাহ ﷻ-র কাছে কৃতজ্ঞ।'

সিলা বিন উসাইম সালাত পড়ার সময় হাজার দিনার মূল্যমানের একটি ডোরাকাটা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিতেন। আতর মাখতেন। আল্লাহর কাছে কেদে কেদে বলতেন, 'আল্লাহ, তুমি সুন্দর। তুমি সৌন্দর্য পছন্দ কর। এজন্যই আমি এই চাদর গায়ে পরেছি।' তিনি রাতেই শুধু এই চাদর পরিধান করতেন। দিনের বেলা চাদর খুলে রাখতেন।

রাত একটু বাড়তেই বাহিনীর সকলে ঘুমিয়ে পরতো। সিলা বিন উসাইম তখন বের হয়ে এক গভীর বনে চলে যেতেন।

কত উর্বর সেই বিচরণভূমি, নাতিশীতোষ্ণ গ্রীষ্মনিবাস, কত উত্তম সেই বাগানবাড়ি, সকলেরই তা প্রত্যাশিত।

সিলা বিন উসাইম যে বনে সালাত পড়তেন, সেটি ছিলো বনের রাজা সিংহের অভয়ারণ্য। সিংহ ছিলো সেখানকার ত্রাসসঞ্চারী প্রাণী। কোথাও সিংহের কথা শুনলে সেখানে কেউ সামান্য সময় অবস্থানের সাহস করতোনা। সিলা বিন উসাইম একদিন সালাত শুরু করলেন। একটি সিংহ এসে তাঁর চারপাশে ঘুরতে লাগলো। সিলা বিন উসাইম একটুও বিচলিত হলেননা। স্থির চিত্তে সালাত শেষ করলেন। সালাত শেষ করে সিংহকে নির্দেশস্বরে বললেন, 'তুমি আমার মৃত্যুদূত হয়ে আসলে আমাকে খেয়ে যেতে পার। আল্লাহর প্রতিরক্ষা ছাড়া আমার আর কোন অস্ত্র নেই। আর মৃত্যুদূত হয়ে না আসলে চলে যাও। আমাকে সালাত পড়তে দাও।' সিলা বিন উসাইমের কথা শুনে সিংহটি কুকুরের মত লেজ নাড়িয়ে সন্তর্পণে আপন গুহায় চলে গেলো।

সিলা বিন উসাইম আল্লাহর সামনে সমর্পিত হয়েছিলেন। আল্লাহই তাকে ভয়ানক সিংহের থাবা থেকে সুরক্ষা করেছেন। সত্যই মানুষ যখন আল্লাহর অনুগত হয়, হিংস্রপ্রাণীও মানুষের বশীভূত হয়। মানুষ যখন আল্লাহর অবাধ্য হয়, ইঁদুর মূষিকের কাছেও মানুষ পরাস্ত হয়। সিলা বিন উসাইমের এ ঘটনা থেকে কবির ভাষায় ওমরের কথা মনে পড়ে।

ওমর! তুমি কি আসবে না ফিরে আমাদের মাঝে আর? জানো কি তোমার জন্য এ জাতি কতটা না বেকারার?

রোম অভিযানে তোমার আদেশে ছুটবে না সেনাদল? থাকবে না কোন সৈন্যবাহিনী 'হিত্তিনে' অবিচল?

ওমর; তোমার বন্ধুরা দেখো দাঁড়িয়ে রনাঙ্গানে, তোমার আদেশ, তোমার নিষেধ খুঁজে ফেরে মনে মনে।

তোমাকে না পেয়ে বিলাপ করছে ফিলিস্তিনের নারী, আকাশে-বাতাসে রোজ প্রতিরোজ শিশুদের আহাজারি!

শুকিয়ে কি যাবে ন্যায়ের বৃক্ষ? হবেনা তা ফলবান? নেমে এসো তুমি নেমে এসো আজি যমানার পালোয়ান।

ওমর তোমার পথপানে চেয়ে মজলুমানের চোখ, তোমার আদেশে মিথ্যে প্রাসাদ ধুলো হোক ধূলো হোক!

মালেক ইবনে দিনার রহ.

মালেক ইবনে দিনার রহ.। নামেই তাঁর পরিচয়। একবার তিনি এক বাগানে ঘুমিয়েছিলেন। ঘুম থেকে জেগে দেখেন তাঁর পাশে একটি সাপ। সাপের মুখে একটি ফুল। ফুলটির কার্যকারিতা ছিলো মশা-মাছি দূর করা। ফলে সেখানে কোন মশা-মাছি আসতে পারছেনা। মালেক ইবনে দিনারের ঘুমেও কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছেনা।

আল্লাহ কত মহান! সাপকে এই বিদ্যা কে শিখিয়েছেন! সাপটিকে এখানে কে পাঠিয়েছেন! মালেক ইবনে দিনারের খেদমতে সাপটিকে কে নিয়োজিত করেছেন! তিনি আল্লাহ। তিনিই দয়ালুদের সেরা দয়ালু। নিরাপত্তা দানে তিনিই শ্রেষ্ঠ কুশলী।

(৭) জড়পদার্থকে প্রিয় বান্দাদের অধীনকরণ

আল্লাহ জড়পদার্থকেও তাঁর প্রিয় বান্দার অধীন করে দেন। এ প্রসঙ্গে বুখারি শরিফের একটি হাদিস প্রাণিধানযোগ্য। আবু হোরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

বনি ইসরাঈলের এক লোক অপর এক লোকের কাছে এক হাজার দিনার ঋণ চাইলো। তখন ঋণদাতা বললো, 'কয়েকজন সাক্ষী আন। আমি তাদের সাক্ষী

রাখবো।’ সে বললো, ‘সাক্ষি হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।’ ঋণদাতা বললো, ‘তাহলে একজন যামিনদার উপস্থিত কর।’ ঋণগ্রহীতা বললো, ‘যামিনদার হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।’ ঋণদাতা বললো, ‘তুমি সত্যই বলেছ।’ এরপর নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাজার দিনার দিয়ে দিলো।

তারপর ঋণগ্রহীতা সামুদ্রিক সফর করলো এবং তার প্রয়োজন সমাধা করে সে যানবাহন খুঁজতে লাগলো, যাতে সে নির্ধারিত সময়ের ভেতর ঋণদাতার কাছে এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সে কোন যানবাহন পেলোনা। তখন সে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করলো এবং ছিদ্রের ভিতর ঋণদাতার নামে একখানা চিঠি ও একহাজার দিনার রেখে ছিদ্রটি বন্ধ করে সমুদ্র তীরে এসে বললো, ‘হে আল্লাহ, তুমি তো জান আমি অমুকের নিকট একহাজার দিনার ঋণ চাইলে সে আমার কাছে যামিনদার চেয়েছিলো। আমি বলেছিলাম, আল্লাহই যামিন হিসেবে যথেষ্ট। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিলো। আমি বলেছিলাম, আল্লাহই সাক্ষি হিসেবে যথেষ্ট। এতেও সে রাযি হয়ে যায়। আমি তার ঋণ যথাসময়ে পরিশোধের উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্ট করেছি, কিন্তু পাইনি। তাই আমি তোমার নিকট সোপর্দ করলাম। এই বলে সে কাঠের টুকরোটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো। কাঠের টুকরোটি সমুদ্রের পানির গভীরে প্রবেশ করলো। অতপর লোকটি ফিরে গেলো এবং নিজের শহরে যাওয়ার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগলো।

ওদিকে ঋণদাতা এই আশায় সমুদ্র তীরে গেলো, হয়ত ঋণগ্রহীতা কোন নৌযানে করে তার মাল নিয়ে এসেছে। হঠাৎ তার দৃষ্টি কাঠের টুকরোটির উপর পড়লো, যার ভিতরে চিঠি এবং এক হাজার দিনার ছিলো। সে কাঠের টুকরোটি তার পরিবারের জ্বালানির জন্য বাড়ি নিয়ে গেলো। যখন সে কাঠের খণ্ডটি ফারল, তখন সে এক হাজার দিনার ও পত্রটি পেয়ে গেলো।

কিছুদিন পর ঋণগ্রহীতা একহাজার দিনার নিয়ে এসে হাজির হলো এবং বললো, ‘আল্লাহর কসম, আমি আপনার মাল যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার জন্য সবসময় যানবাহনের খোঁজে ছিলাম। কিন্তু আমি যে নৌযানে এখন আসলাম, তার আগে আর কোন নৌযান পাইনি।’ ঋণদাতা বললো, ‘তুমি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলে?’ ঋণগ্রহীতা বললো, ‘আমি তো তোমাকে বললাম, এর আগে আর কোন নৌযান আমি পাইনি।’ ঋণদাতা বললো, ‘তুমি কাঠের

টুকরোর ভিতরে যা পাঠিয়েছিলে, তা আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন।' তখন ঋণগ্রহীতা আনন্দচিত্তে একহাজার দিনার নিয়ে ফিরে এলো। [বুখারি : ২২৯১]

আল্লাহর বিধান রক্ষা না করার পরিণাম

আল্লাহর বিধান রক্ষা না করলে আল্লাহর সাহায্য ও সুরক্ষা পাওয়া যায়না। পরিণতিতে পার্থিব জীবনে অবমাননাকর জীবনযাপন অনিবার্য হয়ে পড়ে। অভাগা হয়ে বেঁচে থাকতে হয়। পরকালের জীবনে অনিবার্য হয়ে পড়ে জাহান্নামের পোড়া আগুন। চিরস্থায়ী ছাইভস্ম অগ্নি। আল্লাহ বলেন–

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾

> যে আমার স্মরণে বিমুখ, তার জীবনের ভোগসম্ভার হবে সংকুচিত। আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো অন্ধ অবস্থায়। [সূরা ত্বহা: ১২৪]

ইতিহাসের পাতায় আল্লাহবিমুখদের পরিণতি

ফেরাউনের ঘটনা। তার রাজ্যে কী না ছিলো! ফুলফল নদনদীতে চিরযৌবনা ছিলো রাজ্য। প্রাচুর্য আর ঐশ্বর্যের কোন ঘাটতি ছিলোনা। কিন্তু সে আল্লাহকে স্বীকার করেনি। আল্লাহর বিধান রক্ষা করেনি। ফলে আল্লাহও তাকে সাহায্য সুরক্ষা দান করেননি। বরং চিরঅপদস্থ হয়ে সলীলসমাধি বরণ করতে হয়েছে তাকে। তার ঘটনার বিবরণে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> তারা রেখে গিয়েছিলো কত উদ্যান আর প্রস্রবণ, শ্যামল শস্যক্ষেত্র আর সুরম্য অট্টালিকা, কত বিলাসোপকরণ; তাতে তারা মত্ত ছিলো। এমনই ঘটেছিলো, আমি এসবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। আকাশ এবং পৃথিবী কেউ তাদের জন্য কাঁদেনি এবং তাদের অবকাশও দেয়া হয়নি।' [দোখান: ২৫-২৯]

কারুন

কারুনের ঘটনা। আল্লাহ ﷻ তাকে সম্পদ দিয়েছিলেন অঢেল। অকল্পনীয়। কিন্তু সে আল্লাহকে মানেনি। শুভাকাঙ্ক্ষীদের গুরুত্ব দেয়নি। সদুপদেশে

কর্ণপাতও করেনি। সে বরং দম্ভ করেছিল। অহমিকায় ফেঁপে উঠেছিল। বলেছিল–

﴿إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ﴾

আমি আমার জ্ঞানবলে এই সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছি। [কাসাস: ৭৮]

পরিণামে আল্লাহ ﷻ তাকে চূর্ণ করেছিলেন। তার ঘরবাড়িসহ ভূগর্ভস্থ করেছিলেন। কারুনের দুনিয়া ধ্বংস হয়েছে। আখিরাতও ধ্বংস হয়েছে। কারুনের সর্বধ্বংস হয়েছে।

বারামেকি মন্ত্রীবর্গ

আব্বাসি খেলাফতযুগের একটি ঘটনা। বাদশাহ হারুনুর রশিদের কতক মন্ত্রী ছিল। জাতি হিসেবে তারা ছিল বারামেকি। পরিবারসহ তারা একটি কলোনিতে বসবাস করত। আল্লাহ ﷻ-র রহমতে যেন সম্পদের সামিয়ানায় সুখছায়া উপভোগ করছিল তারা। আল্লাহ ﷻ তাদের দান করেছিলেন রাশি রাশি সোনা রূপা আর কাড়ি কাড়ি সম্পদ। তাদের ছিল রঙ-বেরঙয়ের বহুতল ভবন। কোন কোন ভবনের পলেস্তরায় ছিল স্বর্ণধোয়া প্রলেপ।

তারা এতকিছু পেয়েছে, কিন্তু আল্লাহকে পায়নি। ফলে তারা কিছুই পায়নি। তারা আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করেছে। তাদের বহুতল ভবনে ছিল বহুধরণের গোনাহ। ছিলো সীমালঙ্ঘন আর অবাধ্যতা। তাদের ভবনে চলতো গানবাজনা, মদ্যপান, মাস্তি, আরো কত কি! এমনকি ন্যূনতম সালাতটুকুও তারা আদায় করতোনা।

তাদের অবাধ্যতা আল্লাহ ﷻ জানতেন। আল্লাহ ﷻ অবাধ্যকে সুযোগ দেন, ছেড়ে দেননা। আল্লাহ ﷻ তাদের পাকড়াও করলেন।

আল্লাহ ﷻ তাদের প্রিয়পাত্র বাদশাহ হারুনুর রশিদের হাতেই তাদের শাস্তি রচনা করলেন। বারামেকিদের সবচেয়ে প্রিয় ও বন্ধুভাবাপন্ন বাদশাহ হারুনুর রশিদ একদিন সকালবেলা ক্রোধের সূর্যাগ্নি নিয়ে তাদের সামনে তেজিয়ে দাঁড়ালেন। দুপুর গড়ানোর আগেই তলোয়ারের সূর্যতেজ আঘাতে যুবকদের হত্যা করলেন। কারান্তরীণ করলেন বৃদ্ধদের। বুমে-বুমে বন্দী করলেন নারীদের। শিশু কিশোরদের আবদ্ধ রাখলেন কলোনীর নির্দিষ্ট সীমায়, এক মুক্ত

জেলখানায়। আল্লাহর অবাধ্যতার সে কি করুণ পরিণতি! চারদিকে কান্না, কান্না। রক্তভেজা কান্না!

বারামেক গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবনে খালেদ বারামেকি। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, কোন অপরাধে তোমাদের এ করুণ পরিণতি? সম্পদের সামিয়ানায় সুখছায়ার বদলে দুঃখের অন্ধকার নেমে আসলো কেন? কেন আজ বহুতল ভবনের পলেস্তরায় স্বর্ণধোয়া প্রলেপের পরিবর্তে রক্তলাল প্রলেপ?

ইয়াহইয়া ইবনে খালেদ কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'মজলুমের আর্তনাদ রাতের আঁধারকে গাঢ় করে তুলেছে। আমরা উদাসীন ছিলাম, কিন্তু আল্লাহ উদাসীন হননি।'

আলি ইবনে হোসাইন ﵁-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, 'আল্লাহর আরশ এবং যমিনের মাঝে দূরত্ব কতটুকু?' তিনি উত্তর করেছিলেন, 'আরশ এবং যমিনের মাঝে দূরত্ব শুধু আল্লাহর কাছে মাকবুল দোয়া।'

আলী ইবনে হোসাইন ﵁ তাঁর উত্তরে মাইল বা কিলোমিটারের দূরত্ব নির্ণয় করেননি। তিনি বলেছেন, 'আরশ এবং যমিনের মাঝে দূরত্ব শুধু আল্লাহর কাছে মাকবুল দোয়া।' মকবুল দোয়া আল্লাহ ﷻ মেঘরাশির উপর তুলে নেন। সেখান থেকে তা মুহূর্তে আল্লাহর কাছে পৌঁছে। অতপর আল্লাহ বলেন– 'আমার ইযযতের কসম! আমার সম্মানের কসম! একটু বিলম্বে হলেও আমি তোমার সাহায্য অবশ্যই করবো!'

এ মর্মে রাসুল ﷺ থেকে সহিহ সূত্রে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মুয়ায ﵁ কে রাসুল ﷺ বলেছিলেন–

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

> মজলুমের দোয়াকে ভয় কর। মাযলুমের দোয়া এবং আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নেই।

বাদশাহ হারুনুর রশিদের হাতে বারামেকিদের ভয়াবহ শাস্তি রচিত হলো। যুবকদের হত্যা করা হলো। বৃদ্ধদের সাত বছর বন্দী করে রাখা হলো। তাদের বন্দীজীবনও ছিল অত্যন্ত দুর্বিষহ। বন্দীজীবনে তাদের চুল মোচ নখ কাটার জন্য কোন কাঁচির ব্যবস্থা ছিলোনা। ফলে চুল মোচ নখ দীর্ঘ লম্বা আকার

ধারণ করেছিলো। দাঁত পরিষ্কার করার জন্য একটি মেসওয়াকের ব্যবস্থাও ছিলোনা। এমনকি তারা যেখানে থাকতো, সেখানেই প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়তে হতো। সুখময় প্রাচুর্যময় জীবনের পর এই ছিলো তাদের বন্দীশালার জীবন। রেশমি আর সোনালি জীবনের পর এই ছিলো তাদের লৌহশিকের জীবন।

তাদের অবশিষ্ট জীবন যাপিত হলো ক্ষীণ আশায়, স্বল্প স্বপ্নের আবদ্ধে, তারা অবতীর্ণ হলো অপদস্থের ভূতলে, এককাল প্রতিপত্তির পর।

সেসব পরাস্ত লোকেরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি আর কখনও।

কতই না নিকৃষ্ট তাদের সে অবস্থান!

আল্লাহ ﷻ সত্যিই সকল হেকমতের আধার। আল্লাহ সকল বিষয়ের সমাধানকারী। আল্লাহর হাতেই সকল নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, সম্মানিত করেন। আবার রাজত্ব ছিনিয়ে নেন, অপদস্থ করেন।

খলিফা কাহের

আব্বাসি খেলাফতযুগে কাহের নামীয় এক খলিফা ছিলেন। একবার তিনি ভবিষ্যতের সাম্ভাব্য সঙ্কটকালের চিন্তা করে কিছু সম্পদ গচ্ছিত রাখার মনস্থির করলেন। মাটিতে একটি গর্ত খনন করে স্বর্ণ-রূপা ভর্তি করে রাখলেন। তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করলেননা। সন্তানদের ডেকে বললেন, 'আমার আদরের ছেলেরা, তোমাদের জন্য বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-রূপার ডিবি খনন করে রেখেছি। গচ্ছিত এই স্বর্ণ-রূপা যদি সমগ্র বাগদাদবাসীর মাঝে বিতরণ করা হয়, তাহলে সকলে বড় ব্যবসায়ী হয়ে যাবে। সুতরাং তোমাদের ভবিষ্যতজীবনে দারিদ্রের ভয় করোনা'।

এভাবে কাহের যখন আল্লাহর অবাধ্য হল, সীমালঙ্ঘন করল, আল্লাহ ﷻ তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিলেন। শাসকের রাজমুকুট তার মাথা থেকে খসে পড়লো। তার দৃষ্টিশক্তি জরাগ্রস্ত হল। তার শাসনকাজ পরবর্তী খলিফার কাছে হস্তান্তর হলো। অতপর একদিন তিনি বাগদাদের মসজিদে দাঁড়িয়ে সমবেতদের

বললেন, 'লোক সকল, সম্পদ থেকে দূরে থাক। আমার সম্পদ আমাকে শেষ করেছে!'

সমবেত লোকজন বলাবলি করতে লাগলো, 'দেখো দেখো, ঐ অপদস্থকে দেখো। আল্লাহ ﷻ তাকে কেমন অপদস্থ বানিয়েছেন!'

> এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। [সূরা কফ: ৩৭]

আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাকে হেফাযত করেন

বান্দা যখন আল্লাহর বিধান রক্ষা করে, আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাকে সমূহ বিপদাপদ থেকে হেফাযত করেন। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা আল্লাহর বিধান রক্ষা কর, আল্লাহও তোমাদের রক্ষা করবেন।'

মানুষ আল্লাহর সুরক্ষা পেতে চায় কি! আল্লাহর সুরক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর বিধান রক্ষা করে কি! মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

> তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী (আওয়াব) ও স্মরণকারীকে (হাফীয) এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। [সূরা কফ: ৩২]

উল্লিখিত আয়াতে অনুরাগীর (আওয়াব) অর্থ বেশি বেশি তওবা করা, আল্লাহর কাছে লজ্জিত হওয়া, এস্তেগফার পাঠ করা। আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা। তাঁর কাছে নিজের সকল ভার অর্পণ করা।

স্মরণকারীর (হাফীয) অর্থ হলো সবসময় আল্লাহ ﷻ-র সকল বিধান স্মরণ রাখা।

আল্লাহর সুরক্ষার সারসংক্ষেপ তাকওয়ার মধ্যে নিহীত

তাকওয়া অর্থ আল্লাহকে ভয় করা। আল্লাহ ﷻ-র সকল আদেশ পালন করা। সকল নিষেধ থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহ ﷻ-র সকল সংবাদ অন্তর থেকে বিশ্বাস করা।

তাকওয়া অর্থ নিজের মাঝে এবং আল্লাহ ﷻ-র আযাবের মাঝে একটি পর্দা স্থাপন করা।

তাকওয়া অর্থ সত্ত্বাগত সকল ভয়ের বস্তুর চেয়ে আল্লাহ ﷻ-কে বেশি ভয় করবে। যে কোন প্রসঙ্গো নির্ভার থাকলেও কখনো আল্লাহ ﷻ-র সম্মুখ হলে তাঁকেই ভয় করা।

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। [সূরা ফাতির: ২৮]

আবুল হাসান আলি ইবনে আবু তালেব رضي الله عنه তাকওয়ার পরিচয় ফুটিয়ে বলেন, 'মহীয়ান আল্লাহকে ভয় করা। তাঁর অধ্যাদেশ পালন করা। সল্পতুষ্টি অর্জন করা। মৃত্যুদিবসের প্রস্তুতি গ্রহণ করা।'

তাকওয়ার নিদর্শন

১. তাকওয়ার অন্যতম নিদর্শন সালাত

তাকওয়ার অন্যতম নিদর্শন সালাত। যথাগুরুত্বের সাথে সালাত আদায়কে আল্লাহ ﷻ তাঁর বিধান রক্ষার অন্তর্ভূক্ত করেছেন। বলেছেন–

> অবশ্যই সফলকাম হয়েছে বিশ্বাসীরা ... যারা তাদের সালাতে যত্নবান।' [সূরা মুমিনূন: ৯]

যারা যথাগুরুত্বের সাথে সালাতের যত্নবান হয়, যথাসময়ে জামাতের সাথে স্থির অঙ্গে অন্তরপূর্ণ সালাত আদায় করে, আল্লাহ ﷻ তাঁদের সহায় হন। পৃথীবির নষ্ট সময়েও আল্লাহ ﷻ তাঁদের সুরক্ষা দান করেন।

> সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে। [আনকাবূত: ৪৫]

ওমর ইবনে খাত্তাব رضي الله عنه মৃত্যুশয্যায় শায়িত। দুচোখ গড়িয়ে দরদর পানি ঝরছে। কণ্ঠ অস্ফুট হয়ে আসছে। তখনও তিনি বলছেন–

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ الصَّلَاةِ! لَا حَظَّ فِي الإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

> তোমরা সালাতের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সালাত তরককারীর জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই। [মুয়াত্তা মালেক : ৮৪]

যে সালাতে গুরুত্ব দিবে, আল্লাহ ﷻ তাকে গুরুত্ব দিবেন। যে সালাতে বিমুখ হবে, আল্লাহ ﷻ তাকে ধ্বংস করবেন।

ওমর ইবনে খাত্তাব তাঁর প্রাদেশিক শাসক ও আমিরদের কাছে সালাতের গুরুত্ব দিয়ে চিঠি পাঠাতেন। চিঠিতে লিখতেন, 'তোমাদের জন্য সালাত আবশ্যক।

সালাত হল ইসলামের প্রথম ভিত্তি। ধর্মজীবনে তোমরা সর্বশেষ সালাত ছেড়ে দিবে।’

সালাতের গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ ﷻ মহান ইরশাদ করেছেন–

> তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের। [বাকারা: ২৩৮]

সালাতে যত্নবান হওয়ার তিন পদ্ধতি

১. সময়মত সালাত আদায় করা। কারণ, অপ্রয়োজনে সালাতের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আল্লাহ ﷻ সেই সালাত কবুল করেননা। আল্লাহ ﷻ সেই সালাত মুসল্লির মুখে জড়িয়ে নিক্ষেপ করেন। তখন সালাত মুসল্লিকে ভর্ৎসনা করে। আল্লাহর কাছে বদদোয়া করে বলে, ‘তুমি আমাকে উপেক্ষিত করেছো, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন।’

   কেয়ামতের দিনে মানুষের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে। অসাড় হয়ে যাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি। তখন সর্বপ্রথম মানুষের সালাতের হিসাব নেয়া হবে। সালাতের হিসাবে যে উত্তীর্ণ হবে, ভয়াবহ সে সন্ধিক্ষণে আল্লাহ তাকে হেফাযত করবেন।

   আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘সর্বোত্তম আমল কোনটি?’ রাসুল ﷺ উত্তর করলেন, ‘সর্বোত্তম আমল হল সময়মত সালাত আদায় করা।’ [বুখারি : ৫৯৭০]

২. সর্বদা জামাতের সাথে সালাত আদায় করা। মসজিদে মিনারে যখন আযান ধ্বনিত হয়, মুয়াযযিন যখন চিরহীতাকাঙ্ক্ষী হয়ে ডাক দিয়ে যায় মধুর আহ্বানে– ‘সালাতের দিকে আস...’ ‘সফলতার দিকে আস...’ তখন আর বিলম্ব না করা। অলসতা ঝেড়ে মসজিদে চলে আসা। মনে মনে বিশ্বাসের সাথে স্মরণ রাখা, আমি মসজিদে জামাতের সাথে সালাত আদায় করবো, আলিমুল গাইব আল্লাহ আমার সহায় হবেন।

৩. খুশূ-খুযূর সাথে সালাত আদায় করা। ইবনুল কায়্যিম رحمه الله সালাতে খুশূ-খুযূর বর্ণনা দিয়ে বলেন, ‘ইমাম মনের মাধুরি মিশিয়ে সালাতে কোরআন তেলাওয়াত করবেন, মুসল্লি হৃদয়ের সোহাগ মিশিয়ে তেলাওয়াত শুনবে।

মুসল্লির হৃদয়পটে সে উদার তেলাওয়াত পরম প্রেমাক্ষরে উৎকীর্ণ হবে। পার্থিব জীবনের পাথেয় হিসেবে কোরআনের শিক্ষাবিলাস ঘটনাগুলো মর্মে অনুধাবন করবে। মনেপ্রাণে অনুভব করবে, যেমন সালাতের সারিতে শান্ত মনে দাঁড়িয়ে আছি, তেমনই আখেরাতে বিস্তৃত আঙ্গিনায় প্রশান্ত চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকবো আল্লাহর সামনে!'

২. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুরক্ষা

আল্লাহ ﷻ তাঁর প্রিয় বান্দাদের গোনাহ থেকে হেফাযত করেন। প্রিয় বান্দাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহর আনুগত্যে অবনত রাখেন। গোনাহের উৎপত্তিস্থল অন্তর এবং যবানকে সর্বোত হেফাযত রাখেন।

অন্তর গোনাহমুক্ত রাখার স্বরূপ

অন্তর মানুষের সকল গোনাহের উৎপত্তিস্থল। মানুষের অন্তর যখন গোনাহের প্রণোদনা থেকে মুক্ত থাকে, তখনই সকল গোনাহের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র থাকা সম্ভব হয়।

আল্লাহ ﷻ তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর গোনাহমুক্ত রাখেন। কুপ্রবৃত্তি থেকে, কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসা থেকে, সর্বোপরি শাহওয়াত থেকে সুরক্ষিত রাখেন। শরিয়তের কোন বিধানে সংশয়, অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতা থেকে, সর্বোপরি শুবুহাত থেকে মুক্ত রাখেন।

প্রতিটি মানুষের শরীরে একটি মাংসখণ্ড রয়েছে। এ মাংসখণ্ডটি যতক্ষণ সুরক্ষিত থাকে, মানুষ ততক্ষণ গোনাহমুক্ত থাকে। এ মাংসখণ্ডটি যখন বিনষ্ট ও বিপদগ্রস্ত হয়, মানুষও তখন বিপথে চলতে থাকে। গোনাহের পথে ধ্বংস হতে থাকে। সে মাংসখণ্ডটি হল মানুষের অন্তর। রাসুলের ভাষায় বিষয়টি এমন–

> জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল অন্তর। [বুখারি : ৫২]

অর্থাৎ, মানুষ যখন আল্লাহর আনুগত্যে, আল্লাহর সদাস্মরণে অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখবে, মানুষের হাত, পা, চোখ, কান, পেট, যৌনাঙ্গ সবকিছু তখন গোনাহমুক্ত থাকবে।

কেয়ামতের দিন হিসাবের বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য মানুষের পরিবার-পরিজন, ধন-দৌলত সবকিছুই অনর্থ অকার্যকার বিবেচিত হবে। হিসাবের বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য কার্যকর হবে একমাত্র পরিশুদ্ধ অন্তর।

> যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা। সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে। [সূরা শুয়ারা: ৮৮, ৮৯]

বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ, অর্থাৎ যে অন্তরে কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, শরিয়তের কোন বিধানে সংশয়, অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা, সর্বোপরি শাহওয়াত ও শুবুহাতের অনুপ্রবেশ নেই।

পরিশুদ্ধ অন্তর, অর্থাৎ যে অন্তরের ধ্যানে-মগ্নে, সদাস্মরণে আল্লাহই শুধু চিরজাগ্রত। যে অন্তরের শ্বাসে-প্রশ্বাসে, আবেগ-উচ্ছ্বাসে শুধু এক অনুরণন– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ...

মানুষের অন্তর যখন শাহওয়াত ও শুবুহাতের গুপ্তরোগ থেকে আরোগ্য পাবে, শিরক নেফাক ও রিয়া থেকে পবিত্র থাকবে, সে অন্তর আল্লাহর একত্বে ও বড়ত্বে পরিপূর্ণ থাকবে। এখলাস ও সততায় নিষ্ঠ হয়ে ওঠবে। মানুষের অহংকার ও দম্ভ যখন চূর্ণ হবে, মনের সকল দ্বেষ-বিদ্বেষ, হিংসা-বিরাগ দূর হবে। মানুষ তখন মহান আল্লাহর প্রেমতাড়িত ভয়ে সদাপ্রকম্পিত থাকবে। আল্লাহর ভরসায়, তাঁর দয়ার আশায় দুনিয়া সকল কিছু থেকে বিমুখ থাকবে। এমন মানুষের অন্তর হবে ইবরাহিম عليه السلام-র অন্তরের মত।

> আর ইবরাহিম তাঁর অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ কর, সে তাঁর প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধচিত্তে। [সূরা সাফফাত: ৮৩, ৮৪]

> যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাঁর অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। [তাগাবুন: ১১]

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে সেজদা করে, আল্লাহ তাঁকে সুপথে পরিচালিত করেন। যে মসজিদে গমন করে, আল্লাহর দরবারে মোনাজাতের বিনীত হাত উত্তোলন করে, আল্লাহ ﷻ তাঁর অন্তরকে জ্যোতির্ময় ভুবনে বিচরণ করান। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন। [সূরা আনকাবূত: ৬৯]

যে দীনের কোন আলোচনায় বসে, দীনের কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে, ভালো কাজে অগ্রসর হয়, আল্লাহ ﷻ তাঁর সাথে অনর্থ ও অশ্লীল আড্ডাবাজ, গান ও নেশার আসরে অংশগ্রহণকারী, মাস্তি ও ফুর্তিবাজ, প্রমোদবাজদের সাথে পার্থক্য রেখেছেন। ইরশাদ করেছেন–

> আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করবো! তোমাদের কী হয়েছে? এ তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ! [সূরা কলম: ৩৫, ৩৬]

যে হেদায়াতের বাণী শুনে বিমুখ হয়, দীনের আলোচনা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, ভ্রুকুঞ্চন করে, সে মহাবিপর্যয়ের উন্মুক্ত দ্বারে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

> তারা যেমন প্রথমবার এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তেমন আমিও তাদের অন্তরে দৃষ্টিতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবো। তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিবো।' [সূরা আনয়াম: ১১০]

সকল মুমিনের জন্য অপিহার্য কর্তব্য হলো তাঁর অন্তর সর্বান্তকরণে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা। তাহলেই আল্লাহ তাঁকে সঠিক পথের পথিক বানাবেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার রয়েছে অন্তঃকরণ, অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে। [সূরা ক্বফ, ৩৭]

আল্লাহ সকলকেই অন্তর দিয়েছেন, কিন্তু অন্তরালোকসম্পন্ন সফল অন্তর ক'জনের আছে! কোরআনের ভাষায়–

মানুষের চর্মচোখ অন্ধ হয়না, বরং অন্ধ হয় তাদের বক্ষস্থ অন্তরালোক। [সূরা হজ্জ: ৪৬]

যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন। [সূরা রাদ: ১৯]

এজন্যই যেসব লোক তাদের অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা দ্বারা উপকৃত হয়নি, আল্লাহ তাদের ভর্ৎসনা করেছেন। তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে তাদের পরিচয় দিয়েছেন। বলেছেন–

আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে, কন্তিু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করেনা। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দ্বারা দেখেনা। তাদের কান আছে, তা দ্বারা শোনেনা। তারা পশুর ন্যায়, না, পশু অপেক্ষাও অধিক মুঢ়। তারাই উদাসীন। [সূরা আরাফ: ১৭৯]

অন্তরের গুপ্তরোগ অনেক ধরণের। মানুষ অজান্তে অসচেতনতায় এসব গুপ্তরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই অন্তরের ব্যাপারে সজাগ থাকা, অন্তরকে যথানির্দেশ করা, গুপ্তরোগের সমূহ আশঙ্কা থেকে বাঁচিয়ে সতর্ক রাখা সকল মুসলমানের আবশ্যক দায়িত্ব।

আল্লাহর কাছে মানুষের ভাল কাজের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাপক মানুষের অন্তর। যাঁর অন্তরে আল্লাহর ভালবাসা ও বড়ত্ব ভরপুর, তাঁর ভাল কাজের গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহর কাছে অত্যুচ্চ। এই অন্তরের অবস্থাভেদের কারণেই একই ভাল কাজের দুই সম্পাদনকারীর প্রতিদান ও মর্যাদার মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দাঁড়িয়ে যায়। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন–

জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল অন্তর। [বুখারি : ৫২]

যবান গোনাহমুক্ত রাখার স্বরূপ

যবান বা জিহ্বা মানবদেহের অতি ও রহস্যময় একটি অঙ্গ। অসংখ্য মন্দকাজ, ছোটবড় গোনাহ সম্পাদিত হয় মানুষের জিহ্বা দ্বারা। জিহ্বা দ্বারা পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। পরিবারের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। মানুষের যশ-খ্যাতি কলুষিত হয়।

আল্লাহ ﷻ হেফাযত করুন! গোনাহের ক্ষেত্রে কত প্রভাববিস্তারী মানুষের জিহ্বা! তবে আল্লাহ যাঁকে ভালবাসেন, পছন্দ করেন, তাঁকে জিহ্বার গোনাহ থেকেও মুক্ত রাখেন।

মুয়ায ইবনে জাবাল رضي الله عنه এর প্রসিদ্ধ হাদিস, যে হাদিসে রাসুল ﷺ জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির আমল, সকল কল্যাণের রাজতোরণ, দীনের প্রকৃত বিষয়, মূলস্তম্ভ ও উচ্চশিখরের বর্ণনা দিয়েছেন। অতপর রাসুল ﷺ মুয়ায رضي الله عنه-কে জিজ্ঞেস করেছেন, 'হে মুয়ায, এসব কাজের মূলভিত্তি বলবো'? মুয়ায রাযি. বললেন, 'হ্যাঁ বলে দিন'। তখন রাসুল ﷺ নিজের জিহ্বা ধরে দেখালেন এবং বললেন, 'তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখবে'। মুয়ায رضي الله عنه বললেন, 'হে আল্লাহর নবি, আমরা এ জিহ্বা দ্বারা যেসব কথাবার্তা বলি, কেয়ামতের দিন সেসব কথাবার্তার ব্যাপারেও জিজ্ঞাসিত হবো'? রাসুল ﷺ বললেন, 'কী সর্বনাশা কথা বললে মুয়ায! একমাত্র মানুষের মুখের অসংযত কথাবার্তাই কেয়ামতের দিন তাকে মুখের উপর কিংবা নাকের উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে'। [আহমাদ : ২১৫৬৩]

আল্লাহ ﷻ কোরআন কারিমে তাঁর সৎকর্মপরায়ণ বন্ধুদের প্রশংসাগাঁথা গেয়েছেন। তাঁদের সফলতার নিদর্শন বর্ণনা করেছেন–

> যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে। [সূরা মুমিনূন: ০৩]

অসার ক্রিয়াকলাপ, অর্থাৎ যেসব কথাবার্তা বা কাজকর্ম পরকালের জন্য উপকারী নয়। বরং তা পরকালে ক্ষতিকর হবে।

আল্লাহ ﷻ তাঁর সৎকর্মপরায়ণ বন্ধুদের সফলতার নিদর্শন বর্ণনামূলক প্রশংসামালা অবতীর্ণ করে আরো বলেছেন–

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করবেন। তোমদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সূরা আহযাব: ৭০, ৭১]

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

যে আমাকে জিহ্বা ও লজ্জাস্থান পবিত্র রাখার নিশ্চয়তা দিবে, আমি তাঁর জান্নাতপ্রাপ্তির দায়িত্ব গ্রহণ করবো। [বুখারি : ৬৪৭৪]

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, মানুষ তার সকল অঙ্গের গোনাহের ব্যাপারে যতটা সচেতন থাকে, জিহ্বার স্খলন ও বিপদগামীতার ব্যাপারে ততটা সতর্ক থাকেনা। অথচ সকল অঙ্গের গোনাহের একটা স্বাধ ইন্দ্রানুভূত হয়, কিন্তু জিহ্বার গোনাহের কোন স্বাধ ইন্দ্রানুভূত হয়না। জিহ্বা গোনাহের পথে অনবরত চলতেই থাকে, ফেরেশতাগণও জিহ্বার সকল গোনাহ অনবরত লিখতে থাকেন। কেয়ামতের দিন মানুষ যখন আমলনামায় জিহ্বার স্খলন এবং নিষিদ্ধ কথাবার্তার কাসুন্দি দেখবে, তখন তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়বে। ভয়ানক আশ্চর্য হবে। লজ্জায় সঙ্কোচনে অযথাই অনুতপ্ত হবে। সেদিনের অনুতপ্ততা কোন কাজে আসবেনা।

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য তৎপর প্রহরী তার কাছেই রয়েছে। [সূরা ক্বফ: ১৮]

মানুষ কত কথা বলে থাকে, কিন্তু পরিণতির কথা কল্পনায় থাকেনা। কত নিষিদ্ধ কথাবার্তা গোপনে বলে থাকে, অথচ সেসব কথায় মুখ নিঃসৃত দুর্গন্ধময় বায়ু দোযখের অগ্নিকে সত্তরস্তরে তেজ দিচ্ছে। আবার কত ভাল কথাবার্তা মানুষ করে থাকে, যেসব কথাবার্তার প্রতিদানে আল্লাহর অভাবনীয় সন্তুষ্টি ও প্রতিদান প্রস্তুত হচ্ছে।

মানুষ একবার যদি হিসাব কষতো, তার জিহ্বা দ্বারা কত পরনিন্দা, কুৎসা, চুগলি, বিশ্বাসঘাতকতা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, মিথ্যা, প্রতারণা নিজের অজান্তে অনবরত করে চলছে! এজন্যই আবু বকর রাযি. প্রায়ই কান্না করতেন। জিহ্বার

উপর আফসোস করে বলতেন, 'না জানি এই জিহ্বা আমাকে মন্দ ঠিকানায় পৌঁছে দেয়!'

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه বলেন, 'সুদীর্ঘ সময় নিস্ক্রিয় রাখার সর্বাধিক উপযুক্ত অঙ্গ হল মানুষের জিহ্বা।'

কবির ভাষায়–

মানুষের জিহ্বা অজগরসম, মানুষ তার দংশন থেকে অবশ্যই সতর্ক থাকুক।

কবরদেশে অসংখ্য মানুষ জিহ্বার কারণে ভূপাতিত হবে, যে ভূপতন কল্পনা করে ভয়ার্ত হয় বীরপুরুষও।

কবি হাসসান বিন সাবেত رضي الله عنه

জিহ্বাকে গোনাহমুক্ত রাখার একটি ধাপ হল দীনের কথাবার্তা বলা। যেমন হাসসান বিন সাবেত رضي الله عنه। তিনি তাঁর কবিতায় ছন্দে দীনের কথামালা আবৃত্তি করে স্বীয় জিহ্বাকে গোনাহমুক্ত রেখেছিলেন। অসাধারণ পঙক্তিমালায় মুক্তোর মালা বেঁধে আল্লাহর বিধান রক্ষা করেছিলেন। রাসুলের প্রশংসাগাঁথা, ইসলামের প্রশংসাগাঁথা প্রচার করেছিলেন কবিতার মাধ্যমে। সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন কোরাইশ মুশরিকদের দুর্মুখ গালমন্দের।

কবিতা–

> সাখিনা কোরাইশ ভাবছে প্রভুকে পরাস্ত করব! পারলে অবশ্যই মহাবীরের মত পরাস্ত করুক।

রাসুল ﷺ হাসসান বিন সাবেত رضي الله عنه-কে ভালবাসতেন। কাছে ডাকতেন। মিম্বরে বসিয়ে বলতেন, 'কোরাইশরা গালমন্দ করছে। তাদের প্রতিউত্তর কর। জিবরাইল তোমার সাথে আছেন।' [বুখারি : ৬১৫৩]

তখন হাসসান তাদের উত্তর করতেন–

কবিতা–

> আমার বাবা, দাদা, আমার মান-মর্যাদা তোমাদের হাত থেকে মুহাম্মদের মর্যাদা রক্ষার জন্য ঢালস্বরূপ।

তোমরা মুহাম্মদকে গালমন্দ করছ, আমি সে গালমন্দের প্রতিউত্তর করছি। এতে আল্লাহর কাছে আমার জন্য প্রতিদান রয়েছে।

তোমরা তাঁকে গালমন্দ করছ, অথচ তোমরা তাঁর সমতুল্য নও। তোমাদের সকল কল্যাণ অকল্যাণে পরিণত হোক।

হাসসান ﵁ এর বদর যুদ্ধের কবিতা পাঠ করে আরবগণ আজও গর্ববোধ করে। হাসসান বদরের কবিতা গেঁথেছিলেন–

বদর প্রান্তে কাফেরদের চেহারা কলঙ্কিত হচ্ছে; মুহাম্মদ ও জিবরাইল তখন আমাদের পতাকাতলে।

অর্থাৎ আমাদের নেতৃত্বে রয়েছেন মুহাম্মদ ও জিবরাইল। সুতরাং তোমরা কিভাবে আমাদের পরাজিত করার স্বপ্ন দেখ!

হাসসান বিন সাবেত ﵁ কেয়ামতের দিন জান্নাতবাসী কবিগণের সর্দার হবেন। কারণ তিনি তাঁর কবিতার গাঁথুনিতে আল্লাহ ﷻ-র দীনের হেফাযত করেছিলেন।

বীরমুজাহিদ কবি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ﵁

রাসুলের একনিষ্ঠ সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ﵁। তিনিও ছিলেন একজন শক্তিমান কবি। কাব্যের সুষমায় সাজিয়ে তুলতেন দীনের বাণী।

মুতার যুদ্ধের ঘটনা। সবেমাত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে রাসুল বাহিনীর তৃতীয় সেনাপতি নির্ধারণ করে দিলেন। বিদায় নেয়ার জন্য তিনি যখন রাসুলের সাথে দেখা করতে এলেন, এসে কবিতা আবৃত্তি করলেন, কবিতা–

আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন পূর্ববর্তী নবিদের ন্যায়। আল্লাহ আপনার সৌন্দর্য স্থায়ী রাখুন মুসার স্থায়ীত্বের ন্যায়।

তিনি যখন স্ত্রী সন্তান সহচরদের রেখে মুতার যুদ্ধে রওয়ানা হন, তখন তাঁর বন্ধুগণ তাঁকে শুভকামনা জানালেন। বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে কৃতকার্য করে ফিরিয়ে আনুন।' তিনি বললেন, 'না, না...'

তিনি রাসুলের দিকে তাকিয়ে কবিতাপাঠ শুরু করলেন–

কবিতা–

আল্লাহ তোমার মাগফিরাতের যাঞ্চা করি, চাইনা আমি আসবো ফিরে যুদ্ধ শেষে।

চাই গো আল্লাহ কাফেরদের হামলা করি, আঘাত খেয়ে ছুটবে তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে।

আল্লাহ তোমার দীনের পথে গাজী হবো, শহিদ হবো; ছিড়বে আমার কলজে-নাড়ি।

কবরপাড়ের পথিক থেকে সালাম লবো, জান্নাতী লাশ বলবে তারা ঈর্ষা করি।

মুতার মুজাহিদগণ মদিনা থেকে বের হচ্ছেন, সমবেত সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে দোয়া করলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, আল্লাহ তোমাকে সুস্থ রাখুন। নিরাপদে রাখুন।' তিনি কী এক অপ্রাপ্তি থেকে বলে উঠলেন, 'না, না...'

একটুপর রাসুল ﷺ এলেন। চোখের জলে সিক্ত বিদায় জানালেন আব্দুল্লাহকে। এবার আব্দুল্লাহ প্রশান্ত চিত্তে মদিনা ছেড়ে অশ্ব চালালেন। আব্দুল্লাহ মদিনা ছাড়ছেন আর ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন মদিনার দিকে, মদিনার রাসুলের দিকে। বিগলিত কণ্ঠে আবৃত্তি করছেন–

খেজুর বীথিকায় বিদায় ক্ষণিকায় সম্ভোষিত প্রিয়, তব উষ্ম আহ্লাদে বিগলিত শত সালাম...

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা رضي الله عنه মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দ্বিতীয় সেনাপতি জাফর রাযি. শাহাদাত বরণ করলেন। পর রাসুলের নির্দেশনা অনুযায়ী তৃতীয় সেনাপতি হিসেবে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা যুদ্ধের পতাকা হাতে তুলে নিলেন। নবরূপে বীরভূমে অবতীর্ণ হলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। অসম সাহসিকতায় পরিহিত বর্ম খুলে ফেলেন। তলোয়ার হাতে তুলে তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন–

নফস আমার করছি শপথ; অশ্ব ছেড়ে ক্ষেত্রে নেমে অস্ত্র ধরো রণপথে, সকল মানুষ সিটকে পড়ুক, বিলাপ ধরুক কান্নাতে, ইচ্ছে তোমার হোক বা না হোক, সরবো নাকো পণ হতে।

বলছ কী সব আহাম্মকি মন চলেনা জান্নাতে! দীর্ঘ জীবন করলে যাপন এই দুনিয়ায় শান্তিতে, স্খলিত বীর্য তুমি লাজ লাগেনা কুণ্ঠিতে!

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা رضي الله عنه মুতার যুদ্ধেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন। শাহাদাতের পর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে তাঁরই কবিতার এই ছত্র পাঠ করতেন– 'কবরপাড়ের পথিক থেকে সালাম লবো, /জান্নাতী লাশ বলবে তারা ঈর্ষা করি।' [আহমাদ : ৭০৮৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা رضي الله عنه রাসুলের প্রশংসাগাঁথায় অনেক কবিতা গেঁথেছিলেন। তাঁর সেরা একটি কবিতা হলো–

নবুওয়তের প্রমাণ যদি না থাকত প্রকাশমান, স্বমহিমায় প্রমাণ হতো তিনি আল্লাহর বার্তাবাহক।

ইবনুল কায়্যিম رحمه الله বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা رضي الله عنه লাইলাতুল আকাবায় রাসুলের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। নিজেকে বিক্রয় করেছিলেন দীনের জন্য। সাধারণ ক্রয়বিক্রয়ে যেমন ক্রেতা-বিক্রেতা যখন চুক্তি সম্পন্ন করে পৃথক হয়ে যায় এবং এর দ্বারা তাদের ক্রয়বিক্রয় অনিবার্য হয়ে পড়ে, রাসুলের হাতে আব্দুল্লাহর বাইয়াতও তেমনই অনিবার্য হয়ে গিয়েছিল। এই বাইয়াত, এই বিক্রয়চুক্তি আমৃত্যু ভঙ্গ হয়নি।

এভাবেই তাঁদের যবানে দীনের কথা ছড়াতো। মানুষের অন্তরে জান্নাতের আলোড়ন সাড়া ফেলতো। তাঁদের কবিতায় জিহাদের চেতনা ও স্পৃহা জাগতো। তাঁদের যবানে দুর্মুখদের সমুচিত জবাব উচ্চকিত হতো।

তাঁদের বিপরীতে কত কবি আছে, যাদের কবিতায় প্রচার পেয়েছে অধর্ম। প্রসার পেয়েছে গোনাহ, অশ্লীলতা। যেমন ইমরুল কায়েস, জাহান্নামের ঝাণ্ডাবাহী এক কবি। সে তার যৌবন ধ্বংস করেছে পাপের পথে। জীবন ধ্বংস করেছে মদ্যপান আর নারীভোগে। ধিকৃত হয়েছে পৃথিবীতে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আখিরাতে।

কবি ইবনে হানি আন্দালুসি

ইবনে হানি আন্দালুসি। সীমালঙ্ঘনকারী পাপিষ্ঠ এক কবি। একবার সে খলিফার দরবারে গমন করলো। মনতুষ্টির জন্য খলিফার স্তুতি গেয়ে কবিতা পাঠ করলো–

আমি আস্থা রাখি অদৃষ্টে, পরাক্রান্ত পরাক্রমশালী, যা করার তাই করুন হে!

আল্লাহ ﷻ-র সাথে ধৃষ্টতা! আল্লাহ বিনে আর কাউকে পরাক্রমশালী ঘোষণা করা! আল্লাহ ﷻ তাকে পাকড়াও করলেন। মরণ পর্যন্ত বুঝিয়ে দিলেন, কে একচ্ছত্র পরাক্রমশালী! কে পরাক্রান্ত মহাপ্রতাপশালী! ইবনে হানি আন্দালুসি খলিফার ভবন থেকে বের হতেই অজ্ঞাত এক রোগে আক্রান্ত হলো। বিছানায় কাৎরাতে লাগলো কুকুরের ন্যায়। আক্ষেপের ক্রন্দনে বলতে লাগলো, আল্লাহ, তুমিই পরাক্রান্ত। তুমিই পরাক্রমশালী। তখন সে নতুন করে কবিতা গাঁথলো–

ঐ চোখ আশ্রিত তোমার কাছে, যে চোখের কৃপাডোর চেয়েছি আমি; তুচ্ছ পরিণামে করেছো আমায় প্রভুর রহম বঞ্চিত।

লাঞ্চিত আমি, আমি লাঞ্চিত, জীবনের লাগি অপ্রভুরে মানি পরাক্রমশালী পরাক্রান্ত।

কবি কুরাবি

কুরাবি। লেবাননের বিকৃত পাপাচারী নামধেয় এক কবি। একবার সে দামেস্ক ভ্রমণ করেছিলো। দামেস্কবাসী তাকে সম্মানের শিখরে চড়িয়ে সাদরে গ্রহণ করলো। চারদিকে বেজে উঠলো তুমুল করতালি। কুরাবি তখন আনন্দে ডগমগ হয়ে কবিতা পাঠ করলো–

ঐক্যআরব গড়বো সবাই নবধর্মের আশ্রয়ে, চলো সমর্থনে, পরিভ্রমণে, বারহাম ধর্মের ঐকতানে, সাবাস বারহাম! সাবাস বারহাম! লঙ্ঘিলে চলো জাহান্নামে।

আজি ঐক্যআরব গড়বো সবাই নবধর্মের আশ্রয়ে।

কবি ইলিয়া আবু মাজি

আরেক নাস্তিক্যমনা কবি ইলিয়া আবু মাজি। এক কবিতায় সে লিখেছে–

আমি এসেছি, পৃথিবীর পথে পথে হেঁটেছি–

এসেছি কোথা থেকে জানিনা। মনের চাওয়ায় আমি চিরঞ্জীব
নাকি রাতের পথিক; জানিনা, আমি জানিনা।

সে জানতে পারেনি, কোথা থেকে এসেছে! সে অবাধ্যতা করেছে। পাপ করেছে। বিচ্যুত হয়েছে। আল্লাহ তাকে অপদস্থ করেছেন। শাস্তি দিয়েছেন। নির্মম মৃত্যুর লাঞ্চনা দিয়েছেন।

শ্রবণ গোনাহমুক্ত রাখার স্বরূপ

আল্লাহ ﷻ তাঁর প্রিয় বান্দাদের শ্রবণশক্তি অর্থাৎ কানও গোনাহমুক্ত রাখেন। তাদের শ্রবণে ধারণ করান দীনের বাণী। পৃথিবীর ও পরকালের উপকারী বাণী। তাদের শ্রবণে অনুরিত হয় কোরআনের মধুর আয়াত।

আল্লাহ ﷻ-র প্রিয় বান্দাগণ নিষিদ্ধ কথায় বসেননা। গিবত চোগলে কান দেননা। তাঁদের শ্রবণ গানবাদ্য থেকেও সুরক্ষিত থাকে। গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকে। তাঁরা আল্লাহ ﷻ-র এই ঘোষণায় ভীতকম্পিত থাকেন–

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

> নিশ্চয় কর্ণ চক্ষু হৃদয় তাদের প্রত্যেকের কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে। [সূরা ইসরা : ৩৬]

মুসলমান মাত্র বিশ্বাস করে, শ্রবণ আল্লাহর অপার নেয়ামত। আল্লাহ ﷻ-র প্রতিটি নেয়ামতের ব্যাপারে যেরূপ জিজ্ঞাসিত হবো। তদ্রূপ শ্রবণশক্তির ব্যাপারেও জিজ্ঞাসিত হবো। সুতরাং আমার শ্রবণশক্তির বৈশিষ্ট্য যেন এমন হয়–.

> যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে। [ফুরকান: ৭২]

অর্থাৎ, আল্লাহর বান্দাগণ কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দেননা। তাঁরা মিথ্যা কথা শ্রবণও করেননা। কবির ভাষায়–

> মন্দের শ্রোতা যেন মন্দকারী, যেমন আহার্যের পরিবেশকও আহারকারী!

দৃষ্টি গোনাহমুক্ত রাখার স্বরূপ

মানুষ তার চোখের কারণে অসংখ্য বিপদাপদে নিপতিত হয়। জীবনের বহু ক্ষেত্রে দুর্বিপাক নেমে আসে তার দুর্দৃষ্টির কারণে। কবির ছন্দে–

> দৃষ্টি যখন হৃদয়ের নেগরাণ, পৃথিবী ঘুরবে তোমার পিছন, তুমি দেখবে এমন কিছ, সক্ষম নও তার পুরোটুকুর, অথবা দেখবে এমন কিছু, ধৈর্য হবেনা তার অল্পতে।

মানুষের দৃষ্টি কখনও কখনও শয়তানের তীর হিসেবে নিষিদ্ধ স্থানে নিবদ্ধ হয়। যে নিষিদ্ধ স্থান থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারে, আল্লাহ ﷻ তার অন্তরে ঈমান পূর্ণ করে দেন। তার বক্ষ বেয়ে প্রবাহ হয় ঈমানের শীতল নির্ঝরিণী। আল্লাহ ﷻ-র নির্দেশ–

> বিশ্বাসীদের বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গো হেফাযত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ অবগত। [সূরা নূর: ৩০]

মানুষের দৃষ্টি যখন বিভ্রান্ত হয়, তা তীর হয়ে অন্তরে বিদ্ধ হয়। ভ্রান্ত তীর শুদ্ধ অন্তরে ভ্রান্তির ছাপ ফেলে। অন্তরের অপমৃত্যু হয়। কবির কবিতা–

> আমি উপস্থিত করি মৃত্যু মুহূর্তেই। কে আছ অন্বেষী; হবে নিহত হন্তারক।

জনৈক বুযুর্গ বলেন, কত চোরাদৃষ্টি নিপাতিত হয় ভূতল গর্তে। কত চোরাচাহনি প্রবেশ করে অগ্নিগর্ভে। পলকচোরা এসব চোখের কারণে কেয়ামতের দিন লজ্জিত হতে হবে। আল্লাহ ﷻ আমাদের হেফাযত করুন। প্রত্যেক মুমিনের উচিত, তার দৃষ্টিকে আসমান যমিনের মহাসৃষ্টিতে নিবদ্ধ রাখা। এই বিপুল সৃষ্টিসমাহারে আল্লাহর পরিচয় খোঁজা। আল্লাহ ﷻ-র মহানিদর্শন দেখে তাঁর মহত্ব অনুভব করা। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> বল, আকাশমণ্ডলি এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার প্রতি লক্ষ কর।' [সূরা ইউনুস: ১০১]

> তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করেনা উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে কিভাবে তাকে উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে? এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে? এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে? [সূরা গাশিয়া, ১৭-২০]

তদ্রূপ প্রত্যেক মুমিনের উচিত হারাম ও নিষিদ্ধ স্থান থেকে দৃষ্টি বাঁচিয়ে রাখা। নারী এবং অশ্লীল দৃশ্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা। কারণ, চক্ষু মানুষকে ভূপাতিত করে। দুঃখ আর বঞ্চনার পরিণতি ডেকে আনে।

> দৃষ্টিতে সূচিত হয় সকল বিপদ; তুচ্ছ পাপ ডেকে নেয় নরক-মাজারে।

দৃষ্টিতে লঙ্ঘিত হয় বিচরণসীমা; যেমন ছিলাহীন ধুনকহীন আকস্মিক তীরাঘাতে।

সুন্দর গড়নে দৃষ্টির বিচরণ; সে তো দুর্বিপাকের ত্রিসীমা ছাড়িয়ে।

জীবন হারিয়ে যায় চোখের উল্লাসে, কী হবে বিপদের খুশি ছড়িয়ে!

অনেক মানুষ দৃষ্টির মাধ্যমে পাহাড়সম দুঃখ পেরেশানি ডেকে আনে। আবার দৃষ্টির মাধ্যমে অন্তরস্থ দুঃখ লাঘব করে, সফলতার রাজপথে উল্লসিত বিচরণের স্বপ্ন বোনে। দৃষ্টির মাধ্যমেই অন্তরে খুশির জোয়ার ঢেউয়ের তোড়ে ফুলিয়ে তোলে। কবিতা

হে পণ্ডশ্রমের তীরন্দাজ, নিজ প্রাণ বধ করলে নিজেরই তীরে!

নিরাময় খোঁজ ওহে চোখের নিয়ামক! দৃষ্টি ফিরাও তব বিপদ না আনে।

মানুষ যখন দৃষ্টি হেফাযত করবে, হারাম বস্তু থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নির্দেশিত পথে সঞ্চালন করবে, আল্লাহও তখন তাঁকে হেফাযত করবেন। তাঁর দায়িত্ব ও অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবেন। মানুষের জন্য আল্লাহর হেফাযত ও আল্লাহর অভিভাবকত্বই যথেষ্ট। রক্ষণাবেক্ষণে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ। তিনিই দয়ালুদিগের সেরা দয়ালু।

উদর-আহার গোনাহমুক্ত রাখার স্বরূপ

সচেতন একজন মুসলমানের পক্ষে হারাম খাদ্য বর্জন করা আবশ্যক। সচেতন মুসলমান শুধু আল্লাহপ্রদত্ত হালাল রুজিই গ্রহণ করবে। সুদ ও ধোঁকাবাজির মাধ্যমে উপার্জিত হারাম সম্পদ ত্যাগ করবে। ব্যবসায়, লেনদেনে হারাম পন্থা এড়িয়ে চলবে। আল্লাহর কাছে নিজেকে গৃহীত করার জন্য সকল পানাহারে পবিত্র ও হালাল পন্থা অবলম্বন করবে। আয়রুজি এবং পানাহার হালাল হলে সেই বান্দার দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হবে।

আবু হোরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন–

হে লোকসকল, আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিসই কবুল করেন। তিনি তাঁর রাসুলদের যে আদেশ দিয়েছেন, মুমিনদেরও একই আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ‘আমি বলেছিলাম, হে রাসুলগণ, তোমরা

পবিত্র বস্তু আহার কর এবং সৎকর্ম কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত'। [সূরা মুমিনূন: ৫১] আল্লাহ আরো বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ, আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর'। [বাকারা: ১৭২] অতঃপর রাসুল এক লোকের কথা উল্লেখ করেন, যে দীর্ঘ পথ সফর করেছে। এলোকেশ, ধূলিধূসর। আকাশের দিকে হাত তুলে ডাকছে, 'হে আমার রব... হে আমার রব...' অথচ তার খাদ্য হারাম। পানীয় হারাম। পোষাক হারাম। ভরণপোষণ হারাম। আল্লাহর কাছে তার দোয়া কীভাবে কবুল হবে! [মুসলিম : ১০১৫]

প্রকৃত অর্থে একজন মুসলমানের জন্য তার সকল অঙ্গাই গোনাহ থেকে মুক্ত রাখা আবশ্যক। মুসলমান তার যৌনাঙ্গা হারাম স্থান থেকে হেফাযত রাখবে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে বিশ্বাসীরা ... যারা নিজেদের যৌনাঙ্গা সংযত রাখে। তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিদের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবেনা। [সূরা মুমিনূন : ১, ৫, ৬]

মুসলমান তার পা গোনাহমুক্ত রাখবে। পা দিয়ে সে হারাম রাস্তায় হাঁটবেনা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁরই নির্দেশিত পথে হাঁটবে। মসজিদে গমন করবে। মাহফিলে ও ইলমের মজলিসে অংশগ্রহণ করবে। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের খোঁজখবর নিবে। যে কোন ভাল ও কল্যাণকর পথে চলবে।

মুসলমান তার হাত অনুমোদিত স্থানে ব্যবহার করবে। তার হাত যেন গোনাহের কাজে ব্যবহৃত না হয়, এ জন্য সজাগ থাকবে। আল্লাহ ﷻ বলেন–

যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত, তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। [সূরা নূর : ২৪]

যেদিন আল্লাহর শত্রুদের জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের নিকটে পৌঁছুবে, তখন তাদের কান চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে তাদের বিরুদ্ধে। [সূরা হামীম সাজদা : ১৯, ২০]

এভাবে একজন মানুষ যখন নিজেকে, নিজের অঙ্গা-প্রত্যঙ্গাকে গোনাহ থেকে সুরক্ষিত রাখবে, আল্লাহর আনুগত্যে নিজের সর্বাঙ্গা ব্যয় করবে, আল্লাহও তাঁকে সকল বিপদ থেকে সুরক্ষা দান করবেন। আল্লাহ ﷻ দয়ালুদের সেরা দয়ালু।

অবশেষে হে আল্লাহর বান্দা, বিপদে মুসিবতে আল্লাহর সাহায্য সকলেই আশা করে। দুনিয়া আখেরাতের সফলতার স্বপ্ন সকলেই দেখে থাকে। স্খলন আর বিচ্যুতি থেকে সকলেই নিরাপদ থাকতে চায়। এজন্য চাই আল্লাহর আনুগত্য। আল্লাহভীতিতে প্রকম্পিত অন্তর। আল্লাহর বিধান রক্ষার জন্য সজাগ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। হারাম বিধান থেকে বেঁচে থাকার প্রবল মানসিকতা। মানুষ যখন আল্লাহর বিধান রক্ষা করবে, আল্লাহ তাঁকে সকল অনিষ্ট থেকে বাঁচাবেন। কিন্তু মানুষ যদি আল্লাহর বিধান ভুলে যায়, আল্লাহও তাকে ভুলে যাবেন।

সবিশেষ আমরা ইবনে আব্বাস ﷺ-কে প্রদত্ত রাসুল ﷺ সেই উপদেশ স্মরণ করি–

> তুমি আল্লাহর বিধান রক্ষা কর, আল্লাহ তোমাকে সুরক্ষা দিবেন। তুমি আল্লাহর বিধান প্রতিপালন কর, আল্লাহকে তোমার কাছেই পাবে। কোন কিছু চাইলে আল্লাহর কাছেই চাও। কোন সাহায্যের প্রয়োজন আল্লাহকেই শুধু বল। জেনে রাখ, পৃথিবীর সকল মানুষ তোমার সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত হলেও আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তারা তোমার কোন সহযোগিতা করতে পারবেনা। পৃথিবীর সকল মানুষ তোমার অনিষ্টের জন্য প্রস্তুত হলেও আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তারা তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবেনা। মানুষের ভাগ্য সুস্থির, লিপিবদ্ধ। [তিরমিযি : ২৫১৬]

সফল ব্যক্তির সম্মান

মানুষের জীবনের সবেচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্থান হল আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের স্থান। আল্লাহর কাছে সমর্পিত বান্দা হওয়ার স্থান। আল্লাহর নিষ্ঠাপূর্ণ বান্দা এবং নিরঙ্কুশ আনুগত্য স্বীকারকারীরাই দুনিয়া-আখেরাতের সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল। আল্লাহ তার শ্রেষ্ঠ রাসূলকে জীবনের সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে সবেচেয়ে সম্মানজনক নামে ডেকেছেন এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থানের খেতাব ও উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

শ্রেষ্ঠ রাসূল মোহাম্মদ ﷺ। তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল ইসরা ও মেরাজ। আল্লাহ ইসরা ও মেরাজ সংক্রান্ত আয়াতে রাসূলকে নিজের সমর্পিত বান্দার সম্মানজনক নামে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন–

> পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। [সূরা বনী ইসরাঈল: ০১]

রাসূলের জীবনের অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত প্রেক্ষাপট কোরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট। সেখানেও আল্লাহ তার রাসূলকে সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ খেতাব তথা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দার উপাধিতে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন–

> পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তার বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়। [সূরা ফুরকান: ০১]

রাসূলের জীবনব্রত দায়িত্ব ছিল মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা এবং মানুষের কাছে আল্লাহর আহ্বান পৌঁছানো। মানুষকে খারাপ কাজের কুপরিণতি এবং ভাল কাজের সুপরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। সেই জীবনব্রত দায়িত্বের আলোচনাতেও আল্লাহ ﷻ তার রাসূলকে সর্বোচ্চ ইজ্জত ও গৌরবপূর্ণ উপাধিতে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন–

> আর যখন আল্লাহর বান্দা তাকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হল, তখন অনেক জিন তার কাছে ভিড় জমাল। [সূরা জিন: ১৯]

কবি বলেন–

> বেড়েছে ইজ্জত, বেড়েছে গৌরব, করেছি সুরায়া দলন; 'হে আমার বান্দা' বলে করেছ দাখিল তোমার বান্দাদের!

অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের 'হে আমার বান্দা' বলে ডেকেছেন এবং এতে আমরা রহমানের বান্দার অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছি, এটাই আমাদের জীবনের ইজ্জত ও গৌরব। যেন আমরা সুরায়া তারা পদদলিত করেছি!

আমাকে তুমি ডাকবে শুধু 'হে আমার গোলাম' বলে, এর চেয়ে দামি আর কোন নাম পাইনি এ ধরাতলে।

আল্লাহর নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্যই মানুষের সকল শক্তির উৎস। আল্লাহর বিনীত দাসত্ব মানুষের সকল মর্যাদার উৎস। এটিই মানুষের জীবনের ভিত্তি। এটিই মানুষের জীবনের স্বীকৃতি। আল্লাহর কাছে সেই অক্ষয় অপরাজের শক্তি ও সম্মানের আশা আমাদের।

দুহাতে আঁকড়ে ধরো আল্লাহর রজ্জু, সেই হোক জীবনের ভীত।

সকল শক্তি ক্ষয়ে যাবে তবু ধসবে না সেই স্তম্ভ।

ইবনে কাসির ﵀ তাউস ইবনে কাইসান থেকে বর্ণনা করেন, একবার আমি ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে হারামে প্রবেশ করি। মাকামে ইবরাহিমে দুই রাকাত সালাত আদায় করি। ঘটনাক্রমে সেখানে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আগমন ঘটল। তার সাথে রয়েছে অস্ত্রসজ্জিত দেহরক্ষী আর সেনা-সমাগম। হাজ্জাজ এবং তার বাহিনী সেখানে এসে মাকামে ইবরাহিমে সালাতে দাঁড়ালো।

হাজ্জাজ সালাতের সালাম ফিরাবে, এমতাবস্থায় ইয়েমেনের এক দুনিয়াবিরাগ আবেদ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ শুরু করলেন। যথারীতি তাওয়াফ শেষ করে দুই রাকাত সালাত আদায়ে দাঁড়ালেন। ঘটনাচক্রে এক বল্লমধারীর বল্লমের সাথে আবেদের চাদর পেঁচিয়ে গেল। আবেদ সেজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় চাদরের ক্ষিপ্রতায় বল্লমটি হাজ্জাজের গায়ে পড়ল। হাজ্জাজ রেগে গেল। তৎক্ষণাত

আবেদকে থামিয়ে দিয়ে নিক্ষিপ্ত বল্লমের মত দু'টি শব্দ ছুঁড়ে দিয়ে আবেদকে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

আবেদ অসহায়ের মতো উত্তর করলেন, 'আমি একজন মুসলিম। ইয়েমেন থেকে এসেছি।'

আবেদের বাড়ি ইয়েমেনে শুনে হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের বাদশাহ কেমন আছেন?'

হাজ্জাজের আরেক ভাই মোহাম্মদ বিন ইউসুফ তখন ইয়েমেনের বাদশাহ ছিল। হাজ্জাজের মতোই জালেম এবং বর্বর।

আবেদ বললেন, 'বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর সুঠাম দেহ নিয়ে ভালই আছেন।'

হাজ্জাজ রেগে গিয়ে বলল, 'তোমাকে তার শারীরিক খবর জিজ্ঞেস করিনি। তার ন্যায়নীতি বিচারব্যবস্থা কেমন, তা জিজ্ঞেস করেছি।'

আবেদ কোন রাখঢাক না করে ধাম করে বলে ফেললেন, 'শাসনব্যবস্থায় সে তো ভয়ানক জালিম ও বর্বর!'

হাজ্জাজ বাঁজখাই কণ্ঠে হুঙ্কার ছেড়ে বলল, 'তুমি কি জানো, আমি হলাম হাজ্জাজ আর সে আমার ভাই? তুমি কি আমাকে ভয় কর না?'

আবেদ সাহসভরা কণ্ঠে বললেন, 'আপনি কি মনে করেন, আল্লাহ আমার যত বড় শক্তি, সে আপনার আরো বড় শক্তি?'

তাউস বলেন, আবেদের উত্তর আর সাহসিকতা দেখে আমি অবাক হলাম। ভীত হলাম। আমার শরীরে একটি কাঁপুনি খেলে গেল। ভয়ে শরীরের লোমগুলো পলায়মান হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলাম, হাজ্জাজ লোকটিকে ছেড়ে দিলেন। আমি আরো একবার অবাক হলাম।

এই হল আল্লাহর বান্দাদের আত্মসমর্পণ ও আল্লাহর সাথে তাদের অন্তরের সম্পর্ক! এই হল মুমিনের অপরাজেয় শক্তি! যেদিন আল্লাহ ছাড়া আর কোন ক্ষমতাবান থাকবে না, আল্লাহর স্বীকৃতি ছাড়া আর কোন স্বীকৃতি থাকবে না, সেদিন এই দাসত্ব ও আনুগত্যই হবে মুমিনের একমাত্র ভরসা!

আবেদকে থামিয়ে দিয়ে নিক্ষিপ্ত বল্লমের মত দু'টি শব্দ ছুঁড়ে দিয়ে আবেদকে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

আবেদ অসহায়ের মতো উত্তর করলেন, 'আমি একজন মুসলিম। ইয়েমেন থেকে এসেছি।'

আবেদের বাড়ি ইয়েমেনে শুনে হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের বাদশাহ কেমন আছেন?'

হাজ্জাজের আরেক ভাই মোহাম্মদ বিন ইউসুফ তখন ইয়েমেনের বাদশাহ ছিল। হাজ্জাজের মতোই জালেম এবং বর্বর।

আবেদ বললেন, 'বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর সুঠাম দেহ নিয়ে ভালই আছেন।'

হাজ্জাজ রেগে গিয়ে বলল, 'তোমাকে তার শারীরিক খবর জিজ্ঞেস করিনি। তার ন্যায়নীতি বিচারব্যবস্থা কেমন, তা জিজ্ঞেস করেছি।'

আবেদ কোন রাখঢাক না করে ধাম করে বলে ফেললেন, 'শাসনব্যবস্থায় সে তো ভয়ানক জালিম ও বর্বর!'

হাজ্জাজ বাঁজখাই কণ্ঠে হুঙ্কার ছেড়ে বলল, 'তুমি কি জানো, আমি হলাম হাজ্জাজ আর সে আমার ভাই? তুমি কি আমাকে ভয় কর না?'

আবেদ সাহসভরা কণ্ঠে বললেন, 'আপনি কি মনে করেন, আল্লাহ আমার যত বড় শক্তি, সে আপনার আরো বড় শক্তি?'

তাউস বলেন, আবেদের উত্তর আর সাহসিকতা দেখে আমি অবাক হলাম। ভীত হলাম। আমার শরীরে একটি কাঁপুনি খেলে গেল। ভয়ে শরীরের লোমগুলো পলায়মান হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলাম, হাজ্জাজ লোকটিকে ছেড়ে দিলেন। আমি আরো একবার অবাক হলাম।

এই হল আল্লাহর বান্দাদের আত্মসমর্পণ ও আল্লাহর সাথে তাদের অন্তরের সম্পর্ক! এই হল মুমিনের অপরাজেয় শক্তি! যেদিন আল্লাহ ছাড়া আর কোন ক্ষমতাবান থাকবে না, আল্লাহর স্বীকৃতি ছাড়া আর কোন স্বীকৃতি থাকবে না, সেদিন এই দাসত্ব ও আনুগত্যই হবে মুমিনের একমাত্র ভরসা!

ইমাম যাহাবি ﷺ মুহাদ্দিস ইবনে আবি যীব ﷺ এর জীবনীতে উল্লেখ করেন, একবার খলিফা মাহদি আব্বাসি মসজিদে নববিতে আগমন করেন। সেখানে অনেক মানুষ এবং হাদিসের ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। খলিফা মাহদি আব্বাসি প্রবেশ করতেই সকলে খলিফার সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু ইবনে আবি যীব ছিলেন নির্লিপ্ত। খলিফার আগমনে সকলে দাঁড়িয়ে গেলেও আপন মনে বসে রইলেন তিনি। খলিফা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইবনে আবি যীব, আমার আগমনে সকলে দাঁড়াল, তুমি দাঁড়ালে না যে!'

ইবনে আবি যীব বললেন, "আল্লাহর কসম, আমিও দাঁড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু যেই না দাঁড়াবো, অমনিতেই কোরআনের একটি আয়াত মনে পড়ল–

> যেদিন সকল মানুষ দাঁড়াবে জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে। [সূরা মুতাফফিফিন: ৬]

এ আয়াত স্মরণ হওয়ায় আমি আর দাঁড়াইনি। আমি আয়াতের উদ্দিষ্ট দিনে দাঁড়ানোর অপেক্ষায় রইলাম!

তারাই আমাদের অনুসরণীয়। তারা আমাদের পূর্বপুরুষ। তারা আল্লাহর আনুগত্য বুঝেছিলেন। আল্লাহর দাসত্বের সারমর্ম অনুধাবন করেছিলেন।

আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের অন্যতম একটি উপসর্গ আল্লাহর ভয়। যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত কম্পিত, আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহর প্রতি ধাবিত বন্ধুদের অত্যন্ত সুন্দর বৈশিষ্ট্যে, বড় নৈকট্যশীল ও অনুগত বান্দার উপাধিতে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ ﷻ তাদের সম্মান ঘোষণা করে বলেন–

> যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। [সূরা রহমান: ৪৬]

> যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত। [সূরা নাযিয়াত: ৪০, ৪১]

ওলামায়ে কেরাম বলেন, 'যে কোন বস্তুর কাছাকাছি হলে তার থেকে ভয়মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহর যতই নিকট হই, অন্তরে ততই তার ভয় বৃদ্ধি পায়!'

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাকে ভয় করে। [সূরা ফাতির : ২৮]

আল্লাহর সাথে ওলামায়ে কেরামের নৈকট্যের কারণেই আয়াতে আল্লাহ আলেমদের ভয় পাওয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। উক্ত আয়াতে নিষ্ঠাপূর্ণ ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে।

রাসূল ﷺ-র আগমনের পূর্বে আমরা জীবনের রসবোধে মৃত ছিলাম। আমাদের জীবন প্রাণবন্ত ছিল না। আমাদের কোন পরিচয়, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ছিল না। প্রগতি ও অগ্রগতি ছিল না। মিথ্যুকরা যতই মিথ্যাচার করুক, দাজ্জালরা যতই দাজ্জালি করুক, বাস্তব অর্থেই আমাদের কোন সভ্যতা, ভব্যতা, সংস্কৃতি কিছুই ছিল না।

রাসূল ﷺ আমাদের জন্য একটি বিরল ও অদ্বিতীয় বিদ্যাপিঠ খুলেছেন। যে বিদ্যাপিঠ ছিল মানুষের জীবন সঞ্চারের বিদ্যাপিঠ। যে বিদ্যাপিঠ ছিল প্রজন্ম তৈরি, অন্তরের উৎকর্ষ এবং মহান স্রষ্টার কাছে জীবন পরিচালনার বিদ্যাপিঠ।

এই বিদ্যাপিঠের একজন সুনামধন্য পুণ্যবান ছাত্র ছিলেন ইবনে মাসউদ رضي الله عنه। তিনি বলেন, যেদিন রাসূল ﷺ এসেছেন, সেদিন আমাদের নতুন ও উজ্জ্বল ইতিহাস শুরু হয়েছে। মহান আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হেকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। [সূরা জুমুয়াহ: ০২]

আমরা আমাদের জীবন শুরু করেছি রাসূলের আগমনের দিন থেকে। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আর যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে।

সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে– সেখান থেকে বের হতে পারে না? [সূরা আনয়াম: ১২২]

যে তার অজ্ঞতা, গোনাহ, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ ইত্যাদিতে মৃত ছিল, সে কি ঐ ব্যক্তির মতো হতে পারে, যাকে আল্লাহ ﷻ ঈমানের মাধ্যমে নতুন জীবন দান করেছেন!

না, তারা এক হতে পারে না।

ইবনে মাসউদ رضي الله عنه ছিলেন রাসূলের সেই ঐশ্বরিক বিদ্যাপিঠের একজন পুণ্যবান, প্রিয়তম, সম্ভ্রান্ত গোছের ছাত্র। উম্মতের কৃষ্টিতে সহসা জ্বলে ওঠা এক শক্তি। শারীরিক কাঠামোতে তিনি দুর্বল ছিলেন। দেহে-গঠনে জীর্ণশীর্ণ ছিনলে। কিন্তু ঈমানে ছিলেন অত্যন্ত বলবান!

ধার্মিকতা শরীর দিয়ে বিচার্য নয়। ধার্মিকতা বিচার করা হয় অন্তরাত্মা দিয়ে। রাসূল যখন আমাদের অন্তরে ঈমানি শক্তির প্রতিবিম্ব ছড়ালেন, তখন মানুষ পথ পেতে শুরু করেছে। তখনই উদ্ভ্রান্ত মানুষ সঠিক দিশা পেয়েছে।

ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه শীর্ণকায় ছিলেন। তিনি বসে থাকা কারো পাশে দাঁড়ালে উভয়কে দণ্ডায়মান ঠাওর হতো!

একদিন তিনি একটি গাছে উঠলেন। হঠাৎ বাতাস বইতে শুরু করল। বাতাস যেন ইবনে মাসউদকে গাছসহ উপড়ে ফেলছিল! এ দৃশ্য দেখে লোকেরা হাসল। রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা তার পায়ের নলার ক্ষুদ্রতা দেখে আশ্চর্য হচ্ছো! আল্লাহর কসম! কেয়ামতের দিন মিযানের পাল্লায় সে উহুদ পাহাড়ের চেয়ে ভারী হবে।' তার ঈমান, একিন এবং আল্লাহর সাথে নৈকট্যের মাধ্যমে তিনি উহুদ পাহাড়ের চেয়ে ভারী হবেন!

রাসূল ﷺ একদিন তাকে বললেন, 'তুমি আমাকে একটু তেলাওয়াত শোনাও।'

তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! কোরআন আপনার উপর নাযিল হয়েছে, আর আমি আপনাকে তেলাওয়াত শোনাবো! এযে লজ্জা! আদব পরিপন্থী!'

রাসূল বললেন, 'তুমি আমাকে তেলাওয়াত শোনাও। আমি ব্যতীত অন্য কারো থেকে তেলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি।' [আহমাদ : ৩৯৮১]

অতঃপর ইবনে মাসউদ ﵁ সূরা নিসা থেকে তেলাওয়াত শুরু করলেন। রাসূল ﷺ তার তেলাওয়াত শুনছেন। একপর্যায়ে তিনি আয়াত পাঠ করলেন—

> আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে যখন আমি ডেকে আনবো প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকবো তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে। [সূরা নিসা: ৪১]

তখন রাসূল ﷺ কান্না শুরু করে দিলেন। তার চোখ থেকে পানি ঝরছিল। তিনি বলছিলেন, 'যথেষ্ট হয়েছে।' [বুখারি : ৫০৫০]

তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল। তার পূর্বাপর সবকিছু মাফ করে দেয়া হয়েছে। তথাপি তিনি ধোঁকায় পতীত হননি। প্রতারিত হননি। কোরআন তার এবাদাত এবং আল্লাহভীতিই বৃদ্ধি করেছে।

সাহাবায়ে কেরাম রাতভর এবাদতে মগ্ন থাকতেন। কবি বলেন—

> অন্ধকারের গভীর কোলে ঢলে পড়ে রাত্তির, আবেদের কপোল ভিজে চোখের ঝর্ণায়।
>
> জিহাদি নাকারায় বাজে শাহাদাতের দুফ, ঘুমন্ত শার্দুল জাগে শহিদি তামান্নায়।

সাহাবায়ে কেরাম রাত জেগে সালাত পড়তেন। তেলাওয়াত করতেন। রাসূল তাদের কাছে যেতেন। তেলাওয়াত শুনতেন।

একদিন আবু মুসা আশয়ারি ﵁ আবেগমথিত আবেদনময়ী ব্যথাতুর কণ্ঠে তেলাওয়াত করছেন। রাসূল ﷺ আবু মুসার তেলাওয়াত শুনলেন।

সকালে রাসূল আবু মুসাকে বললেন, 'তুমি যদি গতরাতে আমাকে দেখতে! আমি তোমার তেলাওয়াত শুনেছি। আমাকে দাউদের সুরেলাস্বরের একটি দেয়া হয়েছে।' [বুখারি : ৫০৪৮]

আবু মুসা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার তেলাওয়াত শুনেছেন!'

রাসূল বললেন, 'যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ! আমি তোমার তেলাওয়াত শুনেছি।'

আবু মুসা বললেন, 'যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ! যদি জানতাম আপনি আমার তেলাওয়াত শুনছেন, তাহলে আমি আপনার জন্য তেলাওয়াত আরও অলঙ্কৃত করতাম।' [হাকেম : ৬০১৯]

রাসূল ﷺ তেলাওয়াত শুনতে পছন্দ করতেন। তেলাওয়াত তার আল্লাহভীতি বৃদ্ধি পেত। প্রেম-অনুরাগ স্ফীত হত।

তাফসিরে ইবনে আবি হাতেমে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, তখন রাতের অন্ধকার নেমেছিল। রাসূল ﷺ বের হলেন। মদিনার অলিগলিতে হাঁটছেন। এক ঘরে বয়স্ক একজন মহিলা তেলাওয়াত করছিলো। রাসূল দরজার দিকে মাথা উঁচিয়ে খেয়াল করে শুনলেন। কণ্ঠে মনে হয় বৃদ্ধ ন্যুব্জ মহিলা, কিন্তু তার অন্তর যুবতী। জীবিত। মহিলা বারবার তেলাওয়াত করছেন–

﴿هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡغَٰشِيَةِ﴾

আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?

মহিলা কাঁদছেন আর তেলাওয়াত করছেন। টেরও করতে পারেননি– রাসূল তার তেলাওয়াত শুনছেন।

মহিলার তেলাওয়াত শুনে রাসূল নিজেই কেঁদে ফেললেন আর বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, আমার কাছে (আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত) পৌঁছেছে। হ্যাঁ, আমার কাছে পৌঁছেছে।'

আমাদের পূর্ববর্তীগণ আল্লাহভীতির যথাগুরুত্ব জানতেন। তারা কোরআনকে আল্লাহভীতির সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে গণনা করতেন। আল্লাহভীতি না থাকায় আল্লাহ ﷻ আসহাবে কোরআন ব্যতীত সকল মানুষকে নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন।

ইমাম আহমদ رحمه الله কিতাবুয যুহদে একটি হাদীস বর্ণনা করেন–

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, "আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! তোমার উপর আশ্চর্য হতে হয়! আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি, আর তুমি অন্য কারো এবাদত কর! আমি তোমাকে রিযিক দিচ্ছি, আর তুমি অন্য কারো কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর! তুমি নেয়ামত পেতে পছন্দ কর, অথচ আমি তোমার অমুখাপেক্ষী! তুমি

আমার কাছে অপছন্দনীয় হও, অথচ তুমি আমার কাছে মুখাপেক্ষী! আমার মঙ্গল তোমার কাছে অবতরণকারী, আর তোমার পাপ-মন্দ আমার কাছে আরোহণকারী।" [ফায়জুল কাদির : ৪/৪৯৪]

কেউ যখন আল্লাহর নাফরমানি করে, আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে বিমুখ হয়, তখন তার এই অবস্থা। তখন আল্লাহ ﷻ তার উপর এমন আশ্চর্য প্রকাশ করেন। এজন্য আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বই হল আল্লাহভীতির সর্বোচ্চ অবস্থা।

উসমান رضي الله عنه বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে লজ্জা করে কখনও আমার গুপ্তাঙ্গ দেখিনি। কখনও আমি দাঁড়িয়ে গোসল করিনি।'

কবি বলেন–

> কোন নিয়ন্তা নিয়ন্ত্রণ করছে আমার ডানাগুলো, নিয়ন্ত্রণ করছে আমার কর্ণ ও অন্তরমম...

আন্দালুসি رحمه الله তার ছেলেকে তাকওয়ার নসিহত করছেন–

তুমি যখন অন্ধকারে উৎকণ্ঠায় একাকী হও, মন তোমাকে আহ্বান করে পাপাচারে, তখন লজ্জা কর মহান আল্লাহর দৃষ্টিকে।

মনকে বল– 'মন! তোমাকে দেখছেন তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন এই অন্ধকারের সুযোগ।'

আমরাও যদি অনুভব জাগ্রত রাখি, অন্ধকারের স্রষ্টা আমাদের দেখছেন, তাহলে আমরা আর গোনাহ করবো না। অবাধ্য হবো না। সীমালঙ্ঘন করবো না। কিন্তু মনের নিয়ন্ত্রণ খুব কম লোকই করতে পারে!

সুসাহিত্যিক সালাব বলেন, আমি একদিন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে আগমন করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন– 'কে আপনি?'

আমি বললাম, 'আমি একজন সাহিত্যিক। আমি একটি কবিতা পারি।'

তিনি বললেন, 'কবিতাটি আমাকে শুনাও।'

আমি বললাম, "আবু নাওয়াস বলেন–

'তুমি কখনও একাকী হলেও বলো না আমি একা।

বলো, আমার সাথে আছেন একজন মহাদ্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক।

ভেবো না তুমি, তিনি কখনও গাফেল থাকেন এক পলক, ভেবো না গোপন থাকে তার কাছে– অদৃশ্য যাকিছু তোমার কাছে।

সালাব বলেন, "আল্লাহর কসম! তিনি আমার কবিতা শুনে কিতাব-কালি রেখে তার রুমের দরজা বন্ধ করলেন। অতঃপর কেঁদে কেঁদে বারবার এই কবিতা পড়তে থাকলেন–

> 'তুমি কখনও একাকী হলেও বলো না আমি একা।
>
> বলো, আমার সাথে আছেন একজন মহাদ্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক।"

আবু বকর رضي الله عنه ছিলেন একজন দুনিয়াবিমুখ আবেদ ও মুজাহিদ। রাসূল ﷺ তাকে শ্রেষ্ঠসব নাম ও উপাধি দিয়েছিলেন। ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদাপূর্ণ খেতাবে ভূষিত করেছিলেন।

ইমাম আহমদ কিতাবুয যুহদ-এ তার একটি ঘটনা বর্ণনা করেন–

একদিন আবু বকর رضي الله عنه এক আনসার সাহাবির খামারে প্রবেশ করলেন। একটি খেজুর গাছের দিকে মনোযোগ দিলেন। দেখলেন, একটি পাখি এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ছে। আবু বকর কেঁদে ফেললেন। কেঁদে কেঁদে বললেন, 'সুখী জীবন তোমার হে পাখি! গাছে গাছে উড়ে বেড়াও, পানির ঘাটে পানি খাও, এরপর মরে যাও, তোমার কোন হিসাব নেই! তোমার কোন আযাব নেই!' এই বলে আবু বকর কাঁদতে থাকলেন। তার সাথের সাহাবিরাও কাঁদতে থাকলেন।

এই হল আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। এই হলেন জান্নাতের ঘোষণা পাওয়া ব্যক্তি। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, "যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে– 'হে আল্লাহর বান্দা! এটাই উত্তম।' অতএব যে সালাত আদায়কারী, তাকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রাইয়ান দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সদকা দানকারী, তাকে সদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। এরপর আবু বকর রাযি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কোরবান; সকল দরজা থেকে কাউকে ডাকা প্রয়োজন নেই, তবে কি কাউকে সব দরজা থেকে ডাকা হবে?' রাসূল বললেন, 'হাঁ, আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে হবে!' [বুখারি : ৩৬৬৬]

আবু বকর ﵁ যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, আয়েশা ﵂ তাকে বললেন, কবি সত্য বলেছেন–

> যখন মৃত্যু আসবে; গলা ভেঙ্গে শব্দ উঠবে গড়গড়, সঙ্কোচনে ভেঙ্গে আসবে বক্ষ-পাঁজর, তখনও নিঃশেষ হয় না কতক যুবকের প্রাচুর্য!

আবু বকর ﵁ বলে উঠলেন, আয়েশা, এ কথা বলো না। বরং বলো–

> মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে। এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন। প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে, তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। [সূরা ক্বাফ : ১৯-২১]

অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করলেন।

আবু বকর ﵁ ছিলেন মুসলিম জাহানের খলিফা। অথচ ইন্তেকালের পর তার পরিত্যক্ত সম্পদ ছিল ব্যবহারের খচ্চর, উট এবং পরনের দুটি কাপড়। ওমর ﵁ সেগুলো বাইতুল মালে সংগ্রহ করলেন এবং কেঁদে কেঁদে বললেন, 'আবু বকর, আপনার পরের খলিফাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে গেলেন!'

ইবনুল কায়্যিম ﵀ রাওযাতুল মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতুল মুশতাকীন গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ওমর ﵁ প্রতিদিন সকালে আবু বকর ﵁ এর খবরাখবর দেখতেন। ওমর লক্ষ করলেন, আবু বকর প্রতিদিন ফজরের সালাত শেষে শহরের একটি উপকণ্ঠে আগমন করেন।

কয়েকদিন এ দৃশ্য দেখে একদিন ওমর ﵁ আবু বকরের পিছুপিছু গমন করলেন। দেখলেন, আবু বকর বসতি থেকে বিচ্ছিন্ন একটি তাঁবুতে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলেন। আবু বকর বের হয়ে আসার পর ওমর সে তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, তাঁবুর ভেতর একজন বৃদ্ধা। বৃদ্ধার চোখে আলো নেই। বয়সের ভারে ভেঙ্গে পড়েছে শরীর। সাথে আছে ক'টি বাচ্চা। ওমর বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর বান্দি! আপনি কে?'

বৃদ্ধা বললেন, 'আমি এক অন্ধ ও বৃদ্ধ মহিলা। আমার শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এই সংসারের পিতা মারা গেছে। আমার সাথে এই মেয়েগুলো আছে। আল্লাহ ﷻ ছাড়া এখন আমাদের দেখভাল করার কেউ নেই।'

ওমর বললেন, 'আপনাদের কাছে মাত্র একজন লোক এসে গেলেন, তিনি কে?'

বৃদ্ধা বললেন, 'এই লোককে আমরা চিনি না। এই লোক প্রতিদিন আমাদের এখানে আসেন। তাঁবু ঝাড়ু দেন! আমাদের জন্য সকালের নাস্তা প্রস্তুত করেন! ছাগলগুলোর দুধও দোহন করে দেন!'

মহিলার কথা শুনে ওমর কেঁদে ফেললেন আর বললেন, 'আবু বকর! আপনার পরের খলিফাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে গেলেন!'

ওমরের স্মৃতি। তিনি যখন জুমার খোতবা দিতে দাঁড়াতেন, তার পেট ক্ষুধায় ছটফট করত। তিনি তখন আপন মনে বলতেন, 'আমার পেট! ছটফট কর আর না কর, মুসলমান বাচ্চাদের ক্ষুধা যতক্ষণ নিবারণ না হবে, ততক্ষণ তোমার ক্ষুধাও নিবারিত হবে না। আল্লাহর কসম!'

ওমর জুমার খোতবা দিতে দাঁড়াতেন তালিযুক্ত পোষাক পরিধান করে। তার পরিহিত চাদরে চৌদ্দটা পর্যন্ত তালি যুক্ত হয়েছিল। অথচ কিসরা কায়সারের মত পরাশক্তি তার ভয়ে থরথর করে কাঁপত! কবি বলেন–

ওমরে দেখেছ কেউ –পরনে চাদর, খাবারে তেল শুধু, আশ্রয় কুঁড়েঘর!

অথচ কিসরা, রোম, কায়সার, ওমরের ভয়ে সদা কাঁপে থরথর!

ঠিক তাই! আমরা যখন আল্লাহকে ভয় পেতাম, তখন তাবৎ শক্তি আমাদের ভয় করত। দৈত্য-দানব বাদশাহও আমাদের ভয় পেত। যখন আল্লাহর ভয় আমাদের অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল, আল্লাহ ﷻ সেসব রাজ-রাজড়াদের ভয় আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিয়েছেন।

আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পৃথিবীর তাবৎ শক্তির সাথে যুদ্ধ করেছি। এই শক্তি ছাড়া আমাদের আর শক্তি ছিল না। তাই তখন আমরা বিজয়ী হয়েছি। আমরা তাদের ভয় করিনি। কারণ একমাত্র আল্লাহকেই আমরা মনেপ্রাণে ভয় করেছি।

কাদিসিয়ার যুদ্ধে রবি ইবনে আমের ছিলেন মুসলমানদের শীর্ষব্যক্তি। তিনি বন্দি হয়ে রুস্তমের সামনে উপস্থিত হলেন। রুস্তমের রাজত্বে ছিল খনি ভর্তি স্বর্ণ-রূপা, রং-বেরংয়ের রেশম, শোভাবর্ধণের যতসব উপকরণ। এদিকে রবির সাথে ছিল ভগ্ন তীর, ছিন্নভিন্ন কাপড়, আহত ঘোড়া। কিন্তু তিনি আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করতেন। আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন। আল্লাহর রহমতের নিশ্চিত আশা রাখতেন।

রুস্তম তাকে দেখে হাসল। রবি ইবনে আমেরের এ অবস্থা দেখে অবজ্ঞাভরে বলল, 'তোমরা এই অকৃত তীর নিয়ে, ছিন্নভিন্ন কাপড় পরে, আহত ঘোড়ায় চড়ে নেমেছ দুনিয়া জয় করার জন্য!'

রবি ইবনে আমের বললেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বে মুক্তি দানের জন্য। পার্থিব সঙ্কীর্ণতা থেকে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে ধাবিত করার জন্য। মিথ্যা ধর্মের যাঁতাকল থেকে সত্য ধর্ম ইসলামের ন্যায়নীতি দান করার জন্য।'

> কে ছুটেছে অস্ত্র লয়ে, আল্লাহ নামের ঝাণ্ডা লয়ে, আকাশ ছোঁয়া মিনার হয়ে, তারার ভুবন পাড়ি দিয়ে!
>
> গির্জা প্যাগোডা মন্দিরে; আফ্রিকার ঐ ধর্মালয়ে, আল্লাহ নামে আযান ফুঁকে, দিয়েছিল সব গুঁড়িয়ে!
>
> আমরা ছিলাম সেই সে জাতি– পাহাড় দলে পাহাড় গড়ে, সাগর চিড়ে ঢেউয়ের তোড়ে, –আমরা ছিলাম বীরের জাতি।

একটা সময় ছিল– আমাদের এক তাকবিরে শত্রুর অট্টালিকা ধ্বসে পড়ত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস কাদিসিয়ার পর কিসরার অট্টালিকা দেখে তাকবির ধ্বনি দিয়েছিলেন। তাকবির ধ্বনিতে সেদিন কিসরার অট্টালিকার পতন হয়েছিল। বিজয়ের অশ্রু মেখে সাদ رضي الله عنه কবিতা পাঠ করলেন–

> আমায় ভাসিয়ে নিল বিজয়ের প্লাবন। খুশি আর আনন্দে আমার এ কৃতজ্ঞ রোদন...

অতঃপর সাদ رضي الله عنه তেলাওয়াত করলেন–

> তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান আর প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র আর সুরম্য স্থান, কত সুখের স্থান যাতে তারা সুখগল্প করতো, এমনই হয়েছিল এবং আমি এগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে, তাদের জন্য ক্রন্দন করেনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তারা অবকাশও পায়নি। [সূরা দুখান: ২৫-২৯]

সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর একান্ত বান্দা ছিলেন। তারা আল্লাহকে ভয় করতেন। ইবনে আব্বাস ﵁ যখন নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করতেন, চোখ ছেড়ে কান্না করতেন–

> যে ব্যক্তি রাতে সেজদায় অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের আশঙ্কা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না! [সূরা যুমার: ০৯]

তেলাওয়াত শেষে বলতেন, 'এই ব্যক্তি হলেন উসমান ইবনে আফফান। তিনি ইশা থেকে ফজর পর্যন্ত আল্লাহর তাসবীহ এবং কোরআন তেলাওয়াত করতেন!'

রাত জেগে এবাদতকারী মহান শহীদ উসমান ইবনে আফফানকে বর্বরোচিত হমালায় হত্যা করা হল। হাসসান ইবনে সাবিত ﵁ তার হত্যাকাণ্ডে বাকরুদ্ধ হয়েছিলেন। কবিতা গেঁথে বলেছিলেন–

> সিজদায় যার চুল সাদা হয়েছে, তাসবীহ আর মোহাম্মতে যার রাত কেটেছে, সেই বিরল দৃষ্টান্তকে তারা হত্যা করেছে!

ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে এবং মারুযী ﵀-ও উল্লেখ করেন, উসমান ﵁ ইশার পর এক রাকাত সালাতে পুরো কোরআন তেলাওয়াত করে সারারাত কাটিয়ে দিতেন।

এমন ছিলেন তারা। এমনই ছিল তাদের আল্লাহভীতি ও আল্লাহপ্রেম। আল্লাহর সাথে এযুগের উম্মতে মোহাম্মদির প্রেম ও ভালোবাসা আরও গাঢ় করা উচিত। আত্মপর্যালোচনা করা উচিত– আমাদের আদর্শ সাহাবায়ে কেরাম কেমন এবাদত করতেন, আমরা কেমন করছি! বিশ্ব মানবতা যাদের সমতুল্য আজও পায়নি, কোন মানবসভ্যতা যাদের অনুরূপ আজও দেখেনি, পূর্বসূরী

হয়েও তাদের থেকে আমরা আজ কতদূরে। তাদের উপর্যুক্ত এবাদতের তুলনায় আমরা আজ কী করছি! আমরা পরকালের জন্য অগ্রে কী প্রেরণ করেছি!

তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ সাহাবিদের মসজিদে সমবেত করে বললেন, 'কে এই কঠিন দিনের সেনাবাহিনী সাজিয়ে দিবে? তার জন্য জান্নাতের ঘোষণা!' [আহমাদ : ৫১৩]

এই ভারবহন ছিলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সাহাবায়ে কেরাম চুপ রইলেন।

রাসূল দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এই কঠিন দিনের সেনাবাহিনী সাজিয়ে দিবে? তার জন্য জান্নাতের ঘোষণা!'

সাহাবায়ে কেরাম এবারও চুপ রইলেন।

রাসূল তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এই কঠিন দিনের সেনাবাহিনী সাজিয়ে দিবে? তার জন্য জান্নাতের ঘোষণা!'

উসমান رضي الله عنه দাঁড়ালেন। বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, এই কঠিন দিনের বাহিনী আমি সাজিয়ে দিবো। অর্থ, অস্ত্র, ঘোড়া, জিনপোশ, –আল্লাহর রাহে সবই আমি বহন রবো।'

উসমানের ঘোষণা শুনে রাসূলের দুই চোখে অশ্রু গড়ালা। রাসূল দোয়া করে বললেন, 'আল্লাহ! উসমানের পূর্বাপর সব গোনাহ মাফ করো। আল্লাহ! তুমি তার উপর সন্তুষ্ট হও, আমিও তার উপর সন্তুষ্ট।' [তিরমিযি : ৩৭০১]

সাহাবায়ে কেরামের এ ঘটনা ও স্মৃতিগুলো ঈমানজাগানিয়া। উৎসাহব্যঞ্জক। নসিহতপূর্ণ। আল্লাহ ﷻ তাদেরকে আমাদের জন্য আদর্শ বানিয়েছেন। নেতা ও অনুসরণীয় বানিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> এরা এমন ছিল, যাদের আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। [সূরা আনয়াম: ৯০]

সুতরাং যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়তে চায়, আল্লাহর এবাদতে নিরত হতে চায়, তার আদর্শ ও অনুসরণ সাহাবায়ে কেরামের রঙিন মখমল জীবন ঘিরেই আবর্তিত। কবির ভাষায়–

সাহাবাদের মতো হও যুহদ ও তাকওয়ায়, তাদের মতো জীবন্ত এবাদত বলো আর কোথায় পাই!

আলি ﵁ আমাদের উপমা। যিরার ইবনে হারিস সাদাঈ বলেন, “আলি ﵁ মিম্বারে দাঁড়াতেন। দাড়িতে হাত বুলাতেন আর বলতেন, ‘হে দুনিয়া! আমি ছাড়া আর কাউকে ধোঁকা দাও। আমি তোমাকে তিন তালাক দিয়েছি। তিন তালাকের পর ফিরিয়ে আনার কোন পথ থাকে না। তোমার সফর দীর্ঘ ... তোমার পাথেয় তুচ্ছ ... তোমার বয়স সঙ্কীর্ণ ... হায়! কেউ এই সফর থেকে দূরে থাক ... এই সম্ভার থেকে দূরে থাক ... মৃত্যুর সাক্ষাত ...”

প্রকৃত মুসলমান সেই, যে আল্লাহকে ভয় পায়। সাহাবায়ে কেরাম মৃত্যুকে ভয় পেতেন। মৃত্যুর ভয়ে প্রকম্পিত থাকতেন। আল্লাহ ﷻ-র সাক্ষাতে ভয় পেতেন। এজন্য আল্লাহ ﷻ তাদের লক্ষ্যে পৌঁছিয়েছেন। তাদের কাঙ্ক্ষিত স্থান দান করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ আল্লাহভীতির সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহভীতি এমন অনুভুতি, যা মানুষকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে। মানুষ জীবন সম্ভারের প্রতি মুখাপেক্ষী হয় না। সংসার, নিদ্রা, পানাহার সবকিছু ত্যাগ করা আল্লাহভীতি নয়। এসব ইসলামের অংশ নয়। সুফিদের বাড়াবাড়ি মাত্র।

আল্লাহভীতি মানুষকে গোনাহ থেকে বাঁচায়। গোনাহ ত্যাগের উপর অবিচল রাখে। যে ভীতি মানুষকে গোনাহ থেকে বাঁচায় না, তা ভীতি আল্লাহভীতি নয়। সে ভীতি মুখের কথা মাত্র।

মুআত্তা কিতাবে হাসান ﵀ থেকে বর্ণিত, সাজসজ্জার নাম ঈমান নয়। আশাপ্রত্যাশার নাম ঈমান নয়। ঈমান মানুষের অন্তরে গভীর রেখাপাত করে এবং তার আমলে সত্যায়িত হয়। ঈমান ও আল্লাহভীতির প্রভাব মানুষের সৎকর্মকুশল দ্বারা প্রতিফলিত হয়।

যাহাবি ﵀ সিয়ারু আলামিন নুবালা গ্রন্থে দুনিয়াবিমুখ প্রখ্যাত আলেম আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব মিসরি এর স্মৃতি উল্লেখ করেন– আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাব কেয়ামতের ভয়াবহতা প্রতিপাদ্য করে আহওয়ালু ইয়াওমিল কিয়ামা নামে একটি কিতাব রচনা করেন। কিতাব রচনা শেষ হলে ছাত্ররা তাকে বলল, ‘কিতাবটি আমাদের পড়ে শোনান।’

আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাব বললেন, 'আমি! আল্লাহর কসম! আমি এ কিতাব তোমাদের পড়ে শোনাতে পারবো না। তোমাদের একজন সামনে এসে পড়।'

ছাত্ররা বলল, 'তাহলে আপনার ছেলেই আমাদের তা পড়ে শোনাক!'

আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাবের ছেলে কিতাবটি পড়তে শুরু করলেন। কিতাবে এমনসব আলোচনা স্থান পেয়েছে, যা ইতিপূর্বে কেউ কখনও শোনেনি। আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাব তন্ময় হয়ে শুনছেন। কেয়ামতের ভয়াবহতা শুনে এক পর্যায়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। তিন দিন যাবৎ তিনি বেহুঁশ হয়ে ছিলেন। চতুর্থ দিনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাবের এমনও স্মৃতি আছে– একদিন তিনি গোসল করছিলেন। দিনটি ছিল শুক্রবার। গোসল করা অবস্থায় তার ছেলের তেলাওয়াত শুনলেন। ছেলে তেলাওয়াত করছে–

যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে। [সূরা মুমিন: ৪৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাব এই আয়াত শুনে সংজ্ঞা হারিয়ে সেখানেই পড়ে গেলেন!

তারা ছিলেন সেই সে মানুষ, আল্লাহ ﷻ-র সাথে যাদের অন্তরের গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তাদের গোনাহ কমে গিয়েছিল। তাওবা, প্রত্যাবর্তন, আল্লাহমুখীতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এজন্য আল্লাহ ﷻ তাদের লক্ষ্যে পৌঁছিয়েছিলেন।

মনীষা চরিতের বিরল কিতাব আল-কামালু ফী আসমাইর রিজাল এর লেখক প্রসিদ্ধ ও বিদগ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুল গনি মাকদিসি رحمه الله একবার গ্রেফতার হয়েছিলেন। তার সাথে একই জেলখানায় কজন কাফের বন্দীও ছিল। আব্দুল গনি মাকদিসি رحمه الله বন্দী জীবন শুরু। প্রথম রাতে ঘুম ছেড়ে অযু করে দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। অযু ছুটে গেলে আবার অযু করেন, সালাত পড়েন। কোরআন তেলাওয়াত করেন। আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়ার হাত তুলে অবিরাম কাঁদতে থাকেন। এভাবে তিনি রাত কাটিয়ে দেন।

কাফের বন্দীরা তার এ দৃশ্য অবলোকন করছিল। সকাল হতেই তারা কারারক্ষীদের কাছে গিয়ে বলল, 'আমাদের ছেড়ে দিন। আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, মোহাম্মদ আল্লার রাসূল।'

কারারক্ষীরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কিভাবে ঈমান গ্রহণ করলে?'

তারা বলল, 'আমরা এমন একটি রাত কাটিয়েছি, যা আমাদের সারা জীবনে প্রথম। আমরা যখন এই লোকটিকে (আব্দুল গনি মাকদিসি ﵀) সালাত পড়ে কান্না করতে দেখলাম, মনে হচ্ছিল– কেয়ামত বুঝি অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে!'

কথাবার্তা ওয়ায-নসিহতের তুলনায় আমল দিয়ে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকলে, যুহদ ও তাকওয়া, আল্লাহর সাথে নিগূঢ় সম্পর্ক ধরে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করলে তা বেশি ফলপ্রসূ। আমাদের পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম এ পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখিয়ে গেছেন। তাদের কাছে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি সবসময়ই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আব্দুল গন মাকদিস ﵀ এর ঘটনা আমাদের সে কথাই বলে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ﵀ এর এক ছাত্র বলেন, 'একদিন আমি তার সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। ভাবছিলাম– উসতায আমাদের মতই সালাত পড়ছেন। আমাদের মতই তেলাওয়াত করছেন। আমাদের মতই রোযা রাখছেন। অথচ আল্লাহ ﷻ তার সুখ্যাতি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বিশ্বময় তাকে উঁচু মর্যাদার অধিকারী করেছেন। কেন? কী এমন গোপন ভেদ?'

এসব ভাবতে ভাবতে আমরা একটি রুমে প্রবেশ করলাম। অন্ধকার রাত। হঠাৎ আমাদের রুমের বাতিটিও নিভে গেল। বাতি জ্বালানোর জন্য বের হলাম। বাতি জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ পর রুমে ফিরলাম। রুমে ফিরে দেখি উসতায কাঁদছেন। চোখের পানি বেয়ে বেয়ে তার দাড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে আপনার?'

তিনি বললেন, 'ছোট অন্ধকার এই রুমে আমার কবরের কথা মনে পড়েছে। আমি ভাবছি, কবর যেন কেমন হবে!'

আমি যে ভাবছিলাম, কী এমন গোপন ভেদে আল্লাহ বিশ্বময় তাকে উঁচু মর্যাদার অধিকারী করেছেন, উসতাযের এই কথা শুনে আমার ভাবনার অবসান হল। সে গোপন ভেদ আমি খুঁজে পেলাম!

কবর জগত এক ভীষণ জগত। সেখানে আরাম খোঁজ করবো, কিন্তু আরাম পাবো না। সেখান থেকে ফিরে আসতে চাইবো, কিন্তু ফিরতে পারবো না। সে

জগতে যাওয়ার আগেই আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি গ্রহণ আবশ্যক। আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন করা আবশ্যক।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ﵄ যখন জাহান্নামীদের ব্যাপারে বর্ণিত এই আয়াত পড়তেন– 'তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল হয়ে গেছে, যেমন তাদের সতীর্থদের সাথেও এরূপ করা হয়েছে–

> যারা তাদের পূর্বে ছিল। তারা ছিলো বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত। [সূরা সাবা: ৫৪]

তখন তিনি কান্না জুড়ে দিতেন আর বলতেন, 'আমার এবং আমার বাসনার মধ্যে অন্তরাল করো না।'

তাকে জিজ্ঞেস করা হল, 'আপনার বাসনা কী?'

তিনি বললেন, 'আমার বাসনা হল– কবরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করবো!'

কবরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করার কথা কখনও শোনা যায়? কবরে সালাত পড়ার কথা শুনেছে কেউ? কবরে আবার সওম-ও আদায় করে কেউ? আল্লাহ বলেন–

> তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল হয়ে গেছে, যেমন তাদের সতীর্থদের সাথেও এরূপ করা হয়েছে, –যারা তাদের পূর্বে ছিল। তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত। [সূরা সাবা: ৫৪]

আলী ﵁ এর ঘটনা। কুফা নগরীতে একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। কবরবাসীদের সালাম নিবেদন করলেন– 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূর! আনতুম সালাফুনা ওয়ানাহনু বিলআছার।' অতঃপর বললেন, 'তোমারদের কবর দেখতে কতো সুন্দর, কিন্তু ভিতরে তোমরা কেমন যেন আছ! কী খবর যেন তোমাদের! আমাদের খবর জানবে! তোমার রেখে যাওয়া ঘরবাড়িতে লোকজন বাস করছে। তোমার স্ত্রীর বিয়ে হয়ে গেছে। ধনসম্পদ বণ্টিত হয়ে গেছে। এই হল আমাদের খবর। তোমাদের খবর যেন কী!'

এরপর তিনি বললেন, "কবরবাসী তো চুপ। কোন কথা বলছে না। যদি তারা কথা বলতো, তাহলে এই কথাই বলতো–

আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। [সূরা বাকারা: ১৯৭]

খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আযিয ﵀। তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ একজন শাসক। বয়সে ছিলেন যুবক, চল্লিশের কোটাও পেরুতে পারেননি। ইবনে কাসির ﵀ তার স্মৃতিতে উল্লেখ করেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযিয ﵀ একবার ঈদের সালাত আদায় করলেন। উমাইয়া খেলাফতের আমীর-উযিররাও ছিলেন তার সাথে। সালাত শেষে তার সামনে বাহন আনা হল। তিনি বললেন, 'আমি একজন মুসলমান। আমি মানুষ।' একথা বলে তিনি সামনে চলতে লাগলেন।

তিনি যখন কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন দাঁড়ালেন। কবরবাসীদের সালাম জানালেন– 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূর।' আল্লাহ রব উচ্চারণ করে বললেন, 'কবর! তোমারে গর্ভে কত মসৃণ গাল আর কাজলমাখা চোখ আশ্রয় নিয়েছে! তারা পৃথিবীতে হেসেছে, খেলেছে, জীবনরাঙ্গা স্বপ্নও দেখেছে!'

অতঃপর তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে উঁচু গলায় বললেন, 'মরণ! বন্ধুদের কী করলি তুই!'

আবার আপন মনেই উত্তর খুঁজে বললেন, 'মরণ ওদের চোখের তারা মিলিয়ে দিয়েছে। ওদের চোখদুটি মাটিতে খেয়েছে। বাহু থেকে হাত খসে পড়েছে। কাঁধ থেকে বাহু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পায়ের পাতা ছিন্ন হয়েছে নলা থেকে, নলা ছিন্ন হয়েছে হাঁটু থেকে।'

চোখ মুদিলে নাই কিছু নাই, এই দুনিয়ায় বাধলি ঘর–

সেই ঘর ভালো তো সবই ভালো, মন্দ হলে সবই পর।

ধন কামালি মাল কামালি, চলে গেলি সব ছাড়ি

–ওয়ারিসরা সব নিয়ে নিল, মরার পরে সবাই পর...

ঐ দুনিয়ায় ঘর বাধো মন; ঘরের রক্ষী থাক রাযি

আহমদ হবেন প্রতিবেশী, নির্মাতা তার মহান রব...

ভবন হবে স্বর্ণালী তার মিসক হবে পলেস্তর

যাফরানি ঘাস তরুলতায় মাঠ-জমি-ঘাট সব উর্বর...

মানুষ! যাই করো না কেন, চিরস্থায়ী ভুবনের জন্য কিছু করো। অনন্ত অশেষ নির্বিঘ্ন জীবনের কিছু করো। সে জীবনের জন্য কিছু করলে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হবে। সে সাড়ম্বর জীবনে আনতনয়না হুরগণ গানে গানে আহ্বান জানাবে–

আমরা অনন্ত সঙ্গিনী, আমাদের ধ্বংস নেই। আমরা সুখ-সম্পদশালীনী, আমাদের অভাব নেই। (আমরা আমাদের মালিকদের প্রতি তুষ্ট) অসন্তুষ্টি নেই আমাদের। মোবারক সেসব ব্যক্তি, যারা আমাদের এবং আমরা যাদের! (তিরমিযির হাদীসের আলোকে অনুদিত) [তিরমিযি : ২৫৬৪]

যারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, কুচরিতার্থ ও গান-বাজনা থেকে বেঁচে থাকবে, তাদের জন্য এই নেয়ামত। যারা গোনাহ থেকে বাঁচবে না, গান-বাজনা করবে, কুচরিতার্থ করবে, তারা এই নেয়ামত ভোগ করতে পারবে না। ইবনুল কায়্যিম ﷺ বলেন–

মধুময় আবেশে, মৃদুময় বাতাসে, কেঁপে কেঁপে নড়ে ওঠে লতা পাতা শাখ

কানে কানে মানুষের, বেজে ওঠে কী সুরের! তালে লয়ে গানে অনুরাগ

মন ভরে শুনি তবু, মন ভরে নাকো কভু, জান্নাতে আল্লাহর দান!

তবলা ও বেহালা, সেতারা ও দোতারা, বাঁশরীর কী শোন গো গান?

এই হলো জান্নাতের গান। জান্নাতে যে এই গান শুনতে চায়, সে দুনিয়ার পাপিষ্ঠ গান থেকে দূরে থাকুন। যে অন্তর জান্নাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, সে অন্তর পার্থিব তৃপ্তি থেকে বেঁচে থাকুন। যে চোখ জান্নাতের নেয়ামতরাজি দেখতে চায়, সে চোখ দুনিয়ার হারাম দৃশ্য দেখা থেকে বিরত থাকুন।

আমাদের সালফে সালেহীন আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য আল্লাহভীতির বাহনকে সবচেয়ে নিরাপদ বাহন হিসেবে ব্যবহার করতেন। খোদভীতির মাধ্যমেই তারা আল্লাহর এত নৈকট্যভাজন হতে পেরেছিলেন। ইবনে আব্বাস ؓ সারারাত একটি মাত্র আয়াত পড়তেন আর এই আয়াতটি পড়ে পড়েই সারারাত খুব কাঁদতেন–

তোমাদের আশার উপর ভিত্তি নয়, আহলে কিতাবের আশার উপরও ভিত্তি নয়। যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহর ছাড়া নিজের কোন সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না। [সূরা নিসা: ১২৩]

ইবনে আব্বাস ﵁ এর ছাত্র আতা ইবনে আবি রাবাহ ﵀ বলেন, 'আমি ইবনে আব্বাসের চোখ সবসময় ভেজা রশির মতো আর্দ্র দেখতাম।'

ইবনে আব্বাসের জীবনি সংকলকগণ লিখেন, তায়েফে তার ইন্তেকালের পর যখন কাফন পরিয়ে জানাযার জন্য উপস্থিত করা হয়, তখন একটি পাখি এসে তার কাফনের উপর বসে। এক শ্রোতা পাখির কণ্ঠে কোরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করতে শোনে–

'হে প্রশান্ত মন!

তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।

অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও

এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।'

যে মন আল্লাহ ﷻ-কে প্রভু মেনে সন্তুষ্ট হয়েছে, মোহাম্মদ ﷺ-কে নবি পেয়ে ধন্য হয়েছে, ইসলামকে ধর্ম পেয়ে বিজয়ী হয়েছে, সে মন আল্লাহর বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। সে মন জান্নাতে প্রবেশকারী। আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে এটা তার পুরস্কার।

পৃথিবীতে আল্লাহকে সবচেয়ে ভয় পেতেন রাসূল ﷺ। সহীহ বুখারীতে আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, "রাসূল বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু আমি।"

ইবনে মারদূয়া ﵀ বিলাল রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, বিলাল বলেন– আমি একদিন ভোররাতে রাসূলের কাছে গিয়েছি সালাতের ঘোষণা দেয়ার জন্য। গিয়ে দেখলাম, রাসূল কাঁদছেন। আমি রাসূলকে বললাম, 'আমার বাবা-মা আপনার জন্য কোরবান হোক! কোন জিনিস আপনাকে কাঁদিয়েছে!'

রাসূল ﷺ বললেন, "বেলাল! আমার উপর কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যে ব্যক্তি আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে, অথচ তা নিয়ে চিন্তা করে না, তার জন্য দুর্ভোগ! আয়াতগুলো হল–

নিশ্চয় আসমান ও যমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও যমিন সৃষ্টির বিষয়ে। তারা বলে, 'পরওয়ারদিগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই। আমাদের তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। [সূরা আলে ইমরান: ১৯০, ১৯১] [তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/৪৪১]

দোযখের আগুন থেকে বাঁচার ফরিয়াদ সকলের জরুরি। দোযখের আগুন থেকে বাঁচা যাবে আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করার মাধ্যমে। আল্লাহ ﷻ-র গোস্বা থেকে বাঁচা যাবে আল্লাহভীতির মাধ্যমে।

রাজাদের গোলাম যখন শুভ্রকেশী হয়, রাজাগণ তাদের আযাদ করে দেন ন্যায়সঙ্গতভাবে।

প্রভু! এই ন্যায়পরায়ণে তুমিই উত্তম; আমার কেশ শুভ্র হয়েছে, আমায় আযাদ করো আগুন থেকে।

ইমাম আহমাদ رحمه الله এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি যখন ঘরে নিভৃতে বসতেন, এক পায়ের উপর আরেক পা আড়াআড়িভাবে রেখে বসতেন। স্থির হয়ে বসতেন। ভীত প্রকম্পিত হয়ে বসতেন। যখন মানুষের সামনে আসতেন, তখন তার ভিতর সেই প্রকম্পন দেখা যেত না। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমার সাথে একজন পাহারাদার আছেন। তিনিও আমার সাথে একত্রে বসেন।'

ইমাম আহমাদ رحمه الله এর কথা সেই হাদিসের বাস্তবতা– রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

أَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِيْ

আল্লাহ বলেন, যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সহচর। [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ১২৬৫]

আবু হোরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত,

فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ

আল্লাহ বলেন, যে আমাকে আপন মনে স্মরণ করে, আমি তাকে আপন মনে স্মরণ করি। যে আমাকে মানুষের মজলিসে স্মরণ করে, আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। [বুখারি : ৭৪০৫]

আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের অন্যতম আরেকটি উপসর্গ হল ইখলাস। আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ মনে আমল করা। যে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে আমল করে, তারাই আমলের সাওয়াব ও প্রতিদান পায়। আল্লাহ ﷻ বলেন–

তাদের এ ছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে। [সূরা বায়্যিনা: ০৫]

জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদত আল্লাহরই জন্য। [সূরা যুমার: ০৩]

কোন এবাদতে আল্লাহ ﷻ ব্যতীত আর কাউকে দেখানো বা শোনানোর মানসিকতা না থাকাই ইখলাস। আল্লাহ ﷻ বলেন–

আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করবেন না। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হবে। বিধান তারই, এবং তোমরা তারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। [সূরা কাসাস : ৮৮]

ইখলাস ছাড়া আল্লাহ ﷻ-র কাছে কোন আমলের বা এবাদতের গ্রহণযোগ্যতা নেই। আমলের মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়ার এটিই শ্রেষ্ঠ রাস্তা। এটিই উন্মুক্ত দরজা। রাসূল ﷺ মুয়ায رضي الله عنه-কে বলেন–

يَا مُعَاذُ! أَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْقَلِيْلُ مِنَ الْعَمَلِ

মুয়ায, তোমার এবাদত নিষ্ঠাপূর্ণ কর। অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। [মুস্তাদরাকে হাকিম : ৭৯১৬]

প্রচারমুখী আমল প্রচুর হলেও কোন কাজে আসবে না। নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচারবিমুখ আমল অল্প হলেও প্রচুর আমলের মতো হবে। সে আমল বরকতপূর্ণ হবে। নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত হবে আলেম মুজাহিদ এবং ব্যবসায়ী দ্বারা। কারণ, তারা প্রচারপ্রিয় ছিল। দুনিয়াতে মানুষকে দেখানোর জন্য তারা আমল করেছিল। [তিরমিযি : ২৩৮২]

মুয়াবিয়া ﵁ উক্ত হাদিস শুনে কান্না শুরু করে দিয়েছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, আল্লাহ সত্যই বলেছেন–

> যে ব্যক্তি পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দিবো এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হলো সেসব লোক, আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিলো, সবই বরবাদ করেছে। আর যা কিছু উপার্জন করেছিলো, সবই বিনষ্ট হয়েছে। [সূরা হূদ: ১৫, ১৬]

জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সুফয়ান ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ

> যে লোক দেখানোর জন্য আমল করে, আল্লাহ তা লোকের কাছে দেখিয়ে দেন। যে মানুষের কাছে প্রশংসা শোনার জন্য আমল করে, আল্লাহ তাকে মানুষের প্রশংসা শুনিয়ে দেন। [বুখারি : ৬৪৯৯]

যে তার আমল প্রচার করতে চায়, আল্লাহ ﷻ তার আমল প্রচার করিয়ে দেন। আল্লাহর কাছে সে আমলের কোন প্রতিদান থাকে না। যে মানুষের কাছে সম্মান পাওয়ার জন্য আমল করে, আল্লাহ ﷻ তাকে মানুষের কাছে সম্মানিত বানিয়ে দেন। আখিরাতের সাওয়াব সে বিলকুল পায় না।

আহমদ ﵀ আদি ইবনে হাতেম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাবা আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন। মেহমানের মেহমানদারী করেন। দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। তিনি আল্লাহর কাছে এর বিনিময়ে কিছু পাবেন কি?'

রাসূল বললেন– 'না। তোমার বাবা এসব আমল দ্বারা (পার্থিব) কিছু আশা করেছিল। আল্লাহ তাকে তা পাইয়ে দিয়েছেন।' [আহমাদ : ১৮৮৯৬]

সে যেহেতু দুনিয়াতে নামধাম চেয়েছিল, সম্মান চেয়েছিল, সুতরাং আল্লাহর কাছে এই আমলের কোন প্রতিদান নেই। দুনিয়াতে সে নামধাম সম্মান পেয়ে গেছে।

আয়েশা رضي الله عنها রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইবনে জুদয়ান দান-সদকা করে। সে সম্মানী ব্যক্তি। তার এসব আল্লাহর কাছে কোন কাজে আসবে কি?'

রাসূল উত্তরে বললেন–

لَا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

> আল্লাহর কাছে এসব তার কোন কাজে আসবে না। সে জীবনে কখনও আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেনি– আল্লাহ, কেয়ামতের দিন আমার ভুলগুলো মাফ করে দিন। [মুসলিম : ৫৪০]

সর্বোপরি সততা ও নিষ্ঠা আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক। প্রকৃত বান্দা হওয়ার প্রধান নিক্তি। প্রথম ধাপ। আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হওয়ার অনেক ধাপ থাকলেও এটিই হল অন্যতম। ইখলাস ও নিষ্ঠা ছাড়া কোন আমল হয় না। আর আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া ইখলাস ও নিষ্ঠা অর্জিত হয়না। ইখলাসের জন্য আনুগত্য ও নিয়তের সততা আবশ্যক। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> অতএব জিহাদের সিদ্ধান্ত এলে তারা যদি আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তাহলে তাদের জন্য তা মঙ্গলজনক হবে। [সূরা মোহাম্মদ : ২১]

এক গ্রাম্য সাহাবি রাসূলের দরবারে আসলেন। রাসূলের হাতে বাইয়াত হলেন। রাসূলের দরবারে তখন একটি বকরি হাদিয়া আসল। রাসূল বকরিটি ঐ সাহাবিকে হাদিয়া দিয়ে দিলেন। তখন তিনি বললেন, 'আপনার জন্য আল্লাহর মাগফিরাত। আমি বকরি লাভের জন্য বা অন্য কোন মালের জন্য আপনার হাতে বাইয়াত হইনি। আমি আপনার হাতে বাইয়াত হয়েছি, যেন একটি অনিয়ন্ত্রিত তীর আমার বুকে বিঁধে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'যদি তুমি সত্য বলে থাক, আল্লাহ এর বাস্তবায়ন ঘটিয়ে তোমার সততা প্রমাণ করবেন।'

এরপর এক যুদ্ধে ঐ সাহাবি শহীদ হলেন। রাসূল তার লাশ দেখে বললেন, 'সে আল্লাহর সাথে সততা রেখেছে। আল্লাহও তাকে সত্যায়িত করেছেন।' [নাসায়ি : ১৯৫৩]

মানুষ আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়ার জন্য, তার আনুগত্যের উপর আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার জন্য ইখলাস অতি আবশ্যক।

ইখলাস ও নিয়ত এমনই একটি বিষয়, কোন ব্যক্তি একটি ভালো কাজের নিয়ত করে যদি উক্ত কাজ সম্পন্ন করতে না পারে, তথাপি নিয়তের কারণে সে ভালো কাজের সাওয়াব পাবে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, 'মুমিনের নিয়ত তার আমলের চেয়ে ফলপ্রসু, উত্তম।' [মাজমাউদ যাওয়াইদ : ২১২]

সাহল ইবনে হানিফ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

যে আল্লাহর কাছে শহিদি মৃত্যু চায়, মন থেকে সততার সাথে চায়, সে যদি আপন বিছানায়ও মারা যায়, তথাপি আল্লাহ তাকে শহিদের মর্যাদা দান করেন। [মুসলিম : ১৯০৯]

মূল কথা– কেউ অন্তর থেকে চাইলে আল্লাহ ﷻ তাকে কখনও কখনও তা পাইয়ে দেন। ওমর رضي الله عنه এক হজ্জের সফরে আবতাহে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আমার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ শেষ। আমার অস্থি-মজ্জা দুর্বল হয়ে গেছে। আমার মৃত্যু নিকটবর্তী। আমাকে তোমার রাসূলের শহরে শহিদের মৃত্যু দান কর।'

আল্লাহ ﷻ তার মনের সততা জানতেন। আল্লাহ ﷻ তার দোয়া কবুল করেছেন। মদিনাতেই এক দুর্ভাগা অগ্নিপূজারীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হওয়ার জন্য ইখলাসপূর্ণ আমল করা আবশ্যক। রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ আবশ্যক। রাসূলের অনুসরণ এবং ইখলাসপূর্ণ সাথে আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য।

রিয়া বা প্রচারপ্রিয়তা এমন এক সূক্ষ্ম ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি, যা মানুষের মধ্যে অজান্তেই সংক্রমণ করে। এবাদতকারীর এবাদতের মধ্যে, আলেমের ইলমের মধ্যে, দাঈর দাওয়াতের মধ্যে, দানবীরের দানের মধ্যে, মুজাহিদের জিহাদের মধ্যে অনায়াসেই রিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটে।

রিয়া থেকে বাঁচার তিনটি পন্থা রয়েছে–

এক.

বান্দা এই অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস মনে জাগ্রত রাখবে যে, সকল ভালো-মন্দের মালিক কেবলই আল্লাহ ﷻ। তিনিই দান করেন, দান থেকে বিরত

থাকেন। তিনি জীবন দান করেন, মৃত্যু দান করেন। তিনি রিযিক দান করেন, রিযিক উঠিয়ে নেন। তার হাতেই সকল কাজের চাবিকাঠি।

দুই.

বান্দা বিশ্বাস রাখবে, দুনিয়া ধ্বংসশীল। সে অচিরেই মৃত্যুবরণ করবে। সে তার আমলের প্রতিদান পাবে। তার হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। ভালো কাজ করলে ভালো প্রতিদান পাবে। মন্দকাজ করলে মন্দ প্রতিদান পাবে।

তিন.

আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব মনে জাগরিত রাখবে। তাওবা, ইসতিগফার, দোয়ায় নিরত থাকবে। সকাল সন্ধ্যা এই দোয়া পড়বে–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

[মাজমাউদ যাওয়াইদ : ১৭৬৭০]

সবিশেষ, মানুষের অন্তর জীবিত থাকবে আল্লাহর দাসত্ব দ্বারা। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন দ্বারা। আমরা যেন দাসত্বের সেই স্থান অর্জন করার জন্য সচেষ্ট ও উদ্যোগী থাকি। আল্লাহ ﷻ আমাদের তাওফীক দান করুন।

আল্লাহকে ভয় করুন

কল্যাণময় আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র। স্থাপন করেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র। অনুসন্ধানপ্রিয়, সকৃতজ্ঞ বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীল রাত ও দিন। তিনি আল্লাহ, বান্দাদের সবকিছু দেখেন। সবকিছু জানেন। হৃদয়মথিত সকল প্রশংসা শুধু সেই আল্লাহরই।

আল্লাহ, আমরা যা ভালো কথা বলি, আমাদের ভালো কথার মত আরও যা ভালো কথা আছে, তারও চেয়ে যা ভালো কথা আছে, সবকিছুর জন্যই তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। হে আল্লাহ! খ্যাতিমান তোমার গৌরব! মহিমান্বিত তোমার প্রশংসা! পবিত্রতর তোমার স্বার্থক নামসমূহ! তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, হে আল্লাহ!

মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আমাদের হাদি; কল্যাণের পথ প্রদর্শক। আমাদের মুবাশ্বির; ভালো কাজের ভালো পরিণতির সংবাদবাহক। আমাদের নাযীর; মন্দ কাজের মন্দ পরিণতির সংবাদবাহক। তিনি আল্লাহ ﷻ-র আদেশে আল্লাহর দিকে আহ্বায়ক। তিনি আমাদের উজ্জ্বল প্রদীপ।

হে রাসূল! আপনি আল্লাহর সকল সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। আপনি আপনার আমানত পূর্ণ করেছেন। উম্মতকে নসিহত করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। আপনার দ্বারাই আল্লাহ ﷻ আমাদের মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিয়েছেন, মানবিকতার চেতনা জাগ্রত করেছেন, পৌত্তলিকতার অস্তিত্ব লণ্ডভণ্ড করেছেন।

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ﷻ ছাড়া ইলাহ নেই। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্লাহ ﷻ মানুষকে অন্তর দিয়েছেন। যে অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই, সে অন্তর আক্ষরিক অন্তর নয়।

আল্লাহ ﷻ মানুষের জীবন দিয়েছেন। যে জীবনে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি মনোযোগ নেই, সে জীবন জীবন নয়। সে মানুষ জীবিত নয়। মৃত। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আর যে মৃত ছিল, আমি তাকে জীবিত করেছি, এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, –সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে! সেখান থেকে বের হতে পারছেনা? [সূরা আনয়াম : ১২২]

মানুষ দুনিয়ায় আগমন করে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়। এমন সঙ্কুল পথের মুসাফির হয়, যার নির্বিঘ্ন নিরাপত্তা অর্জন হয় আল্লাহর ভয় অর্জনের মাধ্যমে।

> অতএব আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তার তরফ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। [সূরা যারিয়াত: ৫০]

যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে, কেঁদেছিলে তুমি হেসেছিলো সবে।

এমন জীবন তুমি করো গঠন, মরণে হাসবে তুমি কাঁদবে ভুবন।

দাসত্ব ও আনুগত্য মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মানজনক সম্পদ। মানুষের জীবনকে সবেচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ করে তোলে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য। আল্লাহর নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্যের মাঝেই রয়েছে মানুষের সমূহ বিপদাপদের মুক্তি ও নিস্কৃতির নিশ্চয়তা। দাসত্ব ও আনুগত্য মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হওয়ায় আল্লাহ তার শ্রেষ্ঠ রাসূলকে জীবনের সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে আল্লাহর দাস বা আল্লাহর বান্দা বলে সম্বোধন করেছেন। এই সম্বোধনই মানুষের সবেচেয়ে সম্মানজনক সম্বোধন।

রাসূলের জীবনের অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত প্রেক্ষাপট তার কাছে কোরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট। আল্লাহ ﷻ তার রাসূলকে সে গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটে আল্লাহর বান্দা উপাধিতে সম্বোধন করেছেন। বলেছেন–

> পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তার বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়। [সূরা ফুরকান: ০১]

রাসূলের জীবনব্রত দায়িত্ব মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা এবং মানুষের কাছে আল্লাহর আহ্বান পৌঁছানো। মানুষকে খারাপ কাজের কুপরিণতি এবং ভাল

কাজের সুপরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। সেই জীবনব্রত দায়িতে ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও আল্লাহ ﷻ তার রাসূলকে নিজের বান্দা বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন–

> আর যখন আল্লাহর বান্দা তাকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হল, তখন অনেক জিন তার কাছে ভিড় জমাল। [সূরা জিন : ১৯]

রাসূলের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ইসরা ও মেরাজ। আল্লাহ ﷻ ইসরা ও মেরাজের আয়াতে রাসূলকে নিজের বান্দ উপাধীতে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন–

> পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। [সূরা বনী ইসরাঈল: ০১]

কেউ আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হতে না পারলে সে পথ হারাবে। ভ্রষ্ট হয়ে ঘুরবে দুনিয়ার অলিগলিতে। ক্ষতিগ্রস্থ হবে আখেরাতে। সন্দেহাতীত কেয়ামতের দিন আল্লাহ ﷻ-র সামনে দাঁড়াবে অন্ধ হয়ে।

আল্লাহ ﷻ-র ভয়ে প্রকম্পিত বান্দাদের জন্য আল্লাহ কিছু ওয়াদা দিয়েছেন–

> যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। [সূরা রাহমান : ৪৬]

> যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোর ভয় করেছে এবং খেয়াল খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত। [সূরা নাযিয়াত: ৪০, ৪১]

কারো অন্তরজুড়ে আল্লাহ ﷻ-র নিষ্ঠাপূর্ণ ভয় থাকলে সে আল্লাহর কাছে সবচে মর্যাদাশীল। আল্লাহভীরুরাই সঠিক পথের পথিক। গন্তব্যের পথযাত্রী। সুন্দর আমলের অধিকারী। সুন্দর আমল মুমিনের ভূষণ। অসুন্দর আমল হল মোনাফেকের আলামত।

রাসূল ﷺ আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় পেতেন। রাসূল ﷺ সাহাবিদের বলতেন–

إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا

তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু আমি। আল্লাহকে সবচেয়ে ভালো জানি আমি। [বুখারি : ২০]

ইবনে মারদূয়া رحمه الله বেলাল رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন, বেলাল বলেন একদিন ভোররাতে রাসূলের কাছে গেলাম সালাতের ঘোষণা দেয়ার জন্য। গিয়ে দেখি রাসূল ﷺ কাঁদছেন। আমি বললাম, 'আমার বাবা-মা আপনার জন্য কোরবান হোক! কোন জিনিস আপনাকে কাঁদিয়েছে!'

রাসূল বললেন–

বেলাল! আমার উপর কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যে ব্যক্তি আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে অথচ তা নিয়ে চিন্তা করে না, তার জন্য দুর্ভোগ! আয়াতগুলো হল–

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

নিশ্চয় আসমান ও যমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও যমিন সৃষ্টির বিষয়ে। তারা বলে, পরওয়ারদিগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই। আমাদের তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। [আলে ইমরান: ১৯০, ১৯১] [তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/৪৪১]

অর্থাৎ, যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবন করে না, সে হতভাগা। তার অন্তর মোহরাঙ্কিত। মোহরাঙ্কিত অন্তর গোনাহ ও পাপাচারের প্রতিই ধাবমান।

সাহাবিদের কারো কারো মতে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো ইসলামের আবির্ভাবের মাত্র চার বছর পর অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ تعالى সাহাবিদের উদ্দেশে বলছেন–

যারা মুমিন তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের

মতো যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। অতঃপর তাদের অন্তকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। [সূরা হাদিদ : ১৬]

তোমরা যেনে রাখ আল্লাহই ভূ-ভাগে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। আমি পরিষ্কারভাবে তোমাদের জন্য আয়াতগুলো ব্যক্ত করেছি যাতে তোমরা বোঝ। [সূরা হাদিদ : ১৭]

আল্লাহ ﷻ যেভাবে ভূ-ভাগকে বৃষ্টি ও পানি দ্বারা জীবিত করেন, আশা রাখি– আল্লাহ ﷻ আমাদের অন্তরও সেভাবে জীবিত করুন।

সুলতান নূরুদ্দিন رحمه الله। ইসলামের একজন মহান সুলতান। রাতভর এবাদতে মগ্ন থাকতেন, দিনে রোযা পালন করতেন। ইবনে তাইমিয়া رحمه الله তার কথা উল্লেখ করে লিখেন, আল্লাহ এই মহান ব্যক্তির উপর রহম করুন। আল্লাহ কাকে হেদায়াত দান করেন বলা যায় না। ধনী-গরীব, ছোট-বড়, শেতাঙ্গা-কৃষ্নাঙ্গা নির্বিভেদে আল্লাহ হেদায়াত দান করেন। আল্লাহ ﷻ হেদায়াতপ্রত্যাশী অন্তর ভালো করেই চিনেন। যে অন্তর হেদায়াত চায়, আল্লাহ ﷻ সে অন্তরকে হেদায়াতের আলো দান করেন।

ইবনে কাসির رحمه الله ঐতিহাসিক আল বিদায় ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে সুলতান নূরুদ্দিন رحمه الله এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেন–

সুলতান নূরুদ্দীন যখন তার বাহিনীসহ দামেস্কে প্রবেশ করেন, তখন তিনি শরীয়তের ব্যাপারে একটু আত্মবিস্মৃত ও উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। খুব বড় সরোবরে মেহেরজান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে জাঁকালো জৌলুশপূর্ণ অনুষ্ঠানে সবধরণের মানুষের উপস্থিতি ছিল। তার আমলা-মন্ত্রীরাও উপস্থিত হল। অনুষ্ঠান প্রায় শেষ, একজন আলেম সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি ইবনে ওয়াসেতি রাহি.। ইবনে ওয়াসেতি আপন লেবাসে-পোষাকে সেখানে প্রবেশ করলেন। সোজা সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সুলতানকে উদ্দেশ করে বললেন, 'হে আসমান-যমিনের সুলতানের কাছে ওয়াদাবদ্ধ সুলতান! শোন।'

তার এ কথার সাথে সাথে অনুষ্ঠানে একটি সাড়া পড়ে গেল। সকলে দাঁড়িয়ে গেল ইবনে ওয়াসেতির কথা শোনার জন্য।

ইবনে ওয়াসেতি সিংহাসনে উপবিষ্ট সুলতানকে উদ্দেশ করে বললেন–

'হে প্রতারিত বাদশাহ! কেয়ামতের ময়দানে নিজের অবস্থা একটু ভেবে দেখুন।

সেদিন যদি বলা হয়– আপনি মুসলমান, তাহলে একটি বিষয়ে ভয় রাখুন– যদি আপনার কোন নূর না থাকে!

যে মদের পেয়ালা হারাম করা হয়েছে, সে মদের পেয়ালা আজ আপনার পাশে নেশা ছড়াচ্ছে!'

ইবনে ওয়াসেতির কথা শুনে সুলতান নূরুদ্দীন অঝোরে কাঁদতে শুরু করলেন...

আবু যর ﵁ বর্ণনা করেন, একবার আমি রাসূল ﷺ-র কাছে রাত যাপন করেছিলাম। তিনি ঘম থেকে উঠে নফল সালাত পড়তে শুরু করলেন। আমি শুনছিলাম, তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করলেন এবং খুব কাঁদতে থাকলেন। আবার বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করে কাঁদতে থাকলেন। আবার বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করে কাঁদতে থাকলেন। এরপর তিনি বলছিলেন, 'সে ব্যক্তি দুর্ভাগা, যে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত।'

রাসূল ﷺ একদিন ইবনে মাসউদ ﵁-কে কোরআন তেলাওয়াত শোনাতে বললেন। ইবনে মাসউদ বললেন, 'কোরআন নাযিল হয়েছে আপনার উপর, আর আমি আপনাকে কোরআন শোনাবো!'

রাসূল ﷺ বললেন, 'আমাকে কোরআন শোনাও। আমি অন্যের কাছ থেকে কোরআন শুনতে পছন্দ করি।'

ইবনে মাসউদ সূরা নিসা থেকে তেলাওয়াত শুরু করলেন। তেলাওয়াত করতে করতে তিনি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন–

> আর তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনবো প্রতিটি উম্মত থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকবো তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে! [সূরা নিসা : ৪১]

এ আয়াত তেলাওয়াত করতেই রাসূল তাকে থামিয়ে বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে।' রাসূল অঝোরে কঁদতে থাকলেন। [বুখারি : ৪৫৮২]

রাসূল ﷺ-র আল্লাহভীতি ছিল তুলনাহীন। মিতরাফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শাখির رحمه الله বর্ণনা করেন, রাসূল নফল সালাতে দাঁড়ালে তার বক্ষ থেকে জলটগবগ কড়াইয়ের মতো কান্নার গুঞ্জরণ শোনা যেতো!

এ যুগে আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে কান্না করে কজনে! মৃত্যুর স্মরণ করে কজনে! বন্ধু স্বজন স্ত্রী সম্পদহীন নির্জন রিক্ত সঙ্কীর্ণ কবরের কথা স্মরণ রাখে কে! আল্লাহর কসম! যে মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখে, কবরের কথা মনে আওড়ায়, সে অবশ্যই দুনিয়াবিমুখ। আল্লাহভীরু অনুতপ্ত বান্দা।

ইবনে কাসির رحمه الله আল বিদায় ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযিয رحمه الله একবার ঈদের সালাত আদায় করলেন। আমীর-উযিররাও ছিলে তার সাথে। সালাত শেষে তার সামনে বাহন আনা হল। তিনি বললেন, 'আমি একজন মুসলমান। আমি মানুষ।' একথা বলে তিনি সামনে চলতে লাগলেন।

ওমর ইবনে আব্দুল আযিয কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। দাঁড়ালেন সেখানে। কবরবাসীদের সালাম জানালেন– 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূর।' অতঃপর আল্লাহ উচ্চারণ করে বললেন, 'কবর! তোমারে গর্ভে কত মসৃণ গাল আর কাজলমাখা চোখ আশ্রয় নিয়েছে!'

এ কথা বলে তিনি সাথে থাকা মন্ত্রী ও সহচরদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখো! তারাও পৃথিবীতে হেসেছে, খেলেছে, জীবনরাঙ্গা স্বপ্নও দেখেছে!'

অতঃপর তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে উঁচু গলায় বললেন, 'মরণ! বন্ধুদের কী করলি তুই!'

আবার আপন মনেই উত্তর খুঁজে বললেন, 'মরণ ওদের চোখের তারা মিলিয়ে দিয়েছে। ওদের চোখদুটি মাটিতে খেয়েছে। বাহু থেকে হাত খসে পড়েছে। কাঁধ থেকে বাহু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পায়ের পাতা ছিন্ন হয়েছে নলা থেকে, নলা ছিন্ন হয়েছে হাঁটু থেকে।'

এসব বলে তিনি কান্না শুরু করলেন। কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে পড়লেন।

এই মহান খলিফা আল্লাহকে ভয় করেছিলেন। আল্লাহ ﷻ তাকে দুনিয়াতে সফল করেছেন, আখেরাতেও –ইনশাআল্লাহ– সৌভাগ্যশীল বানিয়েছেন।

আমরা উত্তরসূরীরা আজও তার নাম স্মরণ করলে গভীর অন্তর থেকে দোয়া করি– রাহিমাহুল্লাহু। আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

খলিফা মৃত্যুবরণ করেছিলেন ঈদের দিন। সকলে নতুন নতুন পোষাক পরে ঈদগাহে রওয়ানা হচ্ছে। তিনি কিছু পরিধান করলেন না। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে আপনার? ঈদগাহে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন না যে?'

তিনি বললেন, 'মনে হচ্ছে, আজ আমার মৃত্যুর দিন। আমি আজ আমার রবের সাথে দেখা করবো।'

লোকেরা চলে গেল। তার স্ত্রী তার কাছে আসলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে আপনার? কী দেখছেন আপনি?'

তিনি বললেন, 'তুমি এখান থেকে যাও। আমি দেখছি– মানুষও নয়, জিনও নয়, এমন একটি দল ঈদের সালাত আদায় করছে।'

ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেন, মানুষও নয়, জিনও নয়, –এরা ছিল ফেরেস্তা।

খলিফার কথায় তার স্ত্রী সেখান থেকে চলে গেলেন। পরক্ষণেই তার রূহ কব্জ করা হয়। তিনি তার প্রভুর সাক্ষাতে চলে যান... রাহিমাহুল্লাহু। আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, যে ভয় মানুষকে গোনাহ থেকে দূরে রাখবে, সেই ভয়ই আল্লাহর কাছে মৌলিক। এর অতিরিক্ত ভয় আল্লাহ-র কাছে অমন উদ্দীষ্ট নয়। সাহাবায়ে কেরাম আমাদের চেয়ে বেশি মর্যাদা রাখার প্রধান অবলম্বন হল আল্লাহর ভয়। আমাদের তুলনায় তারা আল্লাহ-কে অনুপমেয় ভয় করতেন।

ইমাম আহমদ কিতাবুয যুহদ-এ আবু বকর এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন–

আবু বকর মদিনায় এক আনসার সাহাবির খামারে প্রবেশ করলেন। তার সাথে আরো কজন সাহাবি ছিলেন। খামারে খেজুর গাছগুলো ফলে পরিপূর্ণ। খেজুরের কাঁদিগুলো বাতাসে দুলছে। গাছে গাছে উড়ছে পাখির ঝাঁক।

সাহাবায়ে কেরাম নির্ঝর বাতাসে একটু প্রশান্তি অনুভব করছিলেন। ওদিকে আবু বকর ﵁ বসে কান্না করছিলেন।

সাহাবায়ে কেরাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে আপনার?'

তিনি বললেন, 'আপনারা দেখুন, এই যে পাখিগুলো, এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ছে। গাছে গাছে উড়ে বেড়িয়ে পানির ঘাটে পানি খাচ্ছে, এরপর মরে যাবে, পাখিগুলোর কোন হিসাব নেই! কোন আযাব নেই! হায়! আমি যদি পাখি হতাম! তাহলে আমিও মরে যেতাম। আমার কোন হিসাব হত না। আযাব হত না। আমার মা যদি আমাকে গর্ভে না নিতেন!'

এই বলে আবু বকর আরো অশ্রু ঝরিয়ে কাঁদতে থাকলেন। সাহাবিরাও কান্না জুড়ে দিল।

এই ছিলেন আবু বকর ﵁। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি। তথাপি তিনি আল্লাহর ভয়ে বিচলিত ছিলেন। বিচারের দিন হিসাবের ভয়ে অস্থির ছিলেন। তিনি বলতেন– 'আমার এক পা জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত নিজেকে আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ মনে করি না। দুর্ভাগা ক্ষতিগ্রস্তরাই কেবল আল্লাহর আযাব থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করে। যে নিজেকে আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ মনে করে, আল্লাহ ﷻ তার পথের মোড় ঘুরিয়ে দেন। আল্লাহ ﷻ তার দৃষ্টি নিভিয়ে দেন।'

ইবনুল কায়্যিম ﵀ বলেন, অনেক দৃশ্য অনেক রয়েছে যে, দুজন ব্যক্তি একই কাতারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছেন। অথচ দুজনের সালাতে আকাশ-পাতালের তফাৎ রয়েছে। অনেকে যখন সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ ﷻ-র প্রতিশ্রুতির ভয়ে কম্পিত হয়। আল্লাহ ﷻ-র সাক্ষাতের ভয় করে। আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে ভয় করে। চিন্তা করে, অচিরেই সে বিচারের ময়দানে এভাবে হিসাবের জন্য দাঁড়াবে। মানুষ যেভাবে কাতারবন্ধ হয়ে সালাতে দাঁড়ায়, সেভাবেই বিচার দিনে কাতারবন্ধ হয়ে আল্লাহ ﷻ-র সামনে দাঁড়াবে।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

> বান্দা সালাতে দাঁড়ালে আল্লাহ ﷻ তার দিকে খেয়াল করেন। বান্দা যতক্ষণ সালাতে আল্লাহর দিকে একমনে থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ তার দিকে খেয়াল

রাখেন। বান্দা যখন আল্লার দিক থেকে মন ঘুরিয়ে নেয়, আল্লাহ ﷻ তখন তার দিকে আর খেয়াল রাখেন না। [আহমদ : ২০৯৯৭]

ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, একজন সফল মুমিন দুনিয়াতে যা কিছু দেখে, সবকিছুতেই তার আখেরাতের চিন্তা জেগে ওঠে। মুমিন যখন ঘুমোতে যায়, গায়ে কম্বল জড়ায়, তখন তার কবরের কথা মনে পড়ে। দুনিয়ার নেয়ামতরাজি, ফুলফল, সবুজ বনানী দেখে জান্নাতের স্বপ্ন দেখে। অগ্নিদৃশ্য, দণ্ডভোগীদের দেখে, বন্দী শিবির দেখে জাহান্নাম থেকে বাঁচার আকুতিতে মুমিনের অন্তর হাহাকার করে ওঠে। আমরা সকলেই আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই। আমরা সকলেই আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার কথা যেন স্মরণ রাখি।

খলিফা মাহদি আব্বাসি মসজিদে নববিতে গমন করলেন। সেখানে অনেক মানুষ ছিল। ইলম অন্বেষী তাফসির ফিকহ ও হাদিসের ছাত্র উপস্থিত ছিল। প্রখ্যাত দুনিয়াবিমুখ আলেম ইবনে আবি যিবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

খলিফা মাহদি আব্বাসি তার দলবল সেনাসামন্তসহ সেখানে প্রবেশ করতেই সকলে খলিফার সম্মানে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু ইবনে আবি যিব নির্লিপ্ত। আপন মনে বসে রইলেন তিনি। জায়গা থেকে একটুও নড়লেন না। দাঁড়ালেন না। খলিফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইবনে আবি যিব, আমার আগমনে সকলে দাঁড়াল, তুমি দাঁড়ালে না যে!'

ইবনে আবি যিব বললেন, "আল্লাহর কসম, আমিও দাঁড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু যেই না দাঁড়াবো, অমনিতেই কোরআনের একটি আয়াত মনে পড়ল—

> যেদিন সকল মানুষ দাঁড়াবে জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে। [সূরা মুতাফফিফিন: ৬]

এ আয়াত স্মরণ হওয়ায় আমি আর দাঁড়াইনি। আমি আয়াতের উদ্দিষ্ট দিনে দাঁড়ানোর অপেক্ষায় রইলাম!"

যে আল্লাহ ﷻ-র সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়, আল্লাহ ﷻ তাকে মহাপ্রলয়ের দিন নিরাপত্তা দান করবেন। আল্লাহ ﷻ বলেন—

যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে, তারা দোযখ থেকে দূরে থাকবে। তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে। মহাত্রাস তাদের চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেস্তারা তাদের অভ্যর্থনা করবে– আজ তোমাদের দিন, যেদিনের ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিল। [সূরা আম্বিয়া: ১০১-১০৩]

এর পরেই আল্লাহ ﷻ কেয়ামত দিনের ভয়াবহতা উল্লেখ করে বলেন–

সেদিন আমি আকাশ গুটিয়ে নিবো, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলোম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে। [সূরা আম্বিয়া : ১০৪]

আল্লাহ মহাপ্রলয়ের ঘোষণা দিয়েছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেদিনকে ভয় পেতেন। তার ভয় বাহ্যিক ছিল না। তার ভয় তাকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতো। অনেকে ওয়ায-নসিহতের সময় খুব আল্লাহভীরু হয়ে যায়, পরক্ষণেই উদাসীন হয়ে পড়ে। পলকেই ওয়ায-নসিহত সব ভুলে বসে। কিন্তু আবু বকর এবং তার মতো আল্লাহভীরুগণ সবসময় আল্লাহর ভয়ে বিচলিত থাকতেন। দিনে রাতে সবসময় আল্লাহর ভয়ে গুটিয়ে থাকতেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ ﷻ-কে প্রচণ্ড ভয় করতেন। তিনি তার করণীয় সমূহের মৌলিক ইশতিহারসম্বলিত প্রথম খোতবা কেঁদে কেঁদে শেষ করেন। সাহাবায়ে কেরাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী হয়েছে আপনার? কাঁদছেন কেন?’

তিনি বললেন– ‘আল্লাহর কসম! আমার মা যদি আমাকে না জন্মাতেন, –আমি তাই পছন্দ করি। আমি যদি গাছ হতাম, আমাকে কেটে ফেলা হতো, তাই আমার জন্য ভালো ছিল। আমি মহাত্রাসের দিনে আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করি। আমি আশঙ্কা করি, যদি আমার দ্বারা কোন অবাধ্যতা হয়ে যায়!’

এই হল আল্লাহর ভয়। যে ভয় আমাকে আমলের প্রতি আগ্রহী করে। আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে রাখে। বান্দার কাছে আল্লাহর মূল চাওয়া এই ভয়। বাহ্যিক ভয় কোন ভয় নয়। সত্যিকারের ভয় মানুষকে সবসময় তাড়িত রাখে। আমলের প্রতি উৎসাহী রাখে।

ইমাম যাহাবি رحمه الله বর্ণনা করেন, ওমর رضي الله عنه এক রাতে মদিনার অলিগলিতে ঘুরতে লাগলেন। ঘুরে ঘুরে মানুষের অবস্থা দেখছেন। একটি খুপরির কাছে এসে দরজার বাইরে চুপচাপ দাঁড়ালেন। খুপরির ভিতরে এক মহিলার কান্নার আওয়ায। তার কান্না শুনে ওমর রাযি. নিজেই কান্না জুড়লেন।

ওমর রাযি. এর গোলাম আসলাম জিজ্ঞেস করল, 'আমীরুল মুমিনীন! কী হয়েছে আপনার?'

তিনি বললেন, 'চলো আমার সাথে।'

দুজনে সেখান থেকে বাইতুল মালে গেলেন। বাইতুল মাল থেকে এক পুঁটলি আটা, কিছু তেল ও চর্বি নিজেই বহন করে রওয়ানা হলেন।

আসলাম বলল, 'আমীরুল মুমিনীন, আমাকে দিন। আমি বহন করি।'

ওমর رضي الله عنه বললেন, 'কেয়ামতের দিন আমার বোঝা তুমি বহন করবে?'

ওমর رضي الله عنه তা বহন করে চললেন। দ্রুত চললেন। সোজা মহিলার খুপরির সামনে গিয়ে অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। একপাশে বসে মহিলার পরিবারের জন্য রাতের খাবার প্রস্তুত করলেন। মহিলা বলল, 'আল্লাহ আপনাকে দয়া করুন। কে আপনি? আপনি তো ওমর ইবনে খাত্তাবের চেয়ে ভালো মানুষ! আপনি যেভাবে বিনয় প্রদর্শন করেছেন, সেবা প্রদান করেছেন, আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, আপনি সত্যই ওমর ইবনে খাত্তাবের চেয়ে ভালো মানুষ।'

আসলাম বর্ণনা করেন– আমরা সেখান থেকে চলে আসলাম। ওমর ফজরের সালাত শুরু করলেন। সালাতে সূরা সাফফাত থেকে তেলাওয়াত করছেন। যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾

এবং তাদের থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে। [সূরা সফফাত : ২৪]

খুব কাঁদলেন। আমরা পিছনের কাতার থেকে তার কান্না শুনেছিলাম। সেদিনের কান্নায় তিনি এতটা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন, দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন।

আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন ও আত্মসমর্পণ ব্যতীত মানুষের কোন উপায়-অবলম্বন নেই। আমরা সাহাবিদের পথে চলবো। তাদের ইতিহাস ও ঈমান জাগানিয়া ঘটনাগুলো বারবার আলোচনা করবো। ওয়ায-মাহফিলে, সভা-সেমিনারে মানুষের কাছে এসব উপাখ্যান তুলে ধরবো। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তাদের ঘটনাতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়। [ইউসুফ: ১১১]

> এরা এমন, আল্লাহ যাদের পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। [সূরা আনয়াম : ৯০]

আবু হানিফা ﵀ বলেন– 'মনীষীদের জীবনপাঠ আমার কাছে অনেক অনেক ফিকহের চেয়ে উত্তম।ফিকহ সহজ, এর দ্বারা মানুষের একটি জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। আর মনীষীদের জীবনপাঠ প্রতিটি মানুষকে আল্লাহভীরু বানায়। আল্লাহর প্রতিশ্রুতির আশাবাদী বানায়। আল্লাহর জন্য বান্দাকে নিষ্ঠাপূর্ণ বানায়। আল্লাহর সাথে তার সততার মোয়ামালা স্থাপন করে।'

এক রাতের ঘটনা। অন্ধকার নেমেছে। রাসূল ﷺ মদিনায় বের হলেন। অলিগলিতে হাঁটছেন। আনসারি এক মহিলার ঘর অতিক্রম করার সময় ভিতর থেকে বয়স্ক মহিলাকণ্ঠের তেলাওয়াত শুনে দাঁড়ালেন। কান্নাজড়িত তেলাওয়াত। রাসূল দরজার দিকে মাথা উঁচিয়ে খেয়াল করে শুনলেন– মহিলা বারবার তেলাওয়াত করছে–

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾

> আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? [সূরা গাসিয়া : ০১]

মহিলা তেলাওয়াত করছে আর কাঁদছে। আবার তেলাওয়াত করছে, আবার কাঁদছে। টেরও করতে পারেনি যে, রাসূল ﷺ তার তেলাওয়াত শুনছেন।

মহিলার তেলাওয়াত শুনে এতক্ষণে রাসূল ﷺ নিজেই মাথায় হাত রেখে কেঁদে ফেললেন আর বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, আমার কাছে (আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত) পৌঁছেছে। হ্যাঁ, আমার কাছে পৌঁছেছে।' [তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম]

আবু বকর ﵁ এর মেয়ে আয়েশা ﵂। সপ্তআকাশ উপর থেকে তার পবিত্রতা ও দোষমুক্তির ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ ﷻ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-র পবিত্র স্ত্রী। জনৈক তাবেঈ ﵀ বলেন, একদিন সকালে আমি আয়েশার কাছ দিয়ে অতিক্রম করেছিলাম। তিনি সালাতে ছিলেন। সালাতে সূরা তূরের এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন–

﴿فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ وَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ﴾

অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল, পরম দয়ালু। [সূরা তূর : ২৭, ২৮]

আয়েশা ﵂ আয়াতদুটি কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে তেলাওয়াত করছিলেন। আমি তার ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়ায শুনেছিলাম। আল্লাহর কসম! আমি সেখান থেকে বাজারে গিয়েছিলাম এবং বাজার থেকে যখন ফিরে এসেছি, তখনও তিনি একই রাকাতে ছিলেন এবং সেই আয়াতদুটিই তেলাওয়াত করছিলেন।

কোরআন মহিলাদেরও আহ্বান করে। সুন্নাত তাদেরও হাতছানি দেয়। রাসূল ﷺ পুরুষ-মহিলা সকলেরই রাসূল ছিলেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমীর পরিশ্রম বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক বা মহিলা। [সূরা আলে ইমরান : ১৯৫]

সুতরাং একজন মহিলাও সাওয়াবের অধিকারী হবেন। তিনি আপন ঘরে ধার্মিকতা অনুযায়ী সাওয়াবের অধিকারী হবেন। আল্লাহ ﷻ-র সাথে তার সততা অনুযায়ী সাওয়াবের অধিকারী হবেন। কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আপন সন্তানের প্রতিপালনে সাওয়াবের অধিকারী হবেন।

উম্মে সুলাইম ﵂। আনাস ﵁ এর মা। তার আসল নাম রুমাইসা বিনতে মিলহান। ইসলাম গ্রহণ করার পর জনৈক মুশরিক এসে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। তিনি প্রস্তাব শুনে বললেন, 'আপনি মুশরিক, আমি মুসলিম। আপনি যতক্ষণ ইসলাম গ্রহণ না করবেন, ততক্ষণ আমি আপনাকে বিয়ে করবো না। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে এটিই হবে আমার মহর।'

উম্মে সুলাইমের কথা শুনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ঘোষণা দিলেন– ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াআশহাদু আন্না মোহাম্মদান আবদুহূ ওয়ারাসূলুহূ।’

আনাস رضي الله عنه বলেন, ‘ইসলামের ইতিহাসে উম্মে সুলাইমের মহরের মতো উৎকৃষ্ট কোন মহরের কথা আমি শুনিনি। তার মহর ছিল ইসলাম।’

আনাস رضي الله عنه এর বয়স তখন দশ বছর। উম্মে সুলাইম তাকে রাসূলের কাছে নিয়ে আসলেন। রাসূলকে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে একটি হাদিয়া দিবো ভেবেছি। দুনিয়ার বিভিন্ন কিছু চিন্তা করেছি, কিন্তু দুনিয়াতো ধ্বংসশীল! আমি আমার প্রাণের প্রাণ এই সন্তানের চেয়ে উত্তম কোন হাদিয়া আর পাইনি। সে দুনিয়াতে আপনার খেদমত করবে। আপনি তার জন্য দোয়া করুন।’

রাসূল আনাসের জন্য দোয়া করলেন– ‘আল্লাহ! তাকে দীর্ঘজীবী করুন। তার ধনসম্পদ-পরিবার পরিজনে বরকত দিন। তার গোনাহ মাফ করুন।’ [বুখারি : ৬৩৩৪]

রাসূলের দোয়ায় আনাস رضي الله عنه প্রায় শতবর্ষ বা তদুর্ধ্ব বয়স বেঁচেছিলেন।

তার সন্তান-সন্ততি অনেক হয়েছিল। সকলেই কোরআনের ধারক-বাহক হয়েছিল। দিনরাত নাজাতের দোয়া করেছিল। ইসাবাহ, আসাদুল গাবাহ প্রভৃতিতে উল্লেখ রয়েছে, তিনি মনে মনে বলতেন, ‘আমি আমার ঔরসজাত এবং তাদের সন্তানের হাতে কবরস্থ হচ্ছি; যেদিন হাজ্জাজ কুফায় প্রবেশ করেছিল।’

আনাস রাযি. জীবনে কখনও অসুস্থ হননি।

আল্লাহ তার মৃত্যু পর্যন্ত রিযিক দান করেছেন।

আর গোনাহ মাফের বিষয়টি তো আখেরাতের সৌভাগ্য!

এই ছিলো উম্মে সুলাইমের উৎসর্গ। দীনের জন্য তার ত্যাগ ও কুরবানী। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– ‘আমি জান্নাতে কারো চলাচলের আওয়ায পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ‘এ আওয়ায কার?’ উত্তর হল, ‘এই আওয়ায আনাসের মা রুমাইসা বিনতে মিলহানের (উম্মে সুলাইমের)।’ [মুসলিম : ২৪৫৬]

উম্মে সুলাইম জান্নাতের অধিবাসী হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর সাথে সততা বজায় রেখেছেন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। একমনে গ্রহণ করেছিলেন– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

মহিয়ষী খানসা নাখঈয়া

কাদিসিয়ার ভয়াবহ যুদ্ধের মর্মান্তিক প্রান্তর। দুপাশে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে মুসলিম ও কাফেররা। একদিকে আল্লাহর দল, আরেকদিকে শয়তানের দল। এক প্রান্তে উড়ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পতাকা, অপর প্রান্তে উড়ছে কুফরির পতাকা। যুদ্ধপ্রান্তরে মুসলমানদের দলে উপস্থিত হয়েছেন মহিয়ষী খানসা নাখঈয়া।

খানসা নাখঈয়া কিবলার দিকে অবনত হয়ে আল্লাহ ﷻ-র কাছে হাত তুলেছেন। দোয়া করে বলছেন– 'আল্লাহ! এই যুদ্ধে আমার কাছে দেয়ার মতো শুধু চারটি সন্তানই আছে। চার সন্তানের চেয়ে উত্তম কিছু দেয়ার মতো নেই। আমি আমার চার সন্তানকে তোমার রাস্তায় পথিক বানাচ্ছি। তুমি আজ তাদের শাহাদাত লাভে ধন্য করো।'

চার সন্তান ব্যতীত খানসা নাখঈয়ার আপন বলতে নেই। তাকে দেখাশোনার কেউ নেই। দুনিয়াতে এই চার সন্তানের চেয়ে তার প্রিয় বলতে কেউ নেই। প্রাণপ্রিয় সন্তানদের তিনি বললেন– 'আমার ছেলেরা! তোমরা গোসল করে আতর মেখে কাফন পরে জিহাদে বেরিয়ে পড়ো।'

তারা গোসল করলেন। কাফন পরলেন। খানসা নাখঈয়া বললেন– 'আল্লাহর কসম! তোমাদের পিতার কোন খেয়ানত করিনি। তোমাদের মামার কোন খেয়ানত করিনি। আল্লাহর কসম! তোমরা এক পিতার সন্তান। আমি হিসাবের দিন তোমাদের কাছে পাওয়ার আশায় আজ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের করছি। তোমরা এক আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হও। আবার হিসাবের দিন তোমাদের সাথে দেখা হবে।'

এভাবে সন্তানদের বিদায় দিলেন।

যুদ্ধ শেষ। খানসার কাছে লোকেরা সুসংবাদ দিল– 'আপনার চার সন্তান শহীদ হয়েছেন।'

তিনি এই সংবাদ শুনে মিষ্টি করে তৃপ্তির সাথে হাসলেন। শোকরিয়া জ্ঞাপন করলেন।

এই হল মুমিনের প্রশান্তি–

আমায় ভাসিয়ে নিল স্ফীত আনন্দের ঢেউ

আমায় কাঁদিয়ে গেল আনন্দলেখা এক মধুর বারতা...

এরপর খানসা নাখঈয়া বললেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি প্রিয় সন্তানদের শাহাদাত দান করে আমার মর্যাদা বুলন্দ করেছেন। আল্লাহ!

> যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোন কাজে আসবে না; কিন্তু যে শুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে। [সূরা শুয়ারা : ৮৮, ৮৯]

– সেদিন আমার সন্তানদের তুমি পাশে রেখো।

মুয়ায ইবনে জাবাল ﵁ ইয়ামানের উদ্দেশে রওয়ানা হচ্ছেন। রাসূল ﷺ তাকে নসিহত করলেন–

> মুয়ায! যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর। কোন মন্দ কাজ হয়ে গেলে সাথে সাথে নেক কাজ কিছু কর; মন্দ কাজের প্রভাব মুছে যাবে। মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর। [আহমাদ : ২১৪৮২]

> মুয়ায! জনপদে, প্রস্তরপ্রান্তে, বৃক্ষভূমিতে আল্লাহকে স্মরণ রেখ। তুমি যখন আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহ তখন তোমার সাথেই থাকেন। [ইবনে আবি শাইবা : ৩০১১৪]

রাসূল ﷺ ইবনে আব্বাস ﵄-কে উপদেশ দিচ্ছেন–

> তুমি আল্লাহর বিধান রক্ষা কর, আল্লাহ তোমাকে সুরক্ষা দিবেন। তুমি আল্লাহর বিধান প্রতিপালন কর, আল্লাহকে তোমার কাছেই পাবে। তোমার প্রাচুর্যের সময় আল্লাহকে স্মরণ রেখ, তোমার কষ্টের সময় আল্লাহ তোমাকে স্মরণ রাখবেন। কোন কিছু চাইলে আল্লাহর কাছেই চাও। কোন সাহায্যের প্রয়োজন আল্লাহকেই শুধু বল। জেনে রাখ, পৃথিবীর সব মানুষ তোমার সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত হলেও আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তারা তোমার কোন সহযোগিতা করতে পারবে না। পৃথিবীর সব মানুষ

তোমার অনিষ্টের জন্য প্রস্তুত হলেও আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তারা তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। মানুষের ভাগ্য সুস্থির, লিপিবদ্ধ। [আহমাদ : ২৬৬৪]

সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

আমি আমার উম্মতের সে সব লোককে জানি, যারা কেয়ামতের দিন তিহামার (মক্কা ও ইয়ামানের অবস্থান অঞ্চলকে তিহামা বলা হয়) পর্বতমালার সমান নেক আমল নিয়ে হাযির হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা বিক্ষিপ্ত ধূলোর ন্যায় করে দিবেন।

সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাদের ব্যাপারে আমাদের অবহিত করুন। সবিস্তারে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করুন। যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের মধ্যে শামিল না হই।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

মনোযোগ দিয়ে শোনো! তারা তোমাদের ভাই এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। রাতে তোমাদের মতো এবাদত করে। কিন্তু তারা এমন কওম, আল্লাহ ঘোষিত হারাম কাজের নিকটবর্তী হলে তারা হারামের পর্দা ছিন্ন করে ফেলে (অর্থাৎ হারাম কাজে লিপ্ত হয়)। [ইবনে মাজাহ : ৪২৪৫]

মানুষ কখনও কখনও আল্লাহ তাআলা-কে ভয় করে। আবার অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলা-র ভয় খানিকের জন্য উবে যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা চান আমরা সবসময় তাকে ভয় করি। প্রকাশ্যে-গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলা-কে ভয় করি। যেদিন সব মানুষ আমাকে ভুলে যাবে, সেদিন আল্লাহ তাআলা-ই আমাকে স্মরণ রাখবেন। আন্দালুসি রাহিমাহুল্লাহ তার ছেলেকে নসিহত করছেন–

তুমি যখন অন্ধকারে উৎকণ্ঠায় একাকী হও, মন তোমাকে আহ্বান করে পাপাচারে, তখন লজ্জা কর মহান আল্লাহর দৃষ্টিকে।

মনকে বল– 'মন! তোমাকে দেখছেন,

যিনি সৃষ্টি করেছেন এই অন্ধকারের সুযোগ।

ওলামায়ে কেরাম লিখেন, যখন তুমি একাকি থাকবে, আকাশের তারা দেখবে, তখন মনকে জিজ্ঞেস কর– 'কে তারাগুলোকে ঝলমলে

বানিয়েছেন?' যখন একাকি চাঁদের দৃশ্য অবলোকন করবে, তখন চাঁদকে জিজ্ঞেস কর, 'কে তাকে সুউচ্চে স্থাপন করেছে?' আকাশকে জিজ্ঞেস কর, 'কে তাকে সুপরিমিত করেছে?' তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহ তোমার সাথে থাকেন। তুমি আল্লাহকে না দেখলেও আল্লাহ ﷻ তোমাকে দেখছেন ঠিকই।

মুয়ায رضي الله عنه মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মৃত্যুর পূর্বাভাস ফুটে আছে চেহারায়। রাতের ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভোর হয়েছে?'

ছেলে বাইরে দেখে বলল, 'না। এখনও ভোর হয়নি।'

মুয়ায رضي الله عنه বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর চোখ তুলে বললেন, 'আল্লাহ! আপনি অল্পতে বরকত দান করেন। অল্পকে বেশি বানান। আমার এই ক্ষতে আপনি বরকত দান করেন।' তার গায়ে তখন প্লেগ রোগের ক্ষত ছিল।

ছেলে বলল, 'আপনি মৃত্যুর আশা করছেন?'

মুয়ায বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছি। বেঁচে থাকতে অনিহা লাগছে।'

অতঃপর ছেলেকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ভোর হয়েছে?'

ছেলে বলল, 'হ্যাঁ, ভোর হয়েছে।'

তিনি বললেন, 'এই ভোর বেলা আমি আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমি বাগ-বাগিচা বানানোর জন্য বেঁচে থাকতে চাইনি। নহর স্থাপনের জন্য বেঁচে থাকতে চাইনি। আমি দালান-কোটার জন্য বেঁচে থাকার আশা করিনি। আমি তিনটি উদ্দেশে বাঁচতে চেয়েছি। দ্বিপ্রহরে পিপাসার্ত থাকার জন্য, যিকিরের মজলিসে আলেমদের প্রতিযোগিতা করার জন্য, তোমার সেজদায় ধূলোয় লুটোপুটি খাওয়ার জন্য।'

আমাশ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তার চেহারায় মৃত্যুর লক্ষণ দেখে ছেলেরা কাঁদতে শুরু করল। আমাশ ছেলেদের বললেন, 'তোমরা কেঁদো না। আল্লাহর কসম! ষাট বছর যাবৎ (সালাতে) ইমামের সাথে আমার তাকবীরুল উলা ছোটেনি!'

আমাশ এ কথা অহংবোধ থেকে বলেননি। বলেছেন তাকবীরুল উলার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য।

প্রখ্যাত বুযুর্গ, দুনিয়াবিমুখ আবেদ ইবনে ইদরিস ﵀ এর জীবনী আলোকপাত করে ইমাম যাহাবি সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে লিখেন, ইবনে ইদরিস মৃত্যুবরণ করার সময় তার ছেলে মাথার পাশে কান্না করছিল। তিনি ছেলেকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর। তোমার আমার বসবাসের এই ঘরে কখনও আল্লাহর অবাধ্যতা করো না। আল্লাহর কসম! এই ঘরে আমি চার হাজার বার কোরআন খতম করেছি!'

যারা আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করে, মন থেকে মানে, আল্লাহ ﷻ তাকে উত্তরসূরীদের কাছে জীবন্ত করে রাখেন। উত্তরসূরীরা তার দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে। সূরা কাহফে আল্লাহ এক আল্লাহভীরু নেককার পিতার সম্পদ সন্তানদের জন্য কিভাবে সংরক্ষণ করেছেন, তা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যে আল্লাহকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, আল্লাহ তার স্ত্রী-সন্তান, পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তার রিযিকেরও ব্যবস্থা করবেন।

একবার রাসূল ﷺ একটি ঘাটে অবস্থান করছিলেন। ওমর ﵁ সেখানে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি অল্প যব ছাড়া কিছু দেখলেন না। এ দৃশ্য দেখে তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেল। রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, 'ওমর! কী হয়েছে তোমার?' তখন রাসূল ﷺ একটি চাটাইয়ে শায়িত ছিলেন। রাসূলের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গিয়েছিল।

ওমর বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসরা ও কায়সার কত ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের মধ্যে ডুবে আছে। অথচ আপনি আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে পৃথিবীর সকল মানুষের উপর মর্যাদা দিয়েছেন।'

রাসূল বললেন, 'ওমর! তুমি দ্বিধায় আক্রান্ত! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া আর আমদের জন্য আখেরাত?' [বুখারি : ৪৯১৩]

উসমান ﵁ একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে একটি লোককে কবর দেয়া হচ্ছিল। তিনি এই দৃশ্য দেখে কান্না শুরু করলেন। কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে পড়লেন। তাকে সেখান থেকে দ্রুত নিয়ে আসা হল। জিজ্ঞেস করা হল, 'আপনি কোরআন পড়েন, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করেন, তখন আপনাকে এভাবে কাঁদতে দেখিনি। অথচ কবর দেখে আপনি এভাবে কাঁদলেন!'

উসমান ؓ বললেন, 'রাসূল ﷺ বলেছেন–

> কবর হল আখেরাতের প্রথম ঘাঁটি। যে এখানে মুক্তি পাবে, তার জন্য পরবর্তী সকল ঘাঁটি সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে মুক্তি না পায়, তাহলে পরবর্তী সকল ঘাঁটি কঠিন হয়ে পড়বে। [আহমদ : ৪৫৬]

রাসূল ﷺ আরও বলেছেন–

مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ

> আমি কবরের চেয়ে ভয়াবহ কোন দৃশ্য দেখিনি। [আহমদ : ৪৫৬]

আলী ؓ এক কবরস্থানে কবরবাসীদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমাদের বাহ্যিক দৃশ্য সুন্দরই দেখায়। কিন্তু তোমাদের ভিতর একটি চুলও নেই! আমাদের অবস্থা কী, জান? তোমাদের কবরস্থ করে আমরা প্রস্থান করেছি। তোমাদের ঘরে অন্য মানুষ বাস করছে। স্ত্রীদের বিয়ে হয়ে গেছে। ধনসম্পদ বণ্টিত হয়ে গেছে। এবার বলো, তোমাদের অবস্থা কী?'

এ কথা বলে আলী ؓ কান্না শুরু করলেন। বললেন, কবরবাসী উত্তর দিচ্ছে না। তারা উত্তর দিলে এই কথাই বলত–

> নিশ্চয় সর্বোত্তম পাথেয় হল তাকওয়া। [সূরা বাকারা : ১৯৭]

আল্লাহর ভয় অন্তরে স্থাপন করার চারটি মাধ্যম

এক.

আল্লাহ ﷻ-র ভয় অন্তরে স্থাপন করার একটি কার্যকরী মাধ্যম– কবর যিয়ারত করা। কবরগুলোতে আমাদের সন্তান, পূর্বপুরুষ, সাথি-সঙ্গী, বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। কবর যিয়ারতের দ্বারা মনে মৃত্যুর কথা জাগে। মৃত্যুর ভয় সৃষ্টি হয়।

মৃত্যু এমনই এক নিয়তি– নিস্তার নেই এর থেকে। পলায়নের জায়গা নেই।

মৃত্যু এমনই এক শয়ান– শাবাধার থেকে এই নামে, এই তো আবার উঠে।

মানুষ কত স্বপ্ন বোনে, কত আশা পুযে রাখে অন্তরে; পড়ন্ত বার্ধক্যে!

গর্বোদ্দীপ্ত ভবন বানায় আকাশ ছুঁয়ে! অথচ সে জানে– মৃত্যু তার অচিরেই...

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

তোমরা কবর যিয়ারত কর। কবর মৃত্যুর কথা স্মরণ করায়।' 'কবর তোমাদের আখেরাতের কথা স্মরণ করায়। [আহমাদ : ৯৩৯৫]

রাসূল ﷺ নিজে কবর যিয়ারত করতেন এবং কবরের কাছে গিয়ে এই দোয়া পড়তেন–

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ. نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

হে মুমিন ঘরের বাসিন্দা! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইনশাআল্লাহ, অচিরেই আমরা তোমাদের সাথে মিলবো। আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের অনুজ-অগ্রজ সকলকে রহম করুন। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করছি। [মুসলিম : ৯৭৪, বুখারি : ৯৭৫]

মাতরাফ ইবনে আব্দুল্লাহ শাখির। তিনি নিজের ঘটনা বর্ণনা দিয়ে বলেন, আমি প্রতি সপ্তাহে বাসরার গ্রাম থেকে শহরে আসতাম জুমা আদায় করার জন্য। জুমাবারের একরাত আগে আমি সাধারণত আমি চলে আসতাম এবং জুমারাতে বাসরার কবরস্থান যিয়ারত করতাম। তাদের সালাম দিয়ে খুব করে দোয়া করতাম।

একরাতে প্রচণ্ড বর্ষা ছিল। আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। আমি সে রাতে কবরস্থান যিয়ারত করে কবরবাসীর জন্য দোয়া করতে না পেরে বাড়ি চলে আসলাম।

রাতে ঘুমালাম। স্বপ্নে দেখলাম– কবরের একজন লোক এসে আমাকে বলছে, 'মাতরাফ! আপনি আজ আমদের বঞ্চিত করলেন! আল্লাহর কসম! আপনার দোয়ার উসিলায় এক সপ্তাহ আমাদের কবরের আযাব বন্ধ থাকে।'

মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসির ঘটনা। একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে কোথাও যাওয়ার সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ পাঠ করলেন। পাঠ করতেই অদৃশ্য থেকে শুনতে পেলেন– 'হে মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসি! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ দ্বারা নিজের পথসম্বল যোগাড় করে

নাও। তুমি যদি এর সাওয়াব ও প্রতিদান জানতে, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে এই কালিমা পাঠ করতে। আমাদের মাঝে এবং এই কালিমার মাঝে এখন পর্দা পড়ে গেছে। আমরা এখন আর তা পড়তে পারি না।'

মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আমল করার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

কোন বেনামাযী মারা গেলে তার সালাত কে আদায় করবে?

কোন ব্যক্তি রোযা না রাখলে তার রোযা কে রাখবে?

কে তার পক্ষ থেকে সদকা করবে? ভালো কাজে খরচ করবে?

কে তার পক্ষ থেকে উত্তম আদর্শ দেখাবে?

এসব কি সম্ভব?

মানুষ যখন মরে যায়, তার ভালো কাজ করার রাস্তা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

দুই.

অন্তরে আল্লাহ ﷻ-র ভয় বদ্ধমূল রাখার দ্বিতীয় একটি পন্থা– সবসময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। সকাল-সন্ধ্যা মৃত্যুর স্মরণ করা। ঘুমুতে গেলেও মৃত্যুর কথা কল্পনা করা।

ওমর ইবনে আব্দুল আযিযের স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক বলেন, ওমর রাতে যখন বিছানায় যেতেন, ঠাণ্ডায় কাতরানো পাখির মতো ছটফট করতেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম– 'আমীরুল মুমিনীন! কী হয়েছে আপনার? আপনি ঘুমুচ্ছেন না কেন?'

তিনি বললেন, 'এই বিছানা, অন্ধকার ঘর আমাকে মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।'

ইমাম যাহাবি রহিমাহুল্লাহ সুফয়ান সাওরি এর ব্যাপারে বর্ণনা করেন, তিনি ইশার পর থেকে ফজর পর্যন্ত সূরা তাকাসুর পাঠ করতেন। এর মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে বলতেন, আমি কিভাবে ঘুমুবো; কবর আমার সামনে!

তিন.

আল্লাহ ﷻ-র ভয় সৃষ্টি হওয়ার তৃতীয় একটি পন্থা– সবসময় আল্লাহ ﷻ-র আযাবের কথা স্মরণ করা। আল্লাহর শাস্তি বড় ভয়ানক। তিনি যখন কাউকে শাস্তি দেন, বড় মর্মন্তুদ শাস্তি দেন। যখন প্রতিশোধ নেন, কঠিন প্রতিশোধ নেন। –এসব কথা সমসময় মনে মনে আওড়ালে আল্লাহ ﷻ-র ভয় অন্তরে সৃষ্টি হয়।

ওমর رضي الله عنه সবসময় বলতেন এবং তার গভর্নরদেরও লিখে পাঠাতেন– 'আল্লাহর শাস্তি বড় ভয়াবহ, সে কথা ভুলবে না।'

ওমর ইবনে আব্দুল আযিয رحمه الله আদি ইবনে আরতাকে বলেছিলেন, 'সুবহানাল্লাহ! কিভাবে তুমি জুলুমের পথ বেছে নিলে! কিভাবে তুমি অবাধ্য হলে! তুমি কি খখনও কবর যিয়ারত করনি! তুমি কি জানো না, আল্লাহর আযাব ভয়ঙ্কর!'

চার.

আল্লাহ ﷻ-র ভয় মনে জাগরুক রাখার চতুর্থ পন্থা– আল্লাহ ﷻ-র অসীম দৃষ্টিশক্তির কথা স্মরণ রাখা।

ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন, 'অন্তর আল্লাহর ঘর। এই ঘর সুন্দর রাখা এবং শুদ্ধ রাখার জন্য করণীয় হল আল্লাহর সাথে সততার আচরণ করা। সবসময় মনে রাখা– আল্লাহ আমাকে দেখছেন।'

ইমাম আহমদ رحمه الله ঘরে প্রবেশ করেলে ভয়ে এতটুকুন হয়ে বসতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি সকলের সাথে থাকলে এভাবে ভীত-প্রকম্পিত হয়ে বসেন না, কিন্তু ঘরে গেলে এভাবে বসেন কেন?

তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন–

أَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِيْ

> যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সহাবস্থানকারী। [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ১২৬৫]

আল্লাহ ﷻ-র ভয় মনে জাগরুক রাখার জন্য সবসময় মনে রাখতে হবে– আল্লাহ ﷻ আমাকে দেখছেন। আমি আল্লাহকে না দেখলেও তিনি আমাকে দেখছেন। সবসময় দেখছেন। সর্বাবস্থায় দেখছেন। [বুখারি : ৫০]

আল্লাহকে ভয় না করার চারটি কারণ

এক.

আল্লাহ ﷻ-কে ভয় না করার প্রথম কারণ– উদাসীনতা। কারো মনে উদাসীনতা ঝেঁকে বসলে সে নিজেকেই ভুলে যায়। তার পক্ষে সরল পথে থেকে সঠিক চিন্তা করা সম্ভব হয় না। উদাসীনরা আল্লাহকে স্মরণ করে না। কোন কিছু বুঝেও বোঝে না।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> কতক মানুষ আছে, যাদের অন্তর আছে, কিন্তু অন্তর দ্বারা কিছু বোঝে না। তাদের কান আছে, কিন্তু কান দ্বারা তারা শোনে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু সে চোখে তারা দেখে না।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। [সূরা ক্বাফ : ৩৭]

মানুষ মাত্রই প্রত্যেকের অন্তর রয়েছে। কিন্তু কারো অন্তর জীবিত। কারো অন্তর মৃত। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তারা কি কোরআন সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করে, না তাদের অন্তর তালাবন্ধ! [সূরা মোহাম্মদ : ২৪]

উদাসীনদের অন্তরে অন্ধকার ছেয়ে যায়। তাদের অন্তর তালাবন্ধ হয়ে যায়। তারা আল্লাহ ﷻ-র প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়। আল্লাহর যিকির ভুলে যায়। নসিহত শোনে, কিন্তু গ্রহণ করে না। বোঝার চেষ্টা করে না। তাদের অন্তরে মহর আঁটা। তাদের অন্তরালোক নিভে গেছে। সে অন্তর আর আলোকিত হয় না।

দুই.

আল্লাহ ﷻ-র ভয় অন্তর থেকে মুছে যাওয়ার দ্বিতীয় কারণ– গোনাহ ও পাপাচার। বান্দাকে আল্লাহভোলা বানাতে গোনাহ ও পাপ কাজের ভয়াবহ কুপ্রভাব রয়েছে। গোনাহর কারণে অন্তরে অন্ধকার ছেয়ে যায়।

একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই। [সূরা নূর : ৪০]

গোনাহ বান্দার মনে প্রথমে সঙ্কীর্ণতা তৈরি করে। ক্রমে অন্তরে মরিচা পড়ে। মরিচার ছাপ পড়ে যায়। অন্তর মহরাঙ্কিত হয়ে যায়।

অন্তর উদাসীনতা দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় মুমিনের। অন্তর মরিচা-আক্রান্ত হয় ফাসেকের। ক্রমধারায় শেষ পরিণতিতে মহরাঙ্কিত হয় কাফেরের।

মুমিনের অন্তরের উদাসীনতার ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ

হে লোকসকল! আল্লাহর কাছে তাওবা কর। ক্ষমা চাও। আমি প্রতিদিন শতবারের চেয়ে বেশি আল্লাহর কাছে তাওবা করি। [আহমাদ : ১৮২৯৪]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

হে লোকসকল! আল্লাহর কাছে তাওবা কর। ক্ষমা চাও। কারণ অন্তরে উদাসীনতা ভর করে। প্রতিদিন আমি শতবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। [মুসলিম : ৭০৩৩]

অন্তরে মরিচা ধরার কথা আল্লাহ ﷻ স্বয়ং বলেছেন–

তারা যা করে, তাই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। [সূরা মুতাফফিফীন : ১৪]

এই আয়াতে কাফের ও ফাসেক সকলেই অন্তর্ভুক্ত।

তিন.

আল্লাহ ﷻ-র ভয় অন্তর থেকে ধীরে ধীরে কমে যাওয়ার তৃতীয় কারণ– সুন্নাত মুস্তাহাব বাদ দিয়ে অধিকহারে বৈধ পন্থা অবলম্বন করা। যেমন, দুনিয়ার গর্বোদ্দীপক বস্তু গ্রহণ করা, প্রাচুর্যশীল হওয়া, দুনিয়াকে আখেরাতের

উদ্দেশ ও চাহিদার উপর প্রাধান্য দেয়া, আল্লাহর অত্যধিক মর্জির বাইরে কিছু করা ইত্যাদি।

বাস্তবতা হল, আজ আমরা প্রায় সবাই এই সমস্যায় আক্রান্ত।

চার.

অন্তর থেকে আল্লাহ ﷻ-র ভয় কমে যাওয়ার চতুর্থ কারণ– সময় নষ্ট করা। কেয়ামতের দিন বান্দা থেকে সময়ের হিসাব নেয়া হবে কড়ায়গণ্ডায়। অধিকাংশ মুসলমানই অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে সজাগ থাকলেও সময়ের ব্যাপারে উদাসীন। মানুষের দিনরাত চলে যায়, সময়ের ব্যাপারে তাদের এতটুকু সচেতনতাও জাগে না।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তোমরা কি ধারণা কর, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না! অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকারের মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। [সূরা মুমিনূন: ১১৫, ১১৬]

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

> কেয়ামতের দিন কোন বান্দার দু'পা এতটুকুও সরবে না, তাকে এ কয়টি বিষয় সম্পর্কে যে পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ না করা হবে– কিভাবে তার জীবনকাল অতিবাহিত করেছে। তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কি আমল করেছে। কোথা হতে তার ধনসম্পদ উপার্জন করেছে ও কোন কোন খাতে ব্যয় করেছে। কি কি কাজে তার শরীর বিনাশ করেছে। [তিরমিযি : ২৪১৭]

ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত–

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

> দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে অনেক মানুষই উদাসীন। সুস্থতা এবং অবসর। [বুখারি : ৬৪১২]

সময়ের সদ্ব্যবহার

সময় দ্বারা লাভবান হওয়ার সবচেয়ে উপযোগী ব্যবস্থা হল আল্লাহর ফরযসমূহ আদায় করা।

ইবনে তাইমিয়া ﵀-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'মানুষ সন্দেহ-সংশয় এবং কুপ্রবৃত্তির রোগ থেকে বাঁচার জন্য ব্যবস্থাপত্র কী হতে পারে?'

তিনি বললেন, 'এই রোগ থেকে বাঁচার মহৌষধ হলো ফরযসমূহ নিগূঢ় ও বাহ্যিকভাবে শুদ্ধ ও পরিপূর্ণরূপে আদায় করা।'

নিগূঢ়তায় শুদ্ধতার স্বরূপ হল একমাত্র আল্লাহর জন্য নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়ত রাখা। সালাতের জন্য যখন দাঁড়াবে, মনে করবে, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছি। এভাবে অন্তরকে আল্লাহর দিকে ধাবিত রাখা।

বাহ্যিকভাবে শুদ্ধতার স্বরূপ হল রাসূল ﷺ-র সুন্নাত অনুযায়ী তা পালন করা।

সময় দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য ফরযসমূহ যথাযথভাবে আদায় করার পর সবচেয়ে উপযোগী হল নফল এবাদতে মনোযোগী হওয়া।

ইবনুল জাওযি ﵀ স্বাইদুল খাত্বির গ্রন্থে লিখেন, আশ্চর্য! যে তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত, সে কিভাবে আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া একটি নিঃশ্বাস ফেলতে পারে!

তিনি একটি হাদিস উল্লেখ করেন— রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

> যে একবার সুবহানাল্লাহিল আযীমি ওয়াবিহামদিহী পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপিত হয়। [তিরমিযি : ৩৪৬৪]

হাদিসটি উল্লেখ করে তিনি লিখেন, আফসোস! কত খেজুর গাছ আমাদের হাতছাড়া হচ্ছে! কারণ আমরা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছি না।

আবু কাসেম মাগরিবি ﵀ ইবনে তাইমিয়া ﵀ কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ফরযসমূহের পর কোন আমলের প্রতি আপনি বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন?'

ইবনে তাইমিয়া ﵀ বললেন, 'ফরযসমূহের পর সবচেয়ে মহান উত্তম ও ফলপ্রদ আমল আল্লাহর যিকির ছাড়া আর কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। এবাদতের মধ্যে সবচেয়ে সহজতর এবাদত এটিই।'

আল্লাহ বলেন–

> জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। [সূরা রা'দ : ২৮]
>
> তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ রাখবো। [সূরা বাকারা : ১৫২]

আল্লাহভীতির চার প্রমাণ

এক.

প্রকৃত আল্লাহভীতির প্রথম প্রমাণ– বান্দার ভিতর-বাহির এক হওয়া। বাহ্য ও অভ্যান্তর এক হওয়া। বান্দার বাহ্যিক অবস্থা অভ্যান্তরের চেয়ে ভালো হবেনা।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

> আল্লাহ বলেন– শেষ যমানায় কিছু লোক এমন বের হবে, যারা ধর্ম পুঁজি করে দুনিয়াকে ধোঁকা দিবে। তারা ভেড়ার পশমের মতো নরম পোষাক পরিধান করবে। তাদের যবান মধুর মত মিষ্টি হবে, কিন্তুঅন্তর হবে নেকড়ের মত।' আল্লাহ বলেন, 'তারা আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে, নাকি আমার সাথে স্পর্ধা দেখাচ্ছে! আমি আমার শপথ করে বলছি, তাদের উপর এমন ফেতনা চাপিয়ে দিবো, তাদের মধ্যে সবচেয়ে সহনশীল ব্যক্তিকেও পেরেশান করে ছাড়বে। [তিরমিযি : ২৪০৪]

আল্লাহ ﷻ-র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বেশ-ভুষা সুন্দর রেখে আভ্যন্তর খারাপ রাখার মতো কপটতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

দুই.

প্রকৃত আল্লাহভীতির দ্বিতীয় একটি প্রমাণ– শুধু বুলি আওড়ে নয়, সার্বিক কথাবার্তায়, কাজেকর্মে, আচার-আচরণে আল্লাহর সাথে সততা বজায় রাখা। আল্লাহর সাথে সততার এই তিনটি স্তর ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন।

শাফি আসবাহি থেকে বর্ণিত, আমি একদিন আবু হোরায়রার কাছে আগমন করলাম। আবু হোরায়রা তখন মসজিদে নববিতে অবস্থান করছিলেন। আমি তাকে বললাম, 'আবু হোরায়রা! আমি আপনাকে আল্লার কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে এমন একটি হাদিস বলুন, যা আপনি নিজে রাসূল ﷺ-র মুখ থেকে শুনেছেন।'

তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে এমন একটি হাদিস বলছি, যা আমি নিজে রাসূল ﷺ-র মুখ থেকে শুনেছি।'

এ কথা বলে তিনি কান্না শুরু করলেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলেন। একপর্যায়ে অবচেতন হয়ে পড়লেন। চেতন ফিরে এলে তিনি বললেন, "আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তি দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলন করা হবে। তারা হলেন, আলেম বা কারী, ব্যবসায়ী, মুজাহিদ। তারা তাদের আমল করেছিল লোক দেখানোর জন্য। তারা এক আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ নিয়ত করেনি। আল্লাহ ﷻ অন্যদের আগে তাদের জাহান্নামে ফেলবেন।'

শাফি আসবাহি বলেন, আমি মুয়াবিয়ার কাছে গেলাম। মুয়াবিয়াকে উক্ত হাদিসের কথা বললাম। তিনি তখন চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। হাদিসটি শুনে তিনি কাঁদতে কাঁদতে চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ ﷻ সত্যই বলেছেন–

> যে ব্যক্তি পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না।
>
> এরাই হল সেসব লোক, আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল, সবই বরবাদ করেছে। আর যা কিছু উপার্জন করেছিল সবই বিনষ্ট হল। [সূরা হূদ : ১৫, ১৬] [তিরমিযি : ২৩৮২]

তিন.

প্রকৃত আল্লাহভীতির তৃতীয় প্রমাণ– মন্দ কাজে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভালো কাজে খুশি হওয়া। ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক বাহিনীকে ভাষণ দিয়ে বলেন, 'যাকে ভালো কাজ খুশি করে এবং মন্দ কাজ অনুতপ্ত করে, সেই প্রকৃত মুমিন।'

আল্লাহর অবধ্যতা করে যে অনুতপ্ত হয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য ঘোষণা–

> তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া কে তাদের ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তাই করতে থাকে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান। [সূরা আলে ইমরান : ১৩৫, ১৩৬]

চার.

প্রকৃত আল্লাহভীতির চতুর্থ প্রমাণ– বান্দার আজকের দিন গতকালের চেয়ে ভালো কাটবে। আগামীকাল আজকের চেয়ে ভালো কাটবে। যে এবাদতে উৎকর্ষ করতে চায়, তার সততা এবং আল্লাহভীতির জন্য এটি অন্যতম প্রমাণ।

যার গতকাল আজকের চেয়ে ভালো কেটেছে, আজকের দিন আগামীকালের চেয়ে ভালো কাটছে, সে দিনদিন পশ্চাদগামী হচ্ছে। তার এবাদতে মিথ্যা ও ধোঁকার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, আল্লাহর ভয় ততটুকু অত্যাবশ্যক, যতটুকু বান্দাকে গোনাহ থেকে বাঁচাবে। এর অতিরিক্ত ভয় অত্যাবশ্যক নয়।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহর ভয় হল– বান্দা যখন একা একা অনুভব করবে– আল্লাহ তার আসনের সামনেই!

আল্লাহর ভয় হল– বান্দার সামনে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দৃশ্য জ্বলে উঠবে। বান্দা অনুধাবন করবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ছাড়া সে পরাজিত!

আল্লাহর ভয় হল– বান্দা এমন অনুভুতি নিয়ে আমল করবে যে, সে আল্লাহর সামনে লজ্জিত। তার সকল আমল যেন তার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ বলেন–

> আল্লাহ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন। [সূরা মায়েদা : ২৭]

ইবনে ওমর ﵁ বলেন– 'আল্লাহ যদি আমার সামান্য কণা পরিমাণ আমল গ্রহণ করতেন!'

উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এমন কথা কেন বললেন?'

তিনি বললেন, "কারণ–

> আল্লাহ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন। [সূরা মায়েদা : ২৭]

উপস্থিত লোকেরা বলল, 'আপনি ভয় পাচ্ছেন? আপনি তো অনেক নেক কাজ করেন!'

তিনি বললেন, "আমি নেক কাজ নিয়ে শঙ্কা করি না। শঙ্কা করি, যদি নেক কাজ করার পর আল্লাহ বলেন, 'আমার ইযযত ও মহত্ত্বের কসম! তোমার এ আমল আমি কবুল করবো না!"

আল্লাহ বলেন–

> তারা দেখতে পাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করতনা। [সূরা যুমার : ৪৭]

আল্লাহ ﷻ যাদের ব্যাপারে এ কথা বলেছেন, তাদের ধারণা ছিল, তারা অনেক নেক কাজ করছে। কিন্তু তাদের নেক কাজে লৌকিকতা প্রচারপ্রিয়তা এবং কপটতার চোরাপ্রবেশ ছিল। তাদের সেসব আমল তাদের দিকে ফিরে আসবে। আল্লাহ ﷻ তাদের সে আমল তাদের চেহারায় নিক্ষেপ করবেন। কারণ আল্লাহ ﷻ সেই আমলই কবুল করেন, যা তার জন্য একনিষ্ঠ নিয়তে করা হয়। যা রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী সঠিকভাবে করা হয়।

রাতজাগা আবেদ

আল্লাহ! তোমারই গুণকীর্তন করছি। তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তোমারই কাছে হেদায়াত প্রত্যাশা করছি। তোমারই জন্য সকল স্তুতি ও বন্দনা হে আল্লাহ!

মনের যত ধোঁকা ও দুষ্টুমি, আমলের যত দোষ ও ত্রুটি, সবকিছু থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি যাকে দিশা দাও, কে তাকে বিস্মৃত করতে পারে! তুমি যাকে ভ্রান্ত বানাও, কে তাকে সঠিক পথের খোঁজ দিতে পারে!

হে আল্লাহ! তুমি এক ও অদ্বিতীয়, মোহাম্মদ তোমার বান্দা ও রাসূল, –এ আমার অন্তরসাক্ষ্য।

ইমাম বুখারি رحمه الله তাহাজ্জুদ অধ্যায়ে লিখেন– আল্লাহ تعالى বলেন–

> রাতের কিছু অংশ কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত। [সূরা ইসরা : ৭৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, রাসূল ﷺ তাহাজ্জুদের জন্য উঠে এই দোয়া পড়তেন–

> اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

আল্লাহ, তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর নূর। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর মালিক। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য। তোমার বাণী সত্য। জান্নাত সত্য। দোযখ সত্য। সকল নবী সত্য। মোহাম্মদ সত্য।

আল্লাহ, তোমারই জন্য আমি সমর্পিত। তোমাতেই আমি বিশ্বাস রেখেছি। তোমারই উপর ভরসা করেছি। তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করেছি। তোমারই রাহে লড়াই করেছি। তোমরাই দরবারে বিচার চেয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার পূর্বাপর ক্ষমা কর। আমার প্রকাশ্য-গোপনীয় সবকিছু ক্ষমা কর। [বুখারি : ১১২০]

আল্লাহ বলেন–

রাতের কিছু অংশ কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত। হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছাবেন। [সূরা ইসরা : ৭৯]

আয়াতে রাসূলকে তাহাজ্জুদ সালাতে কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকতে বলেছেন। অচিরেই তাকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছার সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি আখেরাতে হিসাবের মহাময়দানে সহজভাবে দাঁড়াতে চায়, সে যেন রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদে দাঁড়ায়।

দুর্বল সনদের একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, কবরের অন্ধকারের জন্য রাতের অন্ধকারে দুই রাকাত সালাত পড়। পুনরুত্থানে দাঁড়ানোর জন্য কিছু সদকা কর। [ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৫/১৮৭]

রাতের কিছু অংশ কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত। [সূরা ইসরা : ৭৯]

রাতের কিছু অংশ কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকা রাসূলের জন্য অতিরিক্ত হওয়ার দুটি অর্থ হতে পারে–

এক.

এই বিধান রাসূলের জন্যই অতিরিক্ত আবশ্যক, উম্মতের জন্য নয়। তাবরানী গ্রন্থের একটি দুর্বল সনদের হাদিস থেকেও এই ব্যাখ্যা বুঝা যায়। বর্ণিত হয়েছে– ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন– 'রাতে জাগ্রত থাকার বিধান বিশেষভাবে রাসূল ﷺ-র জন্য আবশ্যক। আমাদের জন্য এটি অতিরিক্ত।'

বিশেষভাবে রাসূলের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর অতিরিক্ত আরও এক ওয়াক্ত আবশ্যক। রাসূল ﷺ কখনও এই সালাত ছাড়তেন না। কোথাও সফরে বের হলেও তিনি এই সালাত ত্যাগ করতেন না। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই আমল করে গেছেন।

দুই.

রাসূলের জন্য এটি নফল এবাদত। অতিরিক্ত একটি উত্তম আমল। অন্যদের জন্য এটি নফলও নয়। বরং অন্যদের জন্য এই এবাদত বিভিন্ন গোনাহ ও পাপাচারের কাফফারাস্বরূপ। রাসূল ﷺ-র কোন গোনাহ ছিল না। তার পূর্বাপর সবকিছু ক্ষমাঘোষিত ছিল। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন। [সূরা ফাতহ : ০২]

রাসূলের পূর্বাপর সব ক্ষমাঘোষিত ছিল, রাসূলের কাফফারার কোন প্রয়োজন ছিল না, এজন্য রাসূলের ক্ষেত্রে তাহাজ্জুদ হল নফল এবাদত। উম্মত গোনাহগার, তাই উম্মতের জন্য তা কাফফারাস্বরূপ।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রা যেত। রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত। [সূরা যারিয়াত : ১৭, ১৮]

আহনাফ ইবনে কায়স ﵀ বলেন, আমি নিজেকে আল্লাহর কিতাব দিয়ে যাচাই করে দেখলাম, আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ মহামহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছেন। আল্লাহ ﷻ তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেছেন–

> তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রা যেত। [সূরা যারিয়াত : ১৭]

আফসোস, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারিনি।

কাফেরদের সাথে নিজেকে যাচাই করে দেখলাম, তারা অত্যন্ত খবিস জাতি। পাপিষ্ঠ জাতি। আল্লাহকে অস্বীকারকারী। কেয়ামত অস্বীকারকারী। আলহামদুলিল্লাহ, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হইনি।

আমি আবার নিজেকে যাচাই করলাম। এমন কিছু লোক আছে, যারা ভালো কাজের সাথে মন্দ কাজেও লিপ্ত হয়। আমি নিজেকে তাদের সারিতেই পেলাম।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, একটি ছাগলের দুগ্ধদোহন পরিমাণ সময় হলেও কিয়ামুল্লাইল করা উচিত। দুই রাকাত সালাতও যদি আদায় করা হয়, সেটাও কিয়ামুল্লাইল বলে বিবেচিত হবে।

আলেমগণ উদ্বুদ্ধ করে বলেন, রাতের শুরুতে হোক, মাঝে হোক, শেষে হোক, যে কোন মূহুর্তে কিয়ামুল্লাইল করলেই আল্লাহ ﷻ-র এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে–

তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রা যেত। [সূরা যারিয়াত: ১৭]

জাফর সাদিক, আনাস ইবনে মালিক, কাতাদা ইবনে দিয়ামা আসসাদুসী رحمه الله বলেন, 'তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রা যেত', অর্থাৎ মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত তারা সালাতে নিরত থাকত।

জাফর সাদিক رحمه الله অপর এক বর্ণনায় বলেন, 'তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রা যেত'। এশা আদায় করে নিদ্রা যেত।

হাসান বসরি বলেন, আল্লাহর কসম! কিয়ামুল্লাইল করে তোমরা মূলত আল্লাহর সাথেই রাত্রি যাপন কর। আল্লাহ ﷻ বলেন,

যে আমায় স্মরণ করে, আমি তার সাথেই উপবেসন করি। [প্রাগুক্ত]

ফুযাইল ইবনে ইয়ায رحمه الله ওয়াকি رحمه الله-কে বললেন, 'ওয়াকি! আল্লাহ কী বলেছেন জান!'

ওয়াকী বললেন, 'না।'

ফুযাইল ﷺ বললেন, “আল্লাহ বলেছেন, ‘যে আমার ভালোবাসার দাবি করল, অথচ রাতে আমাকে ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়ল, সে সত্য দাবি করেনি।” [সিয়ারু আলা মিন নুবালা : ২৭৫৩]

হাসান বসরি ﷺ বলেন, ‘তারা রাতের শুরু থেকেই আল্লাহর সাথে জেগে থাকতেন। রাত যখন শেষ হয়ে আসত, তখন তারা আল্লাহর কাছে অপরাধীর আসনে বসে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।’

ইবনুল কাইয়িম ﷺ আলোচ্য আয়াতের অর্থ একটু ভিন্নভাবে করেছেন। তার মতে আয়াতের অর্থ– তাদের অল্পই কিয়ামুল্লাইল করতেন না। সর্বনিম্ন দুই-চার রাকাত হলেও কিয়ামুল্লাইল করতেন। এছাড়া আল্লাহর তাওফিক অনুযায়ী যে যার সাধ্যমত কিয়ামুল্লাইল করতেন।

উল্লেখ্য, যে যতটুকু কিয়ামুল্লাইল করত, সকলেই আলোচ্য আয়াতে প্রশংসার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত। [সূরা যারিয়াত : ১৮]

সুবহানাল্লাহ! সারারাত এবাদতে কাটিয়ে শেষ রাতে অপরাধীর মত বসে যেতেন ক্ষমা প্রার্থনায়! সারারাত এবাদত করেও যেন ভুলত্রুটি বা গোনাহে রাত কাটানোর অনুভুতি! আল্লাহর সেসব খাঁটি বান্দার তুলনায় ঐসব বান্দারা কোথায় আছেন, যারা সারারাত আনন্দলাল কাটিয়েও শেষ রাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না!

তারা সারারাত আল্লাহর প্রতি একাগ্র থেকে, দোয়া কান্নাকাটি করেও শেষ রাতে ইসতিগফার করতেন। শেষ রাতে তারা আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ না বলে আসতাগফিরুল্লাহ বলতেন। কারণ, তারা তখনও নিজেদের অক্ষম অকৃতকার্য মনে করতেন। সারারাত এবাদতে কাটিয়ে তাদের যদি এই অনুভুতি হয়, তাহলে যারা সারারাত আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তাদের পরিণতি কেমন হবে! আল্লাহ ﷻ তো কেয়ামতের দিন সকলকেই একত্র করবেন!

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। [সূরা আলে ইমরান : ১৭]

আয়াতে বিশেষভাবে শেষ রাতের ক্ষমা প্রার্থনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ ﷻ শেষ রাতে নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন। বান্দাদের ডাকেন, 'কেউ আছ ঝাঞ্চাকারী! আমি তাকে দিবো। কেউ আমাকে ডাকছ! আমি সাড়া দিবো। কেউ আছ ক্ষমা প্রার্থনাকারী! আমি ক্ষমা করবো।' [বুখারি : ১১৪৫]

আল্লাহ ﷻ শেষ রাতে নিকটবর্তী আকাশে তার শান অনুযায়ী অবতরণ করেন। কিভাবে অবতরণ করেন, আমরা তার আকৃতি কল্পনা করবো না। সাদৃশ্যতা ভাববো না। তিনি তার মতই।

> কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়। তিনি সব দেখেন, সব শুনেন।
>
> [সূরা শুরা : ১১]

তারা সারারাত এবাদত করে শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। রাতের উপসংহারে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। মুমিনের সকল এবাদতের উপসংহার ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমেই হয়। আল্লাহ ﷻ সকল নেক আমলের পরে ইসতিগফারের নির্দেশও করেছেন। যেমন সালাতের পর ইসতিগফার পাঠ করার সুন্নত রয়েছে। সাওবান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ সালাতের সালাম ফিরিয়ে 'আসতাগফিরুল্লাহ আসতাগফিরুল্লাহ আসতাগফিরুল্লাহ' পাঠ করতেন। [মুসলিম : ৫৯১]

আল্লাহ ﷻ রাসূলের শেষ জীবনে নাযিল করেছেন–

> যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী। [সূরা নাসর]

রাসূলের শেষ জীবনে এই সূরা নাযিলের মাধ্যমে একটি বার্তা দেয়া হয়েছে। বার্তাটি হল– আপনি আপনার প্রভুর কাছে ইসতিগফার পাঠের মাধ্যমে জীবনের পরিসমাপ্তি টানুন।

ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন, যে কোন নেক আমল ইসতিগফারের মাধ্যমে শেষ করার রহস্য হল, অনেক সময় মানুষ গর্ববোধ করতে পারে, আমি নেক

কাজ করেছি, আমি ইসতিগফার করবো কেন? কিন্তু কোন নেক আমলই ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। এজন্যই যে কোন নেক আমলের পরে ইসতিগফার করতে হয়।

শেষ রাত হল আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের স্বতঃস্ফূর্ত এবাদত ও একাগ্রতার সময়। তাউস ইবনে কাইসান রাহি. একদিন ফজরের পূর্বে তার এক বন্ধুর সাক্ষাতে গেলেন। বন্ধুর ঘরের কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে বন্ধুর ছোট্ট মেয়ে বেরিয়ে সংবাদ দিল, 'বাবা ঘুমোচ্ছেন'।

তাউস ইবনে কাইসান আশ্চর্য হয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! মোহাম্মদ ﷺ-র কোন উম্মত ফজরের পূর্বে ঘুমায়! আমি তো কল্পনাই করতে পারি না!

তাউস ইবনে কাইসান رحمه الله সকলকে নিজের মত মনে করেছেন।

জনৈক আবেদের একটি বাঁদি ছিল। আবেদ অত্যন্ত আল্লাহভীরু ও আল্লাহওয়ালা ছিলেন। তিনি তার স্ত্রী-সন্তান, গোলাম-বাঁদি নিয়ে কিয়ামুল্লাইল করতেন। একদিন আবেদ তার বাঁদিটি বিক্রি করে দিলেন।

বাঁদি নতুন মালিকের ঘরে প্রথম রাত কাটাচ্ছে। রাতের আধাআধিতে বাঁদি সজাগ হল। সে মনে করেছিল, তার এই মালিকও আগের মালিকের মতই। এই ভেবে বাঁদি তার নতুন মালিককে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল। মালিক জিজ্ঞেস করল, 'ফজরের সময় হয়ে গেছে?'

বাঁদি বলল, 'না। আপনি কিয়ামুল্লাইল করবেন না!'

মালিক বলল, 'কিয়ামুল্লাইল করবো না। ফজরে জাগিয়ে দিও।'

রাত শেষ হলে বাঁদি তার আগের মালিকের কাছে চলে এল। মালিককে বলল, 'আপনি আমার উপর জুলুম করেছেন। আপনি আমাকে এমন লোকের কাছে বিক্রি করেছেন, যিনি কিয়ামুল্লাইল করে না!'

রাসূল ﷺ রাতে কোরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য মদীনার অলিগলিতে ঘোরাঘুরি করতেন। যেদিকে সাহাবীদের কোরআন তেলাওয়াতের আওয়ায শুনতেন, সেদিকে যেতেন। একরাতে রাসূল মদীনার গলিতে ঘুরছেন। হঠাৎ শুনলেন, একজন বৃদ্ধা কেঁদে কেঁদে তেলাওয়াত করছেন–

﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾

আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? [গাশিয়া: ১]

মহিলা এই আয়াত বারবার তেলাওয়াত করছিলেন এবং কেঁদেই চলছিলেন।

রাসূল তার দরজার দিকে কান পেতে নিজেই কেঁদে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন– 'হ্যাঁ, আচ্ছন্নকারীর সংবাদ আমার কাছে এসেছে।'

রাসূলের মত ওমর ﷺ-ও কোরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য মদীনার অলিগলিতে ঘোরাঘুরি করতেন এবং কোরআন তেলাওয়াত শুনতেন।

আবু মুসা আশয়ারি ﷺ এর তেলাওয়াত ছিল অত্যন্ত সুললীত কণ্ঠের। তার কণ্ঠ মানুষের অন্তর ছুঁয়ে তরঙ্গায়িত হতো।

রাসূল ﷺ এক রাতে মসজিদে এসে শরীর এলিয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। মসজিদটি ছিল ঘরের পাশেই। তখন আবু মুসা তেলাওয়াত করছিলেন। রাসূল সেখান থেকেই আবু মুসার তেলাওয়াত শুনতে পেলেন। আবু মুসার তেলাওয়াত শুনে রাসূল কাঁদলেন। আবু মুসা জানতেন না, রাসূল তার তেলাওয়াত শুনছেন।

সকালে রাসূল আবু মুসার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, 'গতরাতে তুমি আমাকে যদি দেখতে! আমি তোমার তেলাওয়াত শুনেছি। আমাকে দাউদের সুরেলাস্বরের একটি দেয়া হয়েছে।'

আবু মুসা বললেন– 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার তেলাওয়াত শুনেছেন!'

রাসূল ﷺ বললেন– 'যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ! আমি তোমার তেলাওয়াত শুনেছি।'

আবু মুসা বললেন, 'যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ! যদি জানতাম আপনি আমার তেলাওয়াত শুনছেন, তাহলে আমি আপনার জন্য তেলাওয়াতকে আরও অলঙ্কৃত করতাম।' আমি তেলাওয়াতকে আরও বিশুদ্ধ, সুন্দর ও সুললিত করতাম।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তাদের পার্শ্বশয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। [সূরা সাজদা : ১৬]

ইবনে রাওয়াহা রাসূলের প্রশংসাগাঁথায় বলেন–

শরীর ও বিছানার যোজন দূরত্ব, মুশরিকদের উৎপাতে কাটেনা যে রাত;

যবে আকাশ ছেয়ে উজ্জ্বল হয় যামিনী, তখন শুনি রাসূলের তেলাওয়াত।

সুফিয়ান সাওরি সারারাত জেগে থাকতেন। জনৈক ব্যক্তি বলেন, একবার আমি তার কাছে রাত কাটিয়েছিলাম। চোখে ঘুম আসছে, এমন সময় দেখলাম, তিনি বিছানার উপর চড়ুই পাখির মত তড়পাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে আপনার?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! জাহান্নামের স্মরণ আমার ঘুম তাড়িয়ে দিয়েছে।'

খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের স্ত্রী বলেন, "খলিফা রাতে বিছানায় আসতেন, কিন্তু ঘুমুতেন না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। আমি তার কান্নার আওয়াজ শুনতাম। একবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে আপনার?"

তিনি বললেন, 'হায় আফসোস! মোহাম্মদের উম্মতের দায়িত্ব নিয়েছি আমি! দুর্বল, মিসকীন, শিশু, বিধবা, কত ধরনের মানুষ...!'

এ কথা বলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাত পড়ে সকাল পর্যন্ত কান্না করলেন!'

রাসূলের কিয়ামুল্লাইল

মুগিরা ইবনে শোবা বলেন, "রাসূল দীর্ঘ সময় সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তার পা দুটি ফাটাফাটা হয়ে যেত। আমরা বলতাম, 'আল্লাহর রাসূল! কী হয়েছে আপনার? আপনার পূর্বাপর সবকিছু কি মাফ করে দেয়া হয়নি!"

রাসূল ﷺ বললেন, 'আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না!' [বুখারি : ১১৩০]

ইবনে ইসহাক ﷺ বর্ণনা করেন, নবুওয়াতের প্রথমকালে রাসূল তায়েফে গেলেন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। ধারনা ছিল, তারা দাওয়াত গ্রহণ করবে। কিন্তু তারা রাসূলের দাওয়াতে সাড়া দিল না। তারা রাসূলকে অত্যাচার করে তাড়িয়ে দিল। তাদের অত্যাচারে রাসূল ﷺ পেরেশান হয়ে উপত্যকায় ঘুরতে লাগলেন। কিন্তু তিনি কার কাছে আশ্রয় নিবেন।

পরিস্থিতি অনেক সঙ্গিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখের সামনে ভয়াবহ বিভীষিকা। এক আল্লাহই আছেন আশ্রয়স্থল। রাসূল মক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী এক উপত্যকায় আসলেন। তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। রাসূল একটু ঘুমানোর চেষ্টা করছেন, কিন্তু ভয়ে আতঙ্কে চিন্তায় তার ঘুম হল না। তিনি উঠে অযু করলেন। সালাতে দাঁড়িয়ে কান্না জুড়ে দিলেন। আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

আল্লাহ ﷻ তার চারপাশে জিনদের সমাবেশ ঘটালেন। পুরো উপত্যকায় জিনরা আগমন করল। রাসূল শুধু মানুষদের কাছেই প্রেরিত হননি। তিনি জিনের কাছেও প্রেরিত। তিনি সারা বিশ্বের জন্য প্রেরিত। এভাবে আল্লাহ ﷻ তার আত্মবিশ্বাস বাড়ালেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> বলুন, আমার কাছে ওহি নাযিল করা হয়েছে, জিনদের একটি দল কোরআন শুনেছে অতঃপর তারা বলেছে আমরা বিস্ময়কর কোরআন শুনেছি। [সূরা জিন : ০১]

জিনেরা ইয়ামান থেকে পলকেই এসে উপস্থিত হল। আল্লাহ ﷻ তাদের পলকে উপস্থিত হওয়ার ক্ষমতা প্রদান করেছেন।

রাসূল ﷺ সালাত পড়ছেন। জিনেরাও রাসূলের সাথে সালাতে অংশগ্রহণ করল। রাসূল তেলাওয়াত করছেন–

> আর যখন আল্লাহর বান্দা তাকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হল, তখন অনেক জিন তার কাছে ভিড় জমাল। [সূরা জিন : ১৯]

জিনেরা পূর্ণ মনোযোগে রাসূলের তেলাওয়াত শুনল। তারা পরস্পরকে চুপ করিয়ে দিল।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল। তারা যখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। [সূরা আহকাফ : ২৯]

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। [সূরা আহকাফ : ২৯]

তারা রাসূলের কাছে দীনের দাওয়াত গ্রহণ করে হেদায়াতের বাহক হয়ে নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল। ইয়ামানে নিজেদের সম্প্রদায়কে গিয়ে বলল–

> হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মুসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য কর এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ মার্জনা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। [সূরা আহকাফ: ৩০-৩২]

রাসূল ﷺ মক্কায় ফিরে এলেন। রাসূল যখন জানলেন, জিনেরা তার দাওয়াত গ্রহণ করেছে, তখন তার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে গেল।

রাসূল সালাতের আগে এই দোয়াটি পড়েছিলেন–

> হে আল্লাহ! আমি মানুষের উপর আমার শক্তির দুর্বলতা, আমার কৌশলের স্বল্পতা এবং আমার অসহায়ত্বের অভিযোগ আপনার নিকট করছি। হে দয়ালুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দয়ালু! আপনিই দয়ালুদের মধ্যে পরম দয়ালু।

যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়, আপনি তাদের প্রতিপালক। আপনি আমারও প্রতিপালক। আপনি আমাকে কার কাছে সমর্পণ করছেন! কোন দূরবর্তী শত্রুর কাছে, যে আমাকে অপারগ করবে! না কোন নিকটবর্তী বন্ধুর কাছে, যার কাছে আপনি আমার ব্যাপারে অধিকার দিয়ে রেখেছেন! যদি আমার প্রতি আপনার অসন্তোষ না থাকে, তবে আমি আমার এ দুঃখ ও বেদনার জন্য কোন পরোয়া করি না। যদি আপনি আমাকে নিরাপদে রাখেন, তাহলে এটা হবে আমার জন্য সুখ শান্তির ব্যাপার। আমি আপনার চেহারার ঔজ্জ্বল্যের মাধ্যমে, যার কারণে সমস্ত অন্ধকার আলোকিত হয়ে উঠেছে এবং যার উপর দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কাজের কল্যাণ নির্ভরশীল, আমার উপর আপনার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি নাযিল হোক, –এর থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আপনার সন্তুষ্টিই কামনা করি। পুণ্য কাজ করা ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকার ক্ষমতা একমাত্র আপনার সাহায্যের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। [সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৪২০]

কিয়ামুল্লাইলের ফযীলত

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

তোমরা কিয়ামুল্লাইলের গুরুত্ব দাও। কিয়ামুল্লাইল গোনাহ ও ভুলত্রুটির মার্জনা। তোমাদের পূর্ববর্তীদের ঐতিহ্য। শারীরিক রোগ-বিরোগের উপশম। [তিরমিযি : ৩৫৪৯]

জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের অভিমত, যে ব্যক্তি নিয়মিত কিয়ামুল্লাইল আদায় করে, আল্লাহ ﷻ তাকে শারীরিক সুস্থতা, সক্ষমতা এবং দৃঢ়তা দান করেন।

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'কিয়ামুল্লাইলের উসিলায় ইবনে তাইমিয়া রহ. শারীরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। ভরাট কণ্ঠে কথা বলতেন। জিহাদের ময়দানে ছিলেন যুদ্ধাংদেহী। উঠাবসা, চলাফেরায় ছিলেন অভিজাত।'

কিয়ামুল্লাইল কত রাকাত

কিয়ামুল্লাইলের সর্বোচ্চ কোন রাকাতসংখ্যা নেই। ওলামায়ে কেরামের এমনই অভিমত। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের থেকে রাতের দীর্ঘ সময় কিয়ামুল্লাইলে কাটানোর অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম যাহাবি ﷺ সিয়ারু আলামিন নুবালা গ্রন্থে যাইনুল আবিদিন আলি ইবনে হুসাইন ﷺ এর জীবনীতে উল্লেখ করেন, তিনি এক রাতে এক হাজার রাকাত পর্যন্ত কিয়ামুল্লাইল আদায় করতেন।

আতা ইবনে আবি রাবাহ রাতে সালাতে দাঁড়াতেন। যতক্ষণ সালাত থেকে ঢলে না পড়তেন, ততক্ষণ তিনি সালাতেই থাকতেন।

উল্লেখ্য, আমাদের জন্য যতটুকু সহজ হয়, ততটুকুই আমরা আদায় করবো। আল্লাহ আমাদের জন্য সবকিছু সহজ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

> আপনাকে ক্লেশ দেয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি। [সূরা ত্বাহা : ০২]
>
> আমি আপনার জন্য সহজ শরীয়ত সহজতর করে দিবো। [সূরা আ'লা: ০৮]
>
> আল্লাহ কাউকে সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। [সূরা বাকারা: ২৮৬]
>
> তিনি তোমাদের পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সঙ্কীর্ণতা রাখেননি। [সূরা হাজ্জ : ৭৮]
>
> এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দিত্ব অপসারণ করেন, যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। [সূরা আরাফ : ১৫৭]

মধ্যপন্থায় নিয়মিত এবাদত করা আমাদের দায়িত্ব। অল্প ক'রাকাত হলেও নিয়মিত কিয়ামুল্লাইল আদায় করবো। একরাতে একশ রাকাত আদায় করে পুরো বছর আর কিয়ামুল্লাইল আদায় না করার চেয়ে নিয়মিত অল্প ক'রাকাত আদায় করা ঢের উত্তম।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

> আল্লাহর কাছে এমন আমল সবচেয়ে প্রিয়, যা অল্প হলেও নিয়মিত হয়। [বুখারি : ১৯৭০]

কিয়ামুল্লাইল সর্বনিম্ন কত রাকাত

এশার সালাতের সাথে সাথে সালাতুল বিতির আদায়কারী যদি শেষ রাতে কিয়ামুল্লাইল আদায় করতে চায়, তবে তিনি দুই রাকাত আদায় করলেই

কিয়ামুল্লাইল হিসেবে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি এই আমল নিয়মিত করবে, সে সৌভাগ্যবান। সে আল্লাহ ﷻ-র কাছে পছন্দের ব্যক্তি।

কিয়ামুল্লাইলে সহযোগী আমল

কিয়ামুল্লাইল আদায়ে সহযোগী আমল অনেক রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল–

এক.

ঘুমানোর সময় তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ, চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করা।

ফাতেমা رضي الله عنها রাসূল ﷺ-র কাছে একজন মহিলা খাদেম চেয়েছিলেন। রাসূল ﷺ তাকে বললেন–

> আমি তোমাদের একজন খাদেমের তুলনায় আরও উত্তম কিছু দিবো! যখন তোমরা ঘুমুতে যাবে, তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ, চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। [বুখারি : ৩১১৩]

দুই.

দিনে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করা। সম্ভব হলে যোহরের আগে, না হয় মধ্যাহ্নভোজের পরে।

তিন.

গোনাহ পাপাচার কমিয়ে দেয়া। গোনাহ পাপাচার মানুষের মধ্যে এবাদতের ক্ষেত্রে অলসতা তৈরি করে। কিয়ামুল্লাইলের আগ্রহ ও উদ্যম নষ্ট করে।

হাসান বসরি বলেন, ‘হে আবু সাঈদ! আমরা কিয়ামুল্লাইল করতে পারি না।’

আবু সাঈদ উত্তর দিলেন, ‘আল্লাহর কসম! তোমাদের গোনাহ তোমাদেরকে কয়েদি করে রেখেছে।’

চার.

দ্রুত ঘুমিয়ে পড়া এবং রাত্রি জাগরণ পরিহার করা। রাত্রি জাগরণে বিশেষ কোন লাভ নেই। বরং তা ক্ষতিকর বটে।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, যে ব্যক্তি রাত্রি জাগরণের ফলে ফজরের সালাত আদায় করতে পারল না, তাহলে কোরআন তেলাওয়াত করে রাত্রি জাগরণ করলেও সে একটি হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। কারণ, কোরআন তেলাওয়াত নফল এবং ফজরের সালাত আদায় করা ফরয।

বিষয়টি যদি এমনই হয়, তাহলে যে ব্যক্তি কথাবার্তা গল্পগুজবে রাত কাটাল এবং ফজরের সালাত আদায় করতে পারল না, তার ব্যাপারে আমরা কী বলতে পারি!

কিয়ামুল্লাইলের দোয়া

কিয়ামুল্লাইলের তিনটি দোয়া এখানে উল্লেখ করা হল। এই দোয়াগুলো মুখস্থ করা সম্ভব না হলে যে যার সাধ্যমত আল্লাহ ﷻ-র কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করবো। মানুষ যখন অন্যমনস্ক থাকে, তখন তার অলঙ্কারপূর্ণ কথাবার্তাও আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হতে পারে না।

এক.

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, রাসূল ﷺ যখন কিয়ামুল্লাইলে দাঁড়াতেন, তখন এই দোয়া পড়তেন–

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

হে আল্লাহ! জিবরাইল মিকাইল ইসরাফীলের প্রভু! আসমান ও যমিনসমূহের সৃষ্টিকারী! দৃশ্য অদৃশ্য সবকিছুর জ্ঞাতা! আপনি আপনার বান্দাদের বিবাদমান বিষয়ে বিহিত করেন। হকের ব্যাপারে যে বিবাদ করা হচ্ছে, তাতে আপনি স্বীয় অনুহগ্রহে আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আপনি যাকে ইচ্ছা, সরল পথ প্রদর্শন করেন। [মুসলিম : ২৫২২৫]

দুই.

রাসূল ﷺ কিয়ামুল্লাইলে দাঁড়িয়ে এই দোয়া পাঠ করতেন–

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا أَوْ قَالَ وَاجْعَلْنِي نُورًا

হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর স্থাপন করো। আমার শ্রবণে নূর দাও। আমার দৃষ্টিতে নূর দাও। আমার সামনে-পিছনে নূর দাও। আমার ডানে-বাঁয়ে নূর দাও। আমার উপরে-নিচে নূর দাও। আমার অস্থি-গোস্তে নূর দাও। আমার রক্তে, পশমে, ত্বকে নূর দাও। [মুসলিম : ১৮৩০]

উক্ত দোয়া সেই নূরের প্রার্থনা করা হয়েছে, যা আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের নূর। তার নূরের উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি। [সূরা নূর : ৩৫]

তিন.

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

আল্লাহ, তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর নূর। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর মালিক। তোমার

জন্য সকল প্রশংসা, তুমি সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য। তোমার বাণী সত্য। জান্নাত সত্য। দোযখ সত্য। সকল নবী সত্য। মোহাম্মদ সত্য।

আল্লাহ, তোমারই জন্য আমি সমর্পিত। তোমাতেই আমি বিশ্বাস রেখেছি। তোমারই উপর ভরসা করেছি। তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করেছি। তোমারই রাহে লড়াই করেছি। তোমরাই দরবারে বিচার চেয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার পূর্বাপর ক্ষমা কর। আমার প্রকাশ্য-গোপনীয় সবকিছু ক্ষমা কর।

আকাবির আসলাফের কিয়ামুল্লাইল

আকাবির আসলাফের; আমাদের পূর্ববর্তী মহান মনীষীদের কিয়ামুল্লাইলের কিছু আলোচনা পূর্বে বিবৃত হয়েছে। কিয়ামুল্লাইল, তাহাজ্জুদ ছিল তাদের জীবনের পাথেয়।

বিখ্যাত মুজাহিদ ও পরহেযগার আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রাহি. এর জনৈক ছাত্র বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারকের সাথে খোরাসানের মাটিতে জিহাদে গিয়েছিলাম। একদিন রাতে ঘুমুতে গিয়ে ভাবলাম, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক সারারাত কী করেন, দেখবো।

সেদিন রাত ছিল শীতকম্পিত। আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ঘুম থেকে উঠে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে অজু করলেন। সালাতে দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাওয়াত করতে লাগলেন–

> প্রাচুর্যের লালসা তোমাদের গাফেল রাখে। এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। ... [সূরা তাকাসুর]

তিনি ফজর পর্যন্ত সালাতেই মগ্ন রইলেন।

ইবনে কাসির এবং যাহাবি ﵀ সিলা বিন উসাইমের ঘটনা বর্ণনা করেন– সিলা বিন উসাইম কাবুলে জিহাদে গিয়েছিলেন। তিনি রাতে তাহাজ্জুদ শুরু করার আগ পর্যন্ত বিছানায় ছপফট করতেন।

তার এক সহচর বর্ণনা করেন, সিলা বিন উসাইম কাবুলের এক বনে সালাত পড়তেন। একদিন আমি গাছে চড়ে বসলাম তার এবাদত দেখার জন্য।

সেটি ছিল বনের রাজা সিংহের অভরায়ণ্য। সিলা বিন উসাইম সালাত শুরু করলেন। আল্লাহ ﷻ-র কাছে কান্না করছেন। এমন সময় একটি সিংহ বন থেকে বেরিয়ে তার দিকে আসতে লাগল। আল্লাহর কসম! সিলা বিন উসাইম একটুও বিচলিত হলেন না। নড়াচড়া করলেন না। স্থির চিত্তে সালাত শেষ করলেন। সিংহটি তার পাশে দাঁড়াল। সালাত শেষে সিংহকে নির্দেশস্বরে বললেন, 'হে বনের রাজা সিংহ! তুমি আমার মৃত্যুদূত হয়ে আসলে আমাকে খেয়ে যেতে পার। আল্লাহ ﷻ-র প্রতিরক্ষা ছাড়া আমার আর কোন অস্ত্র নেই। আর মৃত্যুদূত হয়ে না আসলে চলে যাও। আহার খোঁজ কর। আমাকে সালাত পড়তে দাও।'

সিলা বিন উসাইমের কথা শুনে সিংহটি লেজ নাড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সন্তর্পণে আপন গুহায় চলে গেল। সিলা বিন উসাইম ভোর পর্যন্ত সালাতেই রত রইলেন।

সকালে যখন তার সাথে দেখা, তখন তিনি অত্যন্ত প্রফুল্ল ও প্রাণবন্ত। অথচ আমি তখন খুবই ক্লান্ত। কারণ তিনি রাত কাটিয়েছেন আল্লাহ ﷻ-র সান্নিধ্যে। আর আমি!

হাসান বসরিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'যারা কিয়ামুল্লাইল আদায় করেন, তাদের চেহারা এত উজ্জ্বল থাকে কেন?'

তিনি বললেন, 'তারা আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকে। এজন্য আল্লাহ তাদের চেহারায় একটি নূর দান করেন। এই নূর আল্লাহর নূর।'

কিয়ামুল্লাইলের কিছু ঘটনা ও হাদিস

ইবনে ওমর رضي الله عنه নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন–

রাসূলের যুগে সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন স্বপ্ন দেখতেন। রাসূল ফজরের সালাত আদায় করে আমাদের দিকে ফিরে বসতেন। জিজ্ঞেস করতেন, 'তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ?'

সাহাবায়ে কেরাম কোন স্বপ্ন দেখলে তা রাসূলের কাছে বলতেন।

আমি তখন মসজিদে ঘুমাতাম। একরাতে স্বপ্নে দেখলাম– দুই ব্যক্তি এসে একজন আমার ডান হাত ধরল, অপরজন বাম হাত ধরল। তারা আমাকে

একটি বাঁধানো কূপের দিকে নিয়ে গেল। কূপের মধ্যে একটি সম্প্রদায়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। লোক দুজন আমাকে বলল, 'ভয় পেওনা, ভয় পেওনা।'

তারা আবার আমার হাত ধরল। আমি তাদের সাথে চললাম। তারা রেশমের একপ্রস্ত কাপড় আমার হাতে দিল। সেই কাপড় দিয়ে যে দিকেই ইঙ্গিত করছি, আমাকে সেদিকেই একটি সবুজ বাগানের উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সকালে ইবনে ওমর ﵁ রাসূলের কাছে তার স্বপ্নের কথা খুলে বলার উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু লজ্জা পেলেন। তখন ইবনে ওমরের বয়স কম ছিল। অবিবাহিত ছিলেন তিনি।

ইবনে ওমর আপন বোন হাফসাকে স্বপ্নের কথা জানালেন এবং রাসূলকে বিষয়টি জানানোর জন্য বললেন।

হাফসা ﵂ রাসূলের কাছে ইবনে ওমরের স্বপ্নের কথা জানালেন। রাসূল স্মিতহাস্যে বললেন, 'আব্দুল্লাহ কতই ভালো লোক! যদি সে রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করতো!' [বুখারি : ১১২২]

এরপর থেকে ইবনে ওমর রাতে আর ঘুমুতেন না।

ওলামায়ে কেরাম ইবনে ওমরের উক্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। স্বপ্নের বাঁধানো কূপটি ছিল জাহান্নাম। ইবনে ওমরকে জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়েছে। আল্লাহ ﷻ আমাদের জাহান্নাম থেকে হেফাযত করুন।

স্বপ্নের লোক দুজন ছিলেন ফেরেশতা। রেশমের কাপড় হল ইবনে ওমরের নেক আমল। নেক আমল মানুষকে এমনই এক মর্যাদা থেকে আরেক মর্যাদায় উন্নীত করে।

ইবনে আব্বাস ﵄ এর হাদিসের ব্যাখ্যা

ইবনে আব্বাস ﵄ এর হাদিসটি শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ তাহাজ্জুদের জন্য উঠে এই দোয়া পড়তেন–

> আল্লাহ, তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি

আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর নূর। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর মালিক। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। তোমার বাণী সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। সকল নবী সত্য। মোহাম্মদ সত্য।

আল্লাহ, তোমারই কাছে আমি সমর্পিত। তোমাতেই আমি বিশ্বাস রাখি। তোমারই উপর ভরসা রাখি। তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করি। তোমার মদদে বিবাদ করি। তোমরাই দরবারে বিচার চাই। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার পূর্বাপর ক্ষমা কর। আমার প্রকাশ্য-গোপনীয় সবকিছু ক্ষমা কর। [বুখারি : ১১২০]

'আল্লাহ আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক'।

যেমন আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। [সূরা বাকারা : ২৫৫]

তিনি স্বয়ম্ভু। সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। আসমান যমিন সবকিছু তারই স্থাপিত।

আল্লাহ আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর নূর।

আল্লাহর নূরে আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছু আলোকিত। তার নূর সব ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত। তার নূর দ্বারা সবকিছু পরিশুদ্ধ। আল্লাহ ﷻ বলেন–

আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের নূর। তার নূরের উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি। [সূরা নূর : ৩৫]

ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন, উক্ত নূরের অনেক অর্থ রয়েছে। একটি হল, তিনি আসমান ও যমিনের সবকিছুর হেদায়াতদাতা।

তিনি আসমান যমিনের সবকিছুর কর্মবিধায়ক। হেদায়াতপ্রাপ্তদের থেকে অন্যরা সে নূর আহরণ করে।

'তার নূরের উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি।' অর্থাৎ, তিনি যে নূর মুমিনদের দান করেছেন, মুমিনের অন্তরে স্থাপন করেছেন, তার উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি।

'তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি সত্য।'

আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার অস্তিত্ব সত্য। তার বাণী সত্য। তার কর্মকাণ্ড সত্য। তিনিই সত্য, আর সব অসত্য...

কবির ভাষায়–

আল্লাহ ছাড়া আর সব অসত্য।

মুছে যাবে সবকিছুর অস্তিত্ব।

জান্নাত-জাহান্নাম ছাড়া আর সবকিছুর অস্তিত্ব মুছে যাবে।

'তোমার ওয়াদা সত্য।'

আল্লাহ ﷻ যে ওয়াদা মানুষদের দিয়েছেন, সে ওয়াদা হল কেয়ামতের ওয়াদা। কেয়ামতের ওয়াদা সত্য। কেয়ামত হবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ ﷻ সকল মানুষকে আবার জীবিত করবেন, এতে কোন সংশয় নেই।

'তোমার সাক্ষাৎ সত্য।'

অর্থাৎ, যেদিন আমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবো। আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হবো। এই কথার দ্বারাও কেয়ামতের সত্যতা বুঝা যায়।

'তোমার বাণী সত্য।'

আল্লাহ ﷻ-র কোন কথা মিথ্যা নয়। আল্লাহ ﷻ-র বাণী হল কোরআন। কোরআনে কোন মিথ্যা নেই। কোন সন্দেহ-সংশয় নেই।

'জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য।'

হাদিসের এই কথা দিয়ে প্রমাণিত হয়, জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে। তা এখন বিদ্যমান। এর কোন শেষ নেই। শায়খ হাফেয হিকামি رحمه الله বলেন–

এখনও বিদ্যমান জান্নাত জাহান্নাম, শেষ হবে না কভু এসবের পরিণাম।

‘সকল নবী সত্য।’

কোন নবীই নিজ থেকে নবুওয়াত দাবি করেননি। আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে সকল নবীর প্রেরণ সত্য। তাদের উপর সামগ্রিক ও সবিস্তার ঈমান রাখা আবশ্যক।

সামগ্রিক ঈমান আনার অর্থ, আল্লাহ ﷻ যাদেরই প্রেরণ করেছেন, কোরআন-সুন্নাহয় তাদের নাম উল্লেখ থাক বা না থাক, সকলের উপর ঈমান আনয়ন আবশ্যক।

সবিস্তার ঈমান রাখার অর্থ কোরআনে উল্লিখিত পঁচিশজন নবীর উপর ঈমান আনা আবশ্যক।

‘মোহাম্মদ সত্য।’

মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহ ﷻ-র প্রেরিত নবী। তিনি সর্বশেষ নবী। তার মর্যাদা ও সম্মান বিশেষভাবে উল্লিখিত।

‘আল্লাহ, তোমারই কাছে আমি সমর্পিত। তোমাতেই আমি বিশ্বাস রাখি।’

অর্থাৎ, তোমার কাছে দেহ-আত্মা সমর্পন করলাম। কোন অহঙ্কার, অপূর্ণ ও হেয়জ্ঞান ছাড়া আমার দেহ-আত্মার বাগডোর তোমার কাছে সমর্পন করলাম। এসবকিছু আমার অন্তর থেকে বিশ্বাস করলাম।

‘তোমারই উপর ভরসা রাখি।’

ইবনে হাজার رحمه الله বলেন, তাওয়াক্কুল বা ভরসার অর্থ হল সবধরনের মাধ্যম ছেড়ে নিজের সকল বিষয় আল্লাহ ﷻ-র কাছে সমর্পন করা।

উল্লেখ্য, ইবনে হাজারের এই ব্যাখ্যাটি ভুল। কারণ, আহলে সুন্নাহর বিশ্বাস অনুযায়ী তাওয়াক্কুল বা ভরসার অর্থ সকল বিষয় আল্লাহ ﷻ-র কাছে সমর্পন করা, তবে তা মাধ্যম ছেড়ে নয়। সুতরাং মাধ্যম গ্রহণ সিদ্ধ। রাসূল ﷺ মাধ্যম গ্রহণ করেছেন। যুদ্ধে বর্শা ব্যবহার করেছেন। বর্মা পরিধান করেছেন। মাথায় শিরস্ত্রাণ পরেছেন।

রাসূলের কাছে এক লোক এসে আল্লাহর উপর ভরসা সত্বেও উট হারানোর অভিযোগ করেছিল। রাসূল তাকে বলেছিলেন–

> উট বেঁধে রাখ। এরপর তাওয়াক্কুল কর। [তিরমিযি : ২৫১৭]

উক্ত ঘটনায় রাসূল ﷺ তাকে আল্লাহ ﷻ-র উপর তাওয়াক্কুল করতে বলেছেন, মাধ্যমও ব্যবহার করতে বলেছেন।

'তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করি।'

আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রত্যাবর্তন হল তাওয়াক্কুলের শেষ স্তর। কোন বিষয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা হয় এবং সর্বশেষ আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করা হয়।

'তোমারই মদদে বিবাদ করি।'

তোমার জন্য কারো সাথে বিতর্ককালে তুমিই আমাকে প্রয়োজনীয় দলীল-প্রমাণের সন্ধান দিয়েছ। দলীল-প্রমাণের মালিকও তুমিই।

'তোমরাই দরবারে বিচার চাই।'

যে আমার সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে, তার সমাধান তোমার কাছে চাই। তুমি ছাড়া আর কারো কাছে সমাধান নেই। কোন গোত্রপতি যাজকের কাছে সমাধান নেই। তোমার কাছেই একমাত্র সমাধান।

'তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার পূর্বাপর ক্ষমা কর।'

রাসূল ﷺ-র পূর্বাপর সবকিছু ক্ষমাঘোষিত ছিল। তবু রাসূল কেন ক্ষমা চেয়েছেন? এর নামই হল বিনয়। নিজের দুর্বলতা এবং অক্ষমতার সরল স্বীকারোক্তি। এই ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে রাসূল তার উম্মতকে সবক দিয়েছেন, যেন তারাও আল্লাহ ﷻ-র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

'আমার প্রকাশ্য-গোপনীয় সবকিছু ক্ষমা কর।'

আমি গোপনে যত গোনাহ করেছি, যেসব গোনাহের কোন সাক্ষী নেই, সেগুলো তুমি ক্ষমা কর। প্রকাশ্যে যত গোনাহ করেছি, সেসবও তুমি ক্ষমা কর।

'তুমিই প্রথম-শেষ'

তোমার ইচ্ছায় যেসব বিষয় আগে ঘটানোর, তা আগে ঘটাও। যেসব বিষয় পরে ঘটানোর, তা পরে ঘটাও। আল্লাহ ﷻ-র গুণবাচক নামগুলোর স্থিতি তার আগে নয়। আল্লাহ ﷻ বলেন–

তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ। তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান। তিনি সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। [সূরা হাদিদ : ৩]

আল্লাহ ﷻ-র জন্য নতুন কোন গুণবাচক নামের উদ্ভাবন নেই। কোরআন ও হাদিসে আল্লাহ ﷻ-র যেসব গুণবাচক নামের উল্লেখ আছে, সেসবের মধ্যেই আল্লাহ ﷻ-র গুণবাচক নাম সীমাবদ্ধ থাকবে।

আল্লাহ ﷻ-র গুণগুলো পরিপূর্ণ। আল্লাহর গুণাবলীতে কোন অসম্পূর্ণতা নেই। তার গুণগুলো মানুষের বা কোন সৃষ্টিজীবের গুণাবলীর মত নয়। কোন পরিপূর্ণ গুণবাচক শব্দে মানুষের নাম রাখা হলেও মানুষের গুণ পরিপূর্ণ নয়। আল্লাহ গুণ আরও পরিপূর্ণ। যদি কারও নাম রাখা হয় 'কারীম' (সম্মানিত) বা 'হালীম' (সহনশীল), তাহলে আল্লাহর আরও সম্মানিত। আরও সহনশীল। আল্লাহর সম্মান ও সহনশীলতা মানুষের মত নয়। আল্লাহর গুণাবলী তার উপযুক্ত মত।

আল্লাহ ﷻ-র গুণবাচক নাম নিরানব্বইটি। আবু হোরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেন,

আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে তা মুখস্থ করবে, জান্নাতে প্রবেশ করবে। [বুখারি : ২৭৩৬]

এই নিরানব্বই নাম ছাড়া আল্লাহর আরও কিছু গুণবাচক নাম আছে। ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ আল্লাহ ﷻ-র কাছে এই বলে দোয়া করতেন– 'হে আল্লাহ! তোমার সকল নামের উসিলায় তোমার কাছে চাইছি; যেসব নাম তুমি নিজের জন্য রেখেছ, আমাদের অজানায় যেসব অর্থ নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছ, যেসব নাম তোমার পাক কিতাবে অবতীর্ণ করেছ বা তোমার কোন সৃষ্টিকে জানিয়েছ।" [আহমাদ : ৩৭০৪]

উক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ ﷻ-র এমন কিছু নাম আছে, যা কেউ জানে না। নবীগণও জানেন না।

ইবনে আব্বাসের বর্ণিত দোয়াটি রাসূল তাহাজ্জুদে কখন পড়তেন–

ইবনে খোযায়মার সহীহ সূত্রে বর্ণিত, রাসূল ﷺ সালাতে তাকবীরের পর উক্ত দোয়াটি পড়তেন।

আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করি, আল্লাহ আমাদের রাতজাগা এবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। রাতের শেষ প্রহরে তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। কবির ভাষায়–

রাতের আঁধারে ঢেকে যায় যবে এবাদতকারী

চোখের বন্যা প্রবাহিত হয় কপোল গড়িয়ে...

ইবনে তাইমিয়ার উপদেশ

সকল প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য। সালাম ও শান্তি মুত্তাকীদের ইমাম, সকল মানুষের নেতা মোহাম্মদ ﷺ-র জন্য। তার পরিবারবর্গ, সাথি-সহচর ও অনুসারীদের জন্য।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া رحمه الله। প্রখ্যাত আলেমে দীন। বীর-মুজাহিদ। দুনিয়াবিরাগ এবাদতকারী। প্রতিভাবান লেখক ও গবেষক। বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। বক্ষমান শিরোনামে তার একটি হাদিয়া বা অসিয়তনামা উল্লেখ করছি।

আবুল কাসেম মাগরিবি নামে জনৈক লোক ইবনে তাইমিয়া رحمه الله এর ব্যক্তিত্ব শুনে তার সাথে দেখা করার উৎসাহ পেল। লোকটি ইবনে তাইমিয়ার সাথে দেখা করার জন্য দামেস্ক সফর করল। ইবনে তাইমিয়াকে দেখে লোকটি হতবম্ভ হয়ে গেল। তার ব্যক্তিত্বের কথা মন থেকে উবে গেল। লোকটি ইবনে তাইমিয়ার কাছে কিছু জানতে চেয়ে একটি চিঠি লিখল–

হে সম্মানিত শায়খ! বিগত মহান মনিষীদের সম্পূরক নমুনা! আগত প্রজন্মের পরিপূর্ণ আদর্শ! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশ দেশান্তরে সমাদৃত তাকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে তাইমিয়ার সাথে আমি দেখা করতে এসেছি। আমাকে দীন ও দুনিয়ার কল্যাণকর কিছু উপদেশ দিন। আমাকে এমন একটি কিতাব দিন, শরীয়তের যে কোন বিষয়ে যেন আমি উক্ত কিতাবের ভরসা করতে পারি। ওয়াজিব আমল ছাড়াও বিভিন্ন নফল ও উত্তম আমলের পথনির্দেশ সে কিতাব থেকে গ্রহণ করতে পারি। আয় উপার্জনের জন্যও উত্তম ও উপযুক্ত একটি পন্থা সে কিতাব থেকে অবলম্বন করতে পারি। কিতাবটি যেন নিগূঢ় অর্থবাহী সুসংক্ষিপ্ত ভাষায় রচিত হয়। আল্লাহ শায়খকে হেফাযত করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। [মোজমুআতুল ফাতাওয়া : ১০/৬৫৩]

লোকটি ইবনে তাইমিয়ার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণবাহী কিছু উপদেশ জানতে চাইল, অথচ উপদেশগুলো সংক্ষিপ্ত ভাষায় লিখার শর্ত জুড়ে

দিল। কারণ লোকটি জানত, ইবনে তাইমিয়ার কলম চালনা শুরু হলে কয়েক খণ্ডের দীর্ঘ রচনা হওয়ার আগ পর্যন্ত তা আর থামবে না। উপদেশগুলো তখন পৃথক একটি কয়েক খণ্ডের কিতাব আকারে দাঁড়াবে।

ইবনে তাইমিয়া ﷺ লোকটির উদ্দেশ্য বুঝে চিঠির জওয়াব লিখলেন–

সকল প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য।

ইবনে তাইমিয়া ﷺ যে কোন উত্তরনামা সবসময় আল্লাহ ﷻ-র প্রশংসা দিয়ে শুরু করতেন। রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'যে কাজ আল্লাহর প্রশংসা ছাড়া শুরু হয়, তা অপূর্ণ।'

কোন কোন বর্ণনায় 'আল্লাহর প্রশংসা' এর স্থলে 'বিসমিল্লাহ' বা 'আল্লাহর স্মরণ' শব্দমালা দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনাসূত্র দুর্বল হলেও সামষ্টিকভাবে তা হাসান পর্যায়ে পৌঁছে। ইবনে তাইমিয়া সবসময় এই হাদিস দিয়েই তার সকল বিষয়ের সূচনা করতেন। আল্লাহ তাকে যে জ্ঞান প্রজ্ঞা এবং দীনের বুঝ দান করেছেন, তিনি সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন। রাসূল ﷺ যে কোন খোৎবা আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু করতেন। চিঠিপত্র বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করতেন। এটি রাসূলের আদর্শ।

আপনি আমার কাছে উপদেশ চেয়েছেন। যে আল্লাহর ও রাসূলের উপদেশ বোঝে এবং অনুসরণ করে, তার জন্য আমার দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ হল আল্লাহ ﷻ-র এই বাণী–

> বস্তুত আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদের এবং তোমাদের যে তোমরা সবাই ভয় করতে থাক আল্লাহকে। [সূরা নিসা : ১৩১]

এটি হল বান্দার প্রতি আল্লাহ ﷻ-র উপদেশ। আল্লাহ তার কিতাবে এই উপদেশ দিয়েছেন। রাসূল ﷺ-ও হাদিসে এই উপদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ ﷻ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছেন। তাকওয়ার উপদেশই হল সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ উপদেশ।

ইবনুল কাইয়িম ﷺ কিতাবুল ফাওয়ায়েদ-এ উল্লেখ করেন– সুলাইমান ﷺ বলেন, 'মানুষ যেসব বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, আমরাও সেসব বিষয়

থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। মানুষ যেসব বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না, সেসব বিষয় থেকেও আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। তাকওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু পাইনি। মানুষ যেন তার বন্ধু সহচর ছেলে প্রতিবেশীদের তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ প্রদান করে।’

তাকওয়া কী?

তালক ইবনে হাবিব বলেন, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে তার নূরের আশ্রয়ে কোন ভাল কাজ করাই তাকওয়া।

ইবনে তাইমিয়া বলেন, আল্লাহ ﷻ-র আদেশ পালন করা এবং আল্লাহ ﷻ-র নিষেধ থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া।

আলি ইবনে আবু তালেব বলেন, আল্লাহকে ভয় করা, কোরআনের উপর আমল করা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল তাকওয়া।

অনেক আলেমের মতে– তাকওয়া হল আল্লাহ ﷻ-র আযাব এবং বান্দার মাঝে একটি আড় স্থাপন করা।

ইবনে তাইমিয়া লিখেন–

মুয়ায -কে ইয়ামান পাঠানোর সময় রাসূল ﷺ তাকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন–

> হে মুয়ায! যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর। কোন মন্দ কাজ হয়ে গেলে সাথে সাথে একটি ভাল কাজ কর। এতে ভাল কাজটি মন্দ কাজের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। মানুষের সাথে আদর্শ আচরণ প্রদর্শন কর। [তিরমিযি : ১৯৮৭]

কারণ বান্দার উপর দুটি হক রয়েছে। একটি হক আল্লাহ ﷻ-র, আরেকটি হক বান্দার।

মন্দ কাজের পর যে ভালো কাজটি করবে, সেটি যেন মন্দ কাজ জাতীয় হয়। এতে মন্দ কাজের ক্ষতিপূরণ পূর্ণাঙ্গাভাবে হয়।
মানুষ যেখানেই থাক, লোকালয়ে থাক বা নির্জনে থাক, সর্বাবস্থায় তাকওয়া ও আল্লাহর ভয় মানুষের অবলম্বন। জীবন বাঁচানোর জন্য ঠাণ্ডা পানির যেমন

প্রয়োজন, তারও চেয়ে বেশি প্রয়োজন তাকওয়া। বাতাসের চেয়েও বেশি প্রয়োজন আল্লাহর ভয়। যে আল্লাহকে ভয় করে না, সে অনেক অপদস্থ। তার কর্ম নিষ্ফল। তাকওয়া না থাকলে মানুষের অন্তর কঠোর হয়ে যায়। চোখের পানি শুকিয়ে যায়। রিযিক সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। সকল কর্ম ভেস্তে যায়।

জনৈক তাবেঈ রহ. বলেন, প্রতিদিন আয়নাতে আমার চেহারা দেখি আর পরখ করি– গোনাহের কুপ্রভাবে আমার চেহারা কালো হয়ে যায়নি তো!

আবু সোলাইমান দারানি রহ. বলেন, আল্লাহর কসম! আমি কখনও আল্লাহর অবাধ্য হয়ে গেলে আমার স্ত্রীর আচরণে তার প্রতিফল পাই। আমার বাহনের (জন্তু) আচরণেও এর প্রভাব পাই। বাহন আমার নির্দেশ মত চলে না।

নিষ্পাপ কে?

নিষ্পাপ আসলে কেউ নেই। ভুলমুক্ত কোন মানুষ নেই। কবির ভাষায়–

করেনি তো ভুল, কভু এক চুল, কে আছে এমন বলো?

কোথা সেই জন, ভালোই ভূষণ; কোথা পাবে তুমি বলো?

রাসূল ﷺ বলেন–

> কসম সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি কোনই গোনাহ না কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের নিঃশেষ করে আরেকটি জাতি স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারা গোনাহ করবে আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। [মুসলিম : ২৭৪৯]
>
> প্রত্যেক বনী আদমই পাপী। যে তাওবা করে, সে সর্বোত্তম পাপী। [তিরমিযি : ২৪৯৯]

মানুষ মাত্রই পাপ করে। ভুল করে। কেউ যদি বলে, সে কখনও কোন ভুল করেনি, তাহলে সে আল্লাহ ﷻ-র উপর মিথ্যারোপ করেছে।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, গোনাহ মানুষের জন্য একটি সিলমোহরের মতো। গোনাহ মানুষের জন্য অবধারিত। মানুষ গোনাহ করবে, সাথে সাথে আল্লাহ ﷻ-র কাছে ক্ষমা চাইবে। আল্লাহ ﷻ-র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ জানালেন– মানুষ অবশ্যই গোনাহ করবে। রাসূল এ কথা জেনে মানুষদের নির্দেশনা দিলেন– "গোনাহ তো করবেই, 'গোনাহের

পরই একটি পুণ্য কর।" কোন মন্দ কাজ হয়ে গেলে সাথে সাথে একটি ভালো কাজ কর। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> পুণ্যকাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়। যারা স্মরণ রাখে ,তাদের জন্য এটি এক মহাস্মারক। [সূরা হূদ : ১১৪]

অভূতপূর্ব একটি ঘটনাপটে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। রাসূলের যুগে কেউ কোন গোনাহ করে ফেললে সাথে সাথে রাসূলের কাছে তার অবস্থা বর্ণনা দিতেন। এই গোনাহের কারণে যে কোন ব্যবস্থাপত্র গ্রহণে প্রস্তুত থাকতেন। তবু যেন ঈমানের রৌশনি উজ্জ্বল থাকে, ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্যের নতুন তারা দেদীপ্য হয়।

বর্ণিত হয়েছে, এক উলঙ্গা মহিলার উপর দৃষ্টি পড়েছিল জনৈক আনসারি সাহাবির। অপর এক বর্ণনা মতে আনসার সাহাবি এক মহিলাকে চুম্বন করেছিলেন। মুহূর্তেই বুঝতে পারলেন, তিনি যে কত বড় ভুল করেছেন। তৎক্ষণাত রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে অনুতপ্ত হলেন। ক্রন্দন শুরু করলেন। ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন, 'আমি এক মহিলাকে চুম্বন করেছি। আমার শাস্তি কী হবে?'

রাসূল ﷺ বললেন, 'এর কাফফারা কী হবে, আমি জানি না।'

রাসূলের একথার পরই আল্লাহ সাহাবির গোনাহের কাফফারা জনিয়ে আয়াত নাযিল করলেন–

> আর দিনের দুই প্রান্তেই সালাত ঠিক রাখবে এবং রাতেরও প্রান্তভাগে। পুণ্যকাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়। যারা স্মরণ রাখে, তাদের জন্য এটি এক মহাস্মারক। [সূরা হূদ : ১১৪]

ফরয সালাতসমূহ ঠিক মত আদায় কর। অথবা রাতের শুরুতে এবং শেষে নফল আদায় কর। অথবা দিনের শুরুতে ও শেষে সালাত পড়। তোমার মন্দ কাজের কাফফারা হয়ে যাবে। আমলনামা থেকে মন্দ কাজ দূর হয়ে যাবে।

রাসূল আনসারি সাহাবিকে আয়াতটি শুনিয়ে দোয়া করে দিলেন। সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি কি আমার জন্যই বিশেষ হুকুম?'

রাসূল ﷺ বললেন–

এই বিধান তোমার জন্য। তোমার মত যে ব্যক্তিই কোন মন্দ কাজ করবে, তার জন্য। এই বিধান আজ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত। [বুখারি : ৫৬২]

কবির ভাষায়–

মুসলিম ওহে! তোমাদের লাগি শোন এ খোশখবর–

তোমাদেরই লাগি অপার দয়া রয়েছে যে আল্লাহর।

পৃথিবীর মোরা সবচেয়ে সেরা রাসূলের অবদান, ডেকেছেন প্রভু মেনে চলি যেন তাহার সব বিধান।

আমরা সর্বশেষ উম্মত। কিন্তু সবার আগে বেহেসতে প্রবেশ করবো আমরা। আমাদের তাওবা খুব সহজে কবুল হবে। আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। মুসা (আঃ) আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব শুনে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে উম্মতে মোহাম্মদির অন্তর্ভুক্ত করুন।'

রাসূল ﷺ একবার ওমর (রাঃ) এর হাতে তাওরাত কিতাব দেখে রাগ হলেন। বললেন–

হে ওমর ইবনে খাত্তাব! তোমরা কি দ্বিধাগ্রস্ত? কসম সেই সত্ত্বার, যার হাতে আমার প্রাণ! মুসা যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তারও কোন গত্যন্তর থাকত না। আমাকে কি স্বচ্ছ উজ্জ্বল দীন দেয়া হয়নি? [আহমাদ : ১৪৭৩৬]

আমাদের ভিন্ন কোন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সংবিধানের প্রয়োজন নেই। আমরা কোরআন-সুন্নাহ ব্যতীত আর কোন কিছুর জ্ঞানের মুখাপেক্ষী নই। কোরআন-সুন্নাহই সকল বড়-ছোট সকল জ্ঞানের আধার ও উৎপত্তিস্থল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ থেকে রাস্তার কষ্টদায়ক বস্তু সড়ানোর দীক্ষা, মলমূত্র ত্যাগের পর পানি ও পাথরদ্বারা পবিত্রতা অর্জন, নাক ও মুখগহ্বর পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদির শিক্ষাও আমরা কোরআন-সুন্নাহ থেকে পেয়ে থাকি।

মানুষ মাত্রই গোনাহ করবে। গোনাহের পর তাওবা করবে। পুণ্য করবে।

পুণ্যকাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়। যারা স্মরণ রাখে ,তাদের জন্য এটি এক মহাস্মারক। [সূরা হূদ : ১১৪]

রাসূল ﷺ মুয়ায (রাঃ)-কে উপদেশ দিয়েছিলেন–

'মানুষের সাথে আদর্শ আচরণ কর।'

ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন, মানুষের সাথে আদর্শ ও উত্তম আচরণের অর্থ কারো সাথে রাগ না হওয়া।

বাস্তবতা হল, রাগ হওয়া মানুষের অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট। রাগ ছাড়া মানুষ হয় না। শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'যার রাগ আসে, তথাপি সে রাগ করে না, সে আস্ত একটা গাধা!'

উদাহরণত, কোন ব্যক্তি কাউকে গোনাহ করতে দেখে, আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হতে দেখে চুপি চুপি হাসল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, 'আপনি হাসছেন কেন?'

লোকটি বলল, 'আল্লাহ আমাকে সহিষ্নুতা ও শিষ্টতা দিয়েছেন! বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন। এজন্য আমি হাসছি!'

এই লোকটি কি আসলেই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ! বরং লোকটি অজ্ঞ ও বুদ্ধিহীন।

হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, সহাস্যবদন ও বিনম্র কথাবার্তার নাম হল আদর্শ ও উত্তম আচরণ।

অনেকে বলেন, আদর্শ ও উত্তম আচরণ হল বদান্যতা এবং মানুষের দুঃখ-কষ্ট ঘোচানোর নাম। যে আমাকে বঞ্চিত করবে, আমি তাকে দান করবো। যে অনাচার করবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো। সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে আমি সম্পর্ক অটুট রাখবো। –এরই নাম হল আদর্শ ও উত্তম আচরণ।

রাসূল ﷺ বলেন–

> আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন– যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমি তার সাথে সম্পর্ক গড়বো। যে আমাকে যুলুম করবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো। যে আমাকে বঞ্চিত করবে, আমি তাকে দান করবো। [মিশকাত : ৫৩৫৮]

রাসূলের জীবনটা এমনই ছিল। রাসূলের সাথে কেউ সম্পর্ক ভেঙ্গেছে, রাসূল তার সাথে বন্ধন জুড়েছেন। অনাচার করেছে, রাসূল তাকে ক্ষমা করেছেন। বঞ্চিত করেছে, রাসূল তাকে আঁজল ভরে দিয়েছেন।

রাসূল ﷺ বলেন–

> প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়। বরং আত্মীয়তার হক আদায়কারী সে ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরও তা বজায় রাখে। [বুখারি : ৫৯৯১]

এই হল উত্তম ও আদর্শ আচরণের সারসংক্ষেপ। আল্লাহ সুবহান রাসূলের উদ্দেশে বলেন–

> আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। [সূরা কালাম : ০৪]

মুজাহিদ রহ. বলেন, মহান চরিত্রের অর্থ মহান দীন। আপনি মহান দীনের অধিকারী। দীনদারী ও ধার্মিকতা, আচার-আচরণ, আদর্শ ও বিশ্বাস, হালত ও পরিস্থিতি, বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ, সর্বক্ষেত্রেই রাসূল ﷺ ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী।

ইবনে তাইমিয়া লিখেন–

মন্দ কাজের পর যে ভালো কাজটি করবে, সেটি যেন মন্দ কাজ জাতীয় হয়। এতে মন্দ কাজের ক্ষতিপূরণ পূর্ণাঙ্গভাবে হয়।

উদাহরণত, কেউ একজন গান শুনল। সে তাওবা করে এই পাপের ক্ষতিপূরণস্বরূপ কোরআন তিলাওয়াত শুনুক। ইসলামি সঙ্গীত ও আলোচনা শুনুক।

কেউ অকর্মণ্য কোন পাপাচারীর সাথে আড্ডায় মাস্তি করল। সে তাওবার সাথে সাথে কাফফারাস্বরূপ নেককার সৎব্যক্তিদের সঙ্গ ও সাহচর্য গ্রহণ করুক।

ইবনে তাইমিয়া লিখেন–

কয়েকটি অবলম্বনে মানুষের গোনাহ ও মন্দ কাজ বিদূরিত হয়। প্রথম অবলম্বন তাওবা।

মুসলিম গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে, তাওবা পূর্ববর্তী সকল গোনাহ দূর করে দেয়। এমন বড় কোন গোনাহ নেই, যা আল্লাহ ﷻ কখনও ক্ষমা করবেন না।

[মুসলিম : ১২১]

বান্দা যখনই আল্লাহ ﷻ-র কাছে তাওবার বিনীত অন্তরে সত্যিকারার্থে বিগলিত হয়, যমিন ও আসমানপূর্ণ গোনাহ হলেও আল্লাহ ﷻ তা মাফ করেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না। [আলে ইমরান: ১৩৫]
>
> তাদেরই জন্য প্রতিদান হল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ। যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান। [সূরা যুমার : ১৫৩]
>
> বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা যুমার : ৫৩]

উল্লেখ্য, কোন সগীরা গোনাহ অনবরত করতে থাকলে তা কবীরা গোনাহে পরিগণিত হয়। তার ব্যাপারে ভয় হয়। সে নিন্দিত। লায়লার প্রেমে ডুবে গিয়ে মজনু বলেছিল–

তাওবা করি সকল গোনাহর, গোনাহ আমার বড্ড বেশি।

লায়লা প্রেমের সাকী আমি, দর্শনে তার গোনাহ জানি, এই গোনাহটি করতে থাকি, তাওবা আজি নাইবা করি!

মজনু সকল গোনাহ ছাড়তে প্রস্তুত হলেও লায়লার প্রেম ছাড়তে পারেনি। সকল গোনাহ থেকে তাওবা করলেও লায়লার প্রেমের গোনাহ থেকে তাওবা করতে পারেনি। কোন ব্যক্তি মজনুর মত কোন সগীরা গোনাহও যদি পরিত্যাগ করতে না পারে, তাহলে সেটি তার কবীরা গোনাহে পরিগণিত হবে। তার ব্যাপারে ভয় হয়। সে নিন্দিত।

ইবনে তাইমিয়া লিখেন–

দ্বিতীয় অবলম্বন ইসতিগফার। কেউ যদি তাওবা না করে শুধু ইসতিগফার পাঠ করে, আল্লাহ ﷻ তার দোয়ায় সাড়া দিয়ে তাকেও ক্ষমা করবেন। কেউ যদি তাওবাও করে, সাথে ইসতিগফারও পাঠ করে, তাহলে তা কতই না উত্তম!

সুতরাং তাওবা না করে শুধু 'আসতাগফিরুল্লাহ' 'আসতাগফিরুল্লাহ' 'আসতাগফিরুল্লাহ' পাঠ করার দ্বারাও আল্লাহ ﷻ গোনাহ মাফ করবেন।

ইসতিগফারের তিনটি উপকারিতা

এক.

ইসতিগফার পাঠকারীকে আল্লাহ ﷻ দুনিয়াতে আযাবে নিপতীত করেন না।

জাফর সাদিক رحمه الله বলেন, আকাশ থেকে যদি একটি মেঘখণ্ড ভেঙ্গে পড়ে, দুনিয়ার সকল মানুষকে তা আক্রান্ত করবে। কিন্তু উসতিগফার পাঠকারীকে আক্রান্ত করবে না। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> অথচ আল্লাহ কখনই তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না, যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। তাছাড়া তারা যতক্ষণ ইসতিগফার করতে থাকবে আল্লাহ কখনও তাদের উপর আযাব দেবেন না। [সূরা আনফাল : ৩৩]

দুই.

ইসতিগফার মানুষের আত্মিক, দৈহিক, সন্তান-সন্ততি, রিযিক ইত্যাদির উত্তম উপকরণ। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ইসতিগফার কর। অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি তোমাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন। [সূরা হূদ : ০৩]

তিন.

ইসতিগফার মানুষের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি প্রবৃদ্ধির নিয়ামক। নূহ عليه السلام বলেছিলেন–

> অতঃপর বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ইসতিগফার কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন। তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন। [সূরা নূহ : ১০-১২]

খালেদ ইবনে মি'দান ﷺ। অত্যন্ত এবাদতকারী এবং দুনিয়াবিমুখ বুযুর্গ ছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'দৈনিক কতবার ইসতিগফার পাঠ করেন?'

তিনি বললেন, 'আঙ্গুলের গণনা যদি ভুল না হয়, তাহলে এক লক্ষ বার!'

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

> লোক সকল! আল্লাহর কাছে ইসতিগফার কর। তাওবা কর। আমি আল্লাহর কাছে প্রতিদিন সত্তরবারের অধিক ইসতিগফার পড়ি এবং তাওবা করি। [বুখারি : ৬৩০৭]

অপর এক বর্ণনায় একশ বারের কথা উল্লেখ হয়েছে। [মুসলিম : ২৭০২]

ইবনে তাইমিয়া লিখেন–

তৃতীয় অবলম্বন নেক আমল।

ওযু, সালাত, আল্লাহ ﷻ-র যিকির, ইসতিগফার, দোয়া, দীনি ইলমের মজলিসে উপস্থিতি, আলেমদের সাহচর্য, আলেমদের প্রতি ভালোবাসা, শেষ রাতের দোয়া, রাত জেগে এবাদত, সদকা প্রভৃতি নেক আমল গোনাহ ও মন্দ কাজের কাফফারা। গোনাহ করে কেউ আল্লাহ ﷻ-র ক্ষতি করতে পারে না। গোনাহকারী নিজেই ধ্বংস হয়। প্রতিটি শ্বাসে-প্রশ্বাসে নেক আমল করার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু সে সুযোগ ক'জন আর গ্রহণ করে!

ইবনে তাইমিয়া লিখেন–

আপনি জানতে চেয়েছেন, ফরয আমলের পর সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ আমল কোনটি। এটি মূলত মানুষের ভিন্নতার সাথে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। মানুষের পুরো ব্যস্ত সময়ের জন্য আল্লাহর যিকিরই হল সবচে ফযীলতপূর্ণ এবং সর্বাধিক উপযোগী।

কারো জন্য যিকির সর্বাধিক উত্তম আমল। কারো জন্য সওম, কারো জন্য জিহাদ, কারো জন্য আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় খরচ করা, কারো জন্য ইলম শেখানো, কারো জন্য মানুষের সেবা করা সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ আমল। এজন্য প্রত্যেক মানুষের অবস্থা বুঝতে হয়। বুঝতে হয়, কোন ব্যক্তির জন্য কোন আমলটি অধিক ফযীলতপূর্ণ। রাসূল ﷺ মানুষের অবস্থা বুঝে আমল দিতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে বিসর থেকে বর্ণিত, জনৈক সত্তরোর্ধ্ব বয়স্ক লোক রাসূলের কাছে আবেদন করল, ‘ইসলামের বিধানগুলো আমার পক্ষে সাধ্যাতীত হয়ে পড়ছে। আমাকে এমন কোন আমল বলুন, যা আমি নিয়মিত পালন করতে পারবো।’

রাসূল তাকে কী বলবেন! তার শরীর তো সত্তরোর্ধ্ব! তার জন্য কী আমল বলবেন! কিয়ামুল্লাইল করতে বলবেন! নাকি জিহাদে যেতে বলবেন! রাসূল তাকে বললেন–

আল্লাহর যিকির দিয়ে জিহ্বা সজীব রাখ। [আহমাদ : ১৭২২৭]

আবু সাঈদ খুদরি ﵁। শরীর কাঠামোয় তিনি ছিলেন পুরুষ্ট। রাসূলের কাছে এসে উপদেশ চাইলেন। রাসূল তাকে জিহাদে যাওয়ার উপদেশ দিলেন। [আহমাদ : ১১৩৬৫]

আবু উমামা ﵁-কে উপদেশ দিলেন রোযা রাখার জন্য। [আহমাদ : ২১৬৩৬]

আবু দারদা ﵁-কে উপদেশ দিলেন– ‘কারো সাথে রাগ করো না।’ [বুখারি : ৬১১২]

ইয়ামান থেকে এক লোক এসে জিহাদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করল। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার বাবা-মা আছেন!’

লোকটি বলল, ‘হ্যাঁ, আমার বাবা-মা আছেন।’

রাসূল ﷺ বললেন, ‘তাদের খেদমত কর, এটাই তোমার জিহাদ।’ [বুখারি : ৩০০৪]

প্রশ্নকারীর অবস্থা বুঝে উত্তর দিতে হয়। যিনি প্রশ্ন করেছেন, তার অবস্থা জিজ্ঞেস করে উত্তর দিলে তা প্রশ্নকারীর জন্য বেশি উপযোগী হয়।

ইবনে তাইমিয়া লিখেন–

মানুষের পুরো ব্যস্ত সময়ের জন্য আল্লাহ ﷻ-র যিকিরই হল সবচে ফযীলতপূর্ন এবং সর্বাধিক উপযোগী।

সব মানুষই আল্লাহ ﷻ যিকিরে মগ্ন থাকতে পারে। ব্যবসায়ী, আমির, চাকুরিজীবী, কৃষক, ছাত্র, উসতায, পুরুষ, মহিলা সকলেই আল্লাহ ﷻ-র যিকিরে মগ্ন থাকতে পারে। এটি অত্যন্ত সহজ আমল।

আবু দারদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–

রাসূল ﷺ তাদের বললেন, আমি তোমাদের এমন একটি আমলের কথা বলব, যা সবচে ফযীলতপূর্ণ! তোমাদের প্রভুর কাছে সবচে পবিত্র! আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের স্বর্ণ-রূপা ব্যয় করার চেয়ে উত্তম! শত্রুর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের চেয়ে উত্তম!

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'সেই আমলটি হল আল্লাহর যিকির।' [আহমাদ : ২১১৯৫]

আবু হোরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–

রাসূল ﷺ একবার মক্কার রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করছিলেন। তখন জুমদান নামক একটা পাহাড়ে উপনীত হয়ে তিনি বললেন, 'তোমরা ভ্রমণ করো, এটি জুমদান পাহাড়। (মনে রেখ) নির্জনবাসীরা আগে বেড়ে গেছে।'

সাথীরা জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! নির্জনবাসী কারা?'

রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, 'বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরে রত পুরুষ ও নারী।' [মুসলিম : ৬২৭৬]

আবু মুসা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–

'রাসূল ﷺ বলেন, যে আল্লাহর যিকির করে এবং যে আল্লাহর যিকির করে না, তাদের তুলনা জীবিত এবং মৃতের মত।' [বুখারি : ৬৪০৭]

আবু হোরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–

রাসূল ﷺ বলেছেন– "আমার নিকট 'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' পাঠ করা পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু থেকে অধিক প্রিয়, যেসব বস্তুর উপর সূর্য উদিত হয়।" অপর এক বর্ণনায় যেসব

বস্তুর উপর সূর্য উদিত হয় এর স্থলে যেসব বস্তুর উপর সূর্য অস্ত যায় বর্ণিত হয়েছে। [মুসলিম : ২৬৯৫]

বর্ণিত হয়েছে—

> যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়াবিহামদিহী পাঠ করল, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপিত হল। [তিরমিযি : ৩৪৬৪]

অফিসে-আদালতে, সফরে-বৈঠকে সবখানে আল্লাহ ﷻ-র যিকির করা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ ﷻ জান্নাতে অনবরত যিকিরকারীর সম্মান বৃদ্ধি করবেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ-র সাথে মেরাজে ইবরাহিম عليه السلام-র সাথে দেখা হলে ইবরাহিম عليه السلام বলেছিলেন, 'হে মোহাম্মদ! আপনার উম্মতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন। তাদের বলবেন, জান্নাত একটি ভূমি। এর চাষাবাদ হল সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।' [তিরমিযি : ৩৪৬২]

সকল মুসলমানের করণীয়— সবসময় আল্লাহ ﷻ-র যিকিরে মগ্ন থাকা। আল্লাহ ﷻ-র যিকির দিয়ে বসত-ঘর প্রাণবন্ত রাখা। ঘরে কোরআনের চর্চা রাখা। দীনী দাওয়াতের পরিবেশ রাখা। ঈমানের নূরে ঘর আলোকময় রাখা। আল্লাহর অসন্তুষ্টি বৃদ্ধিকারক এবং রাগ গোস্বার উদ্রেককারী সকল উপাদান ঘর থেকে দূর করা। তখনই তার ঘর হবে প্রকৃত মুমিনের ঘর! শান্তি ও সমৃদ্ধির ঘর!

চিঠির শেষে ইবনে তাইমিয়া رحمه الله সর্বোত্তম রিযিক অন্বেষের কথা উল্লেখ করেন।

রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'সর্বোত্তম উপার্জন কোনটি?'

রাসূল ﷺ বললেন, 'সর্বোত্তম উপার্জন মানুষের নিজ হাতের উপার্জন এবং পবিত্র ব্যবসা।' [আহমাদ : ১৬৮১৪]

সবচে উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবসা আসলে কোনটি? কেউ বলেছেন কৃষিকর্মের কথা। কেউ আবার বলেছেন ব্যবসার কথা। অনেকে বলেছেন, মানুষের হাতের উপার্জনই হল সবচে মর্যাদাপূর্ণ উত্তম উপার্জন।

রাসূল ﷺ বলেছেন–

> নিজ হাতে উপার্জিত জীবিকার চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনও কেউ খায় না। আল্লাহর নবি দাউদ ﷺ নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন। [বুখারি : ২০৭২]

দাউদ ﷺ লৌহকর্ম করতেন। আল্লাহ বলেন–

> আর আমি তার জন্য লোহাকে নরম করেছি। [সূরা সাবা : ১০]

দাউদ ﷺ-র হাতে লোহা আঠার মত নরম হয়ে যেত। তিনি যুদ্ধের বর্ম তৈরি করতেন। দাউদ ﷺ-র পরিবারে ছত্রিশ হাজার সদস্য ছিল। সকলেই নিজে উপার্জন করে খেতেন।

যাকারিয়া ﷺ কাঠমিস্ত্রি ছিলেন।

ইদরিস ﷺ সেলাই কাজ করতেন। প্রতিবার কাপড়ে সুই গেঁথে বের করার সময় যিকির করতেন– 'সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।'

তার এই আমলে আল্লাহ খুশি হয়ে তাকে বলেছিলেন, 'ইদরিস! তুমি কী চাও? তোমার মর্যাদা এত বৃদ্ধি করছ কেন?' আল্লাহ ﷻ বলেন– এই কিতাবে ইদরিসের কথা আলোচনা করুন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবি। আমি তাকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম। [সূরা মারয়াম : ৫৭]

ইদরিস ﷺ উত্তর দিলেন, 'জানি না, হে আল্লাহ!'

আল্লাহ ﷻ বললেন, 'যিকিরের আধিক্যে তোমার মর্যাদা প্রতিদিন অর্ধেক দুনিয়াবাসীর আমল পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে!'

আল্লাহ ﷻ বলেন, 'তারই দিকে আরোহণ করে সৎবাক্য এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়।' [সূরা ফাতির : ১০]

ইবনে হাজর ﷺ বলেন, সর্বোত্তম রিযিক হল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং লব্ধ গনীমত। রাসূল ﷺ-র বেশির ভাগ উপার্জন গনীমত থেকেই ছিল। মুসনাদে আহমদে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, কেয়ামতের পূর্বে আমি তরবারিসহ প্রেরিত হয়েছি, যতক্ষণ না অংশিদারমুক্ত এক আল্লাহ ﷻ-র

এবাদত করা হয়। আমার রিযিক রাখা হয়েছে আমার বর্শায় (জিহাদে)। আর অপদস্থতা এবং লাঞ্চনা রাখা হয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমার বিরোধিতা করে। যে কোন জাতির সাদৃশ্যতা অবলম্বন করল, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হল।' [আহমাদ : ৫০৯৩]

হাদিসোক্ত 'আমার রিযিক রাখা হয়েছে আমার বর্শায়' থেকে একথা সুস্পষ্ট– জিহাদ হল জীবিকা নির্বাহের সর্বোত্তম অবলম্বন।

ইবনে তাইমিয়া বলেন, জীবিকা নির্বাহের সর্বোত্তম অবলম্বন আল্লাহর তাওয়াক্কুল। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আল্লাহর কাছে রিযিকের তালাশ কর। তার এবাদত কর। তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। [সূরা আনকাবূত : ১৭]

ইবনুল জাওযি ﷺ লিখেন, এক আবেদ একটি চড়ুই দেখল। চড়ুইটি প্রতিদিন একখণ্ড গোশত নিয়ে একটি খেজুর গাছে শাখে গিয়ে বসে। আবেদ অবাক হলেন। কারণ, চড়ুই পাখি সাধারণত খেজুর গাছে বাসা করে না।

আবেদ খেজুর গাছে দেখল একটি অন্ধ সাপ। চড়ুই সাপটির কাছে গিয়ে একটি আওয়ায করল। অমনি সাপটি মুখ খুলল। চড়ুই সাপের মুখে গোশতের টুকরাটি রেখে উড়ে গেল।

এই সাপের রিযিকের ব্যবস্থা আল্লাহ ﷻ-ই করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাধিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে। [সূরা হূদ : ০৬]

হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ বলেন– 'আমি যাকে আহার দেই, সে ব্যতীত তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত। সুতরাং আমার কাছে আহার চাও, আমি তোমাদের আহার দিবো। আমি যাকে আচ্ছাদন দেই, সে ব্যতীত তোমরা সবাই অনাচ্ছাদিত। সুতরাং আমার কাছেই আচ্ছাদন চাও, আমি তোমাদের আচ্ছাদন দিবো।' [মুসলিম : ২৫৭৭]

শোকর আদায় করো আল্লাহ বাড়িয়ে দিবেন

বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। সর্বসম্মানী রাসূল, রাসূলের পরিবার-সহচর সকলের জন্য অগুণতি দুরূদ ও সালাম। মোহাম্মদ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্লাহ বলেন–

> তুমি কি তাদের দেখনি, যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে এবং স্বজাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের আলয়ে– দোযখের? তারা তাতে প্রবেশ করবে, সেটা কতই না মন্দ আবাস!
>
> [সূরা ইবরাহীম: ২৮, ২৯]

আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে কারা?

ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, এরা হল কোরাইশ। কোরাইশের লোকেরা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে। অস্বীকার করেছে। রাসূল ﷺ কোরাইশের কাছে দীনের দাওয়াত রাখলেন, কোরাইশ রাসূলকে মিথ্যারোপ করল। রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। এটাই ছিল তাদের নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করার স্বরূপ।

অনেক মুফাসসিরের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তিই আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নত থেকে বিমুখ থাকবে, সে ব্যক্তিই আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরে পরিণতকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। যে ব্যক্তি একটি নেয়ামতে এ ধরণের উন্মাসিকতা দেখাবে, সে মন্দ নিবাস জাহান্নামকে আপন আলয়ে গ্রহণ করেছে।

আল্লাহর নেয়ামত অসংখ্য। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আর আল্লাহর নেয়ামত পৌঁছে যাওয়ার পর যদি কেউ সে নেয়ামতকে পরিবর্তিত করে দেয়, তবে আল্লাহর আযাব অতি কঠিন। [বাকারা: ২১১]

যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। [সূরা ইবরাহীম : ৩৪]

আয়াতদু'টিতে আল্লাহ ﷻ একক নেয়ামতের (আর আল্লাহর নেয়ামত পৌঁছে যাওয়ার পর...) উল্লেখ করেছেন। কারণ, একটি নেয়ামতেরই শোকর আদায় না হলে অন্যান্য নেয়ামতের শোকর আদায়ের সম্ভাবনা কোথায়?

আহমাদ ﷺ কিতাবুয যুহদ-এ উল্লেখ করেন, হাদিসে বর্ণিত হয়েছে– 'আল্লাহ বলেন, আশ্চর্য! বনী আদম! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তোমরা অন্যের উপাসনা করছ! আমি তোমাদের রিযিক দিচ্ছি, তোমরা অন্যের কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ছ! আমার নেয়ামত গ্রহণ করে আমারই থেকে বিমুখ থাকতে পছন্দ কর! আমার কাছে অভাবী হয়ে পাপাচার করে আমাকেই রাগত করছ! আমার মঙ্গল তোমার কাছে অবতরণকারী। তোমার অমঙ্গাল আমার কাছে আরোহণকারী।' [কানযুল উম্মাল : ৪৩১৭৪]

হাদিসোক্ত অবস্থা সেসব লোকের হয়ে থাকে, যারা আল্লাহর পথ ভুলে যায়। রাসূলের পথ ছেড়ে যায়। যারা সরল-সঠিক প্রগতির পথ ছেড়ে পশ্চাদশীল পতনের পথ গ্রহণ করে।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে মুসা ইবনে ইমরান ﷺ দুঃসাহসী পদক্ষেপে অকপটে যে কোন প্রশ্ন করতেন। তিনি আল্লাহকে বলে বসলেন–

হে আমার প্রভু! তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন তোমাকে দেখতে পাই। [সূরা আরাফ : ১৪৩]

এই কথা আল্লাহর সামনে আর কেউ বলেননি। মুসা ﷺ বলেছিলেন। তিনি এমনই সাহসী প্রশ্ন করতেন। একবার তিনি আল্লাহকে ﷻ বললেন, 'আল্লাহ! তোমার কাছে আমি একটি জিনিস চাইবো।'

আল্লাহ ﷻ বললেন, 'কী সেই জিনিস?'

মুসা ﷺ বললেন, 'আমার অজ্ঞাতে আমার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা থেকে মানুষের মুখকে তুমি বিরত রাখ।'

আল্লাহ ﷻ বললেন, 'তুমি কেন এটি চেয়েছ! আমি তাদের সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের রিযিক দেই। আমিই তাদের ক্ষমা করি। তারা বলে, আমি নাকি

স্ত্রী-সন্তান গ্রহণ করেছি! অথচ আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমি স্ত্রী-সন্তান গ্রহণ করিনি।'

আবু হোরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

> আল্লাহ বলেন, 'আদম সন্তান আমাকে গালমন্দ করে, অথচ আমাকে গালমন্দ করা তার উচিত নয়। আর সে আমাকে অস্বীকার করে, অথচ তার তা উচিত নয়। আমাকে গালমন্দ হচ্ছে তার এ উক্তি– আমার সন্তান আছে। আর তার অস্বীকার করা হচ্ছে এ উক্তি– যেভাবে আল্লাহ আমাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে কখনও তিনি আমাকে পুনঃসৃষ্টি করবেন না। [বুখারি : ৩১৯৩]

আবু হোরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন–

> মহান আল্লাহ বলেন, 'আদম সন্তান যুগ এবং সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। সময় তো আমারই নিয়ন্ত্রণে। রাতদিনের পরিবর্তন আমিই করে থাকি। [বুখারি : ৪৮৬২]

ওমর ﵁ এর ঘটনা। একবার তিনি সদকার উট দেখতে বেরুলেন। সদকার উটের মধ্যে লাল উটও ছিল। পাশ থেকে একজন বলল, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ সত্যই বলেছেন–

> বল, আল্লাহর দয়া ও মেরবাণীতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করেছ। [সূরা ইউনুস: ৫৮]

ওমর বললেন, 'তুমি কি মনে কর, রহমত মানে এই উট! আল্লাহর কসম, এমনটি নয়। তুমি জান, রহমত কী?'

লোকটি বললেন, 'না।'

ওমর ﵁ বললেন, 'রহমত হল– আল্লাহর নূর প্রাপ্ত হয়ে তার আনুগত্যের সাথে আমল করা। তোমরা আল্লাহর রহমতের আশা রাখ। আল্লাহর নূর প্রাপ্ত হয়ে তার অবাধ্যতা ছেড়ে দাও। আল্লাহর আযাব ভয় কর।'

প্রকৃত নেয়ামত কী?

প্রকৃত নেয়ামত কী? রং-বেরংয়ের বাহারী পোষাক? দামি দামি গাড়ি-ঘোড়া? সুরম্য দালান-ভবন?

না। এসব প্রকৃত নেয়ামত নয়। প্রকৃষ্ট সুখ-সমৃদ্ধি এসব নয়। মানুষের আজ পার্থিব উপায়-উপকরণের অভাব নেই। অথচ তারা আল্লাহবিমুখ। মসজিদবিমুখ। কোরআন থেকে উদাসীন। রাসূলের রেসালাত সম্পর্কে উদাসীন। মানুষ আজ পাপাচারে লিপ্ত। ধর্ম ছেড়ে অধর্মে বিবর্তিত হচ্ছে মানুষ ও মানবসভ্যতা। পর্যটন কেন্দ্রে মহিলাদের বেহায়াপনা। সমুদ্রসৈকতে মহিলাদের উলঙ্গ মেলামেশা। উদ্বাহু উশৃঙ্খলা।

মানুষের প্রকৃত নেয়ামত– ঈমান। প্রকৃষ্ট নেয়ামত– ইসলাম। শ্রেষ্ঠ নেয়ামত– কোরআন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আস্বাদন করালেন; ক্ষুধা ও ভীতির। [সূরা নাহল : ১১২]

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, উক্ত নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জনপদ হল মক্কাবাসী। আল্লাহ ﷻ তাদের জন্য পৃথিবীর প্রান্তসমূহ থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু তারা রাসূলের রিসালাত অস্বীকার করেছে। ফলে আল্লাহ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস সঠিক বলেছেন। আয়াতে উল্লিখিত জনপদ মক্কাবাসী। তদ্রূপ প্রত্যেক এমন জাতি, যারা আল্লাহর পথ ভুলে যায়। সে জাতি আমাদের যতই প্রিয় হোক, যতই অন্তরঙ্গ হোক, তারা অভিশপ্ত। যে জাতি আল্লাহর নেয়ামত ভুলে থাকে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অমান্য করে, আল্লাহু আকবার তাকবীরের ছায়া থেকে সড়ে থাকে, তারা অভিশপ্ত। তাদের পাপাচার ও অবাধ্যতা প্রকাশ্য।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদের উদ্বুদ্ধ করি। অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে উঠে।

তখন সে জনগোষ্ঠীর উপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাকে উঠিয়ে আছাড় দেই। [সূরা ইসরা : ১৬]

ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, আল্লাহ ﷻ তখন পুরুষ-মহিলাদের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোক বাড়িয়ে দেন। তারা পাপাচারে মেতে উঠে। অধিকহারে অবধ্যতা করে।

মহিলারা পর্দা ছাড়া ঘর থেকে বের হয়। চেহারার কমনীয়তা ছড়িয়ে ঘুরে ফেরে। কোরআন ছেড়ে দেয়। ধর্ম ভুলে যায়। লজ্জা ও শ্লীলতা থেকে বিস্মৃত থাকে। স্বামী অমান্য করে। ঘরের চিন্তা মাথা থেকে উড়ে যায়। বাহু দেখিয়ে, উরু দেখিয়ে সমুদ্র পাড়ে প্রমোদ করে।

প্রাচীন এক আরব ব্যক্তির ঘটনা। লোকটি ছিলেন অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন। তিনি দেখলেন, এক মহিলা পুরুষের দিকে তাকিয়ে আছে। আরব আশ্চর্য হয়ে বললেন, লাজুক মহিলারাও পুরুষের দিকে তাকায়! আল্লাহর কসম! তুমি আমার জন্য নও। তার একটি কবিতার অর্থ এমন–

পছন্দের খাবারেও যদি মাছি ওড়ে, আস্বাধের স্বাধ তবু উঠে যায়।

গোলাবজলও যদি কুকুরে শোঁকে, তা থেকে রুচি তবু উঠে যায়।

আশ্চর্য! এই লোক যদি বর্তমানের বাজার-হাট আর সমুদ্র সৈকত দেখতেন, তাহলে কী বলতেন!

পুরুষের পরিধানেও লজ্জাজনক, এ রকম শর্ট পোষাকের যুবতীদের দেখলে তিনি কী মন্তব্য করতেন!

আল্লাহ ﷻ বলেন–

অনেক জনপদ তাদের পালনকর্তা ও তার রাসূলগণের আদেশ অমান্য করেছিল। অতঃপর আমি তাদেরকে কঠোর হিসাবে ধৃত করেছিলাম এবং তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দিয়েছিলাম। [সূরা তালাক : ০৮]

উদাহরণত লেবাননের কথা বলা যায়। তাদের অনেক সুখ-শান্তি ছিল। ঘনপল্লবের ছায়াঘেরা বাগান, আর্দ্র আবহাওয়া, ফুল-ফলের সমারোহ, মৃদুমন্দ বাতাস, স্নিগ্ধ সকাল, সবই ছিল।

কিন্তু তারা আল্লাহ ﷻ-র পথ থেকে বিচ্যুত হল। তাদের মসজিদে আযান কম হত। সৎ কাজে আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ করার মত লোক ছিল না। অতঃপর তাদের অবস্থা এমন হয়েছিল–

> বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল। [সূরা মায়েদা: ৭৮, ৭৯]

আল্লাহ ﷻ তাদের উপর রাগ হয়েছেন। আল্লাহ ﷻ যার উপর রাগ হন, তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি অবধারিত–

> আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয় তার পাকড়াও খুবই মারাত্মক। বড়ই কঠোর। [সূরা হূদ : ১০২]

আল্লাহ ﷻ লেবাননীদের উপর চাপিয়ে দিলেন যুদ্ধ। হত্যা, লুণ্ঠন, অপহরণ, ভয়, ক্ষুধায় তারা আক্রান্ত হল। পৃথিবীর দিকে দিকে তাদের চিৎকার ধ্বনিত হয়েছিল। ভয়াবহ ক্ষতের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল সবর্ত্র, রক্ত গড়িয়েছিল সব জায়গায়।

আল্লাহ ﷻ ইয়ামানবাসীকেও অফুরান নেয়ামত দিয়েছিলেন। কিন্তু তারাও সেই নেয়ামতকে কুফরিতে পরিণত করেছিল। আল্লাহ ﷻ তাদের জন্য লাঞ্চনা অবধারিত করে দিলেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> সাবা-র অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন– দুটি উদ্যান, একটি ডানদিকে একটি বামদিকে। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিযিক খাও এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। স্বাস্থ্যকর শহর এবং ক্ষমাশীল পালনকর্তা। অতঃপর তারা অবাধ্যতা করল। ফলে আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্রবল বন্যা। আর তাদের উদ্যানদুটি পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমুল, ঝাউ গাছ এবং সামান্য কুলবৃক্ষ। এটা ছিল কুফরের কারণে তাদের প্রতি আমার শাস্তি। আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। [সূরা সাবা: ১৫-১৭]

কবির ভাষায়–

মানুষের পার্থিব উন্নতি মূলত লোকসান।

যে লাভে কোন কল্যাণ নেই, সেই লাভ অনর্থক।

সে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত, যে জাতির অস্তিত্বের নেই কোন স্থায়িত্ব।

ইবনে কাসির رحمه الله বলেন, আল্লাহ ﷻ সাবা জনপদের প্রতিটি লোকের ঘরের পাশে দুটি বাগান দিয়েছিলেন। একটি ডান দিকে, আরেকটি বাম দিকে। প্রতিটি বাগানে গাছে গাছে ঝুলে থাকতো থোকায় থোকায় ফল। ছিল ছায়াময় শ্যামলিমা। সুপেয় কোমল পানি। পাখিদের কিচিরমিচির। সেকি অফুরান নেয়ামত! প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন!

আমাদের অবস্থাও বর্তমানে এমনই। দালান-কোটা, গাড়ি-ঘোড়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, অভিজাত খাবার-পানীয় সবই আছে। কিন্তু লোকজন ফ্যাসাদ করছে। ফ্যাসাদে কেউ বাধা দিলে তা-ও সহ্য করছে না। পাপাচার করছে, তার পাপাচার নিয়ে কেউ মুখ খুললে তা-ও পছন্দ করছে না। অশ্লীলতা করছে। দীনী বিষয়ে ধোঁকাবাজি করছে। অন্যায় প্রতিষ্ঠা করছে। সৎ লোকদের বিরোধিতা করছে। রাসূলের রিসালাত নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে। মসজিদের সাধারণ কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান করছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ এর বন্ধন ছিন্ন করছে।

ইবনে কাসির رحمه الله সাবা জনপদের নেয়ামতের বর্ণনা দিয়ে বলেন, খালি ঝুড়ি মাথায় নিয়ে কেউ সাবা জনপদের বাগান এপাড়-ওপাড় অতিক্রম করলে গাছ থেকে ফল পড়ে তার ঝুড়ি পূর্ণ হয়ে যেত।

কিন্তু তারা এ নেয়ামতের যথামূল্যায়ন করেনি। তারা অকৃতজ্ঞ হয়েছে। কৃতঘ্ন হয়ে প্রকাশ্য গোনাহে লিপ্ত হয়েছে। মসজিদগুলো বিরাণ করে আল্লাহ ﷻ-র সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সালাত ভুলে গিয়েছে। আল্লাহ ﷻ-কে সেজদা করার কথা বেমালুম ভুলে গেছে। দিনরাত আমোদ-প্রমোদ করে কাটিয়েছে।

কবির ভাষায়–

কবে দিবে হেদায়াত তব মন তোমাকে

সৎ কাজ দেখাবে তব মন্দ তোমাকে

এই কৃতঘ্ন অধিবাসীর অনিষ্ট যদি তাদের কাছেই শুধু পৌঁছুত, আমাদের কাছে না পৌঁছুত, তবে তো কথা ছিল। কিন্তু খারাপ কাজের অনিষ্ট, কুপ্রভাব এবং অশুভ পরিণতি ব্যাপক ও সামগ্রিক হয়ে থাকে। আর ভালো কাজের পরিণতি হয়ে থাকে নির্দিষ্ট। আমরা যদি তাদের নিষেধ না করি, খারাপ কাজ থেকে নিবৃত করার চেষ্টা না করি, ভালো কাজের আদেশ না করি, আল্লাহ ﷻ আমাদের উপরও গোস্বা হবেন। আমাদেরও শাস্তি দিবেন।

আল্লাহ ﷻ সাবার জনপদের সাথে কী করেছেন! তাদের শাস্তি দেয়ার জন্য কোন বাহিনী প্রেরণ করেছেন? ফেরেসতা পাঠিয়েছেন?

না। আল্লাহ ﷻ তাদের ধ্বংস করার জন্য এমন কিছুই করেননি। তাদের ধ্বংস করার জন্য বাহিনী বা ফেরেসতা পাঠাবেনই বা কেন? তারা তো এগুলোর মোকাবেলার উপযুক্ত নয়। বরং এরও চেয়ে নিকৃষ্ট! আল্লাহ ﷻ নমরূদকে ধ্বংস করেছেন ছোট্ট একটি মশা দ্বারা। কারণ সে মশা দ্বারাই ধ্বংস হওয়ার উপযুক্ত–

> আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনকিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। [সূরা হাজ্জ : ৭৩]

আল্লাহ ﷻ সাবার জনপদ ধ্বংস করার জন্য একটি ইঁদুর পাঠালেন। ইঁদুরটি বাগানের বাঁধের গোড়া দুর্বল করে দিল। বাঁধ ভেঙ্গে বাগানে পানি গড়াল। সবকিছু ডুবে গেল প্লাবনের মত। সাবার জনপদ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা, সকলে কাঁদতে লাগল। কিন্তু এখানেই তাদের পরিসমাপ্তি!

যুগে যুগে যে কেউ আল্লাহ ﷻ-র পথ থেকে বিচ্যুত হলে, রাসূলের পথের উপর অভিযোগ করলে, তাদের অবস্থা এমনই হবে। অবাধ্যতা যত বেশি করবে, আল্লাহ ﷻ অবাধ্যের নীচতা প্রকাশ করার জন্য তাকে ততই নিকৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমে ধ্বংস করবেন।

আল্লাহ ﷻ-র অসংখ্য নেয়ামতের সংরক্ষণ কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমেই সম্ভব। আল্লাহ ﷻ বলেন–

যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদের আরও দিবো এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর। [সূরা ইবরাহিম : ০৭]

আব্বাসি খেলাফতযুগের একটি ঘটনা। সে যুগে একটি জাতি ছিল বারামেকি। আল্লাহ ﷻ তাদেরকে নেয়ামত ঢেলে দিয়েছিলেন। এমনকি তাদের ভবনের পলেস্তরায় ছিল স্বর্ণধোয়া প্রলেপ।

কিন্তু তারা আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ রাখেনি। আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করেনি। তারা আল্লাহ ﷻ-র বিধান লঙ্ঘন করেছে। তাদের ভবনে চলতো গানবাজনা, মদ্যপান, মাস্তি, আরো কত কি!

এক আলেম তাদেরকে সতর্ক করলেন। বললেন, আল্লাহ ﷻ-র নেয়ামতের ব্যাপারে সতর্ক হও। জেনে রাখ, কৃতজ্ঞতা না থাকলে নেয়ামত কোন কাজে আসবে না।

কবির ভাষায়–

থাকতে ফসল করো যতন, পাপে খায় সব পুণ্যরে।

প্রভুর ভয়ের ভূষণ ধর, শোধ নিবেন এক পলকে।

বারামেকি জাতি আল্লাহ ﷻ-র কৃতজ্ঞতা পোষণ করেনি। আল্লাহ ﷻ-র রাগ এল তাদের উপর। আল্লাহ ﷻ তাদের প্রিয়পাত্র বাদশাহ হারুনুর রশিদের হাতেই শাস্তি রচনা করলেন। একদিন সকালে ক্রোধের সূর্যাগ্নি নিয়ে তাদের সামনে তেজিয়ে দাঁড়ালেন হারুনুর রশিদ।

আল্লাহ ﷻ তাদের প্রিয়পাত্র বাদশাহ হারুনুর রশিদের হাতেই তাদের শাস্তি রচনা করলেন। বারামেকিদের সবচেয়ে প্রিয় ও বন্ধুভাবাপন্ন বাদশাহ হারুনুর রশিদ একদিন সকালে ক্রোধের সূর্যাগ্নি নিয়ে তাদের সামনে তেজিয়ে দাঁড়ালেন। তলোয়ারের সূর্যতেজ আঘাতে যুবকদের হত্যা করলেন।

বারামেক গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবনে খালেদ বারামেকি। সাত বছর তিনি কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে কেঁদেছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'কী অপরাধে তোমাদের এ করুণ পরিণতি?'

ইয়াহইয়া ইবনে খালেদ বললেন, 'আমরা আল্লাহ ﷻ-র অবাধ্য হয়েছি। মজলুমের আর্তনাদ রাতের আঁধারকে গাঢ় করে তুলেছে। আমরা উদাসীন ছিলাম, কিন্তু আল্লাহ ﷻ উদাসীন হননি।'

মজলুমের আর্তনাদ বড় ভয়াবহ। নেককারদের আর্তনাদ বড় ভয়াবহ।

আলি ইবনে আবি তালিব رضي الله عنه-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আল্লাহর আরশ এবং যমিনের মাঝে দূরত্ব কতটুকু?'

তিনি উত্তর করেছিলেন, 'আরশ এবং যমিনের মাঝে দূরত্ব শুধু আল্লাহর কাছে মাকবুল দোয়া। আল্লাহ তা মেঘের উপর উঠিয়ে নেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

> আমার ইযযতের কসম! আমার মহত্ত্বের কসম! আমি কিছু সময় পরে হলেও তোমার সাহায্য করবো। [আহমাদ : ৭৯৮৩]

শোকর বা কৃতজ্ঞতা কী?

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। [সূরা লোকমান : ১২]

> আর যারা কৃতজ্ঞ, তাদের আমি প্রতিদান দিবো। [আলে ইমরান: ১৪৫]

জনৈক বুযুর্গকে শোকরের সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, চোখের শোকর আল্লাহ ﷻ-র ভয়ে ক্রন্দন করা। মানুষ কোরআন তেলাওয়াত শুনে কান্না করে না। আল্লাহ ﷻ-র স্মরণে কান্না করে না। অথচ আনন্দ-বিনোদনে কান্না করে। গান শুনে কান্না করে। এই কান্নায় চোখের শোকর আদায় হবে না।

আবু বকর এবং ওমর رضي الله عنهما কোরআন তেলাওয়াত শুনলে চোখের পানিতে তাদের দাড়ি ভিজে যেত।

চোখের শোকর আল্লাহ ﷻ-র ভয়ে কান্না করা। অন্তরের শোকর আল্লাহ ﷻ-কে লজ্জা করা। যার অন্তর আল্লাহ ﷻ-র জন্য প্রস্তুত, দুনিয়া-আখেরাতে সে সফল।

রাসূল ﷺ বলেন– 'লজ্জা মানুষের কল্যাণই বহন করে।' [বুখারি : ৬১১৭]

শাফেঈ ﵀ বলেন, আল্লাহর কসম! যদি জানতাম, আমার লজ্জার চেয়ে পানি পান কম হয়, তাহলে মানুষের সামনে কখনও পানি পান করতাম না।

কতই না চমৎকার বলেছেন শাফেঈ ﵀। আল্লাহ ﷻ-ই তাকে এমন বুঝ দান করেছেন। আজ এমন এক প্রজন্ম তৈরি হয়েছে, যারা ইসলাম থেকে নির্লজ্জভাবে বিমুখ রয়েছে। মসজিদ থেকে নির্লজ্জের মত পিছপা হয়েছে। ইসলামকে কাঁটছাট করে, আল্লাহকে অস্বীকার করে, রাসূলকে গালমন্দ করে, কোরআন বেমালুম ছেড়ে দিয়ে চরম লজ্জাহীনতার পরিচয় বহন করে।

অন্ধকারের পরিণতি ভয় কর না যদি,

তবে করতে পার– যা মন চাহে, তা।

লজ্জা-শরম হারিয়ে শেষে ভোগ-বিলাশে

কল্যাণাশা! –কী আর পাবে তা!

লজ্জা মানুষের ভূষণ। মানুষের পর্দা ও আড়। আল্লাহ ﷻ মানুষকে লজ্জা দিয়েছেন, যেন পাপ কাজের বাসনা জাগলে আল্লাহ ﷻ-কে লজ্জা করে। লজ্জা দিয়ে সেই পাপের মনস্তাপ ঢেকে রাখে।

শয়তান মানুষকে নিষিদ্ধ বস্তু দেখিয়ে বলবে, 'এটা দেখ।' তখন লজ্জা বলবে, 'না। ওটা দেখবে না।'

শয়তান নিষিদ্ধ কিছু শুনিয়ে প্রণোদনা দিবে, 'এটা শোন।' লজ্জা তাকে বলবে, 'না। ওটা শুনবে না।'

শয়তান নিষিদ্ধ রাস্তার পথ দেখিয়ে বলবে, 'চল ওদিকে।' লজ্জা তাকে বলবে, 'না। ওদিকে চলবে না।'

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তুমি কি তাদের দেখনি, যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে এবং স্বজাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের আলয়ে। [সূরা ইবরাহিম : ২৮]

নেয়ামত দুই প্রকার।

এক. আল্লাহ ﷻ-র নিকটভাজনদের জন্য।

দুই. মুসলমান-কাফের সকলের জন্য। মানুষ-জীবজন্তু সবকিছুর জন্য।

দ্বিতীয় প্রকার নেয়ামতের উল্লেখ করে আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আপনি ছেড়ে দিন তাদের, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতিসত্বর তারা জেনে নিবে। [সূরা হিজর : ০৩]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ ﷻ সবার জন্য খাদ্য-পানীয় এবং অন্যান্য নেয়ামতের কথা বলেছেন। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

> আপনি কি মনে করেন যে তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে! তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং আরও পথভ্রান্ত। [সূরা ফুরকান : ৪৪]

তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত! তাদের পানাহার চতুষ্পদ জন্তুর মত। তাদের উঠাবসা, চলাফেরাও চতুষ্পদ জন্তুর মত। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন– আল্লাহ তাদের ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা দিয়েছেন। কিন্তু তারা এসব ভালো কাজে ব্যয় করেনি।

> আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না। তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না। আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত। বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। [সূরা আরাফ : ১৭৯]

মানুষের চোখ না থাকলেই কি সে অন্ধ? যাদের চোখ আছে, তবু তারা দেখে না, তারাই অন্ধ। যাদের চর্মচক্ষু আছে, কিন্তু অন্তঃচোখ নেই, তারাই প্রকৃত অন্ধ–

> বস্তুতঃ চোখ তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়। [সূরা হাজ্জ : ৪৬]

> যে ব্যক্তি জানে যে যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে অন্ধ? তারাই বোঝে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন। [সূরা রাদ : ১৯]

যে ব্যক্তি জানে, দোকান-পাট থেকে মসজিদ উত্তম, অশ্লীল পত্র-পত্রিকার চেয়ে কোরআন উত্তম, গান-বাজনার চেয়ে তেলাওয়াত উত্তম, অসৎ সঙ্গ থেকে সৎ সঙ্গ উত্তম, সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে তার মাথা খেয়ে পশ্চাদগামী হয়েছে! আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়েছে! যে নিজেই শয়তান হয়েছে–

আমার পদোন্নতি হয়েছে শয়তানের দলে।

এখন শয়তান ভিড়েছে আমার দলে!

মানুষ প্রথমে শয়তানের অনুসরণ করে। শয়তান তাকে কাছে ভেড়ায়। ধীরে ধীরে তার অবস্থা আরও করুণ হয়। শয়তানের দলে তার অবস্থান উন্নত হয়। তখন সে নিজেই এমন শয়তান হয়ে যায়, যের শয়তান তার দ্বারা পরিচালিত হয়। সে হয়ে যায় বিতাড়িত শয়তান।

যখন সে নিজেই বিতাড়িত শয়তান হয়ে যায়, তখন তার অনিষ্ট অন্যদের আক্রান্ত করে। তার কুপ্রভাবে আরও মানুষ প্রভাবিত হয়। ফেতনায় জড়িয়ে পড়ে। নিজে ধ্বংস হয়। পরিবার ধ্বংস করে। ভাই-বন্ধুদের ধ্বংস করে। পরিবেশ ও সমাজ ধ্বংস করে। সে যেখানেই যায়, সেখানেই ফেতনা ছড়াতে থাকে।

বিপরীতে এমন মানুষ আছেন, যারা নিজে সৎ। তাদের সংশ্রবে অন্যরাও সৎপথে আসে। সৎলোক যেখানে যান, সেখানে বরকত ছড়ায়। সেখানের পরিবেশ সংশোধিত হয়। আল্লাহ ﷻ এমন এক নবির কথা উল্লেখ করে বলেন–

> আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। [সূরা মারইয়াম : ৩১]

এই নবি যেখানেই আগমন করতেন, সেখানেই বরকত প্রকাশ পেত।

মুতানাব্বি বলেন–

যেথা আগমন করে কোন অভিজাত কিবা কোন সম্মানী

সেথা সজীব হয় সোনালী শ্যামল ঝরে নির্ঝর প্রবাহিণী

কোন সম্মানী ব্যক্তির আগমনে একটি মজলিস জান্নাতের বাগানে পরিণত হয়। অভিজাত ব্যক্তির সাথে সফর করাও একটি সৌভাগ্য। তার সান্নিধ্যে জীবন সুরভিত হয়। তিনি বিদায় গ্রহণ করে দোয়া করতে থাকেন। তার থেকে কেউ বিদায় গ্রহণ করে তার জন্য কান্না করতে থাকে।

বিপরীতে কোন মন্দ ব্যক্তির সংশ্রব অকল্যাণ বয়ে আনে। তার সাথে ভর করে শয়তানের আগমন ঘটে। গোনাহর পরিবেশ তৈরি হয়। আল্লাহ ﷻ-র গজব নাযিল হয়।

জাফর সাদিক বলেন, তিন ব্যক্তির সংশ্রব কখনও গ্রহণ করবে না। তাদের উপর আল্লাহ ﷻ-র গযব অবধারিত।

এক. আল্লাহ ﷻ-র অবাধ্যের সংশ্রব গ্রহণ করো না। সে আল্লাহর সাথে বন্ধন ছিন্ন করেছে।

দুই. যে বাবা-মাকে কষ্ট দেয়, তার সাথে মিশবে না। সে অভিশপ্ত।

তিন. মিথ্যুকের সাথে উঠাবসা করবে না। সে তোমার দূরের লোকদের কাছে আনবে। কিন্তু কাছের লোকদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করবে।

আল্লাহ ﷻ মানুষকে দু'ধরণের নেয়ামত দান করেছেন।

এক. মুসলমান-কাফের সকলের জন্য।

দুই. শুধু মুসলমানদের জন্য।

মুসলমানদের জন্য বিশেষ নেয়ামত হল ইসলাম, কোরআন, হেদায়াত। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

> আল্লাহ ﷻ পছন্দের বান্দা, অপছন্দের বান্দা সকলকে দুনিয়া দান করেন। কিন্তু দীনী বিষয়ে পছন্দের বান্দাদেরই উৎকর্ষ দান করেন। [আহমাদ : ৩৬৬৩]
>
> আল্লাহ ﷻ যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের বুঝ দান করেন। [বুখারি : ৭১]

মুসলমানদের বিশেষ নেয়ামত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সাফা পর্বত থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ -এর নিশান উত্তোলিত হয়েছিল। জনৈক আলেম কত সুন্দর করে বলেছেন–

সাফা পর্বত থেকে মুয়াযযিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন। মানুষের অন্তর জয় করার আযান দিয়েছেন। তখন সকলেরই সফলতা অর্জনের সুযোগ ছিল। কিন্তু আবু জাহল বলল, আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অস্বীকার করলাম।

আবু লাহাব বলল, আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অস্বীকার করলাম।

অপর দিকে সালমান ফারসি ﵁ পারস্যে বসেই বললেন, 'লাব্বাইক! হে আল্লাহ, আমি হাজির!'

বিলাল ﵁ হাবশা থেকে তাকবির দিলেন– 'আল্লাহু আকবার!' রাসূল বিলালকে বললেন–

> বিলাল! সালাত কায়েম কর। সালাতের মাধ্যমে আমাদের প্রশান্তি দাও। [আহমাদ : ২২৫৭৮]

সুহাইব ﵁ রাসূলের কাছে উপস্থিত হলেন। আল্লাহর জন্য নিজের জান বাজি রাখলেন।

> আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। [সূরা বাকারা: ২০৭]

কায়স ইবনে হাযেম খলিফা সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেকের কাছে উপস্থিত হলেন। খলিফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা দুনিয়া ভালোবাসি, আখেরাত অপছন্দ করি, এর কারণ কী?'

কায়স বললেন, 'কারণ, তোমরা দুনিয়ার জীবন সাজিয়েছ, আখেরাতকে উজাড় করেছ। এখন তোমরা দীর্ঘ সুসজ্জিত জীবন ছেড়ে উজাড় করা জায়গায় যেতে অপছন্দ করছ।'

হ্যাঁ, তাইতো! অনেকে দুনিয়াকে সজ্জিত করে, আখেরাত বরবাদ করে। আর অনেকে দুনিয়াতে কিছুরই মালিক হয়নি, কিন্তু আল্লাহ ﷻ-র সাথে ঈমানে-সততায় দুনিয়ার ধনী হয়েছে।

সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ﵁। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত আলেম। শীর্ষ সাত ফকীহর (ইসলামী আইনবিদ) একজন। একবার তিনি বাইতুল্লাহর হেরেমে অবস্থান করছিলেন। হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক সেখানে উপস্থিত

হলেন। তার মন্ত্রী-আমলারাও সাথে ছিলেন। সালিম তখন হাতে জুতা বহন করছিলেন। তার জুতা, পাগড়ী, এবং পরিধেয় কাপড়ের মূল্য ছিল তের দিরহাম। হিশাম তাকে বললেন, 'আমার কাছে তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি?'

সালিম উত্তর দিলেন, 'বাইতুল্লাহর ভিতর তোমার এ কথা বলতে লজ্জা হয়নি!'

হিশাম তার উত্তর শুনে ভড়কে গেলেন। বাইতুল্লাহ থেকে বের হয়ে সালিমের অপেক্ষা করতে থাকলেন। সালিম বের হলে আবার তাকে বললেন, 'তখন আমরা হেরেমের ভিতর ছিলাম। এখন বের হয়েছি। আমার কাছে তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি?'

সালিম বললেন, 'দুনিয়ার প্রয়োজনের কথা বলছ, নাকি আখেরাতের প্রয়োজনের কথা বলছ!'

হিশাম বললেন, 'দুনিয়ার প্রয়োজনের কথা বলছি।'

সালিম বললেন, 'আল্লাহর কসম! তুমি তো দুনিয়ার মালিক নও, একজন ফকীর! যিনি দুনিয়ার মালিক, তার কাছেই চাইনি। এখন তোমার কাছে চাইবো!'

ভাবার বিষয়– মানুষ কয়েক মিলিয়ন টাকার মালিক হয়ে, দালান-কোটা, বাগ-বাগিচার মালিক হয়ে নিজেকে দুনিয়ার বাদশাহ মনে করে। অথচ সে জানেও না– যে ঈমানের দৌলত রাখে, তার জন্য প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য হল অন্তরের ভিতর!

তোমরা দুনিয়া ধর আর ছেড়ে দাও, আমার অন্তর বড় অদ্ভুত, উষ্ণ, প্রফুল্লা!

আমিই প্রাচুর্যশীল সবচে, আমায় বন্ধু বানাও, কর লুণ্ঠন...

ওয়ালীদ ইবনে মুগিরা। তার অঢেল স্বর্ণ-রূপার খনি ছিল। কুড়াল দিয়ে স্বর্ণ ভাঙ্গাত সে। দুই বছর অন্তর কাবা শরিফকে স্বর্ণমণ্ডিত করত। তার দশ ছেলে ছিল। সে রেশমের জুতা পরে হাঁটত।

এত নেয়ামত পেয়ে সে আল্লাহ ﷻ-কে অস্বীকার করেছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াত অস্বীকার করেছে। আল্লাহ ﷻ-র নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে। আল্লাহ ﷻ তার ব্যাপারে বলেন–

যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি তাকে বিপুল ধনসম্পদ দিয়েছি। এবং সদা সঙ্গী পুত্রবর্গ দিয়েছি। তাকে খুব স্বচ্ছলতা দিয়েছি। এরপরও সে আশা করে যে, আমি তাকে আরও বেশি দেই। কখনই নয়, সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। [সূরা মুদ্দাসসির : ১১-১৬]

আল্লাহ ﷻ তাকে নিকৃষ্টতম মৃত্যু দিয়েছেন। তার ধনসম্পদ, প্রাচুর্য কোন কিছুই কাজে আসেনি। কারণ সে আল্লাহ ﷻ-র অবাধ্যতা করেছে। তার নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করেছে।

সাহাবায়ে কেরাম যখন জাযিরা থেকে বের হন, তখন তাদের সাথে পরিধানের কাপড় এবং অস্ত্র ছাড়া আর কিছু ছিল না। তারা এ অবস্থায় চকচকে স্বর্ণময় কিসরা-কায়সারে প্রবেশ করেছিল। সাদ رضي الله عنه কিসরার স্বর্ণভবন দেখে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন– 'আল্লাহু আকবার!' তখন তার চোখ থেকে অশ্রু গড়াচ্ছিল। তিনি তেলাওয়াত করলেন–

তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবন, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য স্থান, কত সুখের উপকরণ, যাতে তারা খোশগল্প করত, এমনিই হয়েছিল এবং আমি ওগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। তাদের জন্য ক্রন্দন করেনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তারা অবকাশও পায়নি। [সূরা দুখান : ২৫-২৯]

কুতাইবা বিন মুসলিম প্রাচ্য জয় করে বিপুল পরিমাণ গনিমত লাভ করেছিলেন। তিনি মন্ত্রীদের তা দেখিয়ে বললেন, 'তোমরা কি এমন একজন মানুষ দেখবে, যার কাছে আমি এসব অর্পণ করলে সে এসব ফিরিয়ে দিবে!'

মন্ত্রীরা বলল, 'এতসব সম্পদ থেকে বিমুখ থাকার মতো কেউ আছেন বলে আমাদের মনে হয় না।

কুতাইবা ছিলেন অত্যন্ত সৎ নিষ্ঠ সমর্পিত একজন ধার্মিক। তিনি বললেন, 'তোমাদের আমি উম্মতে মোহাম্মদি থেকে এমন একজন লোক দেখাবো, যার কাছে স্বর্ণ মাটির মতো।'

এ কথা বলে তিনি মোহাম্মদ বিন ওয়াসি আযদিকে উপস্থিত করার আদেশ দিলেন।

মোহাম্মদ বিন ওয়াসি একজন আলেম ও আবেদ ছিলেন। কুতাইবা একদিন তাকে বাহিনীর জন্য দোয়া করতে দেখে বলেছিলেন, 'এক আল্লাহর কসম! মোহাম্মদ বিন ওয়াসির দোয়ায় উত্তলিত হাতের আঙ্গুল আমার কাছে এক হাজার ধারালো তলোয়ার এবং তাগড়া যুবকের চেয়ে উত্তম!'

কুতাইবা বেশ কিছু স্বর্ণসহ মন্ত্রীদের পাঠালেন মোহাম্মদ বিন ওয়াসির কাছে। মন্ত্রীরা এসে সংবাদ দিল, মোহাম্মদ বিন ওয়াসি স্বর্ণগুলো গ্রহণ করেছেন।

চিন্তায় পড়ে গেলেন কুতাইবা। বললেন, 'আল্লাহ যা করেন। ঘটনা এমন হওয়ার কথা নয়। হে আল্লাহ! আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত করো না।'

তখন একজন ভিক্ষুক মোহাম্মদ বিন ওয়াসির কাছ দিয়ে ভিক্ষা করে যাচ্ছিল। মোহাম্মদ বিন ওয়াসি সবগুলো স্বর্ণ সেই ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন।

কুতাইবা এই কথা শুনে বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি, উম্মতে মোহাম্মদিতে এমন একজন লোক আছেন, যার কাছে স্বর্ণ মাটিতুল্য!'

মানুষ দীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিলে আল্লাহ ﷻ তার কাছে দুনিয়াকে ছোট করে উপস্থিত করেন। আর যারা দুনিয়াকে দীনের উপর প্রাধান্য দেয়, তাদের দীন ধ্বংস হয়ে যায়।

আল্লাহ ﷻ বলেন—

> তুমি কি তাদের দেখনি, যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে এবং স্বজাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের আলয়ে। [সূরা ইবরাহীম : ২৮]

যা মানুষকে আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যের সহযোগিতা করে, মানুষের জন্য জান্নাতের রাস্তা সুগম করে, সৌভাগ্যের অধিকারী বানায়, তা-ই নেয়ামত।

রাসূল ﷺ সাহাবিদের ধন-সম্পদ দিয়েছেন। ধন-সম্পদ দিয়ে অন্তরসমূহ একত্রিত করেছেন।

হোনাইনের যুদ্ধে আল্লাহ ﷻ রাসূলকে বিজয় দান করেছেন। রাসূল ﷺ সেখানে প্রচুর গনিমত পেয়েছিলেন। আরবের বিভিন্ন গোত্রের নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে সেসব গনিমত বণ্টন করেছেন, যারা আনসারদের মত

কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু আনসারদের জন্য গনিমতের কোন অংশ রাখেননি, অথচ আনসাররা রাসূলকে বদর-উহুদে সাহায্য করেছিল।

আনসাররা এতে একটু মনোক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। মূলত এটি ছিল মানবিক দুর্বলতা। আনসাররা বলাবলি করছিলেন, 'আল্লাহ তার রাসূলকে হেফাযত করুন। তিনি সবাইকে গনিমত দিলেও আমাদের দেননি। অথচ আমরা তাকে সাহায্য করেছি। আশ্রয় দিয়েছি। সমর্থন ও প্রতিরক্ষা দিয়েছি।'

আনসারদের এসব মন্তব্য চারদিকে চর্চা হল এবং একে একে তা রাসূলের কানেও পৌঁছল। রাসূল আনসারদের সর্দার সাদ বিন ওবাদা رضي الله عنه-কে ডেকে পাঠালেন। সাদকে বললেন, 'তোমাদের এ কেমন মন্তব্য শুনলাম!'

সাদ বললেন, 'যা শুনেছেন, তা-ই। আমাদের কতক যুবক এমন কথা বলেছে।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমার কওমকে আমার কাছে একত্রিত কর।'

সাদ رضي الله عنه সকলকে একত্র করলেন। রাসূল তাদের উদ্দেশে বললেন, 'হে আনসাররা! তোমাদের এ কেমন মন্তব্য আমার কাছে পৌঁছল!'

আনসাররা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! যা শুনেছেন, তা-ই।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছি, তখন তোমরা বিক্ষিপ্ত ছিলে। অতঃপর আল্লাহ কি আমার দ্বারা তোমাদের সুসংহত করেননি!'

আনসাররা বলল, 'সব আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগ্রহে।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'আমি তোমাদের কাছে এসেছি, তোমরা দরিদ্র ছিলে। আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদের বিত্তশালী বানাননি?'

আনসাররা বলল, 'সব আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগ্রহে।'

রাসূল ﷺ তার আওয়াজ উঁচু করে বললেন, 'আনসাররা! যার হাতে আমার জান, তার কসম করে বলছি! তোমরা চাইলে বলতে পারতে এবং সত্যই বলতে– আপনি আমাদের কাছে বিতাড়িত হয়ে এসেছেন, আমরা আপনাকে

আশ্রয় দিয়েছি। আপনি রিক্তহস্তে এসেছেন, আমরা সহমর্মিতা করেছি। আপনি নিঃস্ব হয়ে এসেছেন, আমরা সাহায্য করেছি।'

আনসাররা বলল, 'সব আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগ্রহে।'

রাসূল ﷺ আবার উঁচু আওয়াযে বললেন, 'আনসাররা! সবাই ছাগল আর উট নিয়ে ঘরে ফিরবে, তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ঘরে ফিরবে, এতে তোমরা সন্তুষ্ট নও! আল্লাহর কসম! মানুষ যা নিয়ে ঘরে ফিরছে, তার তুলনায় তোমরা যা নিয়ে ঘরে ফিরছ, তাই উত্তম। আল্লাহ আনসারদের ক্ষমা করুন। আনসারদের সন্তানদের ক্ষমা করুন। সবার সাথে আমার স্বাভাবিক সুসম্পর্ক, আনসারদের সাথে অত্যধিক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। সবাই যদি একটি জাতি বা উপত্যকা গ্রহণ করে, আমি আনসারদের গ্রহণ করবো।' [বুখারি : ২৩৭৭]

রাসূলের এ বক্তব্যে আনসারদের অশ্রুঝরা প্রতিক্রিয়া হল। কান্নাবিগলিত হয়ে তাদের দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেল।

রাসূল উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট করেছেন– আল্লাহ ﷻ তার পছন্দের পাত্র, অপছন্দের পাত্র, সবাইকে দুনিয়ার প্রাচুর্য দান করেন। কিন্তু দীনের প্রাচুর্য যাকে ভালোবাসেন, তাকেই দান করেন।

আমর ইবনে তাগলিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল ﷺ এর কাছে কিছু মাল বা কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী উপস্থিত করা হল। তিনি তা বণ্টন করে দিলেন। বণ্টনের সময় কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে বাদ দিলেন।

রাসূলের কাছে সংবাদ পৌঁছল– যাদের তিনি দেননি, তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। তখন রাসূল আল্লাহর প্রশংসা ও তার মহিমা বর্ণনা করে বললেন, 'আম্মা বাদ! আল্লাহর শপথ! আমি কোন লোককে দেই আর কোন লোককে দেই না। যাকে আমি দেই না, সে যাকে আমি দেই, তার চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়। তবে আমি এমন লোকদের দেই, যাদের অন্তরে অধৈর্য ও মালের প্রতি লিপ্সা দেখতে পাই। আর কিছু লোককে আল্লাহ যাদের অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা এবং কল্যাণ রেখেছেন, তাদের সে অবস্থার উপর ন্যস্ত করি। তাদের মধ্যে আমর ইবনে তাগলিব একজন।'

বর্ণনাকারী আমর ইবনে তাগলিব বলেন, 'আল্লাহর শপথ! রাসূলের এ বাণীর পরিবর্তে আমি দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে পছন্দ করি না।'

[বুখারি : ৯২৩]

মুসলিম যুবক! আল্লাহর সাথে তোমার অঙ্গীকার ভঙ্গ করছ। আল্লাহর সাথে সম্পর্কের সুতা কর্তন করছ। এটাই কি তোমার যৌবনের প্রতিদান? শরীর-স্বাস্থ্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ রাখার প্রতিদান?

মুসলিম যুবতী! আল্লাহ ﷻ তোমাকে সৌন্দর্য দিয়েছেন। কোমল করেছেন। বস্ত্রাবৃত করেছেন। তোমাকে প্রতিপালন করেছেন। পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তোমাকে নানা ধরনের নেয়ামত দিয়েছেন। এরপরও তুমি আল্লাহ ﷻ-র পথ ছেড়ে শয়তানের পথ ধরছ! শয়তানের পথে গিয়ে মানুষকে ফেতনায় নিপতীত করছ!

এটাই তোমাদের নেয়ামতের প্রতিদান?

নেয়ামতের প্রকারসমূহ

এক.

প্রকাশ্য নেয়ামত। ধন-সম্পদ মানুষের প্রকাশ্য নেয়ামত।

ধন-সম্পদ কখনো মানুষের জন্য নেয়ামত। কখনোও আবার শাস্তি পাওয়ার উপকরণ।

ধন-সম্পদ আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয়িত হলে আল্লাহ সেই সম্পদ দিয়ে মানুষকে দুনিয়া-আখেরাতে সফল করে তোলেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ رضي الله عنه ধন-সম্পদ ব্যয় করে জান্নাতের অধিকারী হয়েছেন।

কেউ যদি মনে করে, ইসলাম ধন-সম্পদ ও অর্থনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহলে তার এই ধারনা ভুল। বরং ইসলাম ধন-সম্পদের বিলাসিতা, অপচয় ইত্যাদিকে নিষেধ করে।

ধন-সম্পদ যদি দীনের খেদমতের জন্য ব্যয়িত হয়, আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যের অধীন হয়, তবে তা মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ বয়ে আনবে।

তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এই কঠিন দিনের সেনাবাহিনী সাজিয়ে দিবে? তার জন্য জান্নাতের ঘোষণা!' [আহমাদ : ৫১৩]

সকলের মাঝ থেকে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়ালেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি এই কঠিন দিনের বাহিনী সাজিয়ে দিবো। অর্থ, অস্ত্র, ঘোড়া, জিনপোশ, –আল্লাহর রাহে সবই আমি বহন করবো।

উসমানের ঘোষণা শুনে রাসূলের দুই চোখে অশ্রু গড়ালো। রাসূল তার জন্য দোয়া করে বললেন, 'আল্লাহ! উসমানের পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ করো। আল্লাহ! তুমি তার উপর সন্তুষ্ট হও, আমিও তার উপর সন্তুষ্ট। আজকের পর উসমানের কোন কর্ম তার ক্ষতি বয়ে আনবে না।' [আহমাদ : ২০১০৭]

দুই.

পদ-পদবী মানুষের প্রকাশ্য নেয়ামত। পদ-পদবী কখনো ইসলামের সাহায্য করে। কখনো ইসলামের বিরোধী শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। দাঈ ও দাওয়াতের পথে দুর্বেধ্য গিরিপথের ভূমিকা পালন করে।

ওমর ইবনে আব্দুল আযিয রহিমাহুল্লাহ খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি সৎ ছিলেন। মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করেছিলেন।

অপর দিকে আবু মুসলিম খোরাসানি, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ শাসক হয়ে হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ মুসলমান হত্যা করেছিল।

আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, 'বনী ইসরাইলের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। একজন শ্বেতরোগী। একজনের মাথায় টাক। একজন অন্ধ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের পরীক্ষা কতে চাইলেন। তিনি তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা প্রথমে শ্বেতরোগীর কাছে আসলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কাছে কোন জিনিস বেশি প্রিয়?'

সে জবাব দিল, 'সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া। কারণ মানুষ আমাকে ঘৃণা করে।'

ফেরেশতা তার শরীরের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। তার রোগ সেড়ে গেল। তার শরীরে সুন্দর চামড়া ও রং দান করা হল।

ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন ধরনের সম্পদ তোমার কাছে বেশি প্রিয়?'

সে জবাব দিল, 'উট'। অথবা সে বলল, 'গরু'।

(এ ব্যাপারে বর্ণনাকরীর সন্দেহ রয়েছে যে, শ্বেতরোগী বা টাকওয়ালা, দুজনের একজন বলেছিল উট আর অপরজন বলেছিল গরু।)

তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী দেয়া হল। ফেরেশতা উট দিয়ে দোয়া করলেন– 'এতে তোমার জন্য বরকত হোক।'

এরপর ফেরেশতা টাকওয়ালার কাছে গেলেন। বললেন, 'তোমার কাছে কী পছন্দনীয়?'

সে বলল, 'সুন্দর চুল আমার বেশি পছন্দনীয়। আমি চাই– এ রোগ যেন চলে যায়। মানুষ এ রোগের কারণে আমাকে ঘৃণা করে।'

ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ মাথার টাক চলে গেল। মাথা ভর্তি সুন্দর চুল গজিয়ে উঠল।

ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়?'

সে বলল, আমার সবচে প্রিয় সম্পদ গরু।

তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দেয়া হল। ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করলেন, 'এতে তোমাকে বরকত দান করা হোক।'

এরপর ফেরেশতা অন্ধের কাছে আসলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন জিনিস তোমার কাছে বেশি প্রিয়?'

সে বলল, 'আল্লাহ ﷻ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন। আমি যেন মানুষকে দেখতে পারি।'

ফেরেশতা তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ ﷻ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন।

ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সবচে প্রিয় সম্পদ কী?'

সে জবাব দিল, 'ছাগল আমার বেশি প্রিয়।'

ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন।

উল্লিখিত লোকদের পশুগুলো বাচ্চা দিল। একজনের উটে ময়দান ভরে গেল। অপরজনের গরুতে মাঠ পূর্ণ হয়ে গেল। অপর একজনের ছাগলে উপত্যকা ভরে গেল।

ফেরেশতা তার পূর্ববর্তী আকৃতি ধারণ করে শ্বেতরোগীর কাছে এসে বললেন, 'আমি একজন নিঃস্ব ব্যক্তি। আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার গন্তব্যে পৌঁছার জন্য আল্লাহ ﷻ ছাড়া কোন উপায় নেই। আমি তোমার কাছে ঐ সত্তার নামে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং, কোমল চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন। আমি এর উপর সাওয়ার হয়ে আমার গন্তব্যে পৌঁছুবো।'

লোকটি বলল, 'আমার উপর বহু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। কাজেই আমার পক্ষে দান করা সম্ভব নয়।'

ফেরেশতা তাকে বললেন, 'সম্ভবত আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি একসময় শ্বেতরোগী ছিলে না, মানুষ তোমাকে ঘৃণা করত? তুমি কি ফকীর ছিলে না, এরপর আল্লাহ ﷻ তোমাকে প্রচুর সম্পদ দান করেছেন?'

লোকটি বলল, 'আমি তো এ সম্পদ আমার পূর্বপুরুষ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছি।'

ফেরেশতা বললেন, 'তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে সেরূপ কের দিন, যেমন তুমি ছিলে।'

এরপর ফেরেশতা মাথায় টাকওয়ালার কাছে তার সেই বেশভূষা ও আকৃতিতে গেলেন এবং তাকে ঠিক তদ্রূপই বললেন, যেরূপ তিনি শ্বেতরোগীকে বলেছিলেন। টাকওয়ালাও ফেরেশতাকে ঠিক অনুরূপ জবাব দিল, যেমন জবাব শ্বেতীরোগী দিয়েছিল। তখন ফেরেশতা বললেন, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ ﷻ তোমাকে তেমন অবস্থায় ফিরিয়ে দিন, যেমন তুমি ছিলে।'

শেষে ফেরেশতা অন্ধ লোকটির কাছে তার আকৃতিতে আসলেন এবং বললেন, 'আমি একজন নিঃস্ব লোক। মুসাফির মানুষ। আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ বাড়ি পৌঁছার জন্য আল্লাহ ﷻ ছাড়া কোন গতি নেই। তাই আমি তোমার কাছে সেই সত্তার নামে একটি ছাগী প্রার্থনা করছি, যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি এই ছাগীটি নিয়ে আমার এ সফরে বাড়ি পৌঁছুতে পারবো।'

সে বলল, 'বাস্তবিকই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ ﷻ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ফকীর ছিলাম, আল্লাহ আমাকে ধনী বানিয়েছেন। এখন তুমি যা চাও, নিয়ে যাও। আল্লাহর কসম! আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি যা কিছু নিবে, তার জন্য আজ আমি তোমার কাছে কোন প্রশংসাই দাবি করবো না।'

তখন ফেরেশতা বললেন, 'তোমার মাল তুমি রেখে দাও। তোমাদের তিনজনকে পরীক্ষা করা হল মাত্র। আল্লাহ ﷻ তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তোমার সাথি দুজনের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।' [বুখারি : ৩৪৬৪]

উক্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত হল, যে আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা পোষণ করে, আল্লাহ ﷻ তার উপর সন্তুষ্ট হন। যে নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করে, পাপাচারে ব্যয় করে, আল্লাহর আয়াতের সাথে গাদ্দারী করে, আল্লাহ ﷻ তার উপর অসন্তুষ্ট হন। এসব নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা পোষণ করা উচিত। কারণ, এবাদত কখনও নেয়ামতের জন্য যথেষ্ঠ নয়।

বনি ইসরাইলের জনৈক আবেদ এক উপত্যকায় আল্লাহ ﷻ-র এবাদতে মগ্ন ছিল। সারাদিন সে এবাদত করত। এভাবে পাঁচশ বছর কেটে গেল। লোকটি যখন মৃত্যুবরণ করল, তাকে জিজ্ঞেস করা হল, 'তুমি তোমার এবাদত দিয়ে জান্নাতে যেতে চাও, নাকি আল্লাহ ﷻ-র রহমতে জান্নাতে যেতে চাও?'

লোকটি বলল, 'আমি পাঁচশ বছর এবাদত করেছি। আমি আমার এবাদত দিয়ে জান্নাতে যেতে চাই।'

আল্লাহ ﷻ তখন ফেরেশতাদের আদেশ করলেন, 'এই লোকের আমল গুণে দেখ এবং তার প্রতি আমার নেয়ামতগুলোও গুণে দেখ।'

ফেরেশতারা তার এবাদত গুণে দেখল, পাঁচশ বছরের এবাদত শুধু চোখের নেয়ামতেরই বদলাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে!

আল্লাহ ﷻ বললেন – 'ওকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।'

লোকটি তখন চিৎকার জুড়ে দিল। বলল, 'আল্লাহ! তোমার রহমতেই আমি জান্নাতে যেতে চাই।'

আল্লাহ ﷻ তাকে রহম করলেন। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। যেন সে একথা বুঝতে পারে, আল্লাহর নেয়ামতের কোন শেষ নেই। কেউ তা গুণে শেষ করতে পারবে না।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন – 'তোমাদের কেউ আল্লাহর রহম ছাড়া নিজ আমল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনিও?'

রাসূল বললেন– 'হ্যাঁ, আমিও। তবে আল্লাহ আমাকে তার রহম দ্বারা পূর্ণ করেছেন।' [বুখারি : ৫৬৭৩]

আমরা সকলেই আল্লাহ ﷻ-র কাছে মুখাপেক্ষী। আমরা সকলেই ভুল করি। আমরা অপূর্ণ। আমাদের এমন কোন আমল নেই, যা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। আমরা আল্লাহর রহম কামনা করি। তার অনুকম্পা ভিক্ষা করি।

শোকরিয়ার স্বরূপ

আল্লাহ ﷻ-র নেয়ামতের শোকরিয়ার স্বরূপ হল– বান্দা নিজে সৎ হয়ে যাওয়া। অপরকে ভালো কাজের আহ্বান করা।

ইসলাম বলে, সৎকাজে আদেশকারী এবং অসৎকাজে নিষেধকারীরাই সফল। যারা চুপ থাকে, সৎকাজে আদেশ করে না, অসৎকাজে নিষেধ করে না, তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকারকারী পাপীদের মতই নিজেদের ধ্বংস করছে। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম গোনাহগারদের নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের নাফরমানীর দরুন। [সূরা আরাফ : ১৬৫]

কৃতজ্ঞতার লাভ

১. কৃতজ্ঞের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে সফল করেন।

২. কেয়ামতের দিন যখন নেয়ামতের কথা জিজ্ঞেস করবেন, তখন কৃতজ্ঞতাই সে জিজ্ঞাসার জবাবে যথেষ্ট হবে।

৩.মানুষ কৃতজ্ঞের জন্য কল্যাণের দোয়া করে।

আল্লাহ ﷻ আমাদের কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার তাওফিক দান করুন। কৃতঘ্নতা থেকে হেফাযত করুন।

যাকিরীন

বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। সর্বসম্মানী রাসূল, রাসূলের পরিবার-সহচর সকলের জন্য অগুণতি দুরূদ ও সালাম। মোহাম্মদ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যাকিরীন– যারা আল্লাহ ﷻ-র যিকির করেন। ধ্যানে-মগ্নে আল্লাহ ﷻ-কে ভাবেন। শ্বাসে-প্রশ্বাসে আল্লাহ ﷻ-র স্মরণ করেন।

এই অধ্যায়ে যাকিরীনদের আলোচনা হবে।

যাকিরীনদের সান্নিধ্যের সৌরভ, সাহচর্যের সাতকাহন এবং যিকিরের পুণ্য ও প্রয়োজন আলোচনা হবে।

উল্লেখ হবে–

১. কোরআনে যিকিরের ফযিলত।

২. সুন্নাহয় যিকিরের ফযিলত।

৩. যাকিরীনদের ঘটনাপাঠ।

৪. রাসূলের নির্দেশনা।

৫. যিকিরের নানা ধরন।

৬. যিকিরের প্রেক্ষিত।

৭. যিকিরের লাভালাভ।

৮. যিকিরের সময়।

৯. শরিয়তের দৃষ্টিতে যিকিরের শুদ্ধসীমা ও অসুদ্ধসীমা।

যিকিরের পুণ্য ও প্রয়োজন

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, ফরয এবাদতের পর সবচে ফযিলতপূর্ণ এবাদত হল যিকির। তার এই কথার সাথে সকল ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে।

আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি অর্জনের দুটি মাধ্যম রয়েছে। এক. আল্লাহর ফিকির। দুই. আল্লাহর যিকির।

আল্লাহ ﷻ-র ফিকিরের অর্থ হল তার সৃষ্টিকূল, নিদর্শনাবলী এবং নেয়ামতসমূহের গবেষণা করা।

আল্লাহ ﷻ-র যিকিরের অর্থ হল শরিয়তের সিন্ধসীমায় তার নাম ও গুণাবলি স্মরণ করা।

কোরআনে যিকিরের ফযিলত

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> নিশ্চয় আসমান ও যমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও যমিন সৃষ্টির বিষয়ে। (তারা বলে–) আমাদের প্রভু! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই। আমাদের তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। [সূরা আলে ইমরান : ১৯০, ১৯১]

নেককার লোকেরা কোথাও একত্র হলে আল্লাহ ﷻ-র স্মরণ করে। বদকার লোকেরা একত্র হলে শয়তানঘনিষ্ঠ আলোচনার আড্ডা জমায়।

নেককারদের আলোচনা হল আল্লাহ ﷻ-র পবিত্রতার বর্ণনা, স্তুতিবয়ান, একত্ববাদের ঘোষণা। বদকারদের আলোচনা হল গান-বাজনা, তামাশা-কৌতুক, অশ্লীলতা, গিবত, চোগলখুরি।

কবির ভাষায়–

রোগ-বিরোগে তোমায় স্মরি, সুস্থ হই।

তোমায় ভুলে গেলেই কভু ধ্বংস হই।

নেককারদের অন্তর যখন অসুস্থ হয়ে আসে, আল্লাহ ﷻ-র স্মরণে তাদের সুস্থতা আসে। বদকাররা অনর্থ আলাপে মগ্ন হয়। ফলে তাদের অন্তরের অপমৃত্যু ঘটে। সুস্থতা ও সঞ্জীবনী তাদের ভাগ্যে আর জোটে না।

আল্লাহ ﷻ- বলেন–

> জেনে রেখো, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।
> [সূরা রাদ : ২৮]

পক্ষান্তরে যে অন্তরে দুনিয়ার আসক্তি বসে যায়, পার্থিব স্বাদ অনুভুত হয়, সে অন্তর কখনও প্রশান্তি অনুভব করে না।

মানুষ আজ পদ-পদবীর ফাঁদে আটকা পড়েছে। ধন-সম্পদ, দালান-অট্টালিকা, পরিবার-সন্তানের দাপটে অন্ধ হয়ে গেছে। তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ হচ্ছে না। বক্ষগুলো দীন গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হচ্ছে না। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সঙ্কীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করবো। সে বলবে, 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, 'এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল। অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাবো। [সূরা ত্বাহা : ১২৪-১২৬]
>
> মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। এবং সকাল বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। [সূরা আহযাব : ৪১, ৪২]

মানুষ কখন আল্লাহ ﷻ-কে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী হয়?

ইবনে সালাহ বলেন, যে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত যিকিরগুলো সকাল-সন্ধ্যা আদায় করে, সেই আল্লাহ ﷻ-কে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দিনে-রাতে, সফরে-বাড়িতে, সুখে-দুঃখে যে আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করে, সেই আল্লাহ ﷻ-কে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, মসজিদে আগমন-প্রস্থান, টয়লেটে প্রবেশ-বহির্গমন, ঘুমোনোর সময়, ঘুম থেকে জাগার সময়, খানার শুরুতে ও শেষে, কাপ পরিধানের সময় রাসূল (সা.) যেসব দোয়া শিখিয়েছেন, সেসব দোয়া নিয়মিত পাঠকারীই হল আল্লাহ (সুব.)-কে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী।

অনেকে বলেন, আল্লাহ (সুব.)-র স্মরণে জিহ্বাকে সজীব রাখাই হল আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করার স্বরূপ। আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা.) থেকে বর্ণিত–

জনৈক বেদুঈন রাসূলের কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের বিধিবিধান আমার প্রতি অনেক হয়ে গেছে। আমাকে তা থেকে কো একটি বলে দিন, যা আমি আঁকড়ে থাকবো।'

তিনি বললেন, 'তোমার জিহ্বা মহান আল্লাহর যিকিরে সর্বদা সজীব রাখবে।' [আহমাদ : ১৭২২৭]

জনৈক নেককার ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তাকে বলা হল, 'আল্লাহকে স্মরণ করুন।'

তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহকে ভুলিনি যে তাকে নতুন করে স্মরণ করবো।'

জুনাইদ বিন মোহাম্মদ (রহ.) ছিলেন প্রখ্যাত একজন বুযুর্গ। মৃত্যুর সময়ও তিনি কোরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তাকে তখন বলা হল, 'আপনি মৃত্যুর সময়ও কোরআন তিলাওয়াত করছেন!'

তিনি উত্তর দিলেন, 'নেক কাজের প্রতি আমার চেয়ে বেশি মুহতাজ আর কে?'

জনৈক নেককার ব্যক্তি বলেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে কখন স্মরণ করেন, আমি জানি।'

জিজ্ঞেস করা হল, 'কখন আল্লাহ আপনাকে স্মরণ করেন?'

তিনি বললেন,

> যখন আমি আল্লাহকে স্মরণ করি. তখন আল্লাহ আমাকে স্মরণ করেন। আল্লাহ বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করবো। [সূরা বাকারা : ১৫২]

সুন্নাহয় যিকিরের ফযিলত

একজন শুভ্রকেশী হাড্ডিসার বয়োবৃদ্ধের জন্য সর্বোত্তম আমল আল্লাহর যিকির।

একজন সুর্দর্শন শক্তিভরা যুবকের জন্যও সর্বোত্তম আমল আল্লাহর যিকির।

আল্লাহর যিকিরের মত সর্বোত্তম আমল ইসলামে দ্বিতীয়টি নেই।

রাসূল ﷺ একবার মক্কার রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করছিলেন। জুমদান নামক একটা পাহাড়ে উপনীত হয়ে তিনি বললেন, 'তোমরা ভ্রমণ করো, এটি জুমদান পাহাড়। (মনে রেখ) নির্জনবাসীরা আগে বেড়ে গেছে।'

সাথীরা জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! নির্জনবাসী কারা?'

রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, 'বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরে রত পুরুষ ও নারী।' [মুসলিম : ২৬৭৬]

নির্জনবাসী– যে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত নেক আমল করে।

নির্জনবাসী– যে ইলমে অনন্য। আল্লাহর যিকিরে অগ্রগণ্য। কোন মজলিসে-বৈঠকে সবাই যখন কথা বলতে পছন্দ করে, তখনও সে আল্লাহর যিকিরকে বেছে নেয়।

গাযালি রহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষ যে কোন মজলিসে আপন আপন পেশা ও পছন্দের বিষয়ে কথা বলে। কাঠমিস্ত্রি কোথাও বসলে কাঠ-চৌকাঠের আলাপ জুড়ে দেয়। রাজমিস্ত্রি কোথাও বসলে তার নির্মাণের আলাপ জুড়ে দেয়। কামার জুড়ে দেয় লোহার আলাপ। বস্ত্র ব্যবসায়ী শুরু করে পোষাকের আলাপ। আর যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের মুখে সবসময় আল্লাহর যিকির। আল্লাহর যিকির।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে যে কূপে ফেলা হয়েছিল, সেটিতে একটি পাথর ছিল। পাথরের চারপাশে পানি। তখন রাত, ইউসুফ পাথরের উপর। সেখানে তার কেউ নেই। আল্লাহ ﷻ ছাড়া কোন সঙ্গী-সহচর, সাহায্যকারী কেউ নেই।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহ ﷻ-র যিকির শুরু করলেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনানুসারে তার যিকিরে সমুদ্রের মাছ থমকে দাঁড়িয়েছিল। ব্যাঙের ঘ্যাঙর-

ঘ্যাঙ থেমে গিয়েছিল। আল্লাহ ﷻ-র একাগ্র যিকিরের প্রভাবেই এমন হয়েছিল। ইউসুফ আল্লাহকে স্মরণ করেছিলেন, আল্লাহও ইউসুফকে হেফাযত করেছিলেন। (ইবনে রজব-কৃত জামিউল উলূমি ওয়ালহিকাম)

ইউনুস ﷺ। তিনি যখন মাছের পেটে, তখন আল্লাহকেই স্মরণ করেছিলেন। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> যদি তিনি আল্লাহর তাসবিহ পাঠ না করতেন, তবে তাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। [সূরা সাফফাত : ১৪৩, ১৪৪]

আবু দারদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত—

রাসূল ﷺ সাহাবিদের বললেন, 'আমি তোমাদের এমন একটি আমলের কথা বলব, যা সবচে ফযিলতপূর্ণ! তোমাদের প্রভুর কাছে সবচে পবিত্র! আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের স্বর্ণ-রূপা ব্যয় করার চেয়ে উত্তম! শত্রুর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের চেয়ে উত্তম!'

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন।'

রাসূল ﷺ বললেন— 'সেই আমলটি হল আল্লাহর যিকির।' [মুসলিম : ২১১৯৫]

আল্লাহর যিকির নফল জিহাদের চেয়ে উত্তম। নফল রোযা এবং সদকার চেয়েও উত্তম।

যাকিরীনদের ঘটনাপাঠ

খালেদ ইবনে মাদান رحمه الله। প্রতিদিন চল্লিশ হাজার বার আল্লাহ আল্লাহ যিকির করতেন।

ইউসুফ ইবনে আসবাত رحمه الله। প্রতিদিন এক লক্ষ বার আল্লাহর যিকির করতেন। তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করতেন।

মহান এই মনীষীদের প্রতিটি শ্বাসে-প্রশ্বাসে আল্লাহর যিকির মিশিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা?

কত কথা বলি!

কত অনর্থ করি!

প্রমোদ-বিনোদন করি!

কিন্তু জীবনের কতটুকু অংশ আল্লাহর স্মরণে ব্যয় করি।

কতটুকু সময় আল্লাহর যিকিরে বাহিত করি!

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

> যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে এবং যে আল্লাহর যিকির করে না, উভয়ের দৃষ্টান্ত জীবিত এবং মৃতের ন্যায়। [বুখারি : ৬৪০৭]

যারা আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করে না, তারা মৃত। তারা খায়-দায়, ফুর্তি করে, গান-বাজনা করে, ভ্রমণ-প্রমোদ করে, কিন্তু–

> তারা মৃত, প্রাণহীন এবং কবে পুনরুত্থিত হবে, জানে না। [সূরা নাহল : ২১]

আসল মৃত সে-ই, যে ঈমানের সাথে, কোরআনের সাথে, আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যের সাথে জীবন চালায় না।

যে রাসূল ﷺ-র নূর ও সুন্নাহকে জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ করে না।

যে জীবনের প্রকৃত পরিচয় জানে না। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আর যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে– সেখান থেকে বের হতে পারছে না? [সূরা আনআম : ১২২]

অন্ধকার! এ হল আল্লাহ ﷻ-র অবাধ্যতার অন্ধকার! কুপ্রবৃত্তির অন্ধকার! আল্লাহর সাথে দূরত্বের অন্ধকার!

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

> আমার নিকট 'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' পাঠ করা পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু থেকে অধিক প্রিয়, যেসব বস্তুর উপর সূর্য উদিত হয়।" অপর এক বর্ণনায় যেসব বস্তুর

> উপর সূর্য উদিত হয় এর স্থলে যেসব বস্তুর উপর সূর্য অস্ত যায় বর্ণিত হয়েছে। [মুসলিম : ২৬৯৫]

দুনিয়া অতি তুচ্ছ। দুনিয়ার সোনা-রূপা অতি নগণ্য। যেদিন মৃত্যু হবে, নেক আমল করার সব পথ রুদ্ধ হবে, সেদিন এসবের কোন মূল্যই থাকবে না।

'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' রাসূলের কাছে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। রাসূল ﷺ বলেন–

> যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়াবিহামদিহী পাঠ করল, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপিত হল। [তিরমিযি : ৩৪৬৪]

জান্নাতের কত খেজুর গাছ প্রতিদিন না জানি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে! কবি বলেন–

ঐ দুনিয়ায় ঘর বাধো মন; ঘরের রক্ষী থাক রাযি

আহমদ হবেন প্রতিবেশী, নির্মাতা তার মহান রব...

ভবন হবে স্বর্ণালী তার মিসক হবে পলেস্তর

যাফরানী ঘাস তরুলতায় মাঠ-জমি-ঘাট সব উর্বর...

ইবনুল কাইয়িম رحمه الله বলেন, রাসূল ﷺ সবসময় যিকির করতেন। তার শ্বাস-প্রশ্বাস ছিল যিকির। তার কথাবার্তা, কাজকর্ম সবই ছিল আল্লাহর যিকির।

রাসূল ﷺ দিনরাত আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করতেন। তিনি মানুষের সাথে থাকতেন, অথচ তার অন্তর আল্লাহ ﷻ-র সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকত। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আপনি বলুন– আমার সালাত, আমার কোরবানী, এবং আমার জীবন ও মৃত্যু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। [সূরা আনয়াম : ১৬২]

রাসূল ﷺ সবসময় আল্লাহ ﷻ-র সাথে সম্পর্ক জুড়ে থাকতেন। রাসূলের অন্তর সর্বদা জাগ্রত থাকত। –এটি ছিল রাসূলের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

রাসূল ﷺ রাতে ঘুমাতেন, কিন্তু তার অন্তর জাগ্রত থাকত। এজন্য রাসূল ﷺ ঘুমালেও ঘুমের কারণে তার অযু ছুটত না। একবার তিনি ঘুমের আগের অযু দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। আয়েশা رضي الله عنها-কে বললেন, 'আয়েশা! আমার চোখ ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।'

অথচ আমরা যখন ঘুমাই, আমাদের অন্তরও ঘুমিয়ে থাকে।

কবির ভাষায়–

সকল চোখই ঘুমে বিভোর, কিছু চোখে তন্দ্রা নাই!

বিছানাতে পিঠ লাগে না, গলগলিয়ে অশ্রু বয়...

এমনই যাকিরীনদের অন্তর। এমন ব্যক্তিই আল্লাহকে সর্বদা স্মরণকরী।

যিকিরের নানা ধরন

ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আল্লাহর যিকির তিন প্রকার।

এক.

অন্তরে আল্লাহ ﷻ-র ধ্যান রেখে মুখে আল্লাহর স্মরণ করা। মুখেও আল্লাহ, মনেও আল্লাহ, –এটি হল সবচে তাৎপর্যময় যিকির।

মুখে আল্লাহ ﷻ-র তাসবীহ পড়বে, অন্তরে তাসবীহর অর্থ চিন্তা করবে।

মুখে ইসতিগফার পাঠ করবে, অন্তরে তার অর্থ ও তাৎপর্য চিন্তা করবে।

মুখে রাসূলের দুরূদ পড়বে, অন্তরে তার প্রশান্তি অনুভব করবে।

এটিই হল সবচে মহান ও তাৎপর্যবাহী যিকির।

দুই.

শুধু অন্তরে আল্লাহর যিকির করা। মুখে যিকির নেই, কিন্তু অন্তরে আল্লাহ ﷻ-র ধ্যান! ঠোঁট নড়ছে না, জিহ্বা নড়ছে না, কিন্তু মনে মনে আল্লাহ ﷻ-কে আওড়ানো!

এটি হল দ্বিতীয় স্তরের তাৎপর্যবাহী যিকির।

তিন.

শুধু মুখে মুখে আল্লাহ ﷻ-র যিকির। অন্তরে নেই, কিন্তু তার ঠোঁট নড়ছে। জিহ্বায় আল্লাহ ﷻ-র যিকিরের মিহিমিহি কম্পন উঠছে। এই ধরনের যিকিরেও আল্লাহ ﷻ প্রতিদান দিবেন। বর্ণিত হয়েছে–

বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে, তার দুই ঠোঁট আমার যিকিরে কেঁপে কেঁপে ওঠে, আমি তখন বান্দার সাথেই থাকি! [তিরমিযি : ৩৩৭৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর ﷺ থেকে বর্ণিত–

জনৈক বেদুঈন রাসূলের কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের বিধি বিধান আমার প্রতি অনেক হয়ে গেছে। আমাকে তা থেকে কো একটি বলে দিন, যা আমি আঁকড়ে থাকবো।'

তিনি বললেন, 'তোমার জিহ্বা মহান আল্লাহ ﷻ-র যিকিরে সর্বদা সজীব রাখবে।' [আহমাদ : ১৭২২৭]

উক্ত হাদীসদুটি থেকে এ কথা বোঝা যায়, অন্তরে ছাড়া শুধু মুখের যিকিরেও আল্লাহ ﷻ প্রতিদান দিবেন।

আবু মুসলিম খাওলানি ছিলেন মহান একজন তাবেঈ। তার জিহ্বা কখনও আল্লাহর যিকিরে অবসাদগ্রস্থ হত না।

যারা মিথ্যা নবুওয়াত দাবি করে নিজেদের নবি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল, তাদের একজন ভণ্ডনবী আসওয়াদ আনাসি। সে ইয়েমেনের প্রান্তরে আবু মুসলিম খাওলানিকে গ্রেফতার করেছিল। আসওয়াদ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি স্বাক্ষ্য দাও যে, মোহাম্মদ আল্লাহর নবি?'

আবু মুসলিম উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।'

আসওয়াদ আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমার উপর ঈমান রাখ কি? আমাকে নবি হিসেবে মান কি?'

আবু মুসলিম বললেন, 'তুমি কী বলেছ, আমি শুনিনি।'

আবু মুসলিমের উত্তর শুনে আসওয়াদ কিছু লাকড়িতে আগুন জ্বালাল এবং আবু মুসলিমকে সে আগুনে নিক্ষেপ করল।

আবু মুসলিম তখন আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করলেন। আল্লাহ ﷻ আগুনকে শীতল ও আরামদায়ক বানিয়ে দিলেন। তিনি যখন মদিনায় ফিরে এলেন, আবু বকর ও ওমর ﷺ খুশি হয়ে তার সাথে মোয়ানাকা করলেন এবং বললেন,

‘আল্লাহ তার বন্ধু ইবরাহিমের সাথে যে আচরণ করেছেন, একই আচরিত ব্যক্তি আবু মুসলিমকে মারহাবা! মোবারকবাদ! স্বাগতম!’

আবু মুসলিম সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর যিকির করতেন। রাতে তিনি অল্পই ঘুমাতেন, সারা রাত আল্লাহর যিকিরে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। [সিয়ারু আলা মিন নুবালা : ৩৬৯]

কোন দীনী ইলমের মজলিস এবং দীনী মাদরাসাও আল্লাহর মহোত্তম যিকির। হাদিস পাঠের আসর, সালাত-রোযার মাসআলা শিক্ষার আসর, শরঈ বেচাকেনা এবং অন্যান্য মাসআলা শিক্ষার আসরও আল্লাহর কাছে মহোত্তম যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ﷻ-র কাছে এগুলো হল ঈমানের মজলিস। জান্নাতের আসর।

যিকিরের প্রেক্ষিত

প্রত্যেক যিকিরের একটি প্রেক্ষিত রয়েছে। আল্লাহ ﷻ-র দাসত্ব করার ক্ষেত্রে প্রেক্ষিত অনুযায়ী যিকির করা উচিত। যিকিরের সময়োপযোগিতা, স্থান-উপযোগিতা লক্ষ রাখা উচিত। এতে আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্য বেশি প্রকাশ পায়।

সালাতের পর রাসূল ﷺ তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ, চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার, একশ বার লা ইলাহা ইল্লাহ, আয়াতুল কুরসী এবং মুয়াওয়াযাত (সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস) পাঠ করা সুন্নত করেছেন।

এমনই প্রত্যেক যিকিরের একটি প্রেক্ষিত বা উপযোগিতা ও সাজুয্যতা রয়েছে। যেমন—

পাহাড়ে আরোহণ বা ভারী কিছু উত্তোলনের সময় লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পাঠ করা।

আবু মুসা আশয়ারী رضي الله عنه বলেন, আমরা একটি উপত্যকায় উঠছিলাম। রাসূল ﷺ আমাদের সাথে ছিলেন। লোকেরা উঁচু আওয়াযে তাকবির দিচ্ছিল। আমি মনে মনে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পাঠ করছিলাম। রাসূল

আমাকে বললেন, 'আবু মুসা! আমি তোমাকে জান্নাতের একটি খাযানার কথা বলবো না!'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ রাসূল, বলুন।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' [বুখারি : ৪২০৫]

তদ্রূপ আল্লাহ ﷻ-র নিদর্শনাবলি ও আশ্চর্য সব সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে সুবহানাল্লাহ পাঠ করা।

কোন গোনাহের কাজ বা আল্লাহ ﷻ-র অবাধ্যতার কথা মনে আসলে আসতাগফিরুল্লাহি ওয়াআতূবু ইলাইহি পাঠ করা।

রাসূলের নাম আলোচনা হলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করা।

খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করা।

হাদিসে রাসূল ﷺ যত যিকিরের কথা বলেছেন, চিন্তকদের কাছে প্রতিটি যিকিরেরই একটি প্রেক্ষিত রয়েছে। একটি সাজুয্যতা ও উপযোগিতা রয়েছে।

যিকিরের লাভালাভ

ওলামায়ে কেরাম যিকিরের একশটি লাভের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কিছু হল–

১. শয়তান বিদূরিত হয়।

২. আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

৩. বন্ধু-সহচরদের ভালোবাসা অর্জন হয়।

৪. মহোত্তম প্রতিদান পাওয়া যায়।

৫. ভুল-ত্রুটি ও পাপাচারের ক্ষতিপূরণ হয়।

৬. চেহারায় ঔজ্জ্বল্য আসে।

৭. হৃদয়টা উদার ও মহান হয়।

৮. আল্লাহ ও বান্দার মাঝে ভালোবাসা তৈরি হয়।

৯. জীবন বরকতময় এবং যৌবন সংরক্ষিত ও গতিশীল হয়।

১০. আনুগত্যের অভ্যাস হয়।

১১. গিবত চোগলখুরিসহ অনুরূপ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।

১২. অন্তর আল্লাহমুখী হয়, অন্তরে হিসাবের ভয় তৈরি হয় এবং তাওবা ও অনুতপ্ততার তাওফিক হয়।

১৩. বিভিন্ন নেক আমলের অনুরূপ সাওয়াব পাওয়া যায়। কখনও বা উক্ত নেক আমলেরও বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়।

১৪. ফেরেশতারা যিকিরকারীকে স্মরণ করে।

১৫. আল্লাহ ﷻ যিকিরকারীকে স্মরণ করেন।

১৬. আল্লাহর বিশেষ সঙ্গ ও নিরাপত্তা পাওয়া যায়।

১৭. সন্দেহ সংশয় ও গোনাহের মানসিকতা থেকে মুক্তি মেলে।

১৮. চিন্তা পেরেশানি অস্থিরতা জীবন নিয়ে হতাশা ও অনিশ্চয়তা দূর হয়।

১৯. সময়ে-বয়সে বরকত আসে। বয়স বৃদ্ধিও পায়।

২০. মুমিনের অন্তর প্রশান্ত করে।

২১. অপরাপর নেক আমলের মানসিকাত তৈরি হয় এবং আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, শক্তি সঞ্চার হয়।

২২. ইবনুল কাইয়িম رحمه الله বলেন, সবচে বড় ফায়দা হল নেফাক থেকে বেঁচে থাকা যায়। কারণ মোনাফেক আল্লাহকে স্মরণ করে না। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায়। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। [সূরা নিসা : ১৪২]

মোনাফেকরা আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করে না। বাজারে, গাড়িতে, বিমানে, মসজিদে, কোথাও তারা আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করে না। আল্লাহ ﷻ-কে মুমিনারই স্মরণ করে।

কেউ যদি নিজের ঈমান ও নিফাক পরীক্ষা করতে চায়, তাহলে সে নিজেকে পর্যালোচনা করে দেখুক। সে সবসময় আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করে কি? বাজারে, গাড়িতে, লোক সমাগমে সে আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করে কি? যদি সে আল্লাহ ﷻ-কে সবসময় সবখানে স্মরণ করে, তাহলে সে মুমিন। তার জন্য ঈমানের সুসংবাদ। অন্যথায় সে হতচ্ছাড়া। তার ভাগ্যে ক্রন্দন আর ক্রন্দন ...

যিকিরের সময়

যিকিরের জন্য সবচে সুন্দর সময় হল ফজর শুরু হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। বর্ণিত হয়েছে–

> فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾
>
> অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা স্মরণ কর সকালে ও সন্ধ্যায় এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা। [সূরা রূম : ১৭, ১৮]

রাসূল ﷺ সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করতেন। আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে–

রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানে বসে আল্লাহর যিকির করবে এবং এরপর দুরাকাত সালাত (ইশরাক) আদায় করবে, তার জন্য একটি হজ্জ ও ওমরা পালনের সাওয়াব হবে। আনাস رضي الله عنه বলেন, রাসূল বলেছেন, ঐ ব্যক্তির জন্য হজ্জ ও ওমরার পরিপূর্ণ সাওয়াব হবে। পরিপূর্ণ সাওয়াব হবে। পরিপূর্ণ সাওয়াব হবে। [তিরমিযি : ৫৮৬]

রাসূল ﷺ-র আমল এমন ছিল।

ইবনে তাইমিয়া رحمه الله ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সালাতের জায়গায় বসে থাকতেন। বলতেন, এই হল আমার ভোর। এভাবে ভোর না হলে আমার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে!

ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকিরের সর্বোত্তম সময়। এ সময় হৃদয়ের দুয়ারগুলো উজাড় হয়। ফুল ফোটে। পাখি ডাকে। আল্লাহ ﷻ-র বরকত নাযিল হয়। রিযিক নাযিল হয়। সাফল্য নাযিল হয়।

আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্তও যিকিরের উত্তম সময়। সূর্যাস্তের পর কয়েক ঘন্টা, বা এক ঘন্টা, বা আধাঘন্টা বা তারও কম সময় যিকিরের জন্য উত্তম।

আল্লাহ ﷻ আমাদের অধিক পরিমাণ যিকির করার তাওফিক দান করুন।

শরিয়তের দৃষ্টিতে যিকিরের শুদ্ধসীমা ও অসুদ্ধসীমা

কিছু যিকির আছে, যা রাসূল ﷺ শিখিয়েছেন। কিছু যিকির আছে, যা রাসূল ﷺ শিখাননি। বরং তা নব-আবিষ্কৃত।

আমরা শরিয়ত পালনে আল্লাহ ﷻ-র অহির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কোরআন এবং সুন্নাহয় যা এসেছে, তাই আমাদের জন্য অনুসরণীয়। রাসূল ﷺ বলেছেন–

> কেউ আমার এ শরিয়তে অসংগত কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যাত। [বুখারি : ২৬৯৭]
>
> তোমরা আনুগত্য কর, নতুন অসংগত কিছু আবিষ্কার করো না। তোমাদের জন্য যথেষ্ট করা হয়েছে। [দারেমি : ২০৫]

শুদ্ধসীমার যিকির– যা রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। আসতাগফিরুল্লাহ। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ।

আর যেসব যিকির আল্লাহ ﷻ কর্তৃক মনোনীত নয়, বরং দীনের ভিতর নবোদ্ভাবনকারী কারো থেকে আবিষ্কৃত, তা শরিয়তের দৃষ্টিতে অশুদ্ধ।

যেমন তারা বলে সর্বোত্তম যিকির হল এসমে আজম– হু... হু...।

তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান সাজিয়ে সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার এর পরিবর্তে হু... হু... যিকির করে। আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত হু... হু... রবে যিকির করতে থাকে।

আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে এটা যিকির নয়। বরং তা কেবলই কুকুরের আওয়াযের মত কিছু একটা।

আল্লাহ ﷻ আমাদের অধিক পরিমাণ যিকির করার তাওফিক দান করুন।

তোমরা আমাকে স্মরণ করো
আমি তোমাদের স্মরণ করবো

হৃদয় উৎসারিত সকল প্রশংসাগাঁথা মহান আল্লাহ ﷻ-র জন্য।

আল্লাহ ﷻ আমাদের হেদায়াত গ্রহণের জন্য উদার একটি অন্তর দিয়েছেন। কোরআন-সুন্নাহ শ্রবণের জন্য হৃদয়ের কান দিয়েছেন। অনুসরণের জন্য হৃদয়ের আনুগত্য দান করেছেন।

আল্লাহ বাতিলপন্থীদের অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন। দীনী বিষয়ে অনবরত নানা অসংগতি সংযোজনের মাধ্যমে তাদের অন্তরের অপমৃত্যু ঘটিয়েছেন।

আল্লাহ ﷻ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ ﷻ তার মাধ্যমে পৃথিবীতে হেদায়াতের নূর-রশ্মির বিচ্ছিন্ন যোগসূত্র পুনঃস্থাপন করেছেন। তাওহিদের সুবিস্তৃত দুর্গের আকাশছোঁয়া মিনার সমুজ্জ্বল করেছেন।

দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তার উপর, তার পরিবার-সহচরদের উপর। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

জীবনের মহেন্দ্রক্ষণ কোনটি?

কথায়-কাজে, সার্বিক বিষয়ে রাসূলের আলোকবর্তিকায় পরিচালিত হওয়া মুহূর্তটিই জীবনের সফল মুহূর্ত। মধুময় অধ্যায়।

কবির ভাষায়–

তোমার পথে পদচারী যে ক্লান্ত হয় না কখনো।

এ চোখ প্রশান্ত প্রেমবীণা শুনে–
এ হৃদয় প্রশান্ত প্রেমলীলা খেলে–

তোমার বাণীতে নিবারিত পিয়াস, তিয়াস আসে না কখনো।

তোমার পথে পদচারী যে ক্লান্ত হয় না কখনো।

রাসূলের বিরোধিতা করে কেমন আয়েশে জীবন যাপিত হয়?

রাসূলের অবাধ্যতা করে কেমন সুখ আস্বাদিত হয়?

রাসূলের আদর্শ বাদ দিয়ে কেমন সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন হয়?

এসব ধোঁকা। এসব মরিচিকা।

রাসূলের মহান জীবনাদর্শই মুসলমানের জীবনকাঠি। আল্লাহর সন্তুষ্টিই মুসলমানের একমাত্র জিয়নকাঠি।

> যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলাল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা।
> [সূরা আহযাব : ২১]

> আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন– তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবি পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদের পরিশোধন করেন এবং তাদের কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট। [সূরা আলে ইমরান : ১৬৪]

রাসূলের প্রেমবীণা গেয়ে কবি বলেন–

তোমার প্রেমে অন্ধ হয়ে ভুলেছি বাঁধ পাহাড়সম

যা কিছু মোর তোমার চেয়ে নেই তো কিছু মহোত্তম।

তোমার ভালোবাসায় আমি নিন্দা শুনি নিত্যদিন,

সে নিন্দাতেই মান, তৃপ্ত আমি, –নেই অভিযোগ কোনও দিন।

তোমায় দেখার তীব্র আশা উথলে আছে এই মনে।

তোমার দেখা পাবো যখন হবে কেমন সেই ক্ষণে!

দুনিয়াতেই তৃপ্ত আজি এই দুনিয়ার অধিক লোক

তোমায় ছাড়া কসম আল্লাহর কিসের তৃপ্তি পায় দ্যুলোক!

রাসূলের জীবনের বৃহৎ, উচ্ছল ও দ্যুতিময় একটি অধ্যায় হল আল্লাহ ﷻ-র যিকির।

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, রাসূল ﷺ সবসময় যিকির করতেন। তার শ্বাস-প্রশ্বাস ছিল যিকির। তার কথাবার্তা, কাজকর্ম সবই ছিল আল্লাহর যিকির।

রাসূল ﷺ শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ﷻ-র যিকির করতেন।

প্রতিটি পদক্ষেপে চলাফেরায় প্রস্থানে অবস্থানে আল্লাহ ﷻ-র যিকির করতেন।

রাসূল কোথাও ভাষণ দিতেন, সেখানেও আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করতেন।

কারো সাতে কথা বলতেন, তখনও আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করতেন।

রাসূলে ﷺ-র যিকিরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে, ক্রন্দরনত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে, যা চীৎকার করে বলা অপেক্ষা কম, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না। [সূরা আরাফ : ২০৫]

আল্লাহ ﷻ-কে এমন স্বরে স্মরণ করতে হবে যা চিৎকার অপেক্ষা কম। এটাই আদব। আর আল্লাহকে ডাকতে হবে সংগোপনে। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। [সূরা আরাফ : ৫৫]

গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ উল্লেখ করেন, আল্লাহ ﷻ-র যিকির করলে অন্তরে একটি আনন্দ ও উচ্ছলতা আসে। এই আনন্দ ও উচ্ছলতা যেন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে না যায়, এ জন্য আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করতে হবে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে, যা চীৎকার করে বলা অপেক্ষা কম। পক্ষান্তরে আল্লাহ ﷻ-কে ডাকা একটি মহামূল্যবান নেয়ামত। এর দ্বারা বান্দার উপর হিংসার ভয় হয়। এজন্য আল্লাহ ﷻ-কে ডাকার ক্ষেত্রে সংগোপনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করবো।

[সূরা বাকারা : ১৫২]

রাসূল ﷺ বলেন–

আল্লাহ বলেন, 'যে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তাকে আমি মনে মনে স্মরণ করি। যে আমাকে কোন মজলিসে স্মরণ করে, আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। [বুখারি : ৭৪০৫]

আল্লাহ বলেন, 'যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সঙ্গো উপবেশনকারী। [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ১২৬৫]

কবি বলেন–

রোগ-বিরোগে তোমায় স্মরি, সুস্থ হই।

তোমায় ভুলে গেলেই কভু ধ্বংস হই।

জনৈক নেককার ব্যক্তি বলেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে কখন স্মরণ করেন, আমি জানি।'

জিজ্ঞেস করা হল, 'কখন আল্লাহ ﷻ আপনাকে স্মরণ করেন?'

তিনি বললেন, 'যখন আমি আল্লাহকে স্মরণ করি. তখন আল্লাহ আমাকে স্মরণ করেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করবো। [সূরা বাকারা : ১৫২]

আল্লাহ ﷻ বলেন–

জেনে রেখো, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। [রাদ: ২৮]

কোরআন তেলাওয়াতে অন্তরসমূহ শান্তি পায়।

আল্লাহ ﷻ-কে স্বাভাবিকভাবে ডাকলেও অন্তরসমূহ শান্তি পায়।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী মাহিলা– তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। [সূরা আহযাব: ৩৫]

ইবনুস সালাহ বলেন, যে সকাল-সন্ধ্যা, সালাতের পর এবং নির্ধারিত প্রতিটি সময়ে আল্লাহর যিকির করে, সেই আল্লাহ ﷻ-কে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما বলেন, দিনে-রাতে, সফরে-বাড়িতে, সুখে-দুঃখে যে আল্লাহকে স্মরণ করে, সেই আল্লাহ ﷻ-কে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী।

ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন, আল্লাহর স্মরণে জিহ্বাকে সজীব রাখাই হল আল্লাহ ﷻ-কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করার স্বরূপ।

আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–

জনৈক বেদুঈন রাসূলের কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের বিধি বিধান আমার প্রতি অনেক হয়ে গেছে। আমাকে তা থেকে কোন একটি বলে দিন, যা আমি আঁকড়ে থাকবো।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'মহান আল্লাহর যিকিরে তোমার জিহ্বা সর্বদা সজীব রাখ।' [প্রাগুক্ত]

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> নিশ্চয় আসমান ও যমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও যমিন সৃষ্টির বিষয়ে। (তারা বলে–) আমাদের প্রভু! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই। আমাদের তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। [আলে ইমরান : ১৯০, ১৯১]

কবির ভাষায়–

দুনিয়াতে বেশি বেশি আল্লাহর যিকির নিজের অভ্যাস বানাও। আসমানে তুমি স্মরিত হবে।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর নাম সর্বশ্রেষ্ঠ।' [সূরা আনকাবূত : ৪৫]

ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, উক্ত আয়াতে সালাতের দুটি ফায়েদা ও উদ্দেশ্য বলা হয়েছে।

এক. সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।

দুই. সালাতে আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠা পায়।

দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে সালাতে আল্লাহ ﷻ-র যিকির প্রতিষ্ঠা পাওয়া সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার খালা মাইমুনা রাযি. এর ঘরে রাসূলের সাথে রাত্রি যাপন করেছিলেন। স্নিগ্ধ শীতল ভোররাত। তারকারা ধীর গতিতে চলছে। রাসূল ﷺ ঘুম থেকে জাগলেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের প্রতিটি পদক্ষেপ দেখছেন। রাসূল ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন। দোয়া পড়া শুরু করলেন–

> আল্লাহ, তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর প্রতিপালক। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর নূর। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য। জান্নাত সত্য। দোযখ সত্য। সকল নবী সত্য। মুহাম্মাদ সত্য।
>
> আল্লাহ, তোমারই জন্য আমি সমর্পিত। তোমাতেই আমি বিশ্বাস রেখেছি। তোমারই উপর ভরসা করেছি। তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করেছি। তোমারই রাহে লড়াই করেছি। তোমরাই দরবারে বিচার চেয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার পূর্বাপর ক্ষমা কর। আমার প্রকাশ্য-গোপনীয় সবকিছু ক্ষমা কর। [বুখারি : ১১২০]
>
> হে আল্লাহ, জিবরাঈল মিকাঈল ও ইসরাফীলের রব, আসমান ও যমিনের স্রষ্টা, প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়সমূহের জ্ঞানের অধিকারী, তোমর বান্দারা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করে তুমিই সেগুলোর ফয়সালা করবে।

সত্য ও ন্যায়ের যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করা হয়েছে, সে বিষয়ে তুমি আমাকে পথ দেখাও। তুমিই তো যাকে ইচ্ছা সরল সহজ পথ দেখিয়ে থাকো। [মুসলিম : ৭৭০]

রাসূল ﷺ-র তাহাজ্জুদ আদায় এবং তাহাজ্জুদে দোয়া পাঠ আল্লাহর এই বাণীর প্রতিফলন–

আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে, ক্রন্দরনত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। [সূরা আরাফ : ২০৫]

আল্লাহ ﷻ বলেন–

মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। এবং সকাল বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। [সূরা আহযাব : ৪১, ৪২]

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে এবং যে আল্লাহর যিকির করে না, উভয়ের দৃষ্টান্ত জীবিত এবং মৃতের ন্যায়। [বুখারি : ৬৪০৭]

আবু হোরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, আমরা এক সফরে রাসূলের সাথে ছিলাম। রাসূল জুমদান নামক একটা পাহাড়ে উপনীত হয়ে বললেন– 'তোমরা ভ্রমণ করো, এটি জুমদান পাহাড়। (মনে রেখ) নির্জনবাসীরা আগে বেড়ে গেছে।'

সাথীরা জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! নির্জনবাসী কারা?'

রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, 'বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরে রত পুরুষ ও নারী।' [মুসলিম : ২৬৭৬]

আবু হোরায়রা رضي الله عنه থেকে অপর এক হাদীসে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন–

যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশবার সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি বলবে, তার গোনাহগুলো সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও মাফ করে দেয়া হবে। [বুখারি : ৬৪০৫]

আবু হোরায়রা رضي الله عنه থেকে আরও একটি হাদিসে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু

ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর– যে ব্যক্তি দিনে একশবার পড়বে, সে একশ গোলাম আযাদ করার সাওয়াব অর্জন করবে। তার জন্য একশটি পূণ্য লেখা হবে। তার একশটি গোনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা তার জন্য রক্ষাকবচে পরিণত হবে। তার চেয়ে বেশি সাওয়াব-সম্পন্ন আমল আর কারো হবে না, তবে যে ব্যক্তি এ আমল তার চেয়ে বেশি করবে।' [বুখারি : ৩২৯৩]

আবু হোরায়রা ﵁ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন– আমার নিকট 'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' পাঠ করা পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু থেকে অধিক প্রিয়, যেসব বস্তুর উপর সূর্য উদিত হয়।" অপর এক বর্ণনায় যেসব বস্তুর উপর সূর্য উদিত হয় এর স্থলে যেসব বস্তুর উপর সূর্য অস্ত যায় বর্ণিত হয়েছে। [মুসলিম : ২৬৯৫]

রাসূল ﷺ বলেছেন– 'যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়াবিহামদিহী পাঠ করল, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপিত হল।' [প্রাগুক্ত]

আবু মুসা আশয়ারি ﵁ বলেন, আমরা একটি উপত্যকায় উঠছিলাম। রাসূল ﷺ আমাদের সাথে ছিলেন। লোকেরা উঁচু আওয়াযে তাকবির দিচ্ছিল। আমি মনে মনে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পাঠ করছিলাম। রাসূল আমাকে ডাকলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন কায়স!'

আমি সাড়া দিলাম, 'লাব্বাইক ওয়াসাদাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

রাসূল বললেন, 'আবু মুসা! আমি তোমাকে জান্নাতের একটি খাযানার কথা বলবো না!'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ রাসূল, বলুন।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' [প্রাগুক্ত]

ইবনে হিব্বান ﵀ বর্ণনা করেন, আবু যর ﵁ বলেন, 'আমার বন্ধু (রাসূল ﷺ) আমাকে আটটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন। একটি হল– লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বেশি বেশি পড়। কারণ তা জান্নাতের খাযানা।' [ইবনে হিব্বান : ৪৪৮]

আবুল কাসেম মাগরিবি ﷫ রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ফরয এবাদতের পর কোন আমলটি আল্লাহর নৈকট্য লাভে বেশি ফযিলতপূর্ণ?'

ইবনে তাইমিয়া ﷫ উত্তর দিলেন, 'আল্লাহর নৈকট্য লাভে ফরয এবাদতের পর আল্লাহর যিকিরের চেয়ে ফযিলতপূর্ণ কোন আমল আছে বলে আমার জানা নেই।'

ইবনে রজব ﷫ জামিয়ুল উলূমি ওয়াল হিকামি গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আবু মুসলিম খাওলানি ﷫ সবসময় আল্লাহর যিকিরে জিহ্বা সজীব রাখতেন। একদিন তিনি মুয়াবিয়া রাযি. এর কাছে উপস্থিত হলেন। মুয়াবিয়া তখন অযু করছিলেন। মুয়াবিয়া বললেন, আবু মুসলিম! লোকটি কি জুনুন! পাগল।

আবু মুসলিম বললেন, না, লোকটি বরং হানূন! আশাবাদী।

আল্লাহর সন্তুষ্টির আশাবাদী। আল্লাহর অনুকম্পা এবং সাক্ষাতের আশাবাদী।

আবু মুসলিম আল্লাহ ﷻ-র যিকিরে সবসময় জিহ্বা সজীব রাখতেন। ফলে আল্লাহ ﷻ তাকে আসওয়াদ আনাসির অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা করেছেন। তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার পর তিনি শূন্যে ভাসতে ভাসতে এই দোয়া পড়েছিলেন– 'হাসবুনাল্লাহি ওয়া নি'মাল ওয়াকীল'।

অতঃপর তিনি যখন আগুনে পড়লেন, আগুন শীতল ও আরামদায়ক হয়ে গেল।

আবু মুসলিম ইয়ামান থেকে মদিনায় ফিরে এলেন। আবু বকর এবং ওমর ﷠ তাকে স্বাগতম জানালেন। ওমর ﷠ বললেন, 'এই উম্মতের খলিলকে স্বাগতম। ইবরাহিম ﵇-র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিকে স্বাগতম।'

পরিশেষে আমাকে এবং সকলকে বেশি বেশি আল্লাহ ﷻ-র যিকির করার উপদেশ দিচ্ছি। যিকিরের বেশ কিছু লাভ পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ ﷻ আমাদের বেশি বেশি যিকির করার তাওফিক দান করুন।

আল্লাহ ক্ষমাশীল

সকল প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-র। আমরা আল্লাহ ﷻ-র কাছে ক্ষমা চাই। সাহায্য ও হেদায়াত চাই। তার কাছে আশ্রয় চাই নফসের অনিষ্ট থেকে, সকল মন্দ কাজ থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ ﷻ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে পথের দিশা দিতে পারে না।

আল্লাহ ﷻ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলের উপর, তার পরিবারবর্গ ও সাথি-সঙ্গিাদের উপর।

আনাস رضي الله عنه বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন–

> আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকবে, আমার ক্ষমার আশা রাখবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করবো –তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কারো পরোয়া করি না।
>
> আদম সন্তান! তোমার গোনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করবো, আমি কারো পরোয়া করি না।
>
> আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গোনাহ নিয়েও আমার সাক্ষাৎ কর এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে আমার সাক্ষাৎ কর, আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হবো। [আহমাদ : ২০৯৬১]

হাদিসটি রাসূলের মুখের ভাষা হলেও এর অর্থ ও মর্ম আল্লাহ ﷻ-র। এ ধরনের হাদিসকে হাদিসে কুদসী বলা হয়।

হাদিসটি মানুষের শরীরে শিহরণ খেলায়। অন্তর কোমল করে। মানুষকে আল্লাহ ﷻ-র কাছে বিনম্র বানায়। আল্লাহ ও কেয়ামতে বিশ্বাসী সকল মুসলমানের জন্য হাদিসটি অসামান্য সুসংবাদ।

রাসূল ﷺ কোন অঞ্চলে দীন-প্রচারক বা শিক্ষক-দিকদর্শক পাঠানোর সময় এই উপদেশ দিতেন–

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا

> তোমরা (দীনের ব্যাপারে) সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না। মানুষকে সুসংবাদ শোনাবে, বিরক্তি সৃষ্টি করবে না। [বুখারি : ৬৯]

দীনের একজন সাধারণ ছাত্র হয়েও আমার কাছে এটিই প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থা মনে হয়। যে মজলিসে দীনের ব্যাপারে শুধু ভীতিই প্রদর্শন করা হয়, সেসব মজলিস মূলত সাধারণ একজন মুসলমানকে ইসলাম থেকে দূরে সড়ানোর নামান্তর। প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থা এটিই যে– ভীতি প্রদর্শনের সাথে আশাব্যঞ্জক কথাও শোনাতে হবে।

একবার কজন ফরাসি জাযিরায় প্রবেশ করে সেখানকার ইসলামের দূর্গগুলো বিরাণ করে ফেলল। এ অবস্থায় জাযিরার জনৈক আলেম আব্দুল হুমাইদ বিন বাদিস স্থানীয় মানুষদের বোঝালেন। গোনাহর অশুভ পরিণতির ভয়ানক ভীতি প্রদর্শন করলেন– যেন তারা মদ যিনা সুদ ইত্যাদি ছেড়ে দেয়।

লোকেরা আব্দুল হুমাইদের কথা শুনে ত্রস্ত হয়ে গেল। আল্লাহ ﷻ-র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গোনাহর কাজ আগের চেয়ে বেশি করতে লাগল।

আব্দুল হুমাইদ মানুষের এই অবস্থা দেখে চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবলেন, তাদের সামনে এমন কোন পন্থা ও দিক উন্মোচন করতে হবে, যেন গোনাহ ছেড়ে দেয়। তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। আল্লাহ ﷻ-র দিকে ফিরে আসে।

আব্দুল হুমাইদ আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করতে লাগলেন। তার মনে হল, এদের আশার বাণী শোনাতে হবে। আল্লাহ ﷻ-র রহমের কথা শোনাতে হবে। এই ভেবে তিনি লোকদের প্রশিদ্ধ এ বাণীগুলো শোনালেন–

আরব বংশোদ্ভুত জাযিরার মুসলিম গোত্রগুলো–

যে বলে আমি তাদের হুমকি দিয়েছি,

সে বাস্তবতাকে পরাজিত করেছে, অথবা সে মিথ্যা বলেছে।

আব্দুল হুমাইদ ভাবলেন, জাযিরার মুসলিম গোত্রগুলোকে আশার বাণী শোনালেই তারা আল্লাহ ﷻ-র পথে ফিরে আসবে। মানুষদের তাওবার আয়াত-হাদিস শোনানো শুরু করলেন। আল্লাহ ﷻ-র রহমতের বাণী শোনালেন। তাওবার ফযিলত এবং তাওবাকারীর মর্যাদা শোনালেন।

মানুষ যখন জানল, অসংখ্য গোনাহ করার পরও একজন রব আছেন, দয়ালু, ক্ষমাশীল, তিনি মাফ করেন, তাওবা কবুল করেন, কেউ ফিরে এলে স্বাগতম জানান, তখন মানুষ দলে দলে ফিরতে লাগল। শাশ্বত দীনের ছায়াতলে প্রত্যাবর্তন করল। মানুষ ঈমানি বলে জেগে উঠল।

মাত্র বছর খানেক, মিলিয়ন সংখ্যক জানবাজ ঘুরে দাঁড়াল। ফরাসিদের দম্ভ অহমিকা ঔদ্ধত্য গুঁড়িয়ে তাদের বিতাড়িত করল। জাযিরা থেকে তাদের উপনিবেশের কফিনে পেড়েক ঠুকে দিল।

আল্লাহ ﷻ-র রহমতের আশা এমনই এক জিয়নকাঠি। মহাশক্তি। ফিরে দাঁড়াবার মহাসড়ক। প্রত্যাবর্তনের নয়াদিগন্ত, প্রশস্ত তোড়ন।

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর রহমতের আশা এমনই এক তোড়ন, যা বান্দাকে আল্লাহ ﷻ-র কাছে গুটিয়ে নিয়ে আসে।

আল্লামা নববি রহিমাহুল্লাহ রিয়াদুস সালিহীন গ্রন্থে ভীতি প্রদর্শনের আলোচনা করেছেন প্রায় চার পৃষ্ঠাব্যাপী। এরপর আল্লাহ ﷻ-র রহমতের আশাব্যঞ্জক আলোচনা করেছেন আট পৃষ্ঠাব্যাপী এবং এর ফযিলত বর্ণনা করেছেন ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী।

এভাবে আলোচনা বিন্যাসের নিগূঢ় তাৎপর্য হল, মানুষ প্রথমে ভীত হবে। অতঃপর তাদের মনে দীর্ঘ আলোচনায় রহমতের আশা ঝলকে উঠবে। অন্তরগুলো আল্লাহ ﷻ-র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ মাদারিজুস সালিকীন গ্রন্থে লিখেন, বিবেকমান মানুষ ভবন বানিয়ে শহর ধ্বংশ করে না।

হারিস আলমাহাসিবি নামক জনৈক ব্যক্তি রিয়ায়া নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মানুষ তার বই পড়ে নিরাশ হয়ে মসজিদ ছাড়তে শুরু করল!

রিয়ায়া গ্রন্থে এমন কী ছিল, যা পড়ে মানুষ মসজিদবিমুখ হতে শুরু করল!

এই বইয়ে গোনাহের অশুভ পরিণতির ভয়ানক ভয়ের কথাই শুধু আলোচনা হয়েছে। দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হওয়ার কথা প্রাধান্য পেয়েছে।

কিন্তু এসব আলোচনা মানুষের স্বভাবমুখী নয়। মানুষ এসব শুনে আনন্দ পায় না। যদিও এতে মানুষের কল্যাণ নিহিত, কিন্তু কজন আর এই কল্যাণ বুঝে এবং গ্রহণ করে! বরং মানুষ এর দ্বারা নিরাশ হয়ে যায়।

আলআওয়াসিম ওয়ালকাওয়াসিম গ্রন্থে ইবনুল ওয়াযিরর ﷬ উল্লেখ করেন, মানুষ যখন বেশি মাত্রায় ভয় পায়, তখন সে বিরক্ত ও নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

রাসূল ﷺ বলেন–

> আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকবে, আমার ক্ষমার আশা রাখবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করবো –তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কারো পরোয়া করি না।

আল্লাহ ﷻ সহনশীল। অনেক সহনশীল। কাফেররা মুসলমানদের হত্যা করছে, মুসলমানদের শহরগুলো ধ্বংস করছে, শিশু ও নারীদের হত্যা করছে, বন্দী করছে, শাস্তি দিচ্ছে, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করাচ্ছে, তথাপি আল্লাহ ﷻ তাদের পাকড়াও করছেন না। কারণ আল্লাহ ﷻ সহনশীল। অতিশয় সহনশীল।

আল্লাহ ﷻ কাফেরদের অত্যাচার সবই দেখেন। মুসলমানদের ফরিয়াদ সবই শোনেন। কিন্তু আল্লাহ তাদের সুযোগ দিচ্ছেন। তাদের সাথে শিথিল আচরণ করছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনও বেখবর মনে করো না। তাদের তো ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে। তারা মস্তক উপরে তুলে ভীত-বিহ্বল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর উড়ে যাবে। [সূরা ইবরাহীম : ৪২, ৪৩]

সূরা বুরূজের তাফসিরে এক মুফাসসির বলেন, জীবনে এত দীর্ঘ নয় যে আল্লাহ ﷻ পাপিষ্ঠ জালেমদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন। বরং জীবন তো অনেক ছোট। ষাট-সত্তর বছর। এত অল্প সময় এই ভয়ানক পাপাচারীদের শাস্তি দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

আল্লাহ ﷻ তাদের জন্য হাজার হাজার বছরের শাস্তি সংরক্ষিত রাখছেন।

আল্লাহ ﷻ কাফেরদের উপরই এত সহনশীল! তাহলে যে মুসলমান আল্লাহ ﷻ-কে ভালোবাসে, সে যদি জীবনের শুরু থেকে আত্মপর্যালোচনা করে আল্লাহ ﷻ-র দিকে ফিরে আসে, তখন কেমন হবে! আল্লাহ ﷻ অবশ্যই ক্ষমা করবেন।

বান্দা তাওবা করলে আল্লাহ ﷻ খুশি হন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন–

মনে কর কোন এক ব্যক্তি (সফরের অবস্থায়) বিশ্রামের জন্য কোথাও অবতরণ করল। সেখানে প্রাণেরও ভয় ছিল। তার সাথে সফরের বাহন ছিল। বাহনের উপর তার খাদ্য ও পানীয় ছিল। সে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল এবং জেগে দেখল তার বাহনটি সেখানে নেই। তখন সে বলল, আমি যে জায়গায় ছিলাম সেখানেই ফিরে যাই। এরপর সে নিজ স্থানে ফিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর জেগে দেখল, তার বাহনটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তখন সে ব্যক্তি যে পরিমাণ খুশি হয়, আল্লাহ তার বান্দার তাওবা করার কারণে এর চেয়ে বেশি খুশি হন। [বুখারি : ৬৩০৮]

ইবনে মাসউদ رضي الله عنه বলেন, 'কোরআনে একটি আয়াত আছে। আল্লাহর কসম! এই আয়াতের পরিবর্তে আমি গোটা দুনিয়াও চাই না!'

ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করা হল, 'সে আয়াত কোনটি?'

তিনি বললেন–

> যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, যদি তোমরা সেসব বড় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিবো এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাবো।' [সূরা নিসা : ৩১]

ওলামায়ে কেরাম বলেন, কেউ যদি কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে, আল্লাহ ﷻ তার সগীরা গোনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল গোনাহ মাফ করেন। [সূরা যুমার : ৫৩]

তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তাই করতে থাকে না।

তাদেরই জন্য প্রতিদান হল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ। যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান। [সূরা আলে ইমরান: ১৩৫, ১৩৬]

ইবনুল কাইয়িম এবং ইবনে কাসির ﵏ বর্ণনা করেন, আল্লাহ যখন ইয়াহইয়া عليه السلام-র কাছে কিছু কথা অবতীর্ণ করলেন, ইয়াহইয়া আ. সেগুলো বনি ইসরাঈলের কাছে পৌঁছাতে একটু দেরি করলেন। ঈসা عليه السلام তাকে বললেন, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা আপনি পৌঁছে দিন। না হয় আমি পৌঁছাবো।'

ইয়াহইয়া عليه السلام বললেন, 'আমি পৌঁছাবো।'

ইয়াহইয়া عليه السلام বনি ইসরাঈলকে এক জায়গায় একত্র করে তাদের কাছে আল্লাহ ﷻ-র বাণী পৌঁছে দিলেন।

আল্লাহ ﷻ ইয়াহইয়া عليه السلام এর কাছে অহি নাযিল করলেন– 'ইয়াহইয়া! তোমার পদ্ধতি ঈসার চেয়ে উত্তম।'

ওলামায়ে ইয়াহইয়ার পদ্ধতি ঈসার চেয়ে উত্তম হওয়ার রহস্য উদঘাটন করে লিখেন, ঈসা عليه السلام তার সংসার ত্যাগ এবং আল্লাহ ﷻ-র সাক্ষাতের কথা অধিক স্মরণ করার কারণে সবসময় চিন্তিত থাকতেন। তার মুখে হাসি থাকত না। কিন্তু ইয়াহইয়া عليه السلام কাউকে দেখলে হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। এজন্য বনি ইসরাঈল তার প্রতি বেশি দুর্বল ছিল।

রাসূল ﷺ কোন অঞ্চলে দীনের কোন প্রচারক বা শিক্ষক-দিকদর্শক পাঠানোর সময় এই উপদেশ দিতেন–

তোমরা (দীনের ব্যাপারে) সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা অবলম্বন করবে না। মানুষকে সুসংবাদ শোনাবে, বিরক্তি সৃষ্টি করবে না। [প্রাগুক্ত]

আল্লাহ ﷻ-কে সবচে বেশি জানতেন এবং ভয় করতেন রাসূল ﷺ। রাসূল সবসময় হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন।

ইবনে সিরিন رحمه الله এর জীবনীতে উল্লেখ হয়েছে, তিনি দিনে হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। রাতে আল্লাহ ﷻ-র ভয়ে কান্না করতেন, প্রতিবেশিরা তার কান্নার আওয়ায শুনত।

ইবনে সিরিন رحمه الله। তাজিরুল আমিন। বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী। তিনি তেলের ব্যবসা করতেন। তেলের অনেকগুলো কলস ছিল। একটি কলসে ইঁদুর পড়ল। কিন্তু কোন কলসটিতে ইঁদুর পড়ল, তা নির্দিষ্ট করা গেল না। সবগুলো কলসে একলক্ষ দিরহাম মূল্যের তেল ছিল। কোন মুসলমান যেন তার তেল কিনে প্রতারিত না হয়, এজন্য ইবনে সিরিন রাহি. সবগুলো তেলের কলস ফেলে দেয়ার আদেশ করলেন!

আল্লাহ ﷻ তাকে এর প্রতিদানও দিয়েছেন। তাকে ঈমান এবং সবরের নেয়ামত দান করেছেন। তার মর্যাদা উভয় জগতে সমুচ্চ করেছেন। তাকে তাজিরুল আমিন (বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী) বলা হয়।

শুধু সালাত আর আল্লাহ ﷻ-র যিকিরই ইবাদাত নয়। এ ধরনের বিশ্বস্ত ব্যবসাও ইবাদাত। কেয়ামতের দিন অসংখ্য মানুষ সদকার উসিলায় জান্নাতে যাবে। তারা হলেন ব্যবসায়ী।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আদম সন্তান! তোমার গোনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করবো, আমি কারো পরোয়া করি না।

বান্দার গোনাহ যদি পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে যায়, পুরো শূন্যলোকে যদি গোনাহ পুঞ্জিভুত হয়ে থাকে, অতঃপর সে শিরকমুক্ত হয়ে আল্লাহ ﷻ-র কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ ﷻ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ আল্লাহ ﷻ কখনও বান্দাকে শাস্তি দিতে চান না।

আল্লাহ ﷻ চান, বান্দা তার কাছে নত থাক। বিনীত থাক। দিনশেষে সে আল্লাহ ﷻ-র কাছেই প্রত্যাবর্তন করুক।

আবু বকর ﵁ বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি গোনাহ করল, অতঃপর অযু করে দুই রাকাত সালাত পড়ল এবং ঐ গোনাহের অপরাধে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইল আল্লাহ ﷻ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।'

আলি ইবনে আবু তালেব ﵁ বলেন, "আমি এমন এক ব্যক্তি ছিলাম, যখন আমি রাসূল ﷺ থেকে কোন হাদিস শুনতাম, আল্লাহ যতটুকু চাইতেন আমি তা হতে ফয়দা উঠাতাম। যখন তার কোন সাহাবি আমার নিকট হাদিস বলতেন, আমি তাকে শপথ করাতাম। সে যখন শপথ করে বলত, আমি তাকে বিশ্বাস করতাম। আবু বকরও আমাকে হাদিস বলেছেন। তিনি সত্যই বলেছেন।'

আবু বকর বলেন, 'আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি যদি গোনাহ করে ফেলে, তারপর উঠে পবিত্রতা অর্জন করে কিছু সালাত আদায় করে আল্লাহ ﷻ-র নিকট তাওবা করে, আল্লাহ ﷻ তার গোনাহ মাফ করে দিবেন। [আহমাদ, হাদিসটি মুহাদ্দিসদের মতে সহিহ]

তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন–

> তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তাই করতে থাকে না। [সূরা আলে ইমরান : ১৩৫]

আবু বকর সিদ্দীক ﵁ থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূলের কাছে আরয করলেন, আমাকে সালাতে পাঠ করার জন্য একটি দোয়া শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, এ দোয়াটি পড়বে– (আরবী)

> اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.
>
> আল্লাহ! আমি নিজের উপর অধিক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ থেকে আমাকে তা

ক্ষমা করে দিন। এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

আবু বকর ﷺ ছিলেন প্রবাদতুল্য মানুষ। আল্লাহভীতি এবং দুনিয়াবিমুখতায় অদ্বিতীয়। আয়েশা ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন বললেন, 'তোমরা আবু বকরকে বল, সে লোকদের সাথে নিয়ে সালাত পড়ুক।' [বুখারি : ৬৬৪]

আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল! তিনি তো একজন পেরেশান ব্যক্তি। কান্নার সময় তার চোখের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যখন সালাত পড়ান, লোকেরা তার কেরাত কিছু বোঝে না!'

রাসূল আবু বকরকে উক্ত দোয়াটি বলেছিলেন। প্রত্যেক মুসলমানের দোয়াটি মুখস্থ থাকা উচিত। এই দোয়া দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং আল্লাহ ﷻ-র একত্ব ঘোষণা করবে।

ক্ষমা প্রার্থনার সাথে আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করার একটি নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ ﷻ কোরআনে তাওহিদ এবং ক্ষমা প্রার্থনার কথা একত্রে বলেছেন–

> জেনে রাখুন আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ত্রুটির জন্য। [সূরা মোহাম্মদ : ১৯]

আবু ইয়ালা ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন–

> শয়তান বলে, আমি মানুষকে গোনাহ দিয়ে ধ্বংস করি। মানুষ আমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং ইসতিগফার দিয়ে ধ্বংস করে। [আবু ইয়ালা : ১৩৪]

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমাদের ঈমান নবায়ন কর।'

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'কীভাবে হে আল্লাহর রাসূল!'

রাসূল ﷺ বললেন, 'বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ কর।'

ঈমানের নবায়ন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দ্বারা এবং তার পরিচ্ছন্নতা ইসতিগফার দ্বারা।

ইউনুস عليه السلام যখন তিন স্তরের অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেন, –সমুদ্রের অন্ধকার, মাছের পেটের অন্ধকার এবং রাতের অন্ধকার, তখন তিনি পাঠ করেছিলেন–

> তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তুমি নির্দোষ, আমি গোনাহগার। [সূরা আম্বিয়া: ৮৭]

শাদ্দাদ ইবনে আওফ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, বান্দার শ্রেষ্ঠতম ইসতিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা হল এই দোয়া পাঠ করা–

> اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ أَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

> হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। আমার প্রতি তোমার প্রদত্ত নেয়ামত স্বীকার করছি। আমার কৃত গোনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া কেউ গোনাহ ক্ষমা করতে পারবে না। [বুখারি : ৬৩০৬]

সকালে এই দোয়া দৃঢ়তার সাথে পাঠ করে সন্ধ্যার আগেই মৃত্যু বরণ করলে সে জান্নাতের অধিবাসী হয়। রাতের প্রথম বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দোয়া পাঠ করে ভোর হওয়ার আগেই মৃত্যু বরণ করে করলে সে-ও জান্নাতের অধিবাসী হয়।

শ্রেষ্ঠতম এই দোয়ায়ও ক্ষমা প্রার্থনা বা ইসতিগফারের সাথে আল্লাহ ﷻ-র একত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। কৃত অপরাধ এবং আল্লাহ ﷻ প্রদত্ত নেয়ামতের সরল স্বীকারোক্তি দিয়ে বলা হয়েছে, আমি গোনাহগার। অপরাধী। তুমি সকল সততা ও সৌন্দর্যের মালিক। তুমি আমাকে অসংখ্য নেয়ামত দিয়েছ। আমাকে সৃষ্টি করেছ। সম্মান দিয়েছ। রিযিক দিয়েছ। আমাকে ক্ষমা করে তোমার এই নেয়ামত পূর্ণ কর!

ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন, উক্ত দোয়ায় আল্লাহ ﷻ-র পথযাত্রীরা দুটি স্বীকারোক্তি নিয়ে রওয়ানা হয়েছে। আল্লাহ ﷻ-র নেয়ামত এবং আপন অপরাধ ও অপূর্ণতা!

ইমাম আহমদ ﷺ কিতাবুয যুহদে একটি হাদিস বর্ণনা করেন–

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

> আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! তোমার উপর আশ্চর্য হতে হয়! আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি, আর তুমি অন্য কারো ইবাদাত কর! আমি তোমাকে রিযিক দিচ্ছি, আর তুমি অন্য কারো কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর! তুমি নেয়ামত পেতে পছন্দ কর, অথচ আমি তোমার অমুখাপেক্ষী! তুমি আমার কাছে অপছন্দনীয় হও, অথচ তুমি আমার মুখাপেক্ষী! আমার মঙ্গল তোমার কাছে অবতরণকারী, আর তোমার পাপ-মন্দ আমার কাছে আরোহণকারী। [কানযুল উম্মাল : ৪৩১৭৪]

একটি মুসলিম জীবনের এই তো সারাংশ! একটি জীবন যখন কোরআন-সুন্নাহর নিক্তিতে ওঠে, তখন দেখা যায় আশপাশে কিছুই নেই! কোন কিছুই স্থায়ী নয়! ভুল-ত্রুটি, গোনাহ আর ব্যর্থতা ছাড়া জীবনখাতায় আর কিছুই নেই!

ওমর ﷺ বলেন, তাওবাকারীদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল! নরোম! তোমরা তাদের সাহচর্য গ্রহণ কর।

আল্লাহ ﷻ যখন কোন বান্দাকে নীত করতে চান, তার দাপট ও প্রতাপ, অহঙ্কার ঔদ্ধত্য দূর করে তাকে কোমল হৃদয়বান বানাতে চান, তখন তাকে গোনাহে নিপতীত করেন। সে গোনাহ করে। অতঃপর আল্লাহ ﷻ তাকে বুঝ দেন। সে অনুতপ্ত হয়। তার দাপট ও প্রতাপ, অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সবকিছু দূর হয়ে যায়। সে নীত হয়ে, অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ ﷻ-র কাছে হাযির হয়।

আল্লাহ ﷻ যখন কোন বান্দাকে লাঞ্ছিত করতে চান, নীচ করতে চান, তাকে তার মত ছেড়ে দেন। কুপ্রবৃত্তির কাছে তাকে ছেড়ে দেন। সে আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ধ্বংস হয়। আর এই ধ্বংসের জন্য অপরকে দুষতে থাকে। অপরকে ধ্বংসশীল বলে বেড়ায়। আবু হোরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন–

> যখন কোন ব্যক্তি বলে 'লোকটি ধ্বংস হয়েছে' তখন সে তাদের মধ্যে সবচে বেশি ধ্বংসশীল বলে পরিগণিত হয়। [মুসলিম : ২৬২৩]

অর্থাৎ, কেউ যখন বলে, মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পাপাচার বেড়ে গেছে। মানুষ আল্লাহবিমুখ হয়ে গেছে। তখন বুঝা যাবে, সে নিজেই প্রতারিত। সে তাদের মধ্যে সবচে ধ্বংসশীল বলে পরিগণিত।

অথবা সেই তাদের ধ্বংস করে। সে মানুষের কাছে এই গোনাহের কথা বলে বেড়ায়। মানুষ যখন এই গোনাহের কথা শোনে, কারো মাদক সেবন বা যিনা করার কথা শোনে, তখন সে এই কথাটি আরও বিভিন্ন মজলিসে প্রচার করে। এভাবে এই গোনাহগুলো মানুষের কাছে খুবই স্বাভাবিক হয়ে যায়। সকলে মিলে এসব করতে থাকে এবং সকলেই ধ্বংস হতে থাকে। যেহেতু তার মাধ্যমেই এই গোনাহ প্রচার পেল এবং অসংখ্য মানুষ তাতে লিপ্ত হল, এজন্য সেই তাদের মধ্যে সবচে ধ্বংসশীল বলে পরিগণিত হল। সেই মানুষকে ধ্বংস করল। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> যারা পছন্দ করে যে ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। [সূরা নূর : ১৯]

প্রজ্ঞার পরিচয় হল, মানুষ কোন মন্দ বিষয়ে পরস্পর আলোচনা না করে সংশ্লিষ্ট এমন কারো সাথে আলোচনা করা, যিনি এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

> লোক সকল! আল্লাহর কাছে ইসতিগফার কর। তাওবা কর। আমি আল্লাহর কাছে প্রতিদিন সত্তরবারের অধিক ইসতিগফার পড়ি এবং তাওবা করি। [বুখারি : ৬৩০৭]

রাসূলের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবি আগার মুযানি رضي الله عنه বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন–

> আমার অন্তরে অনেক সময় আলস্যভাব জন্মে অথবা অস্থিরতা আসে। আমি আল্লাহর নিকট দৈনিক একশ বার ইসতিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করি। [আহমাদ : ৪৭১২]

ওমর রাসূলের সাথে বসে থাকতেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে একশ বারের চেয়ে বেশি এই দোয়া পড়তে শুনেছি– রাব্বিগফিরলী ওয়াতুব আলাইয়া ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুল গাফূর। [আহমাদ : ৪৭১২]

অর্থ: 'প্রভু! আমায় ক্ষমা কর। আমার তাওবা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি তাওবা কবুলকারী।'

এই ছিল রাসূল ﷺ-র আমল। আমাদেরও উচিৎ বেশি বেশি ইসতিগফার পাঠ করা। ক্ষমা প্রার্থনা করা। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবো। তার সাথে অন্তরঙ্গ হবো। তার কাছে আমাদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতা স্বীকার করবো।

রাসূল ﷺ মদিনায় হদ (ইসলামের শাস্তি বিধান) কায়েম করতেন। কিন্তু এর দ্বারা গোনাহ নির্মূল উদ্দেশ্য ছিল না। গোনাহ আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে নির্ধারিত। যা হবার, হবেই।

রাসূলের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের জীবনপথ মসৃণ করা।

মানুষের অন্তরের আবর্জনা দূর করা।

মানুষকে এ কথা বুঝানো– আল্লাহ ﷻ ক্ষমাশীল। দয়ালু।

মানুষ আল্লাহ ﷻ-র অবাধ্য হয়ে পড়লে, কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয়ে গেলে আল্লাহ ﷻ-র রহমত থেকে যেন নিরাশ না হয়।

এক সাহাবি জনৈক মদ্যপকে বলল, 'আল্লাহ তোমাকে লাঞ্চিত করুন। রাসূলের কাছে তোমার নামে এত অভিযোগ!'

রাসূল ﷺ সাহাবিকে বললেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সহযোগী হয়ো না।' [বুখারি : ৬৭৭৭]

অপর বর্ণনায় এসেছে, 'তাকে লানত দিও না। তোমরা জান না, আল্লাহ ও তার রাসূল হয়ত তাকে ভালোবাসেন।' [বুখারি : ৬৭৮০]

রাসূলের ভালোবাসা! একজন লোক গোনাহ করার পরও তার প্রতি কত দরদ!

আল্লাহ ﷻ-র রহমত ও ভালোবাসা কত বিপুল! মানুষ বারবার গোনাহ করার পরও আল্লাহর রাসূর সেই রহমত ও ভালোবাসার সংবাদ অনবরত প্রদান করতেন।

গামেদ গোত্রের এক মহিলা এসে বলল, 'আল্লাহর রাসূল, আমি যিনা করেছি। আমাকে পবিত্র করুন।'

রাসূল ﷺ তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

মহিলা চলে গেল। কিন্তু তার অন্তর পেরেশান। গোনাহ থেকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পবিত্র হতে হবে। তিরস্কার থেকে বাঁচার জন্য পবিত্র হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

পরদিন মহিলা আবার এসে বলল, 'আল্লাহর রাসূল, আপনি কেন আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আমার মনে হচ্ছে, সম্ভবত আপনি আমাকে সেভাবেই ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন, যেভাবে আপনি মায়েযকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি অপগর্ভীতা!'

রাসূল মহিলাকে বললেন, 'তুমি এখন চলে যাও। সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

মহিলা চলে গেল। কিন্তু দৃঢ়তর ঈমান তাকে তাড়িয়ে চলল। আল্লাহর ভয় তার অন্তরকে প্রকম্পিত করে তুলল।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। মহিলা বাচ্চাটিকে এক টুকরো কাপড়ের খণ্ডে পেঁচিয়ে রাসূলের কাছে নিয়ে এসে বলল, 'এই তো সে সন্তান, যা আমি প্রসব করেছি।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'চলে যাও। বাচ্চা মায়ের দুধ ছাড়া পর্যন্ত তাকে দুধ খাওয়াতে থাক।'

মহিলা চলে গেল। বাচ্চাটি দুধছাড়া হল। মহিলা বাচ্চার হাতে একখণ্ড রুটি দিয়ে আবার রাসূলের কাছে নিয়ে এসে বলল, 'আল্লাহর নবি, এই দেখুন বাচ্চাটিকে। সে এখন দুধছাড়া হয়েছে। সে এখন খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়েছে।'

রাসূল ﷺ বাচ্চাটিকে জনৈক মুসলমানের নিকট হাওয়ালা করলেন। মহিলা সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ অনুযায়ী তার বক্ষ পরিমাণ মাটি খুঁড়ে গর্ত করা হল।

রাসূল ﷺ লোকদের আদেশ করলেন। লোকেরা আদেশ অনুযায়ী মহিলাকে পাথর নিক্ষেপ করল।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে একখণ্ড পাথর নিক্ষেপ করলেন। অমনি ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে খালিদের মুখে এসে ছিটে পড়ল। খালেদ রাগ হলেন। মহিলাকে গালি দিলেন।

রাসূল ﷺ খালিদের গালি শুনতে পেলেন। বললেন, 'থামো খালিদ! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! প্রকৃতপক্ষে সে মহিলা এমন তাওবা করেছে, যদি সত্তরজন ব্যক্তিও এমন তাওবা করে, তাকেও মাফ করে দেয়া হবে।' [মুসলিম : ১৬৯৬]

সত্তরজন দ্বারা অবাধ্য পাপী উদ্দেশ্য। সত্তরজন সাহাবি উদ্দেশ্য নয়। [মুসলিম : ১৬৯৫]

অতঃপর রাসূলের আদেশে মহিলার জানাযা পড়া হল এবং দাফন করা হল।

রাসূল ﷺ বলেন−

> আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি তাকে জান্নাতের নালাসমূহে ডুবোচুরি খেলতে দেখেছি। [আবু দাউদ : ৪৪২৮]
>
> এ যেন জান্নাতের সেই নালা, যার কথা আল্লাহ বলেছেন−
>
> তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করেনা এবং জেনে শুনে তাই করতে থাকে না।
>
> তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান। [সূরা আলে ইমরান: ১৩৫, ১৩৬]

একজন পাপীর সর্বপ্রথম করণীয়ই হল আল্লাহ ﷻ-র কাছে ফিরে আসা। আল্লাহ ﷻ-র কছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

বক্ষমান আলোচনার শুরুতে আনাস رضي الله عنه বর্ণিত হাদিসটিতে দুটি বিষয়ে প্রধানত আলোকপাত করা হয়েছে। তাওবা-ইসতিগফার এবং আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া।

তাওবা-ইসতিগফার বিষদ ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদিসোক্ত দ্বিতীয় বিষয়টি হল আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করা।

দোয়া অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ একটি এবাদত। রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'দোয়া হল সকল এবাদতের সার-মজ্জা।' [তিরমিযি : ৩৩৭১]

> 'দোয়াই হল স্বতন্ত্র একটি এবাদত।' [আহমাদ : ১৭৮৮৮]

যাদের ঈমান স্ফীত, জীবন-সমীকরণের সব বিষয়ে যারা আল্লাহ ﷻ-র দিকে ধাবিত, তারাই আল্লাহ ﷻ-র কাছে বেশি বেশি দোয়া করে।

জনৈক ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বলেন, এক সফরে আমি পরিবারসহ শূন্য-নির্জন একটি জায়গায় উপনীত হই। আমাদের সাথে কোন পানি নেই। ডানে-বাঁয়ে, আশপাশের উপত্যকায় খুঁজলাম। কোথাও পানি মিলল না।

পানি না পেয়ে পরিবারের কাছে ফিরে এলাম। আমার সন্তানরা পিপাসায় কাতরাচ্ছে! মরণের উপক্রম হয়েছে!

দিশেহারা হয়ে চিন্তা করছি— কী করবো! মনে হল, আল্লাহর হাতে আসমান-যমিনের সকল খাযানা। আল্লাহ আমাদের দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। বলেছেন—

> তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দিবো। [সূরা মুমিন : ৬০]

> বল তো, কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে ডাকে! [নামল: ৬২]

> আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে— বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। [সূরা বাকারা : ১৮৬]

পানি পাওয়ার শেষ ভরসাটুকুও আমার নেই। আমি তায়াম্মুম করলাম। দুরাকাত সালাত পড়ে আল্লাহ ﷻ-র কাছে হাত তুললাম। চোখ থেকে অশ্রু ঝরালাম। আল্লাহ ﷻ-র কাছে কাকুতি-মিনতি করলাম।

আল্লাহর কসম! দোয়া শেষ করে জায়গা থেকে উঠতে না উঠতেই আকাশে মেঘ জমল। অথচ একটু আগে এখানে এক ফোঁটা মেঘ ছিল না। মুহূর্তেই শুরু হল বৃষ্টি। উপত্যকা ভরে বৃষ্টি এল। আমরা পানি সংগ্রহ করলাম। তৃপ্তি ভরে পান করলাম। আল্লাহ ﷻ-র জন্য সকল প্রশংসা। তিনিই আমাদের পরিতৃপ্ত করেছেন।

এধরনের অসংখ্য ঘটনা কোরআন-হাদিসের পাতায় পাতায় রয়েছে।

জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি ব্যবসায় সফরে বেরুলেন। পথিমধ্যে এক অপহরণকারী তার সাথে জুটল। বলল, 'আমাকে আপনার সাথে অমুক জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যান।'

বুযুর্গ ব্যক্তি তাকে বিশ্বাস করলেন। সাথে নিয়ে নিলেন তাকে।

অপহরণকারী বুযুর্গ ব্যক্তিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিশেষ প্রয়োজনের মুখে বাধ্য করে অন্য রাস্তায় পথ ধরল। একটু দূরে নিয়ে বলল, 'তোমার সাথে যা আছে, দিয়ে দাও। না হয় তোমাকে হত্যা করবো।'

বুযুর্গ ব্যক্তি অনুনয় করে বললেন, 'আল্লাহর দোহায় দিচ্ছি। পরিবারের জন্য আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমাকে ছেড়ে দাও।'

অপহরণকারী বলল, 'আমি কসম করেছি, তোমাকে হত্যা করবো।'

বুযুর্গ ব্যক্তি বললেন, 'তাহলে আমাকে দুরাকাত সালাত পড়ার অবকাশ দাও।'

অপহরণকারী বলল, 'ঠিক আছে। খুব দ্রুত পড়ে নাও।'

বুযুর্গ ব্যক্তি অযু করে সালাতে দাঁড়ালেন। সালাতে দাঁড়িয়ে তিনি সব আয়াত ভুলে গেলেন। একটাই আয়াত তার বারবার মনে পড়ছে–

> বল তো, কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে ডাকে! [সূরা নামল: ৬২]

সালাত শেষ হতেই এক অশ্বারোহী বর্শা হাতে ছুটে এল। তীব্র আঘাত হানল অপহরণকারীর বুকের উপর। অপহরণকারী সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

বুযুর্গ অশ্বারোহীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আপনি?'

অশ্বারোহী বললেন, 'আমি নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দানকারীর পক্ষ থেকে প্রেরিত। তুমি প্রথম ডাকে আমি সপ্তম আকাশে ছিলাম। দ্বিতীয় ডাকে চতুর্থ আকাশে ছিলাম। তৃতীয়বার যখন ডেকেছ, তখন আমি এখানে।'

ইবরাহিম ﷺ নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্তি পেয়েছেন আল্লাহ ﷻ-কে ডেকে। আল্লাহ ﷻ তার জন্য আগুনকে আদেশ করেছেন–

আগুন! তুমি শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যাও। [সূরা আম্বিয়া : ৬৯]

আল্লাহ ﷻ-র আদেশে আগুন শীতল ও আরামদায়ক হয়ে গেল।

সাহিবুল হূত ইউনুস ﷺ। মাছের পেটে গিয়ে আল্লাহকে ডেকেছেন–

তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তুমি নির্দোষ, আমি গোনাহগার। [আম্বিয়া: ৮৭]

আল্লাহ ﷻ তার জন্য লাউ গাছ উৎপন্ন করলেন। তিনি মাছের পেট থেকে দুনিয়ায় এলেন।

যাদের ঈমান স্ফীত, জীবন-সমীকরণের সব বিষয়ে যারা আল্লাহ ﷻ-র দিকে ধাবিত, তারাই আল্লাহ ﷻ-র কাছে বেশি বেশি দোয়া করে।

দোয়া করার শ্রেষ্ঠ সময়

দোয়া করার শ্রেষ্ঠ সময় রাতের শেষে। সালাতের শেষে।

রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন সময় দোয়া বেশি কবুল হয়?'

রাসূল ﷺ বললেন– 'রাতের শেষে। সালাতের শেষে।' [তিরমিযি : ৩৪৯৯]

রাসূল ﷺ মুয়ায ؓ-কে বলেন, প্রত্যেক সালাতের শেষে এই দোয়া পড়তে ভুলো না–

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

আল্লাহ, তোমায় স্মরণ করতে সাহায্য কর। তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে, উত্তম এবাদতে সাহায্য কর। [আহমদ : ২১৬১৪]

দোয়া করার আরও একটি শ্রেষ্ঠ সময় সিজদা।

রাসূল ﷺ বলেন–

> আল্লাহর সবচে কাছাকাছি হয় সেজদাকারী। সুতরাং তখন বেশি বেশি দোয়া কর। [মুসলিম : ৪৮২]

অপর এক হাদিসে উল্লেখ হয়েছে–

> সেজদারত অবস্থায় অধিক দোয়া পড়ার চেষ্টা কর। কারণ তা তোমাদের দোয়া কবুল হওয়ার উপযোগী। [মুসলিম : ৪৭৯]

সেজদায় মাথা রেখে সুবাহানা রাব্বিয়াল আলা যখন পাঠ করা হবে, তখনই আল্লাহর কাছে সহজ কোন দোয়া করা বাঞ্ছনীয়।

আন্দালুসি তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন–

যখন সেজদা কর আল্লাহকে ডাক, যেমন ডেকেছেন ইউনুস।

দুনিয়াতে বেশি বেশি আল্লাহর যিকির নিজের অভ্যাস বানাও। আসমানে তুমি স্মরিত হবে।

জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমি এক বুযুর্গের কাছে বসলাম। তিনি বলছেন, 'আগূছাহ... আগূছাহ... আগূছাহ...'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আগূছাহ... আগূছাহ... অর্থ কী?'

তিনি বললেন, 'আসতাগীছু বিল্লাহ। আল্লাহ ﷻ-র কাছে ফরিয়াদ করছি। আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

> তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে শুরু করলে স্বীয় পরোয়ারদিগারের কাছে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন। [আনফাল: ০৯]

হাসান বসরি বলেন, মানুষ আজ দুনিয়াতে নিমজ্জিত। হাবুডুবু খাচ্ছে। এমন কোন পথ দরকার, যা দিয়ে মানুষ হাবুডুবু থেকে পরিত্রাণ পাবে।

কিছু যিকির, কিছু সালাত, কিছু দোয়া, কিছু ইসতিগফার আমাদের পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র পথ।

তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদের স্মরণ করবো

সালমান ফারসি ﵁ বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি–

নিশ্চয় তোমাদের রব চিরঞ্জীব, মহাদানশীল। তিনি তার বান্দার ব্যাপারে সংকোচবোধ করেন যে, বান্দা তার কাছে দুহাত তুলে প্রার্থনা করবে, আর তিনি তার দুহাত খালি ফিরিয়ে দিবেন। [আবু দাউদ : ১৪৮৮]

আল্লাহ ﷻ সম্যক অবগত। আল্লাহ ﷻ আমাদের উপযুক্ত সময়ে দোয়া করার তাওফিক দিন।

আমাকে ডাকো; সাড়া দিবো

বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লাহ ﷻ-র জন্য সকল প্রশংসা। সর্বশ্রেষ্ঠ নবির জন্য, তার পরিবার-সহচরদের জন্য সকল দুরূদ ও সালাম। মোহাম্মদ; সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম।

মানুষের জীবনে নানা ধরনের অনুষঙ্গ আছে। আছে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না। মানবজীবনের প্রতিটি অনুষঙ্গেই তার চলার সম্বল হল আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া-কান্নাকাটি। কাকুতি-মিনতি।

দোয়া একটি এবাদত। সকল এবাদতের সার-মজ্জা। এ অধ্যায়ে দোয়া প্রসঙ্গে আলোচনা হবে–

১. দোয়ার ফযিলত।

২. দোয়ার আদব।

৩. নবিদের দোয়া।

৪. সৎকর্মপরায়ণদের দোয়া।

৫. দোয়ার লাভালাভ।

দোয়া আল্লাহ ﷻ-র সাথে বান্দার সুসম্পর্কের রজ্জু। আল্লাহ ﷻ-র কাছে সৎ-হৃদয়ে দোয়া করতে পারে সেই, আল্লাহ ﷻ-র সাথে যার সতত আচরণ রয়েছে।

অধিকাংশ মানুষ বিপদে না পড়লে আল্লাহ ﷻ-কে ডাকে না। গভীর কোন সঙ্কটের মুখোমুখী না হলে দোয়া করে না।

> তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। [সূরা আনকাবূত : ৬৫]

মানুষ যখন কোন সন্ধিক্ষণের সম্মুখীন হয়, তখন আল্লাহ ﷻ ছাড়া তার কেউ নেই। ভয়াবহ বিপদে জীবন-পরিধি সঙ্কীর্ণ হয়ে এলে আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কোনও সাহায্যকারী নেই। পথনির্দেশক নেই।

ওগো আল্লাহ ﷻ আমার আশার আধার, লক্ষ-কোটি কৃপা তোমার,

আমায় রক্ষা করেছ।

অত্যাচারির নিনাদ ভারি, ধ্বংস হবো সমূল ছাড়ি;

তুমি রক্ষা করেছ।

তুমি আমায় রক্ষা করে জালিমমনে ভয়ের ভয়াল আঁধার দিয়েছ।

সুলাইমান عليه السلام দলবল নিয়ে বের হলেন। পথিমধ্যে একটি পিঁপড়া তাকে দেখে পিছু হটল। আল্লাহর কাছে হাত তুলল– সুলাইমানের পায়ে যেন পিষ্ট না হয়।

পিঁপড়াকে কে বলল– তাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ!

পিঁপড়া কীভাবে বুঝল– জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ!

কীভাবে বুঝল– সুখ-দুঃখ, সুস্থতা-নিরাপত্তার মালিক আল্লাহ!

পিঁপড়া আল্লাহর কাছে কত চমৎকার কথা বলল– 'ও চিরঞ্জীব আল্লাহ! সবকিছুর ধারক! তোমার রহমতে আমাদের সাহায্য কর।'

সুলাইমান عليه السلام পিঁপড়ার দোয়া শুনে কাঁদলেন। সহচরদের বললেন, 'চল, ফিরে যাও।'

ঈসা عليه السلام একটি গাভীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গভীটি ছিল গর্ভবতী। গাভীর পেটে বাছুরের আভাস বাইরে প্রকাশ পেয়েছে। গাভীটি আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। আল্লাহ তার যবান খুলে দিয়েছেন। গাভী বলছে, 'ও চিরঞ্জীব আল্লাহ! সবকিছুর ধারক! আমার জন্য সহজ কর।'

গাভীটি ঈসা عليه السلام-কে বলছে, 'ঈসা রূহুল্লাহ! আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া কর। আল্লাহ ﷻ যেন আমার জন্য সহজ করে দেন।'

ঈসা عليه السلام কান্না করলেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহ ﷻ গাভীর গর্ভ সহজ করে দিলেন।

মহান এক বুযুর্গ বলেন, আমি লোহিত সাগরে জাহাজে সফর করছিলাম। এডেন নগরীর কাছাকাছি পৌঁছলে মাগরিবের সময় হয়ে যায়। জাহাজ তখন সমুদ্রের মাঝখানে। আমি দাঁড়িয়ে আযান দিলাম। সেখানে সামুদ্রিক বড় একটি সাপ ছিল। আমি যখন আল্লাহু আকবার বললাম, সাপটি লাফিয়ে উঠল। সাপের অর্ধেক পানির উপর প্রকাশ পেল। যখন চুপ হলাম, সাপটি পানিতে ডুবে গেল। এভাবে আযানের একেকটি বাক্য বললাম, সাপটিও একেকবার অর্ধেক পানির উপর উঠে লাফ দিল। আমি একেকবার চুপ হলাম, সাপটিও একেকবার পানিতে ডুবে গেল।

দোয়ার আদব

এক.

আল্লাহ ﷻ-র পবিত্র নামসমূহের উসিলায় দোয়া করা। আসমাউল হুসনা উল্লেখ করে দোয়া করা।

আল্লাহ ﷻ-র কিছু নাম রয়েছে। আল্লাহ নিজেই পছন্দ করেছেন এসব নাম। হাকীম, কারীম, আলীম, হালীম, হাইউন, কাইয়ূম, যুল জালালি ওয়ালইকরাম ইত্যাদি।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাকে ডাক। আর তাদের বর্জন কর, যারা তার নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। [সূরা আরাফ : ১৮০]

আল্লাহ ﷻ-র নামগুলো সুনির্দিষ্ট। আল্লাহ ﷻ-র জন্য নতুন কোন নাম উদ্ভাবন করা যাবে না। নির্ধারিত নামগুলোর সাথে কোন বৃদ্ধিও করা যাবে না।

রাসূল ﷺ আল্লাহ ﷻ-র নামের উসিলায় দোয়া করতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন–

> আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি তোমার সে সকল নামের উসিলায়, যা দ্বারা তুমি নিজেকে অভিহিত করেছ। অথবা তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ। অথবা তুমি তোমার বান্দাদের উপর এলহাম করেছ। অথবা তুমি

গায়েবের পর্দায় তা তোমার নিকট গোপন রেখেছ। তুমি কোরআনকে আমার অন্তরের বসন্ত বানাও। কোরআনের উসিলায় চিন্তা-পেরেশানি দূর কর। [আহমাদ : ৩৭০৪]

রাসূল ﷺ বলেন–

আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে। যে তা আয়ত্ত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [বুখারি : ২৭৩৬]

হাদিসে আয়ত্ত করার তিনটি উদ্দেশ্য হতে পারে–

এক. যে তা মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

দুই. যে নামের আবদার অনুযায়ী আমল করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তিন. যে নামগুলোর অর্থ জানবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

উপরোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যই সঠিক।

দুই.

দোয়ার আগে আল্লাহর প্রশংসা করা। রাসূল ﷺ দোয়া করার আগে আল্লাহ ﷻ-র প্রশংসা করতেন। বর্ণিত হয়েছে–

হে জিবরাইল মিকাইল ইসরাফীলের প্রভু, আসমান ও যমিনসমূহের সৃষ্টিকর্তা, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ের সর্বজ্ঞাতা, আপনি আপনার বান্দাদের বিবাদমান বিষয়ে ফায়সালা করুন। আমাদের বিবাদমান বিষয়ে আপনার নির্দেশনায় হকের সন্ধান দিন। আপনিই সরল পথের দিকে পৌঁছান। [মুসলিম : ৭৭০]

তিন.

দোয়ায় অনুনয় ও আকুতি-মিনতি করা। নিরাশ না হওয়া। এ কথা না বলা– আমি দোয়া করছি, আল্লাহ ﷻ কবুল করছেন না। বরং অব্যাহত দোয়া করতে থাকা।

রাসূল ﷺ বলেন–

তোমাদের দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন, যদি তোমরা এ কথা না বল– আমি দোয়া করছি, আল্লাহ কবুল করছেন না। [বুখারি : ৬৩৪০]

আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রতিটি বিষয় পরিমিত। সময়ের ফ্রেমে নির্ধারিত। সুতরাং কারো চাহিদা অনুযায়ী সপ্তাহর মধ্যেই দোয়া কবুল হবে না। মুসা ﷺ আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করেছিলেন–

> হে আমার পরোয়ারদিগার! তুমি ফেরাউন এবং তার সর্দারদের পার্থিব জীবনের আড়ম্বর দান করেছ। সম্পদ দান করেছ। হে আমার পরোয়ারদিগার! এ জন্যই যে তারা তোমার পথ থেকে বিপথগামী করবে। হে আমার পরোয়ারদিগার! তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও। তাদের অন্তরগুলো কঠোর করে দাও। যেন তারা ততক্ষণ পর্তন্ত ঈমান না আনে, যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে নেয়। [সূরা ইউনুস : ৮৮]

বর্ণিত আছে, মুসা ﷺ-র এই দোয়া চল্লিশ বছর পর কবুল হয়েছিল।

কবি বলেন–

আল্লাহর দানে যদিও বিলম্ব হয়, তাতে লুকায়িত থাকে কোন রহস্য।

আল্লাহ দান করেন চোখের পলকে, যখন দানের দৃষ্টি হয়।

কত কষ্ট লাঘব হয় নিরাশ হওয়ার পর,

কত আশা হারায় নিরাশায় নিয়তের পর।

পবিত্র সেই ক্ষমাশীল সত্তা, ভুল করি আমরা সবসময়।

যতই আমরা ভুল করি, তিনি ক্ষমাশীল সবসময়।

অবাধ্যরে দান করেন তিনি, করেন না কভু বঞ্চিত!

অবাধ্যরে দান করেন যিনি, তুলনাহীন তার মহত্ব!

চার.

আশা-আকাঙ্ক্ষায় সীমা লঙ্ঘন না করা। শরিয়তবিরোধী কিছুর দোয়া না করা। উদাহরণত–

হে আল্লাহ, তুমি আমায় নবি বানিয়ে দাও!

আবু বকরের চেয়ে উত্তম বানিয়ে দাও! অথচ নবিদের পর আবু বকর সবচে শ্রেষ্ঠ –এ কথা শরিয়তের সিদ্ধান্ত।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফালের ছেলে দোয়া করছে– 'আল্লাহ! জান্নাতের ডান পাশে আমাকে একটি শ্বেত-শুভ্র ভবন দিও।'

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল তার দোয়া শুনলেন। ছেলেকে ডেকে বললেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি–

> শেষ যমানায় এমন একটি জাতি বেরুবে, যারা দোয়ায় এবং পবিত্রতা অর্জনে সীমালঙ্ঘন করবে। [আহমাদ : ১৬২৫৪]

তুমি এমন দোয়া না করে জান্নাত পাওয়ার দোয়া কর। জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া কর।

ইবনুল জাওযি رحمه الله বর্ণনা করেন, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি হজ্জ করতে এসে আরাফায় গমন করল। এরপর মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করে প্রথম দিনেই জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করল এবং সবার আগে খুব দ্রুত হারামে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে গিয়ে কাবার পর্দা ধরে দোয়া শুরু করল– 'তোমার কাছে মানুষের ভীড় শুরু হওয়ার আগেই আমাকে মাফ কর!'

সুবহানাল্লাহ! কী দোয়া করল লোকটি! আল্লাহ ﷻ-র কাছে মানুষের নানা অঞ্চলের ভিন্নতা নেই। মানুষের সীমাহীন চাওয়া পূরণে কোন সঙ্কীর্ণতা নেই। মানুষের অগুণতি কণ্ঠ, বৈশিষ্ট্য, প্রথা-প্রচলন, গোত্র নির্ধারণে আল্লাহ ﷻ-র কোন ভ্রম নেই।

হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

> হে আমার বান্দারা, তোমাদের আগের ও পরের মানুষ ও জ্বিন সকলে যদি এক ময়দানে সম্মিলিত হয়ে আমার কাছে চাইতে থাক এবং আমি তোমাদের প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রার্থনা অনুযায়ী দিতে থাকি, তাতে আমার কাছে যে ধনভাণ্ডার রয়েছে তা ফুরিয়ে যাবে না। বরং এতে যে পরিমাণ সম্পদ কমবে, তার পরিমাণ হবে মহাসমুদ্রে একটি সুঁই ডুবিয়ে বের করে আনার অনুরূপ। [মুসলিম : ২৫৭৭]

পাঁচ.

শ্রেষ্ঠ সময়ে দোয়া করা।

দোয়া করার শ্রেষ্ঠ সময় রাতের শেষ প্রহর। কবি বলেন–

'নিশুতি!

এই যে প্রেমবাসরের গোপন কথা, অভেদ আলাপ;

দীর্ঘ তোমার প্রহরগুলোয় এসব কী এমন বিশেষণ?' –বলো!

'যখন ভোর হয়ে এল, অবিরল ঝরবে কেবল রহমধারা,

তখন অঞ্জলি ভরে নিবেদন করো পবিত্র প্রেমের অশ্রুমালা!'

নিশুতি বলে– 'এই তো জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি!'

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

> মহামহিম আল্লাহ প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, 'কে আছে এমন যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো। কে আছে এমন যে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে তা দিবো। কে আছে এমন যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো। [বুখারি : ১১৪৫]

আল্লাহ বলেন–

> তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রা যেত। রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত। [সূরা যারিয়াত : ১৭, ১৮]
>
> (তারা) শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। [সূরা আলে ইমরান : ১৭]

দোয়া করার আরেকটি শ্রেষ্ঠ সময় সিজদা।

হাদিসে উল্লেখ হয়েছে–

> সেজদারত অবস্থায় অধিক দোয়া পড়ার চেষ্টা কর। কারণ তা তোমাদের দোয়া কবুল হওয়ার উপযোগী। [মুসলিম : ৪৭৯]

রাসূল ﷺ বলেন–

> আল্লাহর সবচে কাছাকাছি হয় সেজদাকারী। সুতরাং তখন বেশি বেশি দোয়া কর। [মুসলিম : ৪৮২]

মুহাম্মদ ইবনে জাফর সাদিক কোথাও সেজদা করলে কান্না করতেন। তার কান্নায় উপস্থিত লোকেরাও কান্না করত। তিনি কেঁদে কেঁদে বলতেন, 'তোমার মিসকিন তোমার সামনে। তোমার ফকীর তোমার সামনে।'

দোয়া করার আরেকটি শ্রেষ্ঠ সময় শুক্রবার আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত।

আবু হোরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, 'রাসূল ﷺ জুমার দিন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন–

> এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা যদি এ সময় সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট কিছু চায়, তা হলে তিনি তাকে অবশ্যই তা দান করে থাকেন এবং তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন, সে সময়টি খুবই সংক্ষিপ্ত। [বুখারি : ৯৩৫]

এ সময়টি হল আসরের পর থেকে মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়।

দোয়া করার আরও একটি শ্রেষ্ঠ সময় আরাফার দিন।

আরাফার দিনে আল্লাহ বান্দাদের দেখে ফেরেশতাদের বলেন–

> দেখ ফেরেশতারা, আমার বান্দারা কেমন আলুথালু ধূলিমলিন হয়ে পূর্বাহ্নে হাজির হয়েছে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদের মাফ করে দিলাম। [ইবনে খুজাইমা : ২৮২১]

ছয়.

কৃত্রিম সুর-ছন্দ এবং কৃত্রিম ভনিতা পরিহার করা।

দোয়া হবে অকৃত্রিম। হৃদয়োদ্গত। খাঁজমুক্ত। দুর্বোধ্যতামুক্ত।

সাত.

হাদিসে বর্ণিত সুসংক্ষিপ্ত সুসমৃদ্ধ বাক্য দ্বারা দোয়া করা। আয়েশা رضي الله عنها বলেন, রাসূল ﷺ অত্যন্ত সমৃদ্ধ বাক্যদ্বারা দোয়া করতেন।

হাদিসে বর্ণিত কিছু সুসংক্ষিপ্ত-সুসমৃদ্ধ দোয়া–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

হে পরোয়ারদিগার! আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর। আমাদের দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। [বুখারি : ৪৫২২]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করি। [আহমাদ : ৪৭৭০]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সঠিক পথনির্দেশ আল্লাহভীরুতা চারিত্রিক নির্মলতা ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। [মুসলিম : ২৭২১]

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِيْ.

হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত কর এবং সোজা রাখ। [মুসলিম : ২৭২৫]

اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ.

হে আল্লাহ! আমার অন্তরে সৎপথের সন্ধান দাও এবং আমাকে আমার মনের অপকারিতা হতে পানাহ দাও। [তিরমিযি : ৩৪৮৩]

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ.

হে আল্লাহ! অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর অবিচল রাখ। [আহমাদ : ১১৬৯৭]

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.

হে আল্লাহ! অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার এবাদত ও আনুগত্যের দিকে আবর্তিত করে দাও। [মুসলিম : ২৬৫৪]

উক্ত দোয়াসমূহ ব্যতীত হাদিসের পাতায় পাতায় আরও অসংখ্য ব্যাপক অর্থবহ সুসংক্ষিপ্ত-সুসমৃদ্ধ দোয়া রয়েছে।

আট.

নিভৃতে নিচু স্বরে দোয়া করা। আল্লাহ বলেন–

তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। [সূরা আরাফ : ৫৫]

নবিদের দোয়া

নবিগণ আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করতেন। নূহ ﷺ আল্লাহ ﷻ-র কাছে বলেছিলেন–

> হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদের এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ক্ষমা করুন এবং জালেমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। [সূরা নূহ : ২৮]

ইবরাহিম ﷺ-র অসংখ্য দোয়া কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। তিনি আমাদের জন্য দোয়া করেছেন। আমাদের এই ভূখণ্ড, সবুজ ভূখণ্ড, ফলদার ভূখণ্ড, মাঠ-ঘাঠ, দালান-অট্টালিকার জন্য তিনি দোয়া করেছেন।

বস্তুত আমাদের কী ছিল?

আমাদের এই ভূখণ্ড ছিল নির্জন। তৃণহীন। শুষ্ক।

ছিল না এই গাছপালা, বাগানবাড়ি, সবুজ শ্যামলিমা। ছিল না নির্ঝর পানির শীতল ফোয়ারা।

ইবরাহিম ﷺ আমাদের জন্য দোয়া করেছেন। ফরিয়াদ করে বলেছেন–

> হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র ঘরের কাছে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা সালাত কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদের ফলাদি দ্বারা রুযি দান করুন। সম্ভবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। [সূরা ইবরাহিম : ৩৭]
>
> হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও, হে আমার পালনকর্তা! এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া। [সূরা ইবরাহিম : ৪০]

মুসা ﷺ অত্যন্ত সাহসী এবং বীরদর্পী একজন নবি ছিলেন। ইহুদির মত জাতির জন্য তিনিই উপযুক্ত ছিলেন। ইহুদিরা ঠাণ্ডা পানিতেও তার আকৃতি

কল্পনা করত। সেই তিনি যখন তাদের সামনে থেকে একটু সড়লেন, তারা গো-বৎসের পুজা শুরু করে দিল।

আল্লাহ ﷻ তাকে ফেরাউনের কাছে পাঠালেন। তিনি আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করলেন–

> হে আল্লাহ, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। আমার কাজ সহজ করে দিন। আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। [সূরা ত্বাহা : ২৫, ২৬]

আল্লাহ ﷻ বললেন–

> মুসা, তোমাকে তোমার চাওয়া দেয়া হয়েছে। [সূরা ত্বাহা : ৩৬]

ইউনুস ﷺ-র প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। স্বজাতির সাথে রাগ হয়ে তাদের ছেড়ে চলে গেলেন। নৌকায় আরোহণ করার পর তাকে মাছে খেয়ে ফেলল। তিনি তখন চিত্তাকর্ষক কিছু বাক্য আল্লাহ ﷻ-র কাছে ফরিয়াদের ভাষায় তুলে ধরলেন– লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যলিমীন।

> তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তুমি নির্দোষ, আমি গোনাহগার। [সূরা আম্বিয়া: ৮৭]

তার কথাগুলো আল্লাহ ﷻ-র কাছে পৌঁছল। আল্লাহ ﷻ-র কাছে সকল ভালো কথা এমনই সরাসরি পৌঁছে থাকে। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তারই দিকে আরোহণ করে সৎবাক্য এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়। [সূরা ফাতির : ১০]

বর্ণিত হয়েছে, ইউনুস ﷺ যখন এই কথাগুলো বললেন, ফেরেশতারা তা শুনল। ফেরেশতারা আল্লাহ ﷻ-র কাছে কেঁদে কেঁদে বলল, 'তোমার এক চেনা বান্দার চেনা কিছু কথা! জানি না তিনি কোথায় আছেন!'

আল্লাহ ﷻ ফেরেশতাদের বললেন, আমি জানি সে কোথায় আছে।

যদি তিনি আল্লাহ ﷻ-র তাসবিহ পাঠ না করতেন–

> তবে তাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। [সূরা সাফফাত : ১৪৩, ১৪৪]

আল্লাহ ﷻ তার এই উত্তম দোয়ায় তাকে মুক্তি দিলেন।

প্রিয় নবি ﷺ। তিনিও আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করেছেন। কিন্তু তার দোয়ায় বিশেষ একটি আকর্ষণ আছে। বিশেষ একটি স্বাদ ও অনুভূতি আছে। তার দোয়াগুলো সবচে আশ্চর্যময় দোয়া। অন্তরপুচ্ছকে নিমিষেই আলোড়িত করে। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত– তিনি একবার তার খালা মাইমুনা রাযি. ঘরে রাতযাপন করেছিলেন। রাসূল ﷺ শেষ রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে দোয়া করছেন–

আল্লাহ, তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর প্রতিপালক। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি আসমান যমিন এবং এতদুভয়ের সবকিছুর নূর। তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমি সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য। জান্নাত সত্য। দোযখ সত্য। সকল নবি সত্য। মোহাম্মদ সত্য।

আল্লাহ, তোমারই জন্য আমি সমর্পিত। তোমাতেই আমি বিশ্বাস রেখেছি। তোমারই উপর ভরসা করেছি। তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করেছি। তোমারই রাহে লড়াই করেছি। তোমরাই দরবারে বিচার চেয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার পূর্বাপর ক্ষমা কর। আমার প্রকাশ্য-গোপনীয় সবকিছু ক্ষমা কর। তুমি ছাড়া গোনাহ মাফের কেউ নেই। [বুখারি : ১১২০]

আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, রাসূল শেষ রাতে সালাতে এই বলে দোয়া করতেন–

হে আল্লাহ, জিবরাঈল মিকাঈল ও ইসরাফীলের রব, আসমান ও যমিনের স্রষ্টা, প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়সমূহের জ্ঞানের অধিকারী, তোমর বান্দারা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করে তুমিই সেগুলোর ফয়সালা করবে। সত্য ও ন্যায়ের যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করা হয়েছে, সে বিষয়ে তুমি আমাকে পথ দেখাও। তুমিই তো যাকে ইচ্ছা সরল সহজ পথ দেখিয়ে থাকো। [প্রাগুক্ত]

দুটি লোক রাসূলকে হত্যার উদ্দেশে আসল। রাসূল ﷺ দোয়া করলেন, 'আল্লাহ, তুমি যেভাবে ইচ্ছা, আমার জন্য যথেষ্ঠ।'

তাদের একজন বৃদ্ধা সালুলিয়ার ঘরে উষ্ট্রপ্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছিল। অপরজনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানী একখণ্ড আগুন ভস্ম করে দিয়েছিল।

সৎকর্মপরায়ণদের দোয়া

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে; যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে। [সূরা ইউনুস : ৬২, ৬৩]

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুগণ মসজিদমুখী হন। সামনের কাতারে সালাত আদায় করেন। কোরআন তাদের নিত্যসঙ্গী। মুখে থাকে সদা আল্লাহ ﷻ-র পবিত্রতা। তারা সওম রাখেন। রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করেন। এক আল্লাহ ﷻ-র যিকির করেন। পর্দায় বসবাস করেন।

সাহাবায়ে কেরাম একটি যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। তাদের দলনেতা ছিলেন আলা হাযরামি رضي الله عنه। চলতে চলতে বাহিনী পথ ভুলে গেল।

তাদের পানি শেষ হয়ে গেল। আশপাশেও পানি পাওয়া যাচ্ছে না। বাহিনীর লোকেরা বলল, 'আমাদের দলনেতা! আল্লাহর কাছে বলুন।'

আলা ইবনে হাযরামি আল্লাহর দিকে ঝুঁকলেন। আল্লাহ ﷻ-কে ডাকলেন কায়মনোবাক্যে। ছোট্ট একটু দুয়া করলেন– 'ইয়া হাকীমু, ইয়া আযীমু, ইয়া আলীমু, ইয়া হাকীমু, ইয়া আলীমু, ইয়া আযীমু, আগিছনা। আমাদের সাহায্য করুন।'

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম! তার দোয়া শেষ হতেই একখণ্ড মেঘ ভেসে এল। মাথার উপর আকাশ ছেয়ে নিল। মুষলধারে বৃষ্টি ঝরাল। সাহাবায়ে কেরাম তৃপ্তিভরে পানি পান করলেন। অজু করলেন। তারপর মেঘখণ্ডটি উড়ে গেল!

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ ﷻ তাদের দোয়া কত দ্রুত কবুল করেন!

বারা ইবনে মালেক আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করলেই তা কবুল হত।

একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। বাহিনীর লোকেরা তাকে বলল, 'আল্লাহ ﷻ-র দোহাই দিয়ে আপনাকে বলছি! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেন আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেন।'

বারা ইবনে মালেক বললেন, 'আমাকে একটু সময় দাও।'

এ কথা বলে তিনি গোসল করলেন। কাফনের কাপড় পরে তলোয়ার হাতে নিয়ে আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করলেন, 'আল্লাহ, তোমার কসম দিচ্ছি! তুমি আমাকে প্রথম শহীদ বানাও। মুসলমানদের সাহায্য কর।'

যুদ্ধক্ষেত্রে বারা ইবনে মালেক প্রথম শহীদ হলেন। রাহিমাহুল্লাহ। মুসলমানরাও আল্লাহ ﷻ-র সাহায্যে বিজয়ী হল।

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه। রাসূল ﷺ তার জন্য দোয়া করেছিলেন, যেন তার দোয়া কবুল হয়। এরপর থেকে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস কোন দোয়া করলেই তা কবুল হত!

তিনি যখন ইরাকে দায়িত্ব পালন করছেন, তখন এক লোক তাকে পরীক্ষা করতে এল। বলল, সে সুন্দর করে সালাত পড়তে পারে না। সব বিধান পালন করতে পারে না।'

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস বদদোয়া করলেন, 'আল্লাহ, তার বয়স দীর্ঘ কর। তার দারিদ্রতা দীর্ঘ কর। তাকে ফেতনার সম্মুখীন কর।'

কয়েক বছর পর সেই লোকটি কুফার রাস্তায় রাস্তায় মানুষের কাছে ভিক্ষা করতে শুরু করল। মানুষের কাছে গিয়ে বলতে লাগল, 'আমি ফেতনায় নিপতীত একজন লোক। সাদের বদদোয়া লেগেছে আমার উপর!'

দোয়ার লাভালাভ

এক.

দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর তাওহিদের ঘোষণা হয়। যার তাওহিদ যতখানি গভীরে প্রেথিত, সে তত বেশি দোয়া করে। দোয়া আল্লাহ ﷻ-র সাথে সম্পর্কের প্রমাণ।

দুই.

দোয়া আল্লাহ ﷻ-র দাসত্বের সত্যায়ন। দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ-র কাছাকাছি পৌঁছা যায়। যে সংগোপনে আল্লাহ ﷻ-কে ডাকে, সে যেন আল্লাহ ﷻ-র দাসত্বে অটল রইল।

তিন.

দোয়া ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। যে বান্দা বেশি দোয়া করে, সে আল্লাহর বেশি নৈকট্য অর্জন করে।

কবি বলেন,

আমার চাওয়া যদি ফিরিয়েই বা দিবে,

তবে কেন শিখালে আমায় চাওয়ার ঢং!

আল্লাহ ﷻ-কে যে বেশি ভালোবাসে, সে আল্লাহ ﷻ-র কাছে বেশি দোয়া করে। সেজদাবনত হয়ে দোয়া করে। সালাত শেষে দোয়া করে। রাতের শেষে দোয়া করে। দুই আযানের মাঝে দোয়া করে।

চার.

আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্য অর্জন হয়। বান্দা যখন বেশি বেশি দোয়া করে, আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্য অনুধাবন করে। এই অনুধাবন হল নৈকট্যে সর্বোচ্চ স্তর। এহসানের স্তর। এহসান হল–

> তুমি এভাবে এবাদত কর, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। তুমি আল্লাহকে না দেখলেও আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। [বুখারি : ৫০]

পাঁচ.

আল্লাহ ﷻ-র সাথে সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়। যে বেশি দোয়া করে, তার আস্থা তত অবিচল হয়। ভরসা বৃদ্ধি পায়। যে কম দোয়া করে, আল্লাহ ﷻ-র প্রতি তার আস্থা কমে যায়। নিরাশা তাকে ঘিরে ধরে।

আসুন, বেশি বেশি দোয়া করি। ভিক্ষার হাত আল্লাহ ﷻ-র কাছে উত্তোলন করি। সাহায্য-সহযোগিতা আল্লাহর কাছেই চাই।

মিসওয়াক করে, পবিত্র হয়ে দোয়া করি। ফযিলতপূর্ণ সময়ে, ফযিলতপূর্ণ স্থানে; বাইতুল্লায়, মসজিদে, যিকিরের মজলিসে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করি। আসমাউল হুসনার দোহায় দিয়ে দোয়া করি। দোয়ায় রাসূলের উপর দরূদ পাঠ করি।

আল্লাহকে ডাকো; গোপনে, মিনতিভরে

সকল প্রশংস মহান আল্লাহর জন্য। দুরূদ ও সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসূল মোহাম্মদের জন্য; সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্লাহ ﷻ বলেন—

> তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। [সূরা আরাফ : ৫৫]
>
> আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে—বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। [সূরা বাকারা : ১৮৬]

রাসূল ﷺ বলেন—

> দোয়া একটি স্বতন্ত্র এবাদত। [প্রাগুক্ত]
>
> দোয়া সকল এবাদতের সার-মজ্জা। [প্রাগুক্ত]

এ অধ্যায়ে দোয়া প্রসঙ্গে কিছু শিরোনাম আলোচনা হবে—

১. দোয়ার প্রতি অনুপ্রেরণা।

২. কোরআনে বর্ণিত নবিদের বিভিন্ন দোয়া।

৩. হাদিসে বর্ণিত সবচে তাৎপর্যময় দোয়া।

৪. রাসূল ﷺ থেকে সহিহভাবে বর্ণিত দোয়াসমূহ।

৫. সাইয়িদুল ইসতিগফার। শ্রেষ্ঠ ইসতিগফারের বিস্তারিত বিবরণ।

৬. চিন্তা-পেরেশানি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তিপ্রার্থনা।

৭. আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া কবুল হওয়ার কিছু বিরল দৃষ্টান্ত।

৮. আল্লাহওয়ালাদের কাছে দোয়া প্রার্থনা।

৯. দোয়ায় বাড়াবাড়ি।

১০.দোয়ায় বিরক্তি, নিরাশা, ক্রমে দোয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং দোয়া ধীরে ধীরে কবুল হওয়ার রহস্য।

১১.দোয়া কবুল হওয়ার মোক্ষম সময়।

১২.দোয়া এবং ফয়সালা।

দোয়ার প্রতি অনুপ্রেরণা

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

দোয়া একটি স্বতন্ত্র এবাদত। [প্রাগুক্ত]

এই হাদিসটি আমাদের দোয়ার প্রতি অনুপ্রেরণা যোগায়।

অনেকেই দোয়ার প্রতি গুরুত্ব কম দেয়। বলে থাকে, এটি দ্বিতীয় স্তরের এবাদত। দোয়া করলেও কী, না করলেও কী! এটি স্বাভাবিক একটি বিষয়! অথচ দোয়া হল রাতের অস্ত্র! রাতের বর্শা!

জনৈক বুযুর্গকে এক জালেম বাদশাহর কাছে উপস্থিত করা হল। বাদশাহ বুযুর্গকে বলল, 'আল্লাহর কসম! তোমাকে এমনভাবে হত্যা করবো, এভাবে আর কেউ কাউকে হত্যা করেনি!'

বুযুর্গ বললেন, 'তোমার কাছে সৈন্য আছে। অস্ত্র আছে। তীর-তলোয়ার আছে। আর আমার কাছে আছে রাতের মরণাস্ত্র! রাতের বর্শা!'

বাদশাহ জিজ্ঞেস করল, 'কী তোমার রাতের অস্ত্র?'

বুযুর্গ বললেন, 'এ হল শেষ রাতের চোখের জলে ধোয়া তীক্ষ্ণ বর্শা! এ অস্ত্র হল বিনয় ও আবেগমাখা মন্ত্র! এ আবেগ ও অশ্রু আল্লাহ ﷻ-র কাছে পৌঁছে। তখন আল্লাহ ﷻ বলেন, আমার ইযযত ও মহত্ত্বের কসম! আমি কিছুক্ষণ পরে হলেও তোমার সাহায্য করবোই!'

বাদশাহ ভয় পেয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'তুমি যতক্ষণ আল্লাহ ﷻ-র আশ্রয় গ্রহণ করবে, ততক্ষণ আমি তোমাকে স্পর্শও করবো না!'

বারামেকা জাতির ইতিহাস সুবিদিত। তাদের প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য ছিল। আমোদ-প্রমোদ ছিল। খাওয়া-দাওয়া, ফুর্তি, সবই তারা করেছিল। দীর্ঘ জীবন বেঁচে ছিল। উঁচু উঁচু দালান-কোটাও নির্মাণ করেছিল। কিন্তু সবকিছুতেই তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল। এমনকি তাদের ভবনগুলোর পলেস্তরায় স্বর্ণপ্রলেপ দিয়েছিল।

বলতে বলতে তারা জুলম অত্যাচার শুরু করল। রক্তপাত শুরু করল। তখন তাদেরই একজন বুযুর্গ ও বয়স্ক ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-র কাছে হাত তুললেন–

> আল্লাহ! তুমি বারামেকা জাতিকে ধ্বংস কর!' আল্লাহ তাদের শাস্তি দিলেন। একটু অবকাশ আর দিলেন না। ভয়ানক শাস্তিতে তাদের ধ্বংস করলেন। 'আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয় তার পাকড়াও খুবই মারাত্মক। বড়ই কঠোর। [সূরা হূদ : ১০২]

তাদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বাদশাহ হারুনুর রশিদের হাতেই তাদের শাস্তি রচনা করলেন। যে আল্লাহ ﷻ-র রজ্জু বাদ দিয়ে অন্য রজ্জু ধরে, তখন অন্য রজ্জুই তার আসল রজ্জু কেটে দেয়। যে কোন বন্ধু-সাথী গ্রহণ করে আল্লাহ ﷻ-কে ভুলে যায়, তখন ঐ বন্ধুই তাকে স্খলিত করে।

বারামেকিদের সবচেয়ে প্রিয় ও বন্ধুভাবাপন্ন বাদশাহ হারুনুর রশিদ বারামেকি যুবকদের হত্যা করলেন। বৃদ্ধদের জেলে পুরলেন। ভবনগুলোয় সৈন্য জড়ো করলেন।

বারামেক গোত্রের জনৈক বৃদ্ধ, বয়সাধিক্যে তার ভ্রুযুগল চোখের উপর এসে পড়েছিল, –তাকে জিজ্ঞেস করা হল– 'কেমন আছেন?'

তিনি বললেন, 'আখেরাতবাসীদের তুলনায় আমরা মৃত নই। দুনিয়াবাসীর তুলনায় আমরা জীবিতও নই। আমি আট বছর যাবৎ বন্দী হয়ে আছি। সূর্যের আলো দেখছি না।'

জিজ্ঞেস করা হল, 'কী অপরাধে আপনাদের এ করুণ পরিণতি?'

তিনি বললেন, 'আমরা আল্লাহ ﷻ-র অবাধ্য হয়েছি। মজলুমের আর্তনাদ রাতের আঁধারকে গাঢ় করে তুলেছে। আমরা উদাসীন ছিলাম, কিন্তু আল্লাহ ﷻ উদাসীন হননি।'

দোয়ার গুরুত্ব কিছুতেই কম নয়। দোয়া দ্বিতীয় স্তরের এবাদত নয়। যাদের কাছে দোয়ার গুরুত্ব কম, তারা আহমক ছাড়া আর কী!

ইবনুল জাওযি ﷺ এক আহমকের ঘটনা উল্লেখ করেন। আহমক কোথাও সফরের উদ্যোগ নিল। তাকে বলা হল, 'আমরা তোমার জন্য দোয়া করবো?'

আহমক বলল, 'না। আমার দোয়ার দরকার নেই। গন্তব্যস্থল কাছেই!'

কতবড় আহমক! গন্তব্য কাছে হোক, দূরে হোক, আল্লাহর হেফাযত ছাড়া কোন গত্যন্তর আছে কি! আল্লাহই তো আমাদের সাহায্য ও সঙ্গ দেন সবসময়!

হাসন বসরি ﷺ। একবার কোরআনের কজন কারীর কাছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মুখোশ উন্মোচন করেছিলেন। হাজ্জাজের উপর রাগ প্রকাশ করে তাকে বকেছিলেন। হাজ্জাজের ক্ষোভ হল। হাসান বসরি ﷺ-কে তলব করে পাঠাল। তার পেয়াদারা গিয়ে হাসান বসরিকে বলল, 'হাজ্জাজ আপনাকে ডেকেছেন।'

হাসান বসরি আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করলেন। বললেন, 'আল্লাহ, হাজ্জাজকে আজ আমার বশ করে দিও।'

হাসান বসরি হাজ্জাজের কাছে পৌঁছুবামাত্র হাজ্জাজ পরিবর্তন হয়ে গেল। তার রাগ উড়ে গেল। হাসান বসরি হাজ্জাজের সামনে আসলেন, হাজ্জাজ আচমকা এক ভয়ে লজ্জায় সুগন্ধি নিয়ে হাসানকে সুগন্ধি মাখিয়ে দিল।

পেয়াদারা হাজ্জাজকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি হাসানকে কিছু করলেন না যে!'

হাজ্জাজ বলল, 'আল্লাহর কসম! তাকে দেখে আমার জীবনের সবচে বেশি ভীত ও ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম!'

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ ﷻ বলেন—

> আপনি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই। [ফুরকান : ৫৮]
>
> যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, 'তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর।' তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে আমাদের জন্য

আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী! অতঃপর ফিরে এলো মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হলো। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট। [সূরা আলে ইমরান : ১৭৩, ১৭৪]

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কি আমাদের নিকটেই রয়েছেন, আমরা তাকে চুপিসারে ডাকবো! নাকি তিনি আমাদের অনেক দূরে, আমরা তাকে সজোরে ডাকবো!'

সাহাবায়ে কেরামের উত্তরে আল্লাহ ﷻ বলেন–

আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে– বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। [সূরা বাকারা : ১৮৬]

দোয়া কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ ﷻ বান্দার উপর দুটি বিষয় অপরিহার্য করেছেন।

এক. আল্লাহ ও তার রাসূলের ডাকে সর্বাবস্থায় সাড়া দেয়া। যে আল্লাহ ও তার রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে না, আল্লাহও তার ডাকে কখনও সাড়া দিবেন না। বস্তুতঃ বান্দাই দোয়া কবুল হওয়ার পথ রুদ্ধ করেছে।

দুই. বান্দা সৎকর্মপরায়ণ হওয়া।

দোয়া কখনও কখনও বিলম্বে কবুল হয়। দোয়া কবুলে বিলম্বে হলে নিরাশ হওয়া উচিৎ নয়। দোয়া একটি এবাদত। আল্লাহ ﷻ-র নেয়ামত। দোয়া যখন বিলম্বে কবুল হয়, বান্দা তখন অব্যাহত দোয়া করে আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতেই ডুবে থাকে। আল্লাহ ﷻ-র এবাদতে মগ্ন থাকে।

জনৈক বুযুর্গ বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি চাই আমার দোয়া বিলম্বে কবুল হোক। দোয়া যত বিলম্বে কবুল হবে, আমি ততই দোয়া করতে থাকবো এবং আল্লাহকে ডাকার অমৃত অনুভব করতে থাকবো!'

মুসা ﷺ আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করেছিলেন–

হে আমার পরোয়ারদিগার! তুমি ফেরাউন এবং তার সর্দারদের পার্থিব জীবনের আড়ম্বর দান করেছ। সম্পদ দান করেছ। হে আমার

পরোয়ারদিগার! এ জন্যই যে তারা তোমার পথ থেকে বিপথগামী করবে। হে আমার পরোয়ারদিগার! তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও। তাদের অন্তরগুলো কঠোর করে দাও। যেন তারা ততক্ষণ পর্তন্ত ঈমান না আনে, যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে নেয়। [সূরা ইউনুস : ৮৮]

হারূন ﷺ তখন মুসার সাথে ছিলেন। তিনি মুসার দোয়ার সাথে সাথে বলছিলেন– আমীন। আমীন। তখন আল্লাহ ﷻ বললেন–

তোমাদের দোয়া কবুল হয়েছে। [সূরা ইউনুস : ৮৯]

তাদের এই দোয়া কবুল হতে চল্লিশ বছর বিলম্ব হয়েছিল। এতদিন তার কখনও নিরাশ হননি। নিঃস্পৃহ হননি।

ইয়াকুব ﷺ-ও ইউসুফ ﷺ-র জন্য চল্লিশ বছর কেঁদেছিলেন।

ইমাম আহমাদ ﷺ কিতাবুয যুহদ-এ বর্ণনা করেন, মুসা আলাইহিস সালাম যখন মাদয়ানে প্রবেশ করেন, পাথর সড়িয়ে পানি পান করেন, তখন একটি ছায়ায় বসে তিনি আল্লাহর কাছে কেঁদেছিলেন– 'হে রব! আমি ফকির। গরিব। অসুস্থ। উপবাসী।'

আল্লাহ ﷻ তখন অহি নাযিল করলেন, 'মুসা! যাকে আমি খাওয়াই না, সে উপবাসী। যাকে আমি সাহায্য করি না, সে গরিব। যাকে আমি সাবলম্বী করি না, সে ফকির। যাকে আমি চিকিৎসা দেই না, সে অসুস্থ।'

আমাদের জীবন পথের অন্যতম পাথেয় দোয়া। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, 'দোয়া একটি স্বতন্ত্র এবাদত।' দোয়া মানুষের ঈমানের পরিচয়। যে ব্যক্তি পাঁচ বেলা সালাতে দোয়া করে, ফজরের পর দোয়া করে, শেষ রাতে দোয়া করে, সালাতের আগে-পরে, জুমার দিনে দোয়া করে, সে ঈমানদার ব্যক্তি। তার ঈমানের পূর্ণতা আছে।

আর যে ব্যক্তি উচাটন, পাপিষ্ঠ, ভুলে হয়ত কখনও আল্লাহ ﷻ-কে ডাকে, তবে সে তার দোয়া পরিমাণই ঈমানদার। যতটুকু সে দোয়া করে, ততটুকুই তার ঈমানের শক্তি। আল্লাহ ﷻ বলেন–

তোমরা স্বীয় প্রতিপালককের ডাক কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। [সূরা আরাফ : ৫৫]

আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে, ক্রন্দরনত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে, যা চীৎকার করে বলা অপেক্ষা কম, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না। [সূরা আরাফ : ২০৫]

আল্লাহ ﷻ-র যিকির ভীত হয়ে করা উত্তম। দোয়া সংগোপনে করা উত্তম।

দোয়া সংগোপনে করার রহস্য হল–

এক.মন যেন নিবিষ্ট থাকে। বিক্ষিপ্ত না হয়।

দুই.সংগোপনে দোয়া করলে তা অত্যধিক ইখলাসপূর্ণ হয়। রিয়া-সুমআ; লৌকিকতা ও প্রচারপ্রিয়তার আশঙ্কা কম থাকে।

তিন.হিংসুকের দৃষ্টি থেকে দূরে থাকা যায়। কারণ, হিংসুক দোয়া থেকে বিমুখ করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে পারে।

আবু মুসা আশয়ারি رضي الله عنه বলেন, খায়বারের যুদ্ধসফরে আমরা একটি উপত্যকা পারি দিচ্ছিলাম। রাসূল ﷺ আমাদের সাথে ছিলেন। লোকেরা উঁচু আওয়াযে তাকবির দিচ্ছিল– আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। রাসূল বললেন, 'তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। তোমরা এমন কোন সত্তাকে ডাকছ না, যিনি বধির বা অনুপস্থিত। তোমরা ডাকছ সেই সত্তাকে, যিনি শ্রবণকারী। অতি নিকটে অবস্থানকরী। যিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন।'

আমি মনে মনে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পাঠ করছিলাম। রাসূল আমাকে বললেন, 'আবু মুসা! আমি তোমাকে জান্নাতের একটি খাযানার কথা বলবো!'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ রাসূল, বলুন।'

রাসূল ﷺ বললেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। [বুখারি : ৪২০৫]

আল্লাহ ﷻ বলেন–

আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে– বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। [সূরা বাকারা : ১৮৬]

আল্লাহ ﷻ আমাদের নিকটে রয়েছেন। এটি জ্ঞানগত। আল্লাহ ﷻ মূলত আরশে আপন শান অনুযায়ী অবস্থান করছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আপনি কি ভেবে দেখেননি, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন। এবং পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা করে, তিনি কেয়ামতের দিন তা তাদের জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। [সূরা মুজাদালা : ০৭]

আল্লাহ ﷻ দুজনের সাথে তৃতীয়জন থাকেন জ্ঞানগতভাবে। তিনি মূলত আরশে আপন শান অনুযায়ী আছেন। দোয়ারত ব্যক্তির দোয়া শুনছেন। পিঁপড়ার কৃশকায়ের অভ্যন্তরে মগযও দেকছেন। পিঁপড়ার পায়ের ছাপ দেখছেন। হাঁটার আওয়ায শুনছেন। তিমিড় কালো রাত্রিতে কালো কোন যমিনে, পৃথিবীর তলদেশে, সবখানেই তিনি পিঁপড়াকে দেখছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তার কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতীত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতীত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। [সূরা আনয়াম : ৫৯]

আল্লাহ ﷻ দোয়াকারীর প্রশংসা করেছেন। দোয়ার জন্য নবিদেরও বিশেষ প্রশংসা করেছেন–

> তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত। [সূরা আম্বিয়া : ৯০]

নবিদের দোয়া

ইবরাহিম ﷺ-র দোয়া

কোরআনে নবিদের বিভিন্ন দোয়া বর্ণিত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ দোয়া করেছেন ইবরাহিম ﷺ। নিজের সাম্ভাব্য ভুল-ক্রটির জন্যও মাফ চেয়েছেন–

> আমি আশা করি, তিনিই বিচারের দিনে আমার ক্রটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন। [সূরা শোয়ারা : ৮২]

ইবরাহিম ﷺ নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা চেয়ে আল্লাহ ﷻ-র প্রতি অগাধ সম্মানবোধ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহভীতির পরাকাষ্ঠা উপস্থাপন করেছেন। তিনি একজন নবি। তার সকল ত্রুটি এমনিতেই মাফ। তথাপি তিনি আল্লাহ ﷻ-র কাছে ক্ষমা চেয়েছেন; আল্লাহর কাছে নিজের লজ্জাবোধ প্রকাশ করেছেন। এরপর নিজের চাওয়াগুলো আল্লাহ ﷻ-র কাছে তুলে ধরেছেন—

> হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর। [সূরা শোয়ারা : ৮৩]

ইবরাহিম ﷺ মৃত্যুর সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার তাওফিক প্রার্থনা করেছেন। স্বচ্ছ দীনের উপর প্রাণত্যাগের আশা প্রকাশ করেছেন।

> আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর। আমাকে নেয়ামত উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। [সূরা শোয়ারা : ৮৪, ৮৫]

পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী হওয়ার অর্থ কী?

পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী হওয়ার অর্থ— মত্যুর পর মানুষের মাঝে ব্যক্তির ভালো ভালো গুণাবলী আলোচিত হওয়া। কবির ভাষায়—

মৃত্যুর পরেও মানুষ আলোচিত হয়।

ভালো ভালো আলোচনায় আলোচিত হও।

এক গ্রাম্য ব্যক্তি আলি رضي الله عنه এর কাছে এসে বলল, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, আমার একটি প্রয়োজন পুরণ করে দিন।’

আলি رضي الله عنه বললেন, ‘যমিনের উপর তোমার প্রয়োজনের কথা লিখ। মনুষ্যত্ব ও লজ্জার জল তোমার না থাক।’

গ্রাম্য ব্যক্তি বললেন, ‘আমি আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাইনি। লজ্জা দিতে চাইনি।’

গ্রাম্য ব্যক্তি যমিনের উপর তার প্রয়োজনের কথা লিখলেন।

আলি رضي الله عنه তাকে এক স্যুট পোষাক দিলেন।

গ্রাম্য ব্যক্তি কবিতার ভাষায় বললেন—

'আপনি আমাকে আবৃত করেছেন বস্ত্র দ্বারা।

আমি আপনাকে আবৃত করবো উত্তম প্রশংসা দ্বারা।'

আলী ﵁ বললেন– 'বেশ! তাই হোক।'

হারম ইবনে সিনান। গাতফান গোত্রের মান্যবর একজন ব্যক্তি। দীর্ঘ চল্লিশ বছর চলতে থাকা আব্স এবং যাবইয়ান গোত্রের যুদ্ধ তার হাতেই সমাপ্তির পথে আসে। তিনি উভয় গোত্রের মাঝে সন্ধি করিয়ে দেন। নিহতদের দিয়ত মওকুফ করান।

কবি যুহাইর হারম ইবনে সিনানের প্রশংসায় বলেন–

আবস-যাবইয়ানের দীর্ঘ যুদ্ধ

চূর্ণ করেছে মানশাম; অচূর্ণনীয় সুগন্ধিকাঠ।

তুমি কিনা করেছ সেই যুদ্ধেরই মিমাংসা!

একবার গাতফানের একটি গোত্র ওমর ﵁ এর কাছে এল। তাদের মধ্যে হারম ইবনে সিনানের ছেলেরাও ছিল। ওমর ﵁ হারমের ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা যুহাইরকে কী প্রতিদান দিয়েছ?'

তারা বলল, 'সে আমাদের প্রশংসা করেছে। আমরা তাকে কিছু উপঢৌকন দিয়েছি।'

ওমর বললেন, 'কসম! তোমরা যুহাইরকে যা দিয়েছ, তা নিঃশেষ হয়েছে। যুহাইর তোমাদের যা দিয়েছে, তা অবশিষ্ট রয়েছে। যুহাইর তোমাদের উত্তম প্রশংসামালা দিয়েছেন।'

পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী হওয়া, উত্তম প্রশংসামালার অধিকারী হওয়া, ভালো আলোচনায় স্মরিত থাকা প্রকৃত মুমিনদেরই ভাগ্যে জোটে। কোন পাপী যদি দুনিয়া একত্র করে নেয়, পুরো পৃথিবীকে পৃষ্ঠা বানিয়ে তাতে নিজের প্রশংসামালা ঝুলিয়ে দেয়, তবু তার প্রশংসা মানুষের অন্তরে গৃহীত হয় না।

আবু হোরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন–

> আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালোবাসলে জিবরাঈল ﵇-কে ডেকে বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। তুমিও তাকে

ভলোবাসো।' তখন জিবরাঈলও তাকে ভালোবাসেন এবং জিবরাঈল আকাশবাসীর মধ্যে ঘোষণা করেন– 'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। তোমরাও তাকে ভালোবাস।' তখন আকাশবাসী তাকে ভালোবাসতে থাকে। এরপর পৃথিবীতেও তাকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। [বুখারি : ৩২০৯]

ভালোবাসা আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে। মৃত্যুর পর মানুষের কাছে সপ্রশংস স্মরিত হওয়া আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে। পরবর্তীদের মধ্যে প্রশংসিত হওয়া মুমিনের গুণ। মুমিনের চাওয়া। আল্লাহর সাথে সতত আচরণ ও তদালোকে চরিত্র গঠনের মাধ্যমেই এই গুণ অর্জন করা সম্ভব।

নূহ عليه السلام-র দোয়া

নূহ عليه السلام আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করেছেন। খুব অল্প কথায় দোয়া করলেও তার দোয়ার তাৎপর্য ব্যাপক, প্রভাবশালী ও মর্মস্পর্শী।

নূহ عليه السلام গোত্রের লোকদের ডাকলেন। আল্লাহ ﷻ-র কথা বললেন। ধর্মের কথা বললেন। কোন কাজ হল না। গোত্র হঠধার্মিকতা দেখাল। নূহ عليه السلام আল্লাহ ﷻ-র দিকে মনোনিবেশ করলেন। দোয়া করলেন–

> হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। যদি আপনি তাদের রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী কাফের। [সূরা নূহ : ২৬, ২৭]

তার দোয়া কতটা দূরদর্শী ছিল– হে রব! তাদের সন্তানদেরও ধ্বংস করুন। সন্তানরা তাদের বাবার মতই হবে! সন্তানরাও হঠধর্মী কাফের হবে। কবির ভাষায়–

এক গোনাহের সূত্র আরেক গোনাহ থেকে, সাপের ডিমে জন্ম নেয় যে সাপেরই বাচ্চা!

মুসা عليه السلام-র দোয়া

কোরআনের দোয়াই সবচে সুন্দর ও উত্তম দোয়া। কোরআন থেকেই দোয়া সংকলন করে মুখস্থ করা উচিৎ। কোরআনে নবিদের বর্ণিত দোয়ার চেয়ে তাৎপর্যময় দোয়া আর হতে পারে না।

মুসা عليه السلام ছাগল চড়ান। লাঠি দিয়ে ছাগলের জন্য পাতা জোগাড় করেন। একদিন এক মাঠে উপস্থিত হলেন। আল্লাহর প্রত্যাদেশ জারি হল–

> ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে। [সূরা ত্বাহা: ২৪]

প্রত্যাদেশ পেয়ে মুসা عليه السلام আচমকা থমকে গেলেন। ফেরাউনের কাছে যেতে হবে! মুসার মনে একটু সঙ্কীর্ণতা এল! তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন–

> হে আল্লাহ, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। আমার কাজ সহজ করে দিন। আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। তারা আমার কথা বুঝুক। [ত্বাহা: ২৫-২৮]

মুসা عليه السلام-র এই দোয়াটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বক্ষের প্রশস্ততার জন্য আল্লাহর কাছে এর চেয়ে উত্তম ও সুন্দর বাক্য আর নেই। বক্ষ প্রশস্ততার জন্যও সকলের দোয়া করা উচিৎ। রাসূল ﷺ-র প্রতি আল্লাহ ﷻ-র অপার অনুগ্রহের অন্যতম হল, আল্লাহ ﷻ তার বক্ষ প্রশস্ত করেছেন। উদার ও উন্মুক্ত করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি! [সূরা ইনশিরাহ : ০১]

জনৈক মুফাসসির আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আপনার আশপাশ ভেবে দেখুন, ভেদগুলো খুঁজে দেখুন, নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আপনার বক্ষে সঙ্কীর্ণতা ছিল। আমি তা প্রশস্ত ও উন্মুক্ত করেছি।

বক্ষ উন্মুক্ত হওয়া, একটি উজাড় হৃদয়ের অধিকারী হওয়া বান্দার প্রতি আল্লাহর অপার নেয়ামত। একজন মুমিন জেলে বন্দী থাকলেও সে নির্বিকার। নির্ভিক। তার মন মুক্ত। উন্মুক্ত। একজন কাফের বহুতল ভবনে বাস করে, নিজ ঠিকানায় অবস্থান করে, গাড়িতে বাড়িতে ঘোরাঘুরি করে, তবু তার ভিতর সঙ্কীর্ণতা থাকে। তার উপর যেন জগতের সব লানত একত্র হয়ে আছে।

এর কারণ– আল্লাহ ﷻ নিজের একটি কর্মপন্ধতি ঘোষণা করেছেন–

> যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতীত হবে না। [সূরা ত্বাহা : ১২৩]

যে আল্লাহর বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে দুনিয়ায়-আখেরাতে কোথাও পথভ্রষ্ট হবে না। কষ্টে নিপতীত হবে না। আর যে বিপরীত করবে, তার জন্য জীবন ও জীবিকা সঙ্কীর্ণ হওয়ার ভয়াবহ সতর্কবাণী–

> এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সঙ্কীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করবো। সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুমান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল। অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাবো। [সূরা ত্বাহা: ১২৪-১২৬]

ইউনুস ﷺ-র দোয়া

রাসূল ﷺ নির্দেশিত একটি মহৎ দোয়া হল ইউনুস ﷺ-র দোয়া। রাসূল ইরশাদ করেন–

> মাছওয়ালা নবি ইউনুস ﷺ-র দোয়া হল এই; যখন তিনি মাছের পেটে থেকে দোয়া করেছিলেন–
>
> لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ
>
> তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তুমি নির্দোষ, আমি গোনাহগার।’ [সূরা আম্বিয়া : ৮৭] যে কোন মুসলমানই কোন ব্যাপারে এ দোয়া করবে, নিশ্চয়ই তার দোয়া কবুল হবে। [আহমাদ : ১৪৬৫]

এই দোয়ার তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে।

এক. আল্লাহ ﷻ-র একত্ববাদের পরিচয়।

দুই. নিজের অক্ষমতার প্রকাশ।

তিন. ইসতিগফার। গোনাহ মাফের প্রার্থনা।

কখনও বিপদে নিপতীত হলে, কোন সঙ্কটে পড়লে, চিন্তা-দুর্দশার সম্মুখীন হলে এই দোয়াটি বারবার পাঠ করা উচিৎ। এই দোয়ায় বিপদমুক্তি রয়েছে। মহাসফলতা রয়েছে।

আন্দালুসি তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন–

যখন সেজদা কর আল্লাহ ﷻ-কে ডাক, যেমন ডেকেছেন ইউনুস।

দুনিয়াতে বেশি বেশি আল্লাহ ﷻ-র যিকির নিজের অভ্যাস বানাও। আসমানে তুমি স্মরিত হবে।

ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, ইউনুস ﵇ নিজ জাতির সাথে রাগ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। নৌকাযোগে কোথাও যাচ্ছিলেন। লটারিতে যখন তার নাম উঠল, নৌকাচালক তাকে নদীতে ফেলে দিলেন। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> অতঃপর লটারি করালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। [সাফফাত: ১৪১]

ইউনুস ﵇-কে নদীতে ফেলা হল। তখন সময় ছিল রাত। অন্ধকার রাত, অন্ধকার সমুদ্র, এরই সাথে তিনি পড়লেন মাছের সামনে। মাছ তাকে গিলে ফেলল। মাছের পেটে আরও অন্ধকার!

সেখানে কে শুনবে তার আর্তনাদ! কে শুনবে তার অসহায় আওয়ায! কোন জরুরি সঙ্কেত, উপকূলীয় কোন ব্যক্তি, নৌবাহিনী, কোন কিছুতে কি ধরা পরত তার আওয়ায! না।

সেখানে তার আওয়ায শোনার মত আছেন আল্লাহ। আল্লাহ ﷻ তার আওয়ায শুনেছেন। আল্লাহ ﷻ মানুষের শাহরগের চেয়ে বেশি নিকটবর্তী।

> আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে–বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। [সূরা বাকারা : ১৮৬]

ইউনুস ﵇ আল্লাহ ﷻ-কে ডেকেছেন। হৃদয়বিদারক আহ্বানে আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করেছেন–

> তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তুমি নির্দোষ, আমি গোনাহগার। [সূরা আম্বিয়া: ৮৭]

তাওহিদের অনুসারীদের কাছে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বচন আর নেই।
ইউনুস ﵇ যখন এই কথাগুলো বললেন, আসমান বিদীর্ণ হয়ে গেল। ফেরেশতারা তা শুনল। তারা আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে বলল, 'তোমার এক চেনা বান্দার চেনা কিছু কথা! জানি না তিনি কোথায় আছেন!'

আল্লাহ ﷻ তাকে মুক্তি দিলেন। মাছের পেট থেকে বের করলেন। নাজাত দিলেন। কারণ তিনি আল্লাহমুখী হয়েছিলেন। প্রত্যেক মুসলমান কোন বিপদে পড়লে ইউনুস ﵇-র এই দোয়া মুখে মুখে পাঠ করা উচিৎ।

ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ সঙ্কটের সময় এই দোয়া পড়তেন–

> لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ
>
> আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যিনি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও অশেষ ধৈর্যশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি আরশে আযীমের প্রভু। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি আসমান-যমীনের প্রতিপালক। আরশে আযীমের মালিক। [আহমাদ : ১৪৬৫]

সুলাইমান ﵇-র দোয়া

সুলাইমান ﵇ রাজত্বের দোয়া করেছিলেন। এমন রাজত্ব চেয়েছেন, যা তার পূর্বে আর কারো ছিল না। অতঃপর তিনি জানলেন, রাজত্ব শেষ হয়ে যায়। সৈন্য-সামন্ত ধ্বংস হয়ে যায়। বাড়ি-ঘর, দালান-কোটা বিরাণ হয়ে যায়। সাথে সাথে আল্লাহ ﷻ-র কাছে বললেন–

> প্রভু, আমাকে ক্ষমা করো! [সূরা আরাফ : ১৫১]

আল্লাহ ﷻ প্রথমে তাকে রাজত্ব দিয়েছেন। সৈন্য-সামন্ত দিয়েছেন। পাখিরা সূর্যের কিরণ থেকে ছায়াদান করত। নদীতে-সাগরে অসংখ্য জিন ছিল। স্থলে সৈন্য ছিল। তিনি এত নেয়ামত পেয়ে আল্লাহ ﷻ-র কাছে সেজদায় নুয়ে পড়লেন। কাঁদলেন। বললেন,

> এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের উপকারের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত, কৃপাশীল। [সূরা নামল : ৪০]

ইউসুফ ﷺ-র দোয়া

ইউসুফ ﷺ মিসরের রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার পর শেষজীবনে আল্লাহর কাছে বলেছিলেন—

> হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতাও দান করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা! আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে। আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে স্বজনদের সাথে মিলিত করুন। [সূরা ইউসুফ : ১০১]

আল্লাহ ﷻ-র প্রেরিত একজন নবি ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করার দোয়া করেছেন! কারণ, এটিই জীবনের সুমিষ্ট লক্ষ্য। এটিই আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য। ইপ্সিত লক্ষ্য।

পাপযুক্ত জীবন এবং ইউরোপীয় সভ্যতার জীবনাচার মুসলিম ছেলে কিশোর ও যুবকদের থেকে আল্লাহর সাক্ষাতের ভয় দূর করে দিয়েছে। জীবনের একটি সুন্দর পরিসমাপ্তি, আল্লাহর প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রাপ্তির আশা মন থেকে মুছে দিয়েছে। বিপরীতে তাদের দিয়েছে এমন এক প্রবৃত্তিতাড়িত জীবন, যা দেখে বিবেকমানমাত্র ধাক্কা খেয়ে পড়ে।

এসব যুবক কি আবু বকর, ওমর, উসমান, আলি, খালেদ, সাদ ﷺ-দের উত্তরসূরীদের জীবন দেখে একটু লজ্জাবোধ করে না, যারা জয় করেছে পৃথিবী! দুনিয়ার কানে কানে যাদের কণ্ঠে উচ্চকিত হয়েছে আযানের ধ্বনি! যারা অনায়াসেই জীবন বিলিয়ে দিয়েছে তাওহিদের পতাকা উড্ডীন করার জন্য!

আজকের কিশোর-যুবকরদের সেই লজ্জাবোধ কেন নেই, যা থেকে তাড়িত হয়ে আবু বকর, ওমর, উসমান, আলি, খালেদ, সাদ ﷺ-দের উত্তরসূরীদের মত জীবনযাপন করবে!

রাসূল ﷺ থেকে সহিহভাবে বর্ণিত সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ দোয়াসমূহ

কোরআনের সবচে শ্রেষ্ঠ দোয়া হল–

﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنۡيَا حَسَنَةً وَّفِى الۡاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

> হে পরোয়ারদিগার! আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর। আমাদের দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। [সূরা বাকারা : ২০১]

পৃথিবীর এমন কোন কল্যাণকর দিক আছে, যা এই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়নি!

দুনিয়া আখেরাতের এমন কোন ন্যায়-নিষ্ঠতা, সফলতা বা রিযিকের অন্বেষ আছে, যা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়নি!

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> অনেকে বলে, হে আল্লাহ, আমাদের দুনিয়াতে দান কর। অথচ তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। [সূরা বাকারা : ২০০]

গ্রাম্য কিছু লোক রাসূলের সাথে হজ্জ করতে এসে আরাফা এবং মিনায় হাত তুলে দোয়া করত– 'আল্লাহ, আমাদের পশুর ওলান স্ফীত করে দিন। এই বছরের জন্য আমাদের বৃষ্টিভেজা ঘাস দিন। আমাদের উটের বাচ্চা দিন। আমাদের পশু, ফসল সতেজ ও সজীব রাখুন।'

তারা এই দোয়া করত না– 'আল্লাহ, আমাদের মাফ করে দিন।'

এদের বিপরীতে আরেক দল ছিল, তারা শুধু আখেরাতের জন্যই দোয়া করত। দুনিয়ার জন্য কোন দোয়া করত না। এমনকি কেউ দোয়া করে নিজের উপর অসুস্থতাও চাপিয়ে নিয়েছিল। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, জনৈক আনসার সাহাবি দোয়া করেছিলেন, 'আল্লাহ, তুমি যদি আখেরাতে আমাকে শাস্তি দাও, তবে তা দুনিয়াতেই দিয়ে দাও। তুমি আজই আমাকে সেই শাস্তি দিয়ে দাও।'

দোয়ার পর সাহাবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার প্রভাবে শীর্ণকায় হয়ে পড়েন।

রাসূল ﷺ তাকে দেখতে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কোন কিছু বলে দোয়া করেছ?'

সাহাবি বললেন, 'আমি এই দোয়া করেছি– 'আল্লাহ, তুমি যদি আখেরাতে আমাকে শাস্তি দাও, তবে তা দুনিয়াতেই দিয়ে দাও। তুমি আজই আমাকে সেই শাস্তি দিয়ে দাও।'

রাসূল বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি আল্লাহর আযাব সহ্য করতে পারবে! তুমি এই দোয়া কর–

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

> হে পরোয়ারদিগার, আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর। আমাদের দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। [সূরা বাকারা : ২০১] [মুসলিম : ২৬৮৮]

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হল–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

> হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করি। [আহমাদ : ১৭৬৯]

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه রাসূলের কাছে বললেন, 'আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন।' রাসূল ﷺ বললেন–

> বল, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা কামনা করি। শরীরের নিরাপত্তা, পরিবারের নিরাপত্তা কামনা করি। গোনাহ ও ভুল-ত্রুটি থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করি। [আহমাদ]

রাসূল ﷺ এই দোয়াটি নিয়মিত পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِيْ.

> হে আল্লাহ! আমাকে হোদায়াত কর এবং সোজা রাখ। [প্রাগুক্ত]

রাসূল ﷺ আলি رضي الله عنه-কে বলেন–

> আলি! বল– 'হে আল্লাহ, আমাকে হোদায়াত কর এবং সোজা রাখ।' যখন হেদায়াতের কথা বলবে, তখন সরল পথের কথা উল্লেখ কর। যখন

সোজা রাখার কথা বল, তখন তীরের মত সোজা রাখার কথা উল্লেখ কর। [মুসলিম : ২৭২৫]

এটি চমৎকার একটি দোয়া। সকাল-সন্ধ্যা পড়ার মত সহজ একটি দোয়া।

আরও একটি অর্থবহ দোয়া–

اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ.

হে আল্লাহ, আমার অন্তরে সৎপথের সন্ধান দাও এবং আমাকে আমার মনের অপকারিতা হতে পানাহ দাও।

রাসূল ﷺ এই দোয়াটি হুসাইন ইবনে উবাইদকে শিখিয়েছিলেন। তিনি একবার রাসূলের কাছে এলেন। রাসূল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হুসাইন, তুমি এখন কয়টি উপাস্যের এবাদত কর।'

হুসাইন বললেন, 'সাতটি উপাস্যের এবাদত করি।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'সাতটি উপাস্য কোথায়?'

হুসাইন বললেন, 'ছয়টি যমিনে, একটি আসমানে।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'ভয়ে ও আশায় তুমি কাকে ডাক?' অর্থাৎ, যখন কোন বিষয়ে সঙ্কটে নিপতীত হও, সবদিকের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, মুক্তির সকল পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে, তখন কাকে ডাক?

হুসাইন বললেন, 'আসমানের খালেককে।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'তাহলে যমিনের উপাস্যদের ছেড়ে দাও। এক আসমানের প্রভুর এবাদত কর।'

হুসাইন বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আপনি তার প্রেরিত রাসূল।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিবো, হুসাইন!'

হুসাইন বললেন, 'হ্যাঁ, শিখিয়ে দিন।'

রাসূল ﷺ তখন তাকে উক্ত দোয়াটি শিখিয়ে দিলেন। [তিরমিযি : ৩৪৮৩]

আবু বকর ؓ বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম, ‘আমাকে সালাতে পড়ার মত একটি দোয়া শিখিয়ে দিন।’

রাসূল ﷺ বললেন, এই দোয়া পড়–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

আল্লাহ! আমি নিজের উপর অধিক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ থেকে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন। এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। [বুখারি : ৮৩৪]

রাসূল ﷺ মুয়ায ؓ এর কাছে গেলেন। তার আঙ্গুলের সাথে নিজের আঙ্গুল জড়িয়ে বললেন, ‘মুয়ায, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে ভালোবাসি!’

মুয়ায বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমিও আপনাকে ভালোবাসি!’

রাসূল ﷺ বললেন, ‘মুয়ায, সালাতের পর এই দোয়া পড়তে ভুলবে না–

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

আল্লাহ! তোমার যিকির করার তাওফিক দাও। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের তাওফিক দাও। উত্তমরূপে এবাদত করার তাওফিক দাও। [আহমাদ : ২১৬১১৪]

রাসূল ﷺ তাহাজ্জুদে এই দোয়া পাঠ করতেন–

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

হে জিবরাইল মিকাইল ইসরাফীলের প্রভু! আসমান ও যমিনসমূহের সৃষ্টিকর্তা! প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ের সর্বজ্ঞাতা! আপনি আপনার বান্দাদের বিবাদমান বিষয়ে ফায়সালা করুন। আমাদের বিবাদমান বিষয়ে আপনার নির্দেশনায় হকের সন্ধান দিন। আপনিই সরল পথের দিকে পৌঁছান। [মুসলিম : ৭৭০]

সেজদায় পাঠ করার সবচে তাৎপর্যবাহী দোয়া–

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ.

হে আল্লাহ! অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর অবিচল রাখ। [আহমাদ : ১৭১৭৮]

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.

হে আল্লাহ! অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার এবাদত ও আনুগত্যের দিকে আবর্তিত করে দাও। [মুসলিম : ২৬৫৪]

এই দোয়াটিও রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

আল্লাহ! তোমার রহমতের কার্যকরিতা চাই। মাগফিরাতের দৃঢ়তা চাই। প্রত্যেক ভালো কাজের গনিমত চাই, গোনাহ থেকে নিরাপত্তা চাই। জান্নাত পেয়ে সফলতা চাই। জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই।

সাইয়িদুল ইসতিগফার; শ্রেষ্ঠ ইসতিগফার

সাইয়িদুল ইসতিগফার। সকল ইসতিগফারের শ্রেষ্ঠ ইসতিগফার। তাবাকাতুল হানাবিলায় উল্লেখ আছে, জনৈক আলেম দাফন হওয়ার পর স্বপ্নে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আল্লাহ আপনার সাথে কী আচরণ করেছেন?'

উত্তর দিলেন, 'আমাকে সাধারণ ক্ষমা করা হয়েছে। বিশেষ ক্ষমাও করা হয়েছে।'

: 'আপনি আমাদের কিছু উপদেশ দিন।'

: 'আমি তোমাদের সাইয়িদুল ইসতিগফারের উপদেশ দিচ্ছি।'

সাইয়িদুল ইসতিগফার খুবই আশ্চর্যজনক একটি দোয়া। প্রত্যেক সালাতের পর, সকাল-সন্ধ্যা সাইয়িদুল ইসতিগফার বারবার পাঠ করা অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

সাইয়িদুল ইসতিগফার নিম্নরূপ–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

হে আল্লাহ, তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নেয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গোনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও, কারণ তুমি ছাড়া কেউ গোনাহ ক্ষমা করতে পারবে না। [বুখারি : ৬৩০৬]

শ্রেষ্ঠতম এই দোয়ায় ক্ষমা প্রার্থনা বা ইসতিগফারের সাথে আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। কৃত অপরাধ এবং আল্লাহ ﷻ প্রদত্ত নেয়ামতের সরল স্বীকারোক্তি দেয়া হয়েছে।

চিন্তা-পেরেশানি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তিপ্রার্থনা

সকাল-সন্ধ্যা আমরা কিসের দোয়া করবো!

কোন কোন জিনিস থেকে আল্লাহ ﷻ-র আশ্রয় ও মুক্তি প্রার্থনা করবো!

রাসূল ﷺ অনেক কিছু থেকেই আল্লাহ ﷻ-র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। চিন্তা-পেরেশানি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তিপ্রার্থনা করতেন–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَلْعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চিন্তাভাবনা হতে পানাহ চাই। অপারগতা ও অলসতা থেকে পানাহ চাই। কৃপণতা ও কাপুরুষতা হতে পানাহ চাই। ঋণের চাপ ও মানুষের জবরদস্তি থেকে পানাহ চাই। [আবু দাউদ : ১৫৫৫]

রাসূল ﷺ কুফরি এবং দারিদ্রতা থেকেও মুক্তি প্রার্থনা করতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুফর এবং দারিদ্রতা থেকে পানাহ চাই। [আহমাদ : ১৯৮৬৮]

রাসূল ﷺ দারিদ্রতা থেকেও মুক্তিপ্রার্থনা করতেন। কারণ, দারিদ্রতা কখনও কখনও মানুষকে আল্লাহ ﷻ-র প্রতি অসন্তুষ্ট ও বিরাগভাজন করে দেয়। আল্লাহ ﷻ আমাদের হেফাযত করুন।

রাসূল ﷺ এমন ধনাঢ্যতা থেকে মুক্তিপ্রার্থনা করতেন, যা বান্দাকে আল্লাহ ﷻ-র অবাধ্য বানিয়ে ফেলে। এমন দারিদ্রতা থেকে মুক্তিপ্রার্থনা করতেন, যা বান্দাকে আল্লাহ ﷻ-র রহমত, ক্ষমাশীলতা ও মহানুভবতার কথা ভুলিয়ে দেয়। রাসূল ﷺ বলতেন–

اللَّهُمَّ إِنِّي وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করি ক্ষুধা থেকে; তা মানুষের কত খারাপ নিদ্রা-সাথি! তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি বিশ্বাসঘাতকতা থেকে; তা মানুষের কী মন্দ গোপন-চরিত! [আবু দাউদ : ১৫৪৭]

রাসূল ﷺ কবরের আযাব, দোযখের আযাব, জীবন-মৃত্যুর ফেতনা এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকেও মুক্তি প্রার্থনা করতেন। [বুখারি : ৮৩৩]

রাসূল ﷺ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দোয়া পড়তেন–

اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে বিপথগামী হওয়া ও বিপথগামী করা, উৎপীড়ন করা ও উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া থেকে মুক্তি চাই। [আহমাদ : ২৬১৮৯]

ইবনে আসাকিরের বর্ণনায় أو أطغى يطغي عليّ উল্লেখ হয়েছে।

উক্ত দোয়াটি প্রত্যেকের মুখস্থ থাকা উচিৎ। অফিসে, মাদরাসায়, স্কুলে, ক্ষেতে, বাজারে, দোকানে, যে কোন জায়গায় যাত্রাকালে এই দোয়া অবশ্যই পড়া উচিৎ।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আরও একটি দোয়া–

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর উপর ভরসা রাখছি। আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি সামর্থ্য নেই। [আবু দাউদ : ৫০৯৫]

এই দোয়া পাঠ করে কেউ ঘর থেকে বের হলে দুজন ফেরেশতা তার সঙ্গী হয়। তারা পরস্পর বলাবলি করে– যথেষ্ট। এই বান্দা নিরাপদ। শয়তানের কুচক্র থেকে মুক্ত।

রাসূল ﷺ নিম্নোক্ত দোয়াটিও পাঠ করতেন–

> اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ ، وَنَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ ، وَدُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ ، وَعِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ
>
> হে আল্লাহ! তোমার কাছে ভয়-ডরহীন অতৃপ্ত মন, আমলহীন ইলম, অগৃহীতব্য দোয়া থেকে আশ্রয় চাই। [আহমাদ : ৮২৮৩]

আল্লাহর কাছে দোয়া কবুল হওয়ার কিছু বিরল দৃষ্টান্ত

ইবরাহিম عليه السلام-র দোয়া কবুল

হাসবুনাল্লাহি ওয়ানিয়মাল ওয়াকীল। আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। [সূরা আলে ইমরান: ১৭৩]

ইবরাহিম عليه السلام-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলে তিনি শূন্যে ভাসমান থেকেই এই দোয়া পাঠ করেছিলেন। দোয়ার প্রভাবে আগুন শান্ত ও শীতল হয়ে গিয়েছিল।

রাসূল ﷺ-র দোয়া কবুল

এক.

রাসূল ﷺ-ও হাসবুনাল্লাহি ওয়ানিয়মাল ওয়াকীল –দোয়াটি পড়েছিলেন। কোরআনে এর বিবরণ এসেছে–

> যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, ‘তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর।’ তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী! ‘অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হল না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট। [সূরা আলে ইমরান: ১৭৩, ১৭৪]

কেউ যদি ঝগড়া বাধাতে চায়, ষড়যন্ত্র আঁটে, ফাঁদ পাতে, বাঁকা চোখে তেড়ে আসে, –তা অবগত হওয়ার সাথে সাথে এই দোয়া পড়া উচিৎ– 'হাসবুনাল্লাহি ওয়ানিয়মাল ওয়াকীল।' 'আল্লাহ ﷻ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।'

অনুরূপ কারো চক্রান্তের কথা অবগত হলে, জালেমের আক্রমন, কুপরিকল্পনা, কোন মন্দ লোকের বিরুদ্ধ অবস্থানের কথা অবগত হলে এই দোয়া পড়া উচিৎ– 'হাসবুনাল্লাহি ওয়ানিয়মাল ওয়াকীল।' 'আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।'

উক্ত দোয়া পড়াই এটাই উপযুক্ত সময়। ইনশাআল্লাহ, কোন বিপদ আর ছুঁতে পারবে না।

দুই.

বদর প্রান্তরের ঘটনা। বলতে গেলে মুসলিম বাহিনী রিক্তহস্তই ছিল। রাসূল ﷺ দীর্ঘ দোয়া করলেন। তার দুই কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেল। আলি رضي الله عنه বলেন, 'বদরে রাতে রাসূল ছাড়া আমি কাউকে সজাগ দেখিনি। রাসূল গাছের নিচে বসে ভোর হওয়া পর্যন্ত দোয়া করেছেন।'

আবু বকর رضي الله عنه রাসূলকে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আপনার প্রভুর কাছে এই মোনাজাত যথেষ্ট!'

রাসূল ﷺ তখনও কাকুতি মিনতি করেই চললেন। আল্লাহ ﷻ তার দোয়া কবুল করলেন। বদর প্রান্তরে মুসলমানদের সাহায্য করলেন। ইতিহাসে এমন বিরল ঘটনা দ্বিতীয়টি শোনা যায় না।

দুই.

তুফাইল ইবনে আমর রাসূলের কাছে এলেন। বললেন, 'দাওস গোত্রের যিনা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা আমারও অবাধ্য হয়েছে। তাদের ধ্বংসের জন্য দোয়া করুন।'

রাসূল ﷺ হাত তুললেন। তুফাইল বললেন, 'দাওস গোত্র ধ্বংস হোক।'

রাসূল ﷺ বললেন– 'আল্লাহ, আপনি দাওস গোত্রকে হেদায়াত করুন। তাদের ইসলামে নিয়ে আসুন। আল্লাহ, আপনি দাওস গোত্রকে হেদায়াত করুন।

তাদের ইসলামে নিয়ে আসুন। আল্লাহ, আপনি দাওস গোত্রকে হেদায়াত করুন। তাদের ইসলামে নিয়ে আসুন। [বুখারি : ২৯৩৭]

রাসূলের দোয়ায় আল্লাহ ﷻ তাদের হেদায়াত দিলেন। ইসলামে ফিরিয়ে আনলেন।

তিন.

আবু হোরায়রা رضي الله عنه রাসূলের কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার মা-কে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বকাঝকা করেছেন। আমাকে শুনিয়ে আপনাকেও গালমন্দ করেছেন। তার জন্য দোয়া করুন।'

রাসূল ﷺ দোয়া করলেন– 'আল্লাহ, আবু হোরায়রার মা-কে হেদায়াত দান করুন।'

আবু হোরায়রা رضي الله عنه বলেন– আমি রাসূলের কাছ থেকে বাড়িতে ফিরলাম। মা তখন গোসল করছিলেন। দরজার পিছনে তার গোসলের চড়চড় আওয়ায শুনলাম। তিনি কাপড় পরে বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। [মুসলিম : ২৪৯১]

চার.

আবু লাহাবের এক ছেলে রাসূল ﷺ-কে গালি দিল। কোন এক বর্ণনা মতে রাসূলের মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছিল।

রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে নালিশ করলেন। বললেন, 'আল্লাহ, তার উপর তোমার পক্ষ থেকে একটি কুকুর লেলিয়ে দাও।' [হাকিম : ৪০৩১]

রাসূলের এই নালিশের পর আবু লাহাবের ছেলে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে রওয়ানা হল। পথিমধ্যে তারা যেখানেই রাত যাপন করত, আবু লাহাবের ছেলে সবার মাঝখানে ঘুমুত।

শামের কাছাকাছি পৌঁছে কাফেলা এক জায়গায় রাত কাটাল। আবু লাহাবের ছেলে ঘুমুল সবার মাঝখানে। রাতের তখন মাঝামাঝি, কুকুরসদৃশ একটি সিংহ ঢুকে পড়ল কাফেলার ভিতর। সকলে জেগে উঠল। সিংহটি সবার মুখের কাছে

গিয়ে শুঁকে শুঁকে দেখছে। কাঙ্ক্ষিত শিকার মিলছে না। সিংহ তার নির্দিষ্ট শিকার খুঁজে চলছে। আল্লাহ ﷻ তাকে নির্দিষ্ট শিকারের জন্যই পাঠিয়েছেন।

খুঁজতে খুঁজতে আবু লাহাবের ছেলের কাছে গিয়ে থামল এবং তাকে এক লোকমায় গিলে নিল!

পাঁচ.

এক লোক এসে রাসূল ﷺ-কে গালমন্দ করল। রাসূল আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করলেন– 'আল্লাহ, আমার পক্ষে তুমিই তার জন্য যেভাবে ইচ্ছা যথেষ্ট হয়ে যাও।'

যে রাসূল ﷺ-কে গালি দিবে, তার ভাগ্যে চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী থাকতে পারে! সে ভরা মজলিসে রাসূলকে গালি দিয়েছে, আল্লাহ ﷻ তাকে চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত করবেন।

লোকটি ছাগলের দুধ দোহন করতে গেল। ঠিক তখনই ছাগলটির নাভি ফেঁটে বেরিয়ে এল এক গাদা আবর্জনা। আর এতেই সে ছাগলের পায়ের কাছে মৃত্যুবরণ করল।

ছয়.

আমের ইবনে তুফাইল এবং আরবাদ ইবনে কায়স রাসূলকে হত্যার পরিকল্পনা নিল। আমের আরবাদকে বলল, 'আমি মোহাম্মদকে তোমার ব্যাপারে অমনোযোগী করে রাখবো। যখনই অমনোযোগী করবো, অমনি তাকে মেরে ফেলবে।'

দুজন রাসূলের কাছে আসল। আমের রাসূলের সাথে কথা শুরু করল। আরবাদ রাসূলকে আঘাত করার সুযোগ খুঁজতে লাগল। কিন্তু তারা যতটা সহজ ভেবেছে, আসলেই কি অতটা সহজ! রাসূল ﷺ মানুষের হত্যার হাত থেকে নিরাপদ।

রাসূল অহির মাধ্যমে তাদের হত্যাপরিকল্পনা জানতে পারলেন। আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করলেন– 'আল্লাহ, আমার পক্ষে তুমিই তার জন্য যেভাবে ইচ্ছা যথেষ্ট হয়ে যাও।'

আমের ইবনে তুফাইলের বুকে উটের প্লেগ দেখা দিল। আমের যতই চিকিৎসা করল, অবস্থার আরও অবনতি হল। এক পর্যায়ে তার পেটেও উষ্ট্রপ্লেগ ছড়িয়ে গেল। সে তখন বলতে লাগল, 'তোমরা আমাকে ঘোড়ায় উঠিয়ে দাও। আমি উষ্ট্রপ্লেগে বনি সালুলের এক মহিলার ঘরে মৃত্যুবরণ করবো।'

এসব বলে সে আর্তনাদ করতে থাকল এবং বনি সালুলের এক মহিলার ঘরেই মৃত্যু বরণ করল।

আরবাদ ইবনে কায়স উট এবং কিছু আসবাবপত্র নিয়ে বাজারে রওয়ানা হল। বাজারের কাছাকাছি যেতেই এক বজ্রাঘাতে সব খুয়ে মারা গেল। [মাজমাউদ যাওয়াইদ : ১১০১৯]

কবি এ জাতীয় মানুষকে নিন্দার ভাষায় বলেন–

আমেরের মাকে নিয়ে গেল গাধা

না ফিরল আমেরর মা, না ফিরল গাধা!

বুযুর্গদের দোয়া কবুল

আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদেরও দোয়া কবুল হওয়ার অনেক ঘটনা আছে।

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ﵁। তিনি রাসূলের কাছে বললেন, 'আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেন আমার দোয়া কবুল করা হয়।'

রাসূল ﷺ বললেন–

يَاسَعْدُ! أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ.

> সাদ, তোমার রিযিক হালাল রেখ। তোমার দোয়া কবুল হবে। [মাজমাউদ যাওয়াইদ : ১৮১০১]

দোয়া কবুল হওয়ার জন্য রিযিক হালাল হওয়া আবশ্যক। রাসূল ﷺ এলোকেশী ধুলোমলিন এক দীর্ঘ পথের মুসাফিরের কথা উল্লেখ করে বলেন–

> সে আকাশের দিকে দুহাত তুলে দোয়া করছে– 'হে আল্লাহ! হে আল্লাহ!' অথচ তার রিযিক হারাম। পোষাক হারাম। ভরণপোষণও হারাম। কীভাবে তার দোয়া কবুল হবে! [মুসলিম : ১০১৫]

জনৈক ব্যক্তি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের উপর অপবাদ দিয়ে বলল, 'সাদ ন্যায়বিচার করে না। প্রজাদের সাথে ইনসাফ রাখে না। যুদ্ধে বেরোয় না।'

সাদ رضي الله عنه আল্লাহর কাছে বললেন, 'সে যদি মিথ্যুক হয়, তবে আল্লাহ তার বয়স দীর্ঘ করুন। তাকে ফেতনার সম্মুখীন করুন।'

আল্লাহ ﷻ সেই লোকের বয়স দীর্ঘ করলেন। বার্ধক্যে তার চোখে পর্দা পড়ে গেল। সে ফেতনারও সম্মুখীন হল। কুফার রাস্তাঘাটে সে মেয়েদের সামনে গিয়ে দাঁড়াত। আর বলত, 'আমি ফেতনায় নিপতীত এক বৃদ্ধ। সাদের বদদোয়া লেগেছে আমার উপর!'

জনৈক ব্যক্তি সাদ رضي الله عنه এর সামনে আলি رضي الله عنه-কে গালমন্দ করল। সাদ রাযি. বললেন, 'আমার ভাইকে গালমন্দ করো না।'

অতঃপর সাদ رضي الله عنه বললেন, 'আল্লাহ, আমাদের পক্ষে তুমিই তার জন্য যেভাবে ইচ্ছা যথেষ্ট হয়ে যাও।'

ঘটনাক্রমে কুফা থেকে একটা উট আসল। লোকজন ছিল উটের পিছনে। ঐ ব্যক্তি এসে উটটাকে প্রহার করল। উটটা তাকে মেরে ফেলল।

সাহাবায়ে কেরাম একটি যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। তাদের দলনেতা ছিলেন আলা হাযরামি رضي الله عنه। চলতে চলতে বাহিনী পথ ভুলে গেল।

তাদের সাথে পানি শেষ হয়ে গেল। আশপাশেও পানি পাওয়া যাচ্ছে না। বাহিনীর লোকেরা বলল, 'আমাদের দলনেতা! আল্লাহর কাছে বলুন।'

আলা ইবনে হাযরামি আল্লাহর দিকে ঝুঁকলেন। আল্লাহকে ডাকলেন কায়মনোবাক্যে। ছোট্ট একটু দোয়া করলেন– 'ইয়া হাকীমু, ইয়া আযীমু, ইয়া আলীমু, ইয়া হাকীমু, ইয়া আলীমু, ইয়া আযীমু, আগিছনা। আমাদের সাহায্য করুন।'

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম! তার দোয়া শেষ হতেই একখণ্ড মেঘ উড়ে এল। মাথার উপর আকাশ ছেয়ে নিল। মুষলধারে বৃষ্টি ঝরাল। সাহাবায়ে কেরাম তৃপ্তিভরে পানি পান করলেন। অজু করলেন। তারপর মেঘখণ্ডটি উড়ে গেল!

আলা ইবনে হাযরামি নদির পাড়ে এসে আল্লাহর কাছে বললেন, 'আমাদের জন্য সমুদ্র জমাট করে দাও।'

আল্লাহ ﷻ সমুদ্র জমাট করে দিলেন। আলা ইবনে হাযরামি দলবলসহ হেঁটে গেলেন।

সমুদ্রপথে বাহিনীর একটি ব্যাগ হারিয়ে গেল। তারা সমুদ্রপথে থাকতেই এক লোক ব্যাগটি নিয়ে এল। ব্যাগে এক ফোঁটা পানিও লাগেনি। আলা ইবনে হাযরামি ঐ লোকের কাছ থেকে ব্যাগটি বুঝে নিলেন।

উম্মে আইমান ﵂। মক্কা থেকে মদিনার পথে আল্লাহ ও রাসূলের জন্য হিজরতে বের হলেন। পথিমধ্যে পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। পানি খোঁজ করে পেলেন না। মৃত্যুর উপক্রম হলেন।

উম্মে আইমান আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আসমান থেকে একটি বালতি নেমে আসল। তিনি পান করলেন। পরিতৃপ্ত হলেন। বালতিটি আসমানে উঠে গেল।

এরপর তিনি চল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। কখনই পিপাসাকাতর হননি!

বারা ইবনে মালেক ﵁। রাসূল ﷺ তার ব্যাপারে বলেন–

> অনেক লোক এমনও আছে, যার মাথার চুল এলোমেলো। ধুলাবালি জড়িত। দুখানা পুরাতন কাপড় পরিহিত। যার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। যদি সে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে কোন বিষয়ে শপথ করে, আল্লাহ তার কসমকে পূরণ করেন। এসকল লোকের মধ্য হতে বারা ইবনে মালেক হলেন অন্যতম। [তিরমিযি : ৩৮৫৪]

বারা ইবনে মালেক আল্লাহর কাছে দোয়া করলেই তা কবুল হত।

একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। বাহিনীর লোকেরা তাকে বলল, ‘আল্লাহর দোহাই দিয়ে আপনাকে বলছি! আল্লাহর কাছে শপথ করে দোয়া করুন, যেন আল্লাহ আজ আমাদের সাহায্য করেন।’

বারা ইবনে মালেক বললেন, ‘আমাকে একটু সময় দাও।’

এ কথা বলে তিনি গোসল করলেন। কাফনের কাপড় পরে তলোয়ার হাতে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, ‘আল্লাহ, তোমার কসম দিচ্ছি! তুমি আমাকে প্রথম শহিদ বানাও। মুসলমানদের সাহায্য কর।’

যুদ্ধক্ষেত্রে বারা ইবনে মালেক প্রথম শহিদ হলেন। রাহিমাহুল্লাহ। মুসলমানরাও আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী হল।

আল্লাহওয়ালাদের কাছে দোয়া প্রার্থনা

আমরা সাধারণত একে অপরের কাছে দোয়া প্রার্থনা করি। দোয়ায় বিভিন্নজনের উসিলা ধরে থাকি। অপরকে বলি, 'ভাই, দোয়ার সময় আমাকে স্মরণ রাখবেন। ভুলবেন না যেন।' 'আপনার উসিলায় আল্লাহ ﷻ যদি এটা করেন...'

আমরা কি যে কারও কাছে এভাবে দোয়া প্রার্থনা করতে পারি!

হ্যাঁ, যে কারও কাছে এভাবে দোয়া প্রার্থনা করা যাবে। তবে দুটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে।

এক. যার কাছে দোয়া চাইবো, তিনি জীবিত থাকবেন। উপস্থিত থাকবেন।

দুই. তিনি নেককার সৎ মানুষ হবেন।

জীবিত কারও উসিলায় দোয়া প্রার্থনা করা যাবে। মৃত কারও কাছে দোয়া প্রার্থনা করা যাবে না। কারও কবরের কাছে গিয়ে এ প্রার্থনা করা যাবে না– 'আল্লাহর কাছে আমি আপনার উসিলা ধরছি।'

এভাবে বললে শিরক হবে। দুনিয়া-আখেরাত নিষ্ফল হবে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ ﷻ-র কাছে কিছুই পাওয়া যাবে না। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরিক স্থির করেন তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। [সূরা যুমার : ৬৫]

জীবিত ব্যক্তি উপস্থিতও থাকতে হবে। অনুপস্থিত কারও উসিলায় দোয়া প্রার্থনা করা যাবে না। যেমন কোন ব্যক্তি রিয়াদ বা জেদ্দায় রইল, আমি এখানে তার উসিলা ধরে দোয়া করলাম– 'আল্লাহ, ঐ ব্যক্তির উসিলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও।'

এটা জায়েয হবে না। যার উসিলা ধরা হবে, তিনি উপস্থিত থাকবেন।

যার কাছে দোয়া চাইবো, যার উসিলায় দোয়া চাইবো, তিনি নেককার মানুষ হবেন। কোন পাপাচারীর কাছে দোয়া প্রার্থনা করা যাবে না। সাম্যবাদী-কমিউনিস্ট, ধর্মত্যাগী-অবিশ্বাসী-নাস্তিকের কাছে দোয়া চাওয়া যাবে না। তাকে এ কথা বলা যাবে না- 'ভাই, দোয়ার সময় আমাকে ভুলবেন না যেন।'

সে আল্লাহর কাছে কিসের দোয়া করবে! আল্লাহর কাছে তার কিছুই তো নেই! আল্লাহ ﷻ বলেন-

> নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহঙ্কার করেছে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদের শাস্তি প্রদান করি। [সূরা আরাফ : ৪০]

আল্লাহ ﷻ-র কাছে তার কোন হক নেই। কোন দাবি নেই। অংশ নেই। গ্রহণযোগ্যতা নেই। সাফল্য, সন্তুষ্টি, বিনিময়, কিছুই নেই। তার জন্য আছে আল্লাহ ﷻ-র গযব, লানত, দূরত্ব ও ধ্বংস।

দোয়া চাইতে হবে নেককার আল্লাহওয়ালাদের কাছে। ওমর رضي الله عنه রাসূল ﷺ-র কাছে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমি ওমরার নিয়ত করেছি।'

রাসূল বললেন-

يَا أُخَيَّ لَا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ

> ভাই, তোমার দোয়ায় আমাদের ভুলো না। [আহমাদ : ১৯৬]

ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন, কেউ যখন কারও কাছে দোয়া প্রার্থনা করে, প্রার্থনাকারী মূলত দোয়াকারীর কল্যাণকামী হয়ে থাকে। দোয়াকারী যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারীর জন্য দোয়া করে, তখন দোয়াকারীকে বলা হয়, 'তোমার জন্যও অনুরূপ!'

দোয়ায় বাড়াবাড়ি

দোয়ায় অনেক সময় বাড়াবাড়ি হয়। যেমন কেউ দোয়া করল- 'হে আল্লাহ, তুমি আমায় নবি বানিয়ে দাও!'

‘আবু বকরের চেয়ে উত্তম বানিয়ে দাও!’ ‘উসমান আলির চেয়ে উত্তম বানিয়ে দাও।’

এরূপ দোয়া বৈধ নয়। সম্পূর্ণ হারাম।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফালের ছেলে দোয়া করছে– ‘আল্লাহ! জান্নাতের ডান পাশে আমাকে একটি শ্বেত-শুভ্র ভবন দিও।’

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল তার দোয়া শুনলেন। ছেলেকে ডেকে বললেন, “আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ‘শেষ যমানায় এমন একটি জাতি বেরুবে, যারা দোয়ায় এবং পবিত্রতা অর্জনে সীমালঙ্ঘন করবে।’ তুমি এমন দোয়া না করে জান্নাত পাওয়ার দোয়া কর। জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া কর।” [আহমাদ : ১৬৩৫৪]

দোয়ায় বাড়াবাড়ির আরেকটি রূপ হল কৃত্রিম সুর-ছন্দে এবং ভনিতায় দোয়া করা।

দোয়ায় বিরক্তি, নিরাশা, ক্রমে দোয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং দোয়া ধীরে ধীরে কবুল হওয়ার রহস্য

রাসূল ﷺ বলেন–

> তোমাদের দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন, যদি তোমরা এ কথা না বল– ‘আমি দোয়া করছি, আল্লাহ কবুল করছেন না। [বুখারি : ৬৩৪০]

আল্লাহ ﷻ দ্রুত দোয়া কবুল করেন না। বান্দাকে দোয়ায় অব্যাহত রাখতে চান। আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রতিটি বিষয় সমাধা হওয়ার জন্য সময় নির্দিষ্ট আছে। আল্লাহ ﷻ নির্দিষ্ট সময়ে পরিমিতভাবে সকল বিষয় সমাধা করেন। সুতরাং দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করা উচিৎ নয়।

কখনও কখনও দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতে দোয়াটি বেশি লাভজনক হয়। দোয়ার উসিলায় বিভিন্ন অনিষ্টও দূর করা হয়। বর্তমান সঙ্কটের চেয়ে দ্বিগুণ সঙ্কট দূর করা হয়।

কখনও আবার আল্লাহ ﷻ এই দোয়ার সাওয়াব সংরক্ষিত রাখেন। কিছু বিলম্বে দোয়ার প্রতিফলন ঘটান। সুতরাং দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া উচিৎ নয়। নিরাশ হওয়া উচিৎ নয়। বরং দোয়া অব্যাহত রাখা চাই। আল্লাহ ﷻ-র রহমত থেকে অবিশ্বাসীরাই নিরাশ হয়!

দোয়া কবুল হওয়ার মোক্ষম সময়

সালাতের পর দোয়া কবুল হয়। ফরয সালাত শেষে দোয়া কবুল হওয়ার অত্যন্ত উপযুক্ত সময়। তখন, বিশেষত তাশাহুদের পর সালাম ফিরানোর আগে আল্লাহ ﷻ-র কাছে সহজে যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করা যায় ...

সালাম ফিরানোর পর সাথে সাথে হাত তুলে দোয়া করা সুন্নত নয়। রাসূল এমনটি করেননি। সাহাবায়ে কেরামও করেননি।

দুই আযানের এবং আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া কবুল হয়। ইমাম নাসাঈ রাহি. বলেন, আযান হলে বেশি বেশি দোয়া কর। আল্লাহ ﷻ-র কাছে চাও। আল্লাহ ﷻ সাড়া দিবেন। যা কিছু চাও, আল্লাহ কবুল করবেন।

সেজদায় দোয়া কবুল হয়। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

> আল্লাহর সবচে কাছাকাছি হয় সেজদাকারী। সুতরাং তখন বেশি বেশি দোয়া কর। [মুসলিম : ৪৮২]

সেজদায় সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পাঠ করার পর আল্লাহ ﷻ দোয়া কবুল করেন। এই সময়ের দোয়া কবুল হওয়ার বেশি কাছাকাছি।

রাতের শেষভাগে দোয়া কবুল হয়। রাসূল ﷺ বলেন–

> মহামহিম আল্লাহ প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, 'কে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো। কে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে তা দিবো। কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো। [বুখারি : ১১৪৫]

জুমার দিন আসরের পর দোয়া কবুল হয়। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে– এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা যদি এ সময় সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ ﷻ-র নিকট কিছু চায়, তা হলে তিনি তাকে অবশ্যই তা দান

করে থাকেন এবং তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন, সে সময়টি খুবই সংক্ষিপ্ত।'

এ সময়টি হল আসরের পর থেকে মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়।

দোয়া কবুল হওয়ার আরও একটি শ্রেষ্ঠ সময় আরাফার দিন।

দোয়া এবং ফয়সালা

দোয়া এবং ফয়সালা পরস্পর বিরোধী নয়। বান্দা অনেক সময় বলে, 'দোয়া করে কী লাভ! আমার ভাগ্যে এটিই আছে!'

বিষয়টি এমন নয়। দোয়া এবং ফয়সালা পরস্পর বিরোধী নয়। আল্লাহ ﷻ মানুষের ভাগ্য এভাবে লিখেন–

তোমার জন্য এটা ফয়সালা। তবে তুমি দোয়া করলে তা পরিবর্তন করা হবে।

তোমার জন্য এই বিপদের ফয়সালা। তবে তুমি দোয়া করলে তা দূর করা হবে।

ভাগ্যে লিখা থাকে– তোমার ছেলে অকৃতকার্য হবে। তুমি দোয়া করবে, আল্লাহ ﷻ তাকে নাজাত দিবেন। সফলতা দিবেন। সুতরাং এ কথা বলা যাবে না, ছেলের জন্য দোয়া করে কী হবে, ছেলের ভাগ্যে যদি অকৃতকার্যতা লেখা থাকে!

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে– দোয়া এবং ফয়সালা আসমান-যমিনের মাঝে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

দোয়া চায় ফয়সালা পরিবর্তন হোক। ফয়সালা চায় তদানুরূপ সংঘটিত হোক। তখন আল্লাহ ﷻ ফায়াসালার উপর দোয়ার পাধান্য দান করেন।

দোয়া করা উচিৎ সবসময়। সর্বাবস্থায়। আশাবাদী হয়ে। দোয়া ফয়সালার বিপরীত নয়। দোয়ার মাধ্যমে আরেকটি ফয়সালা লিখা হয়। অন্তত পূর্বেকার ফয়সালা শিথিল হয়। সহজ হয়। সাওয়াব পাওয়া যায়।

> হে পরোয়ারদিগার! আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর। আমাদের দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। [সূরা বাকারা : ২০১]

সবর করুন; সফল হোন

কল্যাণময় আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র। অনুসন্ধানপ্রিয় ও কৃতজ্ঞতাপ্রিয় বান্দাদের জন্য পরিবর্তনশীলরূপে সৃষ্টি করেছেন দিন ও রাত।

পরম কল্যাণময় আল্লাহ, যিনি বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন ফয়সালার গ্রন্থ, যেন সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়। আল্লাহ এমন সত্তা, যার রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তার কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে।

হে কল্যাণময় আল্লাহ! আমাদের সকল ভালো কথার চেয়ে উত্তম প্রশংসা তোমার জন্য। আমাদের ভালো কথার অনুরূপ, বরং তারও উর্ধ্বের প্রশংসা তোমার জন্য। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমাদের ঈমানের প্রশংসা তোমার জন্য। ইসলামের প্রশংসা তোমার জন্য। মোহাম্মদ ﷺ-কে পাঠানোর প্রশংসা তোমার জন্য। তোমার মর্যাদা দুর্মূল্য। তোমার প্রশংসা সমুচ্চ। তোমার নামগুলো পবিত্র। তুমি সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত প্রশংসা করছি। সন্তুষ্ট হওয়াকালীন প্রশংসা করছি। সন্তুষ্ট হওয়ার পরও প্রশংসা করছি।

হে আল্লাহ, হেদায়াত ও রহমতের নবি মোহাম্মদের উপর দুরূদ ও সালাত প্রেরণ কর। জগদ্বাসীর কাছে তিনি সর্বোত্তম কথিকায় অহি পৌঁছিয়েছেন। হৃদয়ছোঁয়া ভঙ্গিমায় তিনি অহি নিংড়ানো কল্যাণের প্রচার করেছেন। তার উপর, তার পরিবার-সহচরের উপর দুরূদ ও সালাম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সবর ও ধৈর্য মুমিনের অন্তর্নিহিত গভীর তাওহিদের পরিচয়। সৃষ্টিগত স্বভাব-প্রকৃতির জীবনদান। আল্লাহ ﷻ বলেন–

মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে, –এভাবে যে তাকে পরীক্ষা করবো। অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। [সূরা দাহর : ১, ২]

আহলুসসুন্নাহ ওয়ালজামায়াতের দৃষ্টিতে ধৈর্য আল্লাহর দাসত্বের সম্মানজনক একটি স্তর। উল্লেখযোগ্য স্তর। আল্লাহ কোরআনে নব্বই বার ধৈর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কোথাও ধৈর্যের প্রশংসা করেছেন। কোথাও ধৈর্যধারণকারীর প্রশংসা করেছেন। আল্লাহর কাছে ধৈর্যধারণকারীর প্রতিদানের কথা বলেছেন। অধৈর্যের নিন্দাও জানিয়েছেন।

সবরের তিন স্তর

ইসলামে সবর ও ধৈর্যের তিনটি স্তর রয়েছে–

এক. আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ।

দুই. অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার ধৈর্যধারণ।

তিন. তাকদির ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ।

আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্য প্রকাশে ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। বিনীত ও সুস্থিরভাবে পরিপূর্ণ আনুগত্যের জন্য মনকে ধৈর্যের পথে টানতে হয়। এটি হল সর্বোত্তম ধৈর্য। আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যে ধৈর্য।

মন মানুষকে মন্দের আহ্বান করে। খামখেয়ালির পথে তাড়িয়ে নেয়। তখন ধৈর্যধারণ করতে হয়। এই হল গোনাহ ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার ধৈর্য।

আল্লাহ ﷻ মানুষের নিয়তি নির্ধারণ করে রেখেছেন। অদৃষ্টে যা রেখেছেন, তা আমার মর্যাদা বাড়াতে পারে। ভুলত্রুটি কমাতে পারে। তাই নিয়তির উপর বিরক্ত না হওয়া চাই। এ ক্ষেত্রেও ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়, তাকদীরের উপর ধৈর্য।

আল্লাহ ﷻ-র নেককার বান্দারা নানা ধরণের বিপদের সম্মুখীন হতেন। তখন তারা ধৈর্যধারণ করতেন। তাদের সেসব ঘটনাপঞ্জি থেকে সবর ও একিনের স্বরূপ নিরুপণ করা যায়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল– 'দীনের ইমামাত বা নেতৃত্ব কীভাবে অর্জন করা যায়?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'সবর ও একিন, ধৈর্য ও আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে। আল্লাহর এই বাণী শুনুন–

> তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম। যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে অগাধ বিশ্বাসী ছিল। [সূরা সাজদা : ২৪]

আল্লাহ ﷻ-র নেককার বান্দারা বিভিন্ন বিপদে পরীক্ষার সম্মুখীন হতেন। আল্লাহ ﷻ কাউকে সম্পদ দিয়ে তা নিঃশেষ করে দেন। কোন মুসিবতে আক্রান্ত করে হতবাক ও বিবেকশূন্য করে রাখেন।

কারো শরীর রোগাক্রান্ত করে কোন এক অঙ্গা বা ইন্দ্র বিকল করে ফেলেন। সন্তান-পরিজন দিয়ে পরীক্ষা করেন। সন্তানকে পথহারা করেন। মৃত্যু দেন। নিখোঁজ রাখেন। কারো উপর অলিক অযৌক্তিক কোন অপবাদ চাপিয়ে দেন। আল্লাহর নেককার বান্দারা যে কোন বিপদে ধৈর্যধারণ করেন। সবরের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

আল্লাহ ﷻ সবরকারীদের কথা কোরআনে উল্লেখ করেছেন। তাদের প্রশংসাসহ আয়াত নাযিল করেছেন–

> হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের– যারা বিপদে পতীত হয়ে বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সেসব লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে। এবং এসব লোকই হেদায়াতপ্রাপ্ত। [সূরা বাকারা : ১৫৩-১৫৭]

সবরের পরিচয়

সবরের সংজ্ঞায় ও স্বরূপ নির্ণয়ে বহুধা মতামত রয়েছে।

কেউ আমার শরীর কেটে ফেললেও তা আল্লাহর ফয়সালা এবং নিয়তির লেখা হিসেবে কর্তনকালে তৃপ্তির সাথে হাস্যোজ্জ্বল থাকার নাম সবর।

আল্লাহ ﷻ আমার জন্য যা পছন্দ করেছেন, তা আমার পছন্দ হওয়া এবং আল্লাহ ﷻ যা বেশি পছন্দ করেছেন, তা আমার বেশি পছন্দনীয় থাকার নাম সবর—

হিংসুটেরা যাই বলে তাই হয় যদি গো গোপনভেদ,

কষ্ট তবে তুষ্টি তোমার কান্না-হাসির কী ভেদাভেদ!

স্বাভাবিক প্রাপ্তি অর্জন না হয়ে যা অর্জন হয়েছে, তাই শ্রেষ্ঠ প্রতিদান হিসেবে মেনে নেয়ার নাম সবর।

সবরের সংজ্ঞা যাই হোক, আল্লাহ সবরকারীদের ব্যাপারে বলেন—

> যারা সবরকারী, তারাই পুরস্কার পায় অগুণতি। [সূরা যুমার : ১০]
>
> হে ঈমানদাররা! ধৈর্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার। [সূরা আলে ইমরান : ২০০]

আল্লাহ ﷻ বান্দাকে পরীক্ষা করেন। এটি আল্লাহ ﷻ-র কর্মপদ্ধতি।

চারটি উদ্দেশ্যে আল্লাহ বান্দার পরীক্ষা নিয়ে থাকেন—

এক.

মর্যাদাদান। আল্লাহ ﷻ পরীক্ষা দ্বারা দুনিয়ায়-আখেরাতে বান্দার মর্যাদা উঁচু করেন। পরীক্ষিত বান্দারা আল্লাহ ﷻ-র কাছে বেশি মর্যাদাশীল। তারা জীবনের প্রথম ধাপেই পরীক্ষার সম্মুখীন হন। যদি সবর করেন, আল্লাহ ﷻ তাদের মর্যাদা উঁচু করে দেন। চিরকাল তাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে।

দুই.

প্রতিপালন। আল্লাহ ﷻ পরীক্ষা দ্বারা বান্দার অন্তর প্রতিপালন করেন। আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠ ও সত্য-সমর্পিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ ﷻ বান্দা থেকে এই পরীক্ষা নিয়ে থাকেন।

তিন.

দাসত্ব নিশ্চিতকরণ। আল্লাহ ﷻ বান্দাদের সতত-বান্দারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। দাবি-দাওয়া, যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে নিজেকে আল্লাহ ﷻ প্রকৃত বান্দারূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। অনেকেই নিজেকে আল্লাহ ﷻ-র সমর্পিত বান্দা হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে প্রকৃত পরিচয় ফুটে ওঠে। তখন আল্লাহর লিখন থেকে পার্শ্ব ফিরিয়ে পলায়ন করতে চায়। দুনিয়ায়-আখেরাতে এ এক সুস্পষ্ট ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লাহ ﷻ-র দাস হিসেবে, প্রকৃত বান্দারূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারা পরীক্ষার মহোত্তর লাভ। পরীক্ষা বঞ্চনার জন্য নয়, প্রকৃত বান্দারূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। পরীক্ষার সম্মুখীন হলে অবশ্যই ধৈর্যধারণ করা চাই। যিনি আমার ভাগ্যে বিপদ ও পরীক্ষা লিখেছেন, তিনিই আমার জন্য অসংখ্য নেয়ামতের ব্যবস্থা রেখেছেন।

চার.

সাওয়াব ও প্রতিদানপ্রাপ্তি। পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ ﷻ-র কাছে উত্তম বিনিময় ও সাওয়াব গচ্ছিত থাকে। দুনিয়ার সবার কাছে গচ্ছিত সম্পদ বিনষ্ট হলেও আল্লাহ ﷻ-র কাছে বিনষ্ট হওয়া কোনই সম্ভাবনা নেই। বিপদে ধৈর্যধারণ করলে, আল্লাহর সাথে উত্তম আচরণ করলে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, লাভবান হয়। আল্লাহর বিধানে, পরীক্ষায় ধৈর্যের সাথে সমর্পিত হলে কেউ পরাস্ত হয় না, বিজীয় হয়।

আল্লাহ ﷻ-র রজ্জু আঁকড়ে ধরো।

পৃথিবীর সকল সাহায্যক্ষেত্র বিশ্বাসভঙ্গ করলেও আল্লাহ আছেন বিশ্বাসের স্তম্ভ, আল্লাহ ﷻ আছেন সদা-সর্বত্র।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সহজ পরামর্শ

ইবনুল কাইয়িম ﷺ যাদুল মায়াদ গ্রন্থে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কিছু সহজ পরামর্শ উল্লেখ করেছেন–

এক.

আল্লাহ ﷻ-র ফয়সালা ও ভাগ্যের লিখনের উপর অগাধ বিশ্বাস রাখা।

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, 'কারো কাছে যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তা দান করে, আল্লাহ তার এ দান গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকদিরের উপর ঈমান না রাখবে।' [মুসলিম : ৮]

ওবাদা ইবনে সামেত رضي الله عنه মৃত্যুর সময় তার ছেলেকে বলেন, 'আল্লাহর ফয়সালা এবং তাকদীরের উপর ঈমান রেখো। যার হাতে আমার জীবন, তার কসম করে বলছি, আল্লাহর ফয়সালা এবং তাকদিরের উপর ঈমান না রাখলে তোমার আমল কোন উপকারে আসবে না।' [আহমাদ : ২২১৯৭]

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন–

> তুমি আল্লাহর বিধান রক্ষা করো, আল্লাহ তোমাকে সুরক্ষা দিবেন। তুমি আল্লাহর বিধান প্রতিপালন করো, আল্লাহকে তোমার কাছেই পাবে। সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণ রেখো, দুঃখের সময় আল্লাহ তোমাকে স্মরণ রাখবেন।' 'নিশ্চয় ধৈর্যের সাথেই রয়েছে সাহায্য। জেনে রেখো, তোমার বিপদ তোমাকে স্খলিত করার জন্য নয়। তোমার স্খলন তোমাকে বিপদে ফেলার জন্য নয়। [হাকিম : ৬৩৫৫]

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম নিয়ামক হল আল্লাহ ﷻ-র ফয়সালা ও ভাগ্যের লিখনের উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করা। যে এই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না, তার কোন গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ ﷻ-র কাছে নেই। তার সদকা-যাকাত, কথাবার্তা, কিছুই আল্লাহ ﷻ-র কাছে গৃহীত হবে না।

দুই.

পরীক্ষায় সহজে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এই বিশ্বাস স্থাপন করা– আল্লাহ ﷻ যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা এই বিপদ তুচ্ছ। আল্লাহ ﷻ বলেন–

তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে যা আছে তা কখনও শেষ হবে না। [সূরা নাহল : ৯৬]

আল্লাহ ﷻ বান্দাকে যে রোগ-শোক দেন, চিন্তা-পেরেশানি দেন, এর দ্বারা বান্দার গোনাহ মাফ করেন।

তিন.

বিপদাক্রান্ত এবং পরীক্ষা নিপতীত মানুষ নিজেদের এই বিশ্বাসে আশ্বস্ত রাখবে– দুনিয়া বিপদের জায়গা। সর্বক্ষেত্রেই বিপদ আছে। দুঃখ ছাড়া কোন সুখ পূর্ণতা পায় না। কবি খানসা বলেন–

আমার পাশে এত ক্রন্দনকারী যদি না থাকত,

তবে আত্মহুতি দিতাম সেই কবেই!

বিপদে নিজেকে এই সান্তনা দেয়া বিপদ লাঘবের অন্যতম নিয়ামক। পরীক্ষা সহজ হওয়ার বিশেষ একটি উপায়।

চার.

এই বিশ্বাস রাখা– আল্লাহ ﷻ এক বিপদকে অন্য বিপদের তুলনায় সহজ করে থাকেন।

বিদ্যমান বিপদকে অন্য বিপদের তুলনায় সহজ মনে করলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ হয়।

ভয়ঙ্কর পরীক্ষা

মানুষের জীবনে সর্বাধিক ভয়ঙ্কর পরীক্ষা হল ধর্ম পালনে পরীক্ষা। মানুষ ধর্ম পালন করতে গিয়ে অসম্ভব পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে তার আর কোন অবলম্বন নেই। পরিত্রাণ নেই। সান্ত্বনা নেই। সবকিছুর বিকল্প থাকলেও আল্লাহ ﷻ-কে না মানার বিকল্প নেই। কেউ যদি আল্লাহ ﷻ-কে হারিয়ে ফেলে সে সবই হারিয়ে ফেলে।

ধর্মপালনের বিপদের তুলনায় শরীরের রোগ, সন্তান-সম্পদ বা অন্যকিছুতে কোন বিপদ-বিপর্যয় কিছুই নয়। অধর্ম হল সকল বিপদের মূল। সকল বিপদের

জননী। অধার্মিকের একমাত্র অবলম্বন হল তাওবা। ধর্মের পথে ফিরে আসা। আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রত্যাবর্তন করা।

পরীক্ষায় নিপতীত হওয়ার কিছু আশ্চর্য ঘটনা

কোরআনে, হাদিসে, ইতিহাসের পাতায় পাতায় বিপদাক্রান্ত হওয়া ও পরীক্ষায় নিপতীত হওয়া, তা থেকে মুক্তি ও প্ররিত্রাণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অসংখ্য ঘটনা উল্লেখ আছে।

আইয়ূব عليه السلام সালাম

আইয়ূব عليه السلام দীর্ঘ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। সুস্থতা নেই। কোন খাবারে স্বাদ পাচ্ছেন না। কিছু পান করে তৃপ্তি পাচ্ছেন না। ঘুমিয়ে চোখ শীতল করতে পারছেন না।

আঠার বছর কেটে গেল। একদিন তার স্ত্রী বললেন, 'আপনি আল্লাহকে কেন বলছেন না! কেন আল্লাহর কাছে অনুযোগ করছেন না!'

> বল তো, কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে ডাকে!
> [সূরা নামল : ৬২]

আইয়ূব عليه السلام আল্লাহর কাছে অনুযোগ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। বরং তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ ﷻ-কে ডেকে বললেন–

> আমি দুঃখ-কষ্টে পতীত হয়েছি। আপনি দয়াবানদের শ্রেষ্ঠ দয়াবান। [সূরা আম্বিয়া : ৮৩]

আমি রুগ্ন। আপনার হাতে রোগমুক্তি। আমার জন্য সুস্থতা পছন্দ করলে আমাকে সুস্থ করুন। আপনি আমার জন্য যা পছন্দ করবেন, তাই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ অষুধ।

আবু বকর رضي الله عنه অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাকে দেখার জন্য অনেকে গেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে আপনার?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহই ভালো জানেন।'

: 'আপনার জন্য ডাক্তার ডাকবো!'

: 'ডাক্তার আমাকে দেখেছেন।'

: 'কী বলেছেন ডাক্তার?'

: 'ডাক্তার বলেছেন, 'আমি তাই করি, যা চাই।''

কবির ভাষায়–

রোগ নিয়ে কীভাবে যাব ডাক্তারের কাছে,

যবে ডাক্তারই দিয়েছেন এই রোগ!

ইবনে তাইমিয়া ﷺ অসুস্থ হলেন। লোকেরা তাকে দেখতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে আপনার?'

তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন–

'আত্মারা মরে যায় ব্যাধিতে, জানে না সে কিসে কল্যাণ!

আত্মার অনুযোগ অবন্ধুরে, জীবনের সে তো এক বেইনসাফি!'

তার এ কথাটি ইয়াকূব আলাইহিস সালামের সেই বিনীত কথার মত–

> আমি দুঃখ-কষ্টে পতীত হয়েছি। আপনি দয়াবানদের শ্রেষ্ঠ দয়াবান। [সূরা আম্বিয়া : ৮৩]

অতঃপর ইবনে তাইমিয়া সুরা ইউসুফের এই আয়াত শোনালেন–

> আমি আমার দুঃখ অস্থিরতা আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি। [ইউসুফ: ৮৬]

দুঃখ কষ্ট অস্থিরতা আল্লাহর কাছেই বলতে হয়। তিনিই এসব শোনার সবচে উপযুক্ত।

অসুস্থতাও আল্লাহ ﷻ-র একটি পরীক্ষা। অনেক বড় একটি পরীক্ষা। এটি আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে ভাগ্যে লিখা থাকে। আল্লাহ ﷻ-ই জানেন, আমার শরীরে কী কী রোগ ভর করবে।

ইমরান ইবনে হুসাইন ﵁

ইমরান ইবনে হুসাইন ইবনে উবাইদ খুযাঈ ﵁ রাসূলের একজন শীর্ষ সাহাবী। খ্যাতনামা মুজাহিদ। গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তিনি এক রোগে ত্রিশ বছর ভুগেছিলেন। বিছানা থেকে উঠতে পারছিলেন না। তাকে কেউ দেখতে এসে বললেন, 'আপনি আল্লাহর কাছে বলুন। তিনি রোগ উঠিয়ে নিন।'

ইমরান ইবনে হুসাইন ﵁ বললেন, 'আল্লাহর যা পছন্দ, আমারও তাই। আল্লাহ যতদিন আমার জন্য এই রোগ লিখেছেন, আমি ততদিন এই রোগে সন্তুষ্ট।'

ইমরান ইবনে হুসাইন ﵁ এর জীবনীতে উল্লেখ হয়েছে, প্রতিদিন ফজরে ফেরেশতারা তার সাথে ডান হাতে মুসাফাহা করত!

[সিয়ারু আলা মিন নুবালা : ২০১]

তার সাথে ফেরেশতাদের মুসাফাহা অসম্ভব কিছু নয়। এটি বুযুর্গদের কারামাত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিতে তা সম্ভব। তিনি ত্রিশ বছর সবর করেছেন। আল্লাহ ﷻ দুনিয়াতে ফেরেশতাদের মুসাফাহার মাধ্যমে তার সবরের প্রতিদান দিয়েছেন। তার জন্য রয়েছে ব্যাপক কল্যাণ। আল্লাহ ﷻ-র কাছে অসংখ্য সাওয়াব।

জান্নাতি মহিলা

ইবনে আব্বাস ﵁ আতা ﵀-কে বললেন, 'আতা! তোমাকে একজন জান্নাতি মহিলা দেখাবো!'

আতা বললেন, 'হাঁ, দেখাও।'

ইবনে আব্বাস বললেন, 'এই মহিলা একবার রাসূল ﷺ-র কাছে এসে বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমি মৃগিরোগী। আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন–

> তুমি চাইলে আল্লাহর কাছে তোমার জন্য দোয়া করবো। তুমি চাইলে সবরও করতে পার। বিনিময়ে তোমার জন্য থাকবে জান্নাত। [বুখারি : ৫৬৫২]

রাসূল মহিলাকে কত সুন্দর দুটি বিষয়ে ইচ্ছা দিলেন! মহিলাও কী উত্তম বিষয়টি বেছে নিলেন! বললেন– আমি সবর করছি। তবে আমি সতর খুলে ফেলি। আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করুন, যেন সতর না খুলি।

রাসূল মহিলার সামনে দুটি পথ তুলে ধরলেন। দুটি দিক দেখালেন। দুটি পদক্ষেপের কথা বললেন। মহিলা উত্তম পথটিই বেছে নিলেন। তিনিই জান্নাতি মহিলা। দুনিয়াতে বিচরণকারী জান্নাতি মহিলা।

প্রিয় রাঙা চোখ

চোখ গুরুত্বপূর্ণ একটি নেয়ামত। চোখ দিয়ে মানুষ জীবনের আলো দেখে। জন্ম-মৃত্যুর খেলা দেখে। জীবনের সৌন্দর্য উপভোগ করে। চোখ দিয়ে পৃথিবী চেনে। মানুষ চেনে। পৃথিবীর সবকিছুর অস্তিত্ব অবলোকন করে।

আল্লাহ ﷻ মানুষকে চোখ দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেন। সামান্য হুকুম দেন। চোখের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায়। এখানেই মানুষ শেষ। কিছুই করার থাকে না। কোন উপায়-অবলম্বন থাকে না। উপায় একটাই থাকে– ধৈর্য। সবর।

আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন–

> (আল্লাহ বলেন) যাকে আমি দুটি প্রিয় বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করি এবং সে ধৈর্য ধারণ করে, তাকে দুটি প্রিয় বস্তুর বদলে জান্নাত দেই। [বুখারি : ৫৬৫৩]

কী চমৎকার সংবাদ! কী মনোহর উপস্থাপন!

আল্লাহ ﷻ পরীক্ষা নিচ্ছেন দুটি চোখের আর বলছেন প্রিয় দুটি বস্তুর! কারণ চোখ যে মানুষের অতি প্রিয়! অমূল্য ধন!

আল্লাহ ﷻ চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছেন, বলছেন পরীক্ষা করছি! কারণ পরীক্ষায় আছে বান্দার জন্য পুরস্কার! সাওয়াব ও প্রতিদান। আছে জান্নাত। জান্নাতের খাযানা।

ইয়াযিদ ইবনে হারুন ওয়াসতি رحمه الله। তার চোখের দৃষ্টি হারিয়ে গিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, 'আপনার চোখের দৃষ্টি কোথায় গেল?'

তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম, শেষ রাতের ক্রন্দন চোখের দৃষ্টি নিয়ে গেছে।’

ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما। শেষ জীবনে তার চোখের দৃষ্টি মিলিয়ে যায়। দুর্মুখেরা ঠাট্টা করতে থাকে। তামাশা রটাতে থাকে। ইবনে আব্বাস শুনে বললেন–

আল্লাহ যবে মিলিয়ে দিলেন চোখের নূর,

হৃদয়দেশে দিলেন নূরের আলোকছটা।

স্বচ্ছ বিবেক সরল হৃদয় নেই কো কুব্জ,

মুখে আছে তরবারি তেজ বচনধারা।

কত বাস্তবতা তুলে ধরেছেন ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما। আল্লাহ سبحانه وتعالى চোখের নূর মিলিয়ে দিলেও অন্তরদেশ আলোকিত। দৃষ্টিসম্পন্ন। চোখের জ্যোতি হারিয়ে গেলেও তার রূহের জ্যোতি রশ্মি ফেলছে জগতময়।

ইবনে হুবাইরা رحمه الله। ইফসাহ গ্রন্থের প্রণেতা। হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী। ইবনুল জাওযি رحمه الله এর উসতায। আব্বাসি খেলাফতকালের প্রসিদ্ধ উযির। আল্লাহভীরু। তিনি একবার মিনা ময়দানে বৃষ্টির দোয়া করেছেন, মিনায় থাকাকালীনই বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। তখন তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, ‘হায়! যদি আমার মাগফিরাতের দোয়া করতাম!’

একদিন তিনি উযিরের আসনে বসে আছেন। জনৈক ব্যক্তি তার কাছে আগমন করলেন। ইবনে হুবাইরা তাকে কিছু হাদিয়া দিলেন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকেরা ইবনে হুবাইরাকে বলল, ‘কী ব্যাপার, চেনা-জানা নেই। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন! হাদিয়াও দিলেন!’

তিনি বললেন, ‘আমরা যুবক ছিলাম। তিনি আমাকে চিনেননি। আমি তাকে চিনেছি। তার এক আঘাতে ত্রিশ বছর হল, আমার চোখের দৃষ্টি মিলিয়ে গিয়েছিল। আমি এ কথা কাউকে বলিনি।’

ইবনে হুবাইরা কারও কাছে অভিযোগ করেননি। অভিযোগ-অনুযোগ তো শুধু আল্লাহরই কাছে!

প্রিয় সন্তান

সন্তান-সন্ততি আল্লাহর অপার নেয়ামত। আল্লাহ ﷻ সৎকর্মশীলদের আলোচনা করেছেন। বলেছেন, তারা আল্লাহ ﷻ-র কাছে বলত–

> হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর। [সূরা ফুরকান : ৭৪]

জীবন সুশোভিত করে তোলে সন্তান ও সম্পদ। এগুলো পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।

সন্তান চোখের সামনে বেড়ে ওঠে, ইসলামের আলোকে জীবন সাজিয়ে তোলে, আল্লাহ ﷻ-র সেজদায় অবনত হয়, কোরআনের মধুময় তেলাওয়াত শোনায়, –এর চেয়ে সুখকর চিত্র জীবনের আর কোন পাটে আছে!

কিন্তু সেই সন্তানকে যখন আল্লাহ চোখের সামনে থেকে ডেকে নেন, তখন কী আর করার থাকে!

রাসূল ﷺ বলেন–

> আল্লাহ বলেন, 'আমার মুমিন বান্দার অন্তর-প্রিয়কে যখন কেড়ে নেই এবং সে ধৈর্য ধারণ করে, তখন তার জন্য জান্নাতই উপহার! [বুখারী : ৬৪২৪]

আল্লাহ ﷻ সন্তান কেড়ে নেয়ার কথা বলেননি। বাবা, ভাই বা বন্ধু কেড়ে নেয়ার কথা বলেননি। একজনের কথা বলে অপরজনকে বাদ দেননি। বরং যার বিচ্ছেদে কষ্ট আসে, দুঃখ লাগে, সেই অন্তর-প্রিয়। তিনি বাবা হতে পারেন। সন্তান হতে পারেন। ভাই-বন্ধুও হতে পারেন। তাদের যে কারও বিচ্ছেদে ধৈর্য ধারণ করলে তার জন্য জান্নাত উপহার!

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

> কারো সন্তান মারা গেলে আল্লাহ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানকে উঠিয়ে নিয়েছ?
> ফেরেশতারা বলে, 'হাঁ।'

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি তার কলিজার ধনকে কেড়ে নিলে?'

ফেরেশতারা বলে, 'হ্যাঁ।'

আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, 'আমার বান্দা কী বলল?'

ফেরেশতারা বলে, 'সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং ইন্নালিল্লাহ পড়েছে।'

তখন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাও এবং তার নাম দাও 'বাইতুল হামদ।'' [আহমাদ : ১৯২২৬]

জান্নাতের সেই ভবনটি হবে সাদা মেঘের মত। উজ্জ্বল তারার মত। সেখানে লেখা থাকবে– 'বাইতুল হামদ'। সন্তান হারানোর ব্যথায় যারা ধৈর্য ধারণ করেছে, তারা সেখানে প্রবেশ করবে।

জান্নাতের এই সুসংবাদ মহিলার জন্যও। বরং সন্তান হারানো মহিলা ধৈর্যধারণ করলে তার জন্য রাসূল যে সুসংবাদ দিয়েছেন, পুরুষের জন্য তা দেননি।

রাসূল ﷺ বলেন–

তোমাদের মধ্যে যে মহিলা তিনটি সন্তান আগেই পাঠাবে, (তার জীবিতাবস্থায় তিনটি সন্তান মারা গেলে) তারা তার জন্য জাহান্নামের পর্দাস্বরূপ হয়ে থাকবে।

তখন এক মহিলা বলল, 'আর দুটি পাঠালে?'

রাসূল বললেন, 'দুটি পাঠালেও।' [বুখারি : ১০২]

কোন কোন বর্ণনা মতে মহিলা আবার জিজ্ঞেস করল, 'আর একটি পাঠালে?'

রাসূল বললেন, 'একটি পাঠালেও।'

একটি সৎসন্তানের মৃত্যুতে সবরকারীর জন্য আল্লাহ ﷻ জান্নাত উপহার রেখেছেন! সকল প্রশংসা আল্লাহরই!

পছন্দের দেহখানি

আল্লাহ ﷻ মানুষকে শরীর দিয়েছেন। শক্তি ও সামর্থ্য দিয়েছেন। যৌবন-জৈবিকতা দিয়েছেন। উদ্যম দিয়েছেন। মানুষ তা ভোগ করবে। ব্যবহার করবে।

কিন্তু আল্লাহ ﷻ তার গভীর হেকমত থেকে এসব ছিনিয়েও নিতে পারেন। অসংখ্য বুযুর্গদের শারীরিক রোগ আল্লাহ ﷻ দিয়েছেন। শারীরিক পরীক্ষা আল্লাহ ﷻ নিয়েছেন।

ওরওয়া ইবনে যুবাইর رحمه الله। আয়েশা رضي الله عنها থেকে অসংখ্য হাদিস বর্ণনাকারী। তিনি চারদিনে একবার কোরআন খতম করতেন। আল্লাহ ﷻ তার মর্যাদা অত্যুচ্চে পৌঁছানোর ফয়সালা করলেন। তাকে পরীক্ষায় নিপতীত করলেন।

ওরওয়া ইবনে যুবাইর رحمه الله শামের উদ্দেশে সফরে বেরুলেন। পথিমধ্যে তার পায়ে ক্ষয়রোগ দেখা দিল। ডাক্তাররা তার পা কেটে ফেলতে বললেন। তিনি বললেন, 'আমি সবর করছি। আমি এসবের অমুখাপেক্ষী।'

ক্ষয়রোগ বাড়তে লাগল। নলা পর্যন্ত পৌঁছল। ডাক্তাররা আবার পা কাটতে বললেন। তিনি একই উত্তর দিলেন– 'আমি সবর করছি। আমি এসবের অমুখাপেক্ষী।'

ক্ষয় রান পর্যন্ত বৃদ্ধি পেল। ডাক্তাররা বললেন, 'সম্পূর্ণ পা কাটা ছাড়া আর উপায় দেখছি না। না হয় আপনার মৃত্যু হবে।'

তিনি বললেন, 'আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই। আমরা আল্লাহর জন্য। আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

ডাক্তাররা বলল, 'আপনাকে এক পেয়ালা মদ পান করিয়ে পা কাটতে হবে।'

তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে আকল দিয়েছেন, আর তা আমি মদ খেয়ে বিগড়াবো! আমি অযু করে সালাতে দাঁড়ালে তোমরা পা কেটো।'

ওরওয়া ইবনে যুবাইর رحمه الله অযু করে সালাত শুরু করলেন। আল্লাহকে ডাকছেন। প্রাণ মিশিয়ে কণ্ঠ ছেড়ে তেলাওয়াত করছেন। ডাক্তাররা পা কেটে ফেললেন। প্রচুর রক্ত বেরুল। বেহুশ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন।

কয়েক ঘন্টা পর জ্ঞান ফিরল। তাকে সংবাদ জানানো হল, 'খলিফার সাওয়ারীর পায়ের আঘাতে আপনার ছেলে মৃত্যু বরণ করেছে।'

আল্লাহর কি বিধান! ওরওয়া ইবনে যুবাইরের এই জ্ঞানহারা সময়টুকুর মধ্যে তার ছেলের মৃত্যু! কীভাবে বিপদের পর বিপদ। আল্লাহর কী হেকমত! কেমন তকদীর! কেমন ফয়সালা!

ওরওয়া ইবনে যুবাইর রহ. ছেলের মৃত্যুর সংবাদ শুনে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ, তোমার জন্য সকল প্রশংসা। তুমি দিয়েছ, তুমিই নিয়ে গেছ। তুমি আমাকে পরীক্ষায় ফেলেছ, তুমিই আমাকে সুস্থ করছ। তুমি আমাকে চারটি অঙ্গ দিয়ে মাত্র একটি নিয়েছ। তোমার কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি। সব প্রশংসা তোমার।'

অতঃপর তিনি এই কবিতাগুলো পাঠ করলেন–

রুগ্ন পায়ে আমায় করোনি ভগ্নমত –আমি করেছি সবর।

বিবেক বুদ্ধি জ্ঞানে করিনি কিছু –আমি করেছি সবর।

রোগীর আগে তুমি নিয়েছ এক সুস্থ যুবককে –আমি করেছি সবর।

ওরওয়া ইবনে যুবাইর রহ. সবর করলেন। আল্লাহর কাছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

পরীক্ষা কখনও অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আল্লাহ এর দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। ভুলত্রুটি ক্ষমা করেন।

ইবরাহিম আ.। তাওহিদের স্তম্ভ। ইসলামি আকিদার উসতায। তার মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপি তাওহিদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা তাকে অনেক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন। তাকে পোড়ানোর জন্য কাঠখড়ি একত্র করা হল। তাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত হল। ইবরাহিম আ.-র সামনে আল্লাহর দরজা খোলা ছিল। ধরার মত আল্লাহ তাআলা-র রজ্জু অবশিষ্ট ছিল। তার তওয়াক্কুল ছিল উচ্চমাত্রার।

জিবরাঈল আ. তার কাছে এলেন। ইবরাহিমকে বললেন, 'আপনার কোন সহযোগিতায় আসতে পারি কি?'

তিনি উত্তর করলেন, 'তোমার সহযোগিতা নয়, আমি আল্লাহ তাআলা-র সহযোগিতার অপেক্ষায় আছি!'

ইবরাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হল। তিনি পাঠ করলেন– ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকীল’।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما একটি দোয়া বর্ণনা করেন, ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়ানি‘মাল ওয়াকীল’। ‘আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ঠ, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহী!’

ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما বলেন, “এই দোয়াটি ইবরাহিম عليه السلام অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় পড়েছিলেন। আর রাসুল ﷺ পড়েছিলেন, যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জমায়েত হওয়ার সংবাদ এসেছিল। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> যখন তাদেরকে লোকে বলেছিলো, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর। কিন্তু এ কথা তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক। [সূরা আলে ইমরান : ১৭৩]

ইবরাহিম عليه السلام অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে আল্লাহ جل جلاله-র মহত্বের কথা স্মরণ করলেন। আল্লাহ جل جلاله-ই যথেষ্ট। আল্লাহ ছাড়া কোন হেফযতকারী নেই। কবির ভাষায়–

ওগো আল্লাহ আমার আশার আধার, লক্ষ-কোটি কৃপা তোমার,

আমায় রক্ষা করেছো।

অত্যাচারির নিনাদ ভারি, ধ্বংস হবো সমূল ছাড়ি;

তুমি রক্ষা করেছো।

তুমি আমায় রক্ষা করে জালিমমনে ভয়ের ভয়াল আঁধার দিয়েছো।

ইবরাহিম অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে আল্লাহকে ডাকলেন। আল্লাহ جل جلاله অগ্নিকে বললেন–

> হে অগ্নি, তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল হয়ে যাও, আরামদায়ক হয়ে যাও। [সূরা আম্বিয়া : ৬৯]

আগুনকে শুধু ঠাণ্ডা হতে বললে তা বরফ হয়ে যেত। এজন্য আরামদায়ক ঠাণ্ডা হতে বললেন। সব আল্লাহ جل جلاله-রই কুদরত!

ইবরাহিম ﷺ-কে আল্লাহ আরও কঠিন পরীক্ষা করেছিলেন সন্তান ইসমাঈল ﷺ দ্বারা। ইসমাঈল ধীরে ধীরে পরিণত বয়সে পৌঁছলেন। বাবার সাথে চলাফেরা করছেন। এই বয়সে সাধারণত সন্তানের প্রতি বাবার ভালোবাসা অত্যধিক হয়। সন্তানের প্রতি বাবার অন্তর ঝুঁকে যায় খুব বেশি। ইবরাহিমেরও তাই। কিন্তু তার অন্তরে তো শুধু আল্লাহরই ভালোবাসা থাকবে। আল্লাহ ইবরাহিমের অন্তর খালি করতে চাইলেন–

যবে অন্তরের ভালোবাসায় থাকবে না নিজের কিছু,

তবেই তো হবে তুমি নিরেট বন্ধু!

ইবরাহিম ﷺ আল্লাহর খলীল। অন্তরঙ্গ বন্ধু। ইবরাহিমের মনে আল্লাহর ভালোবাসাই বেশি থাকবে। ইসমাঈল যখন পরিণত বয়সে পৌঁছলেন, বাবার নিরঙ্কুশ ভালোবাসা প্রাপ্তির বয়সে পৌঁছলেন, আল্লাহ ইবরাহিম ﷺ-কে পরীক্ষা করলেন– ইবরাহিমের মনে কার ভালোবাসা বেশি!

ইবরাহিমকে স্বপ্নে দেখালেন– তিনি তার সন্তানকে জবাই করছেন!

নবিদের স্বপ্ন সত্য। স্বপ্ন নিশ্চিত হয়ে তিনি সকালে ছেলেকে জানালেন। ছেলেও একজন প্রকৃত মুমিনের মত প্রতিক্রিয়া জানালেন। আল্লাহ বলেন–

> যারা বংশধর ছিলেন পরস্পরের। আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। [সূরা আলে ইমরান: ৩৪]

কবির ভাষায়–

বাড়ন্ত ছেলে বাড়বে সেভাবে,

বাবার প্রতিপালন হবে যেভাবে।

অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহিম তাকে বললেন, ছেলে! আমি স্বপ্নে দেখি– 'তোমাকে জবাই করছি। এখন তোমার অভিমত কী দেখ।' সে বলল–

> পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। [সূরা সাফফাত : ১০২]

ইসমাঈল কত বিনয়ী ভাষায় কথা বললেন! তিনি এভাবেও বলতে পারতেন– 'আপনি আদেশ মত কাজ করুন। আমাকে সবরকারী পাবেন।'

কিন্তু সবর কি তার হাতে! ইচ্ছা করলেই তিনি সবর করতে পারবেন! সবর আল্লাহর হাতে। এ জন্য ইসমাঈল বললেন, 'আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন।'

ইবরাহিম ﷺ ইসমাঈলকে জবাই করার প্রস্তুতি নিলেন। এরপরের ঘটনা কোরআনের ভাষায়–

> আমি তার পরিবর্তে জবাই করার জন্য দিলাম এক মহান জন্তু। [সূরা সাফফাত : ১০৭]

ইবরাহিম ﷺ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। সফল হলেন। প্রমাণ করলেন– তিনি সত্যবাদী। তিনি মুহসিন। আল্লাহ তার জন্য পরবর্তী প্রজন্মে সুনাম ছড়িয়ে দিলেন– তিনি 'সত্যভাষী'। মানুষের মুখে মুখে কেয়ামত পর্যন্ত তার প্রশংসা ও স্তুতি। প্রজন্মান্তরে তার উপর বর্ষিত হচ্ছে দুরূদ ও সালাম। আল্লাহ ﷻ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

বিপদবালাই

আল্লাহ ﷻ যুগে যুগে তার প্রিয় বান্দাদের বিভিন্ন বিপদে ফেলে পরীক্ষা করেছেন।

ইউনুস ﷺ তার কওমের সাথে রাগ হয়ে চলে গেলেন। আল্লাহ ﷻ-র কাছে অনুমতি নেননি। নৌকাযোগে যাচ্ছিলেন কোথাও। ঘটনাচক্রে তাকে নৌকা থেকে ফেলে দেয়া হল। তিনি মাছের পেটে চলে গেলেন।

রাতের অন্ধকার। সমুদ্রের অন্ধকার। মাছের পেটের অন্ধকার। তিন স্তরের অন্ধকারে তার সামনে আল্লাহর রজ্জু ছাড়া আর কোন রজ্জু নয়। স্ত্রী-সন্তান-বন্ধু কাউকে স্মরণ করলেন না। একমাত্র আল্লাহকেই স্মরণ করলেন। বললেন,

> তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তুমি নির্দোষ, আমি গোনাহগার। [সূরা আম্বিয়া : ৮৭]

রাসূল ﷺ বলেন–

> লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাযযলিমীন।' 'তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তুমি নির্দোষ, আমি গোনাহগার।' –এটি আমার ভাইয়ের দোয়া। বিপদগ্রস্ত যে কেউ এই দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ তার বিপদ দূর করে দিবেন। [আহমাদ : ১৪৬৫]

আন্দালুসি رحمه الله ছেলেকে উপদেশ করেছিলেন–

যখন সেজদা কর আল্লাহ ﷻ-কে ডাক, যেমন ডেকেছেন ইউনুস।

দুনিয়াতে বেশি বেশি আল্লাহ ﷻ-র যিকির নিজের অভ্যাস বানাও। আসমানে তুমি স্মরিত হবে।

কেউ এই দোয়া পড়ে আল্লাহ ﷻ-কে ডাকলে আল্লাহ ﷻ তার বিপদ দূর করবেন। চিন্তা-পেরেশানি দূর করবেন। অকল্পনীয় জায়গা থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহ ﷻ-র কাছে সবরকারীদের সাওয়াব ও প্রতিদান মহান!

আল্লাহ ﷻ ইউনুস عليه السلام-কে তিন পর্দার অন্ধকার থেকে মুক্তি দিলেন–

> যদি তিনি আল্লাহর তাসবিহ পাঠ না করতেন, তবে তাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। [সূরা সাফফাত : ১৪৩, ১৪৪]

ইয়াকুব عليه السلام

কোরআনে বর্ণিত বিপদবালাই ও পরীক্ষাগুলো একই নয়, বিভিন্ন ধরনের। আল্লাহ ﷻ ব্যক্তি বিশেষ পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন নিয়েছেন। নেয়ামতও ভিন্ন ভিন্ন দিয়েছেন।

ইয়াকুব عليه السلام-র ছেলে ইউসুফ عليه السلام হারিয়ে গেলেন। কোথায় হারালেন, ইয়াকুব জানেন না। তখন ইয়াকুব عليه السلام বারবার এই কথা বলছিলেন–

> এখন সবর করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। [সূরা ইউসুফ : ১৮]

ইউসুফ عليه السلام চল্লিশ বছর পিতার কাছ থেকে দূরে রইলেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদে তিনিও ভালোবাসার একটা টান অনুভব করলেন–

বিচ্ছেদ হল দীর্ঘকাল, আমাদের পিতা-পুত্রের।

শুকায়নি চোখের জল, কমেনি হৃদয়ের টান এতটুকুন।

যখনই আমাদের মন ডাকে মনকে, কষ্টরা উঠে আসে বুক ফেটে।

ইয়াকুব عليه السلام পুত্রশোকে বুক ভাসালেন। নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল ক্রন্দনে। চোখ দুটি সাদা হয়ে গেল। তিনি সবসময় চিন্তায় পেরেশানিতে মগ্ন থেকে বলতেন–

> আমি আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি। [সূরা ইউসুফ: ৮৬]

তিনি সবকিছু আল্লাহ ﷻ-র সমীপেই নিবেদন করলেন। আল্লাহ ﷻ-র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। সবরের প্রতিদানে আল্লাহ ﷻ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিলেন।

একজন খাঁটি বান্দার এ-ই বৈশিষ্ট্য– যত দামী হোক, মূল্যবান হোক, কিছু হারিয়ে গেলে আল্লাহ ﷻ-র কাছেই অনুযোগ করবে।

ইউসুফ عليه السلام

ইউসুফ عليه السلام পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। তার উপর অপবাদ আরোপ হল। তিনি সবর করলেন। ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সবকিছু আল্লাহর কাছে সমর্পণ করলেন। আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করলেন। তার প্রশংসা করলেন–

> নিশ্চয় সে আমার মনোনিত বান্দাদের একজন। [সূরা ইউসুফ : ২৪]

ইউসুফ عليه السلام-র পরীক্ষা ছিল অত্যন্ত ভয়ানক। ইবনুল কাইয়িম رحمه الله মাদারিজুস সালিকীন গ্রন্থে ইউসুফের পরীক্ষা ভয়ানক হওয়ার কিছু কারণ উল্লেখ করেন–

তিনি টগবগে যুবক ছিলেন। যুলাইখার আহ্বান করা মন্দ কাজে নিপতীত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা ছিল।

তিনি সেখানে নিঃস্ব ছিলেন। তার পক্ষে কাউকেই পাননি।

তিনি সুলতানের ঘরে ছিলেন। যেখানে সুলতানের স্ত্রী ছিলেন নির্ভয়। কোন শাস্তির আশঙ্কা তার ছিল না।

যুলাইখা ছিলেন যেন অপ্সরী। সাথে পরিধান করেছিলেন স্বর্ণালঙ্কার আর সবধরনের সাজসজ্জা।

যুলাইখা তাকে ঘরে একাকী করে ফেলেছেন। দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন। তাকে প্ররোচিত করেছেন।

এতকিছুর পরও ইউসুফ ﷵ সবর করেছেন। বলেছেন– এই কাজ থেকে আল্লাহর পানাহ!

কোরআনে বর্ণিত ইউসুফ ﷵ-র ঘটনাটি বারবার পাঠ করা প্রত্যক মুসলমানের জরুরী।

ইফকের ঘটনা

ইসলামের ইতিহাসে বহুল আলোচিত ইফকের ঘটনা। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে বিস্তৃত এক পরীক্ষা। আয়েশা (রা.) থেকে এই ঘটনাটি বুখারি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে–

রাসূল ﷺ জিহাদে বের হলে স্ত্রীদের নামে লটারি করতেন। লটারিতে যার নাম উঠত, তাকে রাসূল সাথে নিয়ে যেতেন।

আয়েশা (রা.) এক যুদ্ধে রাসূলের সাথে গেলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এক জায়গায় যাত্রাবিরতি হল। সেখানে আয়েশা (রা.) এর গলার হার হারিয়ে গেলে তিনি তা খোঁজার জন্য বেরুলেন।

এদিকে কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল। তারা ধারনা করেছিল আয়েশা (রা.) হাওদাজে (পাল্কি সদৃশ) আছেন। আয়েশা (রা.)-কে তারা আর খোঁজল না। আয়েশা (রা.) এর হাওদাজ উটে চড়িয়ে কাফেলা চলে গেল।

আয়েশা (রা.) জায়গায় ফিরে এসে দেখেন কেউ নেই। তিনি এখন কী করবেন?

আয়েশা (রা.) নিজেকে পর্দাবৃত করে সেখানেই অবস্থান করলেন এবং বললেন– 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিয়ূন।' 'নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।'

আল্লাহ ﷻ কোরআনে সবরকারীদের বৈশিষ্ট্য বলেন–

তারা বিপদে পতীত হয়ে বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। [সূরা বাকারা : ১২৪]

কাফেলার পেছনে থাকা সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল رضي الله عنه এসে আয়েশা رضي الله عنها পর্দাবৃত অবস্থায় দেখলেন। তাকে দেখে বললেন– আল্লাহই একমাত্র সাহায্যস্থল!

আয়েশা رضي الله عنها কসম করে বলেন, সফওয়ান তার সাথে এক শব্দ কথাও বলেননি। সফওয়ান তার উট আয়েশা রাযি. সামনে বসিয়ে দিলেন। আয়েশা رضي الله عنها উটে চেপে বসলেন। সফওয়ান উটের লাগাম ধরে হাঁটা শুরু করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জায়গায় সাহাবাদের নিয়ে অবস্থান করলেন। সফওয়ান আয়েশা رضي الله عنها সহ তাদের সাথে মিলিত হলেন।

মুমিনরা জানতেন– আয়েশা رضي الله عنها ভদ্র সম্ভ্রান্ত মহিলা। তিনি সিদ্দীকা। নিষ্পাপ। পবিত্রতার তিলোত্তমা।

আর যারা ঈমান রাখে, তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। [সূরা তাওবা : ১২৪]

কিন্তু মোনাফেকদের মনে কপটতা চাড়া দিল। সন্দেহ নড়ে উঠল। আল্লাহ হেফাযত করুন; তারা চারদিকে কথা ছড়াতে লাগল– আয়েশা কেন দেরি করলেন! সফওয়ান কেন আয়েশাকে নিয়ে এল! এসবের কারণ কী?

মোনাফেকদের নেফাক অহঙ্কার ঔদ্ধত্য এবং আল্লাহবিমুখিতা এমনই বৃদ্ধি পেল!

রাসূল ﷺ মদিনায় ফিরে এলেন। তখনও এতকিছু অবগত হননি।

আয়েশা رضي الله عنها অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি রাসূলের কাছে আগের মত প্রেম অনুভব করলেন না। কারণ এতক্ষণে সব কথা রাসূলের কানে এসেছিল। রাসূল ﷺ আয়েশার কাছে যেতেন। খোঁজ নিতেন– 'আয়েশা অসুস্থ! সে কেমন আছে?' এর বেশি কোন কথা বলতেন না।

আয়েশা رضي الله عنها চিন্তিত হলেন। তার সন্দেহ হল, রাসূলের কাছে আগের মত প্রেম সোহাগ অনুভব করছি না কেন?

আয়েশা রা. উম্মে মিসতাহর কাছে সব জানলেন। সব জেনে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য রাসূলের কাছে বাবা-মায়ের কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। রাসূলের অনুমতিক্রমে অসুস্থ অবস্থায়ই তিনি বাবা-মায়ের কাছে গেলেন।

আয়েশা রা. তখনও জানতেন না, যে অপবাদ তাকে দেয়া হয়েছে, তার আড়ালে রয়েছে মানুষের সবচে মর্যাদাকর অবস্থান! সাইয়িদ কুতুব রহ. বলেন–

এই ঘটনায় রাসূলের মর্যাদা এবং রিসালাতে আঘাত এল। রাসূল ও সাহাবাদের স্তম্ভিত করে পূর্ণ একমাসে গড়াল। মোনাফেকরা শুধু অপবাদই ছড়াতে পারল।

একজন সংস্কারক মানবরক্ত নতুন করে সঞ্চালন করতে চান। নিজের মর্যাদায় পরিবারের মর্যাদায় কোন আঘাত আসলে সে অন্ধকার থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে চান। না হয় কীভাবে তিনি ময়দানে দাঁড়াবেন! কীভাবে তিনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করবেন! কীভাবে মানুষকে শিখাবেন! জিহাদ করবেন! সমস্যা সমাধান করবেন!

এ এক ভয়ানক পরিস্থিতি। ভয়ঙ্কর বিপদ। রহস্যের মূল পাঠ হল, আল্লাহ এতদিন অহি নাযিল করেননি। আল্লাহ মানবজাতির সন্দেহপ্রবণতা পরীক্ষা করলেন। মুমিন মোনাফেক এবং সত্যবাদী মিথ্যাবাদীর পার্থক্য প্রকাশ করলেন।

রাসূল ﷺ নিকটভাজন বন্ধু ও চাচাতো ভাই আলি রা. এর কাছে এলেন। মুসা আ.-র জন্য হারূন যেমন ছিলেন, রাসূলের জন্য আলিও তেমনই ছিলেন। রাসূল আলিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আলি! কী মনে করছ তুমি!'

আলি রা. উত্তর দিলেন, 'আল্লাহর রাসূল! আয়েশা ছাড়া আরও অনেক মহিলা আছে।'

রাসূল উসামা রা. এর কাছে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না।'

রাসূল আয়েশা রা. এর খেদমতে নিয়োজিত বাদির কাছে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী মনে করছ?'

বাদি বললেন, 'তিনি নিয়মিত রোযাদার। তাহাজ্জুদগুযার। ইবাদাতগুযার। আমি তাকে শুধু ভালোই জানি। তিনি ঘুমালে পোষা প্রাণীরা তৈরি থাকা খামিরা খেয়ে ফেলে।'

অর্থাৎ, তার সারল্য ও সহজতা খুব বেশি, ফলে ছাগল এসে পাত্র থেকে খামিরা খেয়ে ফেলে।

আয়েশা رضي الله عنها একদিন মহিলাদের সাথে বের হলেন। এক মহিলা তাকে অপবাদের কথা জানাল। আয়েশা رضي الله عنها তা শুনে মুখ থুবড়ে পরে গেলেন। তার অসুস্থতা আরও বৃদ্ধি পেল। অস্থিরতা দ্বিগুণ হল। তিনি ঘুমোতে পারতেন না। কান্নায় কলিজা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হত।

রাসূল ﷺ তার কাছে এলেন। বললেন, 'আয়েশা! তুমি অপরাধে সম্পৃক্ত হয়ে থাকলে আল্লাহর কাছে তাওবা কর। ক্ষমা প্রার্থনা কর। তুমি পবিত্র হলে অচিরেই আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন।'

আয়েশা رضي الله عنها এ কথা শুনে বাবার কাছে বললেন, 'আমার পক্ষ থেকে উত্তর দিন।'

বাবা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি কী বলবো, বুঝছি না।'

আয়েশা রাযি. মায়ের কাছে গেলেন, 'রাসূলের সাথে কথা বলুন।'

মা বললেন, 'আমি কী বলবো, জানি না।'

আয়েশা رضي الله عنها থকে বসলেন। বললেন, 'আমার আর আপনাদের দৃষ্টান্ত আবু ইউসুফের এই কথার মত–

> এখন সবর করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।' [সূরা ইউসুফ : ১৮]

আয়েশা رضي الله عنها গোস্বায় ইয়াকুব عليه السلام-র নাম ভুলে 'আবু ইউসুফ' বলেছেন।

রাসূল ﷺ সেখান থেকে সড়তে না সড়তেই অহি নাযিল হল। তিনি ঘুমিয়েছিলেন। এই আয়াত তেলাওয়াত করতে করতে জাগ্রত হলেন–

> যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। [সূরা নূর : ১১]

আল্লাহ ﷻ সপ্তআকাশ উপর থেকে আয়েশা رضي الله عنها এর পবিত্রতা ঘোষণা করলেন। তার মর্যাদা আগের চেয়ে বহুতর বৃদ্ধি করলেন। আয়েশা رضي الله عنها এর ধৈর্যের ফলে আল্লাহ ﷻ তার অসংখ্য ভুলক্রটি ক্ষমা করলেন। [বুখারি : ২৬৬১]

যারা মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছিল, রাসূল ﷺ তাদের শাস্তি প্রদান করলেন। বেত্রাঘাত করলেন।

রাসূল ﷺ অনেক কঠিন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পরীক্ষিত হয়েছেন। জিহাদের ময়দানে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সবর করেছেন। ধৈর্য ধারণ করেছেন।

কলিজার ধন, হৃদয়ের আবেগ পুত্র ইবরাহিমের দুই বছর বয়সের মৃত্যু ছিল কঠিন একটি পরীক্ষা। আনাস রাযি. বলেন, আমি রাসূল ﷺ-র সাথে গিয়েছিলাম। রাসূলের সামনে পুত্র ইবরাহিমকে আনা হল। তখন সে মৃত্যুমুখী। প্রাণ উড়ুউড়ু। রাসূল তাকে কোলে নিলেন। কেঁদে কেঁদে বললেন–

> ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। চোখ কাঁদছে। হৃদয় অস্থির হচ্ছে। তবু আমার আল্লাহ ﷻ যাতে সন্তুষ্ট, আমি তাই বলি। ইবরাহিম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা ভারাক্রান্ত। [বুখারি : ১৩০৩]

রাসূলের মেয়ে ইন্তেকাল করেছেন। রাসূল সবর করেছেন। ধৈর্য ধরেছেন। যাইনাব رضي الله عنها এর কবরের কাছে মাটি আঁচড়ে কেঁদে কেঁদে বলছেন–

> কসম সেই সত্ত্বার, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি যা জানি, তোমরা তা জানলে কম হাসতে এবং বেশি বেশি কাঁদতে। [বুখারি : ৪২৬১]

রাসূল ﷺ দাওয়াত প্রচারেও অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। তাকে কাফেররা জাদুকর, কবি, গণক বলেছিল। এগুলোও পরীক্ষা। রাসূল ﷺ ধৈর্য ধরেছেন। সবর করেছেন।

পরীক্ষায় নিপতিত হওয়া নবীদের সুন্নত। বিভিন্নভাবে আমাদের সামনে পরীক্ষা আসতে পারে। এমন জায়গা থেকে এমনভাবে পরীক্ষা আসবে, কল্পনারও বাইরে থেকে। তখন আমাদের একটাই করণীয়– সবর। ধৈর্য।

বুযুর্গদের বিপদে পরীক্ষিত হওয়ার ঘটনা

আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বুযুর্গরাও নানা বিপদে নিপতিত হয়েছেন এবং পরীক্ষিত হয়েছেন।

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, হে দুর্বলমনা! নূহ আলাইহিস সালাম রাস্তায় রাস্তায় আর্তনাদ করে ফিরেছেন। ইয়াহইয়া ﷺ জবাই হয়েছেন। যাকারিয়া ﷺ হত্যা হয়েছেন। ইমামগণ কারাবন্দী হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য ওলামায়ে কেরাম বেত্রাঘাতে আহত হয়েছেন।

এভাবেই সবাই পরীক্ষিত হয়েছেন। উম্মতের নেতা হয়েছেন–

> আমি তাদের নেতা বানালাম। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাদের প্রতি অহি নাযিল করলাম সৎকর্ম করার, সালাত কায়েম করার এবং যাকাত দান করার। তারা আমার এবাদতে ব্যাপৃত ছিল। [সূরা আম্বিয়া : ৭৩]

ইমাম আহমদ ﷺ; আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের ইমাম। হাজারে হাজার মারফু মাওকুফ মুসনাদ মাকতু আসার এবং তাবেঈদের বাণী তার মুখস্থ ছিল। তিনি কারাবন্দী হয়েছিলেন। চাবুকের আঘাতে জর্জরিত হয়েছিলেন। কেন?

এবাদতকারী এবং দুনিয়াবিমুখ হয়ে চাবুকের আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন!

হাদিসের অঙ্গনে ব্যাপক পারদর্শী হয়েও চাবুকের আঘাতে রঞ্জিত হয়েছেন!

দিনভর রোযা রেখেও তিনি রক্তাক্ত হয়েছেন!

দুনিয়ার শোভা বর্জন, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, উচ্ছল প্রভাকর দীনী দাওয়াত, আল্লাহর অস্তিত্বে দৃঢ় অবিচল থেকে তিনি বেত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন!

উম্মতের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে দীনের শিক্ষা এবং দীক্ষা দান করে বেত্রাঘাতে মৃতপ্রায় হয়েছেন!

এসব ছিল মূলত আল্লাহর পরীক্ষা। আল্লাহ ﷻ পরীক্ষা নিয়ে তার মর্যাদা আকাশছোঁয়া করেছেন।

ইমাম আহমদ রহ. কারাবরণ করেছেন। বেত্রাঘাত সহ্য করেছেন। অতঃপর যখন মুক্ত হয়েছেন, তখন যেন লালচে স্বর্ণ আগুনে পুড়ে আরও নিরেট ও খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছেন!

আল্লাহ ﷻ বলেন–

মানুষ কি মনে করে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে– 'আমরা বিশ্বাস করি' এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরও পরীক্ষা করেছি যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন মিথ্যুকদের। [সূরা আনকাবূত : ২, ৩]

দীন ও ঈমান শুধু দাবির নাম নয়।

কবি বলেন–

দাবির পক্ষে যবে না থাকে প্রমাণ,

ওরা শুধুই দাবিদার, দাবির নেই কোন প্রাণ।

কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ ﷻ-কে ভালোবাসে, কিন্তু আযান হলে শরীয়ত সমর্থিত কারণ ছাড়া মসজিদে না যায়, তাহলে সে মুনাফিক।

কেউ যদি আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে সুসম্পর্ক বজায়ের দাবি করে, তাদের ভালোবাসার প্রচার করে, কিন্তু তার সন্তানের মৃত্যুতে আল্লাহ ﷻ-র ফয়সালা ও তকদিরের উপর ক্ষোভ আসে, অযৌক্তিক কথা বলে, তাহলে সে কেমন ঈমানদার! কোথায় তার দাবির সত্যতা? এটাই কি প্রকৃত ঈমানের পরিচয়!

প্রকৃত ঈমানের দাবি কী?

বন্ধুদের সাথে রাত জেগে আড্ডা এবং বন্ধুদের ডাকে সাড়া দেয়ার চেয়ে ঠাণ্ডা ফজরে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে বেশি তৃপ্তি পাওয়াই হল প্রকৃত ঈমানের দাবি ও চাহিদা। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

আল্লাহ বলেন, 'হে আমার বন্দারা! কোন মুমিন বান্দা যখন রাতে উঠে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে অযু করে আমাকে ডাকে, আমি তোমাদের সাক্ষ্য করছি, আমি সেই বান্দাকে ক্ষমা করে দেই। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাই। [তথ্যসূত্র পাওয়া যায়নি]

আল্লাহ ﷻ-র সাথে সততার প্রমাণ কী?

হৃদয়ের উষ্ণতা ও আবেগ নিয়ে মুমিনদের সাথে সালাতের কাতারে দাঁড়ানোই হল আল্লাহর সাথে সততার প্রমাণ। মুনাফিকরাও সালাত পড়ে– কিন্তু আল্লাহকে ভালোবেসে নয়, নিষ্ঠতা ও আত্মসমর্পণের সাথে নয়। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। [সূরা নিসা : ১৪২]

মুনাফিকরা সালাত পড়ে শিথিলভাবে। কেরাআন পড়ে শিথিলভাবে। আল্লাহ প্রেমের দাবিতে তাদের সততা নেই। নিষ্ঠতা নেই। আল্লাহ ﷻ-র প্রতি তাদের ভালোবাসা ও তাড়না নেই। এই সালাত তাদের কোনই উপকারে আসে না।

ইমাম আহমদ 'আল্লাহ ﷻ আমার প্রভু' বলার অপরাধে কারান্তরীণ হয়েছেন। আমরা তাকে প্রতিটি মজলিসে, মিম্বারে, সভা-সেমিনারে সশ্রদ্ধ স্মরণ করি। আল্লাহ ﷻ তার মর্যাদা এমনই বৃদ্ধি করেছেন।

তার প্রতিপক্ষকে আল্লাহ নিশ্চি... করেছেন। নাম-গন্ধ মুছে দিয়েছেন। তার বিরোধিতা করেছিল উযির ইবনে যাইয়াত। ইমাম আহমদ তাকে বদদোয়া দিয়েছেন। সে শাস্তি পেয়েছে। চাবুক খেয়েছে। চুলায় জ্বলে ছাই-ভস্ম হয়েছে।

আহমদ ইবনে আবু দাউদ জাহমি। শরীয়তে নানা অসঙ্গাতির উদ্ভাবনকারী। মোতাযিলাদের শীর্ষ ব্যক্তি। তার কারণে ইমাম আহমদ رحمه الله বেত্রাঘাতের অন্যায় শাস্তি ভোগ করেছেন।

ইমাম আহমদ رحمه الله বদদোয়া করেছিলেন– আল্লাহ! তার শরীরে তুমি শাস্তি দাও।

আল্লাহ ﷻ তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করলেন। শরীরের অর্ধাঙ্গা অবশ করে দিলেন।

লোকেরা আহমদ ইবনে আবু দাউদকে জিজ্ঞেস করত, 'আপনার কী অবস্থা?'

সে বলত, 'আমার শরীরের এই অংশে একটি মাছি বসলেও মনে হয় কেয়ামত হয়ে গেছে। আর শরীরের এই অংশে কেউ ছুরি দিয়ে কাটলেও কোন অনুভুতি হয় না।'

আহমদ ইবনে আবু দাউদ এই শাস্তি কেন ভোগ করেছিল? কারণ সে আল্লাহবিমুখ ছিল। সত্য অস্বীকার করেছিল। অথচ ইমাম আহমদ ﷺ আজ পর্যন্ত হাদিসের কিতাবে শত-সহস্রবার স্মরিত হচ্ছেন!

জনৈক বুযুর্গ এক জালেম উযিরের দরবারে উপস্থিত হল। উযির বুযুর্গকে একটি চড় কষিয়ে বসিয়ে দিলেন। বুযুর্গ আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন— 'আল্লাহ! সে আমাকে আঘাত করেছে, তুমি তার হাত কেটে দাও।'

আল্লাহ ﷻ বুযুর্গকে মূলত পরীক্ষা করলেন। বুযুর্গ আল্লাহ ﷻ-র কাছেই অনুযোগ করেছেন। আল্লাহ উযিকে আরেক জালেমের সামনে ফেললেন। জালেম তার ডান হাত কেটে দিল। উযির তখন আক্ষেপ করে কবিতায় বলতে লাগল—

ডান হাত কেটে গেল, আর নেই বেঁচে থাকার স্বাধ।

হায় জীবন! আমার ডান হাত গেল, আর কী আছে আমার!

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ। আল্লাহ তাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষায় নিপতিত করেছিলেন। তার মান-সম্ভ্রবে নির্লজ্জ অবাস্তব অসত্য অপবাদ দেয়া হয়েছিল।

তিনি আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকতেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াত দিতেন। মানুষের আকীদা-বিশ্বাস ঠিক করে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আহ্বান করতেন। এসবের কারণে তিনি কারান্তরীণ হয়েছিলেন!

তাকে যখন জেলে দেয়া হল, দরজা বন্ধ করে দেয়া হল। তিনি প্রহরীর দিকে তাকিয়ে তেলাওয়াত করতে লাগলেন—

> অতঃপর উভয় দলে মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর। যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব। [সূরা হাদিদ : ১৩]

ইবনে তাইমিয়া ﷺ-কে সমকালের সুলতান সালজুকির কাছে উপস্থিত করা হল। সুলতান তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইবনে তাইমিয়া! আপনি নাকি আমার রাজত্ব ছিনাতে চাচ্ছেন?'

ইবনে তাইমিয়া ﵀ হাসলেন। তার অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি চান আখেরাত। আল্লাহর খাযানা। দুনিয়া তার দৃষ্টিতে তুচ্ছ। নগণ্য। মসজিদে তিনি যে মজলিস করতেন, দুনিয়া তার অর্ধেক সময়ের মূল্যমানও নয়।

ইবনে তাইমিয়া ﵀ বললেন, 'আল্লাহর কসম! আপনার রাজত্ব, আপনার বাপ-দাদার রাজত্ব আমার কাছে এক পয়সারও সমমান নয়।'

অদ্যাবধি ইবনে তাইমিয়া বেঁচে আছেন। তার অসংখ্য নিদর্শন, রচনা ও কিতাব আজও মুসলমানের অন্তরে জীবিত হয়ে আছে। কিন্তু পৃথিবী থেকে সেই সালজুকি সুলতানের নাম-পরিচয় নিশ্চি... হয়ে মুছে গেছে।

আল্লাহ ইবনে তাইমিয়ার মর্যাদা উঁচু করেছেন। তিনি তখন একা ছিলেন। কারণ তিনি আল্লাহর এবাদত করেছেন। আনুগত্য করেছেন। অথচ সুলতানের সৈন্য-সামন্ত কত কিছু ছিল। সবসহ তিনি ধরাপৃষ্ঠ থেকে অজ্ঞাত হয়ে গেছেন।

যত মানুষ বিপদে নিপতিত হয়ে সবর করেছেন, ধৈর্য ধরেছেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, আল্লাহ ﷻ তাদের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। সম্ভ্রব বৃদ্ধি করেছেন। পরীক্ষিত বান্দারা কেয়ামত পর্যন্ত অগুণতি মানুষের দোয়ায় সপ্রশংস স্মরিত হন।

পরীক্ষায় নিপতীত হওয়ার ফায়দা

এক.

আল্লাহ ﷻ-র সাহায্য প্রাপ্তির স্বাধ। বিজয়ের সুখ।

কত সাহাবি অসহায় ছিলেন। রিক্ত ছিলেন। আল্লাহ ﷻ সাহায্যের মাধ্যমে তাদের চক্ষু শীতল করেছেন। সে মানুষ কত সৌভাগ্যবান, যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে, খরচ করছে, দান-সদকা করছে। অবশেষে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে বিজয়ী হচ্ছে!

বিলাল ইবনে রাবাহ ﵁। মূর্তিপূজকদের থেকে তিনি কতটা অপদস্থ হয়েছেন, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ ﷻ জানেন, বিলাল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর বিশ্বাসী। বিলাল সালাত আদায়কারী। আখেরাতে সফলতা প্রত্যাশী। মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে টেনে

হেঁচড়ে বুকে পাথর চাপা দেয়া হচ্ছে, তবু তার মুখ থেকে বের হচ্ছে– 'আহাদ, আহাদ' 'আল্লাহ এক, আল্লাহ এক'।

আল্লাহ ﷻ চাইলেই ঐ পাপিষ্ঠ জালিমদের ধ্বংস করতে পারতেন। বিলালকে মুক্তি দিতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ ﷻ বিলালকে পরীক্ষার একটি পাঠ শিখাতে চাইলেন। অতঃপর আল্লাহ বিলালকে বিজয় দান করলেন। ঈমানকে কুফরের উপর বিজয়ী করলেন। বিলালের একিন ও বিশ্বাসকে তাগুতের উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। বিলাল আল্লাহর হেদায়াতে পথপ্রাপ্ত হলেন। বিলাল এখন সফল লোকদের সর্দার। আমাদের মাঝে আজও প্রসিদ্ধ। আর মূর্তিপূজকরা বিফল। ব্যর্থ মনোরথ।

বিলাল ছিলেন ইসলামের মুয়াযযিন। বিশ্ব মুসলিম আজ বিলালকে চেনে।

কবি বলেন–

বিলালের আযান,

যে আযানে প্রাণ পায় হাজার আযান।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল ﷺ বিলালকে আযান দিতে বললেন। বিলাল তাওহিদের স্তম্ভ কাবায় উঠে আযান দিলেন। তাগুত ও ভ্রষ্টতার নেতৃ-মুশরিকদের ক্ষেপানোর জন্য রাসূল বিলালকে কাবায় উঠালেন। রাসূল তাদের বোঝালেন– দেখ, যে গোলাম তোমাদের কাছে একটাকার মূল্যমানের নয়, সে আজ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সুবাদে সবার সর্দার!

দেখ এই পবিত্র আল্লাহভীরু মুমিনকে, যে আজ কাবা চড়ে মানুষের কানে কানে তাওহিদের যবানে আযান ফুঁকছে!

দেখ, যাকে তোমরা পাথরের উপর টানা-হেঁচড়া করতে, প্রহার করতে, গালমন্দ বলতে, অপদস্থ করতে, সে আজ বিজয়ের আযান দিচ্ছে!

এ দুনিয়া শুনুক বিলালের আযান–

এ যুগ শুনুক, মন দিয়ে শুনুক বিলালের আযান–

সত্য হৃদয়ের দৃঢ়বল বিলাল!
আমাদের আনন্দ দাও তুমি সত্য মুসল্লী

তাওবার পানি দিয়ে ধুয়ে দাও, তুমি নিষ্ঠ মুসল্লী

যেন পাবো মোরা অষ্টস্বর্গের রাজতোরণ...

আল্লাহ ﷻ বিলালকে কীভাবে পরীক্ষা করলেন। বিলাল সবর করলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আল্লাহ ﷻ তাকে চিরকালের জন্য সম্মানী করলেন।

এই হল বিজয়। এই হল আল্লাহর সাহায্য।

দুই.

মহাপ্রতিদান। পরীক্ষিত বান্দার জন্য আল্লাহ ﷻ-র মহাপ্রতিদান।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-র কাছে গেলাম। তখন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত।’

তিনি বললেন, ‘হাঁ। তোমাদের দু’ব্যক্তি যতটুকু জ্বরে আক্রান্ত হয়, আমি একাই ততটুকু জ্বরে আক্রান্ত হই।’

আমি বললাম, ‘এটি এ জন্য যে, আপনার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।’

তিনি বললেন—

> হাঁ ব্যাপারটি এমনই। কেননা যে কোন মুসলিম মুসিবতে আক্রান্ত হয়, চাই তা একটি কাঁটা কিংবা আরো ক্ষুদ্র কিছু হোক না কেন, এর দ্বারা আল্লাহ তার গোনাহগুলো মুছে দেন, যেভাবে গাছ থেকে পাতাগুলো ঝরে যায়। [বুখারি : ৫৬৪৭]

পরীক্ষার সাথে আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে রয়েছে সাওয়াব ও প্রতিদান। আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে যে পরীক্ষাই আসুক, চিন্তা, পেরেশানি, দুঃখ-কষ্ট, এমনকি সূর্যের তীব্রতাই হোক না কেন, তাতে সবর করা চাই। এতে থাকবে আল্লাহ ﷻ পক্ষ থেকে প্রতিদান। বেশুমার সাওয়াব।

তিন.

সম্মান। উচ্চ মর্যাদা।

আল্লাহ ﷻ মানুষকে বিপদ দিয়ে, মানুষের পরীক্ষা নিয়ে তাকে ছোট করতে চান না। তাকে মহান করতে চান। কেউ যদি আখেরাতের প্রতিদান চায়, আল্লাহ ﷻ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান।

চার.

শিক্ষা গ্রহণ।

আল্লাহ ﷻ মানুষকে বিপদ দিয়ে দাসত্বের পাঠদান করান। যে পাঠ কখনও ভুলার নয়। কারণ বিপদ ও পরীক্ষায় পতীত হয়ে মানুষ ছোট হয়ে আসে। বিনীত হয়ে আসে। চরিত্র সংশোধন করে নেয়। অনেক অজ্ঞ মানুষ এমন আছে, যারা অসুস্থ হলে আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যের বেড়ি গলায় পরে নেয়।

পাঁচ.

সবরের দীক্ষা।

রাসূল ﷺ-র পক্ষ থেকে সবচে গুরুত্বপূর্ণ পাঠদান হল সবরের পাঠ।

ইমাম আহমদ رحمه الله বলেন, আমি কোরআনে সবর নিয়ে গবেষণা করলাম। নব্বইয়ের অধিক জায়গায় সবরের উল্লেখ হয়েছে।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, যে সবরের বাহনে চড়তে পারে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

ওমর رضي الله عنه বলেন, আমরা সবচে উত্তম জীবনোপকরণ পেয়েছি সবর।

অনেকে বলেন, যখন আমরা সবর করি, মুক্তি পাই। সফল হই। যে সবর করে না, তার কোন প্রাপ্তি নেই। প্রাজ্ঞতা নেই। তার জীবনের সুন্দর পরিসমাপ্তি নেই। সুবিন্যস্ত কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই।

পাঠক! যে কোন বিপদে আসুন ধৈর্য ধারণ করি। আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশা রাখি। সুহাইব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন–

> মুমিনের বিষয়টি বিস্ময়কর। তার যাবতীয় ব্যাপারই তার জন্য কল্যাণকর। এ বৈশিষ্ট্য মুমিন ছাড়া আর কারো নেই। যদি তার সুখ-শান্তি আসে তবে সে শোকর আদায় করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। যদি দুঃখ মুসিবত আসে তবে সে সবর করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর। [মুসলিম : ২৯৯৯]

সুতরাং আসুন! সর্বাবস্থায় সবর করি। বন্ধু-স্বজন হারানোর বেদনায়, শরীরের কোন অঙ্গ বিকল হওয়ার যন্ত্রণায় সবর করি। ধৈর্য ধরি। ইনশাআল্লাহ, সাহায্য সাথে আসবেই।

লক্ষণীয় হল, আল্লাহ ﷻ-র কাছে সবসময় নিরাপদ থাকার দোয়া করতে হবে, বিপদ ও পরীক্ষা আসার দোয়া নয়। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, 'চাচা! আমি আপনাকে ভালোবাসবো না!'

অপর বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه রাসূলকে বললেন, 'আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন। আমি তা পড়ে আল্লাহকে ডাকবো।'

রাসূল ﷺ বললেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করি। [প্রাগুক্ত]

বর্ণিত হয়েছে, জনৈক আনসার সাহাবি দোয়া করেছিলেন, 'আল্লাহ, তুমি যদি আখেরাতে আমাকে শাস্তি দাও, তবে তা দুনিয়াতেই দিয়ে দাও। তুমি আজই আমাকে সেই শাস্তি দিয়ে দাও।'

দোয়ার পর সাহাবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার প্রভাবে শীর্ণকায় হয়ে পড়েন।

রাসূল ﷺ তাকে দেখতে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কোন কিছু বলে দোয়া করেছ?'

সাহাবি বললেন, 'আমি এই দোয়া করেছি– 'আল্লাহ, তুমি যদি আখেরাতে আমাকে শাস্তি দাও, তবে তা দুনিয়াতেই দিয়ে দাও। তুমি আজই আমাকে সেই শাস্তি দিয়ে দাও।'

রাসূল ﷺ বললেন–

সুবহানাল্লাহ! তুমি আল্লাহর আযাব সহ্য করতে পারবে! তুমি এই দোয়া কর–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে পরোয়ারদিগার! আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর। আমাদের দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। [সূরা বাকারা : ২০১] [প্রাগুক্ত]

আসুন! আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করি। যেন আমরা নিরাপত্তার চাদরে আবৃত থাকি। জানি না, এমন বিপদে পতীত হবো, যা সহ্য করতে পারবো না। সবর করতে পারবো না।

আল্লাহ ﷻ আমাদের সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রেখো।

আমাদের জন্য সহজ ও সর্বোত্তম ফয়সালা রেখো।

আমাদের সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ কল্যাণ দান করো। জীবনযাপনে স্বাচ্ছন্দময় করো। সময়ে সৌভাগ্যময় করো।

আল্লাহ! তুমি আমাদের উভয় জগতে অভিভাবক হও। সকল বিষয়ে সুন্দর পরিসমাপ্তি দাও। আমিন।

তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করবো

হে কল্যাণময় আল্লাহ! আমাদের সকল ভালো কথার চেয়ে উত্তম প্রশংসা তোমার জন্য। আমাদের ভালো কথার অনুরূপ, বরং তারও উর্ধ্বের প্রশংসা তোমার জন্য। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমাদের ঈমানের প্রশংসা তোমার জন্য। ইসলামের প্রশংসা তোমার জন্য।

তোমার মর্যাদা দুর্মূল্য। তোমার প্রশংসা সমুচ্চ। তোমার নামগুলো পবিত্র।

তোমার কাছে গেলে ভালোবাস। তোমার কাছে সাহায্য চাইলে সাহায্য কর। তোমার ভরসা করলে যথেষ্ট হও।

যে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তুমি তাকে লাঞ্চিত কর। বিরোধিতা করলে তার কপটতা ও প্রকৃত রূপ প্রকাশ কর। স্বরূপ উন্মোচন কর। মুখোশ খুলে দাও।

কল্যাণের নিশান, মানবজাতির আলোকবর্তিকা, মূর্তিপূজকদের অস্তিত্বে কম্পন সৃষ্টিকারী হযরতের উপর দুরূদ ও সালাম। তার পরিবার-সহচরদের উপর অসংখ্য অগুণতি সালাম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> মানুষ কি মনে করে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে– 'আমরা বিশ্বাস করি' এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরও পরীক্ষা করেছি যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন মিথ্যুকদের। [সূরা আনকাবূত : ২, ৩]

আল্লাহ ﷻ-র পছন্দনীয় নেককার আলেম দাঈ সৌভাগ্যবানরা যেন না ভাবে, ইসলাম শুধু মুখে দাবি করার নাম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু নিয়ে কে সত্য দাবি করে, কে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, আল্লাহ ﷻ তা জানেন।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চি... হয়ে যায়। তোমরা যা বলছ, তার জন্য তোমাদের দুর্ভোগ। [সূরা আম্বিয়া: ১৮]

আল্লাহ ﷻ ছড়িয়ে পরা মিথ্যার উপর সত্যকে নিক্ষেপ করেন। রটিত বাতিল এবং বাতিল বক্তব্যের উপর সত্য নিক্ষেপ করেন। এভাবে বাতিল ও মিথ্যাকে মিটিয়ে দেন। বাতিল ও মিথ্যা পর্যবসিত হয়। তোমরা যে বস্তু আল্লাহ ﷻ-র জন্য সাব্যস্ত করছ, আল্লাহ ﷻ-র ব্যাপারে যা বলছ, ধারণা করছ, এজন্য তোমাদের দুর্ভোগ।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

বলুন, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। [সূরা ইসরা : ৮১]

আমি তোমাদের মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। [সূরা আম্বিয়া : ৩৫]

আমি তোমাদের একজনকে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। দেখি তোমরা সবর কর কিনা। আপনার পালনকর্তা সব কিছু দেখেন। [সূরা ফুরকান : ২০]

এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের– যখন তারা বিপদে পতীত হয় তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সব লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে। এবং এসব লোকই হেদায়াতপ্রাপ্ত। [সূরা বাকারা: ১৫৫-১৫৭]

ইসলাম মানুষের ভিতর এমনিতেই পূর্ণাঙ্গ হয় না। পরীক্ষার মাধ্যমে ইসলাম মানুষের কাছে আসে। পরীক্ষায় নিপতিত লোকরাই এই দীনে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রবেশ করতে পারে। আল্লাহ ﷻ তাদের সত্যতা প্রকাশ করেন। তাদের স্থিতি জানেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর।' তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী! অতঃপর ফিরে এলো মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হল না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট। [সূরা আলে ইমরান : ১৭৩, ১৭৪]

কবি বলেন–

শত্রু আমায় বিপদে ফেলেছে;

আমার অন্তর আক্রান্ত তীরন্দাজের আক্রমণে।

আমায় এক বর্শা আক্রমণ করে বিচূর্ণ হয়েছে অসংখ্য বর্শা।

আমি আছি আমারই মত;

বিপদের কোন পরোয়া নেই। পরোয়া করেও কোন লাভ নেই।

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, হে দুর্বলমনা! নূহ আলাইহিস সালাম রাস্তায় রাস্তায় আর্তনাদ করে ফিরেছেন। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম জবাই হয়েছেন। যাকারিয়া আলাইহিস সালাম হত্যা হয়েছেন। ওমর জবাই হয়েছেন। উসমান রক্তে রঞ্জিত হয়েছেন। আলি হত্যা হয়েছেন। ইমামগণ কারাবন্দী হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য ওলামায়ে কেরাম বেত্রাঘাতে আহত হয়েছেন। কারাবন্দী হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

মানুষ কি মনে করে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে– 'আমরা বিশ্বাস করি' এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরও পরীক্ষা করেছি যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন মিথ্যুকদের। [সূরা আনকাবূত: ২, ৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে আল্লাহর কাছে মিনতি করে বলতেন–

আল্লাহ! তুমি সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য। জান্নাত সত্য। দোযখ সত্য। সকল নবি সত্য। মোহাম্মদ সত্য। [বুখারি : ১১২০]

আল্লাহ তাআলা বলেন–

হে নবি! আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ যথেস্ট। [সূরা আনফাল : ৬৪]

অর্থাৎ, আল্লাহই তোমার জন্য যথেস্ট।

কবির ভাষায়–

ওগো আল্লাহ আমার আশার আধার, লক্ষ-কোটি কৃপা তোমার,

আমায় রক্ষা করেছো। ...

তুমি আমায় রক্ষা করে জালিমমনে ভয়ের ভয়াল আঁধার দিয়েছো।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে, যদিও পাপীদের তা মনঃপুত নয়। [সূরা ইউনুস : ৮২]

এবং কাফেররা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী। [সূরা আলে ইমরান : ৫৪]

নিশ্চয় চক্রান্ত করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা, অতঃপর আল্লাহ তাদের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। এরপর উপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ ধ্বসে পড়েছে এবং তাদের উপর আযাব এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণাও ছিল না। [সূরা নাহল : ২৬]

কবির ভাষায়–

আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরো,

পৃথিবীর সকল সাহায্যস্থল বিশ্বাসভঙ্গা করলেও আল্লাহ আছেন বিশ্বাসের স্তম্ভ,

আল্লাহ আছেন সদা-সর্বত্র।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

আমি সাহায্য করবো রাসূল ও মুমিনদের পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিন। সেদিন জালেমদের ওযর-আপত্তি কোন উপকারে

আসবে না। তাদের জন্য থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্য থাকবে মন্দ গৃহ। [মুমিন: ৫১- ৫২]

পৃথিবীতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আসার পর থেকে মুমিনদের পরীক্ষায় নিপতীত হওয়ার ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। নূহ عليه السلام পরীক্ষিত হয়েছেন। ইবরাহীম, মুসা, ঈসা عليه السلام পরীক্ষিত হয়েছেন। তাদের জীবন থেকে শিক্ষণীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হল।

মুসা عليه السلام। নির্মল প্রকৃতির একজন মানুষ। তাওহিদের রাসূল। ফেরাউন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল–

মুসা! তোমাদের পালনকর্তা কে? [সূরা ত্বাহা : ৪৯]

মুসা عليه السلام বললেন–

আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। [সূরা ত্বাহা: ৫০]

মুসা عليه السلام জীবনে অত্যন্ত তিক্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তার সততা, সদুপদেশ ও মর্যাদার উপর কী হীন চক্রান্ত করা হয়েছে!

কারুন। মোটা অঙ্কের মূল্য দিয়ে এক লম্পট মহিলাকে ভাড়া নিল মুসা عليه السلام-র চরিত্রে কালিমা লেপনের জন্য। তারা চক্রান্ত করল, মুসা عليه السلام জনসম্মুখে ভাষণে দাঁড়ালে মহিলা সবার সামনে চেঁচামেচি করবে। কাপড় ছিঁড়ে, চুল ছিড়ে, বিলাপ করে, কসম করে বলবে– মুসা তার চরিত্র হরণ করেছে!

মুসা عليه السلام জনসম্মুখে দাঁড়ালেন। ঈমান ও তাওহিদের আলোচনা শুরু করলেন। কারুন তার দাওয়াত নিষ্ফল করে মাটিতে মিশিয়ে দেয়ার অপেক্ষা গুণছে। মানুষ যেন আবার তার দিকে না ঝোঁকে, তাকে যেন বিশ্বাস না করে, সেই পরিকল্পনায় কারুন মুসা عليه السلام-র পথ ও পন্থা কলুষিত করার চেষ্টায় প্রমত্ত হয়ে আছে। কিন্তু–

আল্লাহ অবশ্যই তার নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। [সূরা তাওবা : ৩২]

আল্লাহ ﷻ-র নূরই প্রতিষ্ঠিত হবে। তার রেসালাতই প্রতিষ্ঠা পাবে। তার রাসূলেরই বিজয় হবে। তার পথই অবশিষ্ট থাকবে।

মুসা ﷺ কথা বলছেন। হঠাৎ মহিলার ক্রন্দন শুরু হল। মহিলা নিজের মুখে থাপড়াতে শুরু করল। এ হল সেই মিথ্যা ঘৃণ্য পরিকল্পনার প্রকাশ, যা ইসলাম বিদ্বেষী, আলেম ও দাঈ বিদ্বেষী কুমতলবীরা গ্রহণ করেছিল।

মুসা ﷺ চুপ করলেন। মহিলার দিকে তাকিয়ে দ্বিধান্বিত হলেন। কেঁদে ফেললেন।

মুসা ﷺ, আল্লাহ তাকে রেসালাতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি করবেন এই ঘৃণ্য কর্ম! তিনি বুঝে ফেললেন, এটি আল্লাহর পরীক্ষা।

মুসা তার লাঠি মহিলার সামনে উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি এ কাজ করেছি?'

মহিলা উত্তর দিল, 'না।'

অতঃপর মহিলার সব কুপরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেল।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> হে মুমিনগণ, মুসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়ো না। তারা যা বলেছিল, আল্লাহ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে ছিলেন মর্যাদাবান। [সূরা আহযাব : ৬৯]

এই ঘটনায় মুসা ﷺ-র মর্যাদ আরও বেড়ে গেল। তিনি সত্যবাদী। তার দাওয়াত আরও প্রতিষ্ঠিত হল। তার শক্তি আরও বৃদ্ধি পেল।

ইউসুফ ﷺ। মুসা ﷺ-র পূর্বে তাকেও বাদশাহর স্ত্রীর সাথে অপকর্মের অপবাদ দেয়া হয়েছিল। ইউসুফ ﷺ-কে অপবাদ দিয়ে কারান্তরীণ করা হয়েছিল। তিনি তখন বলেছিলেন–

> হে আল্লাহ! তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চেয়ে আমি কারাগারই পছন্দ করি। [সূরা ইউসুফ : ৩৩]

ইউসুফ ﷺ সাত বছর কারন্তরীণ ছিলেন। তিনি এই পরীক্ষায় সবর করেছিলেন। আল্লাহ ﷻ জানেন, তিনি সত্যবাদী। আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ। আল্লাহ ﷻ তাকে মুক্তি দিলেন। মিশরভূমিতে তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

রাত যত গভীর হয়, ভোর ততই নিকটবর্তী হয়। আল্লাহ ﷻ-ই মানুষকে বিপদ থেকে মুক্তি দেন।

রাসূল ﷺ সবসময় অপবাদ সন্দেহ এবং গুজবের মধ্যেই অবস্থান করতেন। ইফকের ঘটনা রাসূলকে দীর্ঘ একমাস তাড়িয়ে চলেছিল। ইহুদিদের প্রেতাত্মা ইসলাম বিরোধী কুমতলবীরা রটিয়েছিল– আয়েশা رضي الله عنها অপকর্মে লিপ্ত হয়েছেন!

না। আল্লাহর কসম! কখনই তিনি অপকর্মে লিপ্ত হতে পারেন না। আয়েশা رضي الله عنها সত্যবাদী। একজন সত্যবাদীর মেয়ে। সাত আকাশ উপর থেকে তার পবিত্রতার ঘোষণা হয়েছে। তিনি পবিত্র। পবিত্রতার তিলোত্তমা। এভাবেই সত্যকে কলুষিত করা হয়, কিন্তু আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আমি সাহায্য করবো রাসূল ও মুমিনদের পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিন। [সূরা মুমিন : ৫১]

> ধৈর্য ধারণ করো। তোমার ধৈর্য হবে আল্লাহর সাহায্যে। [সূরা নাহল: ১২৭]

রাসূল ﷺ-র কাছে এই সংবাদ আসল। তিনি ঘরেই অবস্থান করলেন। তার চোখ থেকে অশ্রু শুকায়নি এক মুহূর্তও। এই অশ্রু ছিল রাসূলের প্রতি জুলমের অশ্রু। এই অশ্রু যার চোখ থেকে ঝরে, সেই বুঝে এর জ্বালা। আল্লাহ ﷻ তাকে এই জ্বালা সহ্য করার সক্ষমতা দান করেছিলেন।

শাফেঈ رحمه الله মালিক رحمه الله-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'বান্দাকে পরীক্ষা করা হয়, নাকি বিপদ সহ্য করার ক্ষমতা দেয়া হয়?'

মালিক رحمه الله বললেন–

> কেউ পরীক্ষায় নিপতীত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে সক্ষমতা দেয়া হয় না। 'তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম। যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে অগাধ বিশ্বাসী ছিল। [সূরা সাজদা : ২৪]

একজন মানুষের ঘরে আগুন লেগে সব জ্বলে গেলেও তা সহনীয়।

সন্তান-সন্ততি, চাকুরি খোয়া গেলেও তা সহনীয়।

কিন্তু সে তুলনায় একজন মুসলমানের ব্যক্তি বা স্ত্রীর ইযযত ও সম্ভ্রবে কালিমা লেপন হলে তা অসহনীয়। কারণ, সুনাম সুখ্যাতি নষ্ট হলে তা অনেক কিছুই বরবাদ করে দেয়।

রাসূল ﷺ-র সম্ভ্রবে কালিমা লেপন হয়েছে। তা ছিল রাসূলের জীবনে সবচে ভয়াবহ পরীক্ষা।

রাসূল ﷺ পূর্ণ একমাস মুমিনদের জন্য সর্ববিনাশী মুনাফিকদের আরোপিত এই অপবাদ থেকে মুক্তির জন্য অহির অপেক্ষা করলেন। একমাস পর জিবরাঈল عليه السلام অহি নিয়ে আসলেন–

> যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু আছে, যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে এটা তো নির্জলা অপবাদ! [সূরা নূর : ১১, ১২]

অনেকেই এই রটনাকে নির্জলা অপবাদ বলেনি। কারণ, একটি কথা যখন রটে গিয়েছে, তখন তা ভুল বলে কে নিশ্চিত করবে! কে মানুষদের তা মিথ্যা বলে প্রমাণ করবে!

উকবা ইবনে হারিস رضي الله عنه বর্ণনা করেন, তিনি আবু ইহাব ইবনে আযিয এর মেয়েকে বিয়ে করলে তার কাছে এক মহিলা এসে বলল, 'আমি উকবাকে এবং তার বিবাহিত কন্যাকে দুধ পান করিয়েছি।'

উকবা رضي الله عنه তাকে বললেন, 'আমি জানি না তুমি আমাকে দুধ পান করিয়েছ। ইতিপূর্বে তুমি আমাকে এ কথা জানাও নি।'

এরপর তিনি মদিনায় রাসূলের কাছে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

রাসূল ﷺ তাকে বললেন– 'একথার পর তুমি কিভাবে তার সঙ্গে সংসার করবে?' ... [বুখারি : ৮৮]

যখন একটি কথা রটে যায়, তখন তা ভুল বলে কে নিশ্চিত করবে! কে মানুষদের তা মিথ্যা বলে প্রমাণ করবে!

কবি বলেন–

যখন বলা হয়– এটি সত্য। এটি মিথ্যা।

তোমার আর কী অযুহাত, যখন এটি রটে যায়!

ইসলামই আসল পথ। মাথা বিলিয়ে দেয়ার পথ। রক্ত ঝরানোর পথ। মাল-সম্পদ ব্যয় করার পথ। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে। অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তার সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। [সূরা তাওবা : ১১১]

বিপদাপদ আমাদের যে বার্তা দেয়–

এক.

পরীক্ষাগ্রহণ আল্লাহ ﷻ-র একটি কর্মপদ্ধতি। এর মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ সত্য ও মিথ্যাবাদীর পার্থক্য নিরূপণ করেন। মুমিন ও মুনাফিকের পরিচয় প্রকাশ করেন। ঈমান ও সত্যের পথ যদি খুবই সহজ করা হত, তবে যে কেউ নিজেকে মুমিন ও সত্যবাদী দাবি করে বসে থাকত।

আল্লাহ ﷻ সত্যবাদীদের অবশ্যই প্রকাশ করবেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযি বান্দাদের বিজয় দিবেন। আল্লাহ ﷻ তার বন্ধুদের কখনই অপদস্থ করবেন না।

হেরা গুহায় প্রথম যখন রাসূল ﷺ-র কাছে অহি এল, তিনি ফেরেশতা দেখলেন এবং ভয় পেলেন। রাসূল খাদিজা رضي الله عنها এর কাছে এলেন। তখন রাসূলের অন্তর কাঁপছিল। তিনি খাদিজা রাযি. কে বললেন, ‘আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও’, ‘আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও’।

তারা রাসূলকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। রাসূল খাদিজা ﵂-কে বললেন, 'আমার নিজের উপর আশঙ্কাবোধ করছি।'

খাদিজা ﵂ বললেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনও অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন। অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন। নিঃস্বকে সাহায্য করেন। মেহমানের মেহমানদারী করেন। দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। [বুখারি : ৪]

আল্লাহ ﷻ নামাযি বান্দাদের কখনই অপদস্ত করবেন না। কোরআন হাদিসের অনুসারী, তাসবিহ আদায়কারী, রোযা ও তাহাজ্জুদ আদায়কারী, আল্লাহর সাথে সত্য আচরণকারীদের আল্লাহ ﷻ কখনই অপমানিত করবেন না। কখনই না।

আল্লাহ ﷻ বেঈমানদের পঙ্কিলময় করেন। যারা আল্লাহর শত্রু, সালাত কোরআন মসজিদ রাসূলের সুন্নত আল্লাহর সাথে সততা এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে যারা আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে, আল্লাহ ﷻ তাদের অপমানিত করেন।

আবু বকর ﵁ বলেন, সৎকর্মশীলরা অসৎ ঘাঁটি থেকে বেঁচে থাকে।

যে সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাকে অপদস্তদের স্থান থেকে হেফাযত রাখেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদের আমার পতে পরিচালিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন। [সূরা আনকাবূত : ৬৯]
>
> আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারীদের এবং সবরকারীদের এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই না করি। [সূরা মোহাম্মদ : ৩১]

দুই.

পরীক্ষা আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে মুসলিম জাতির জন্য শুদ্ধাভিযান। আল্লাহ ﷻ এর মাধ্যমে জেনে নেন, কে সৎকর্মশীলদের কলঙ্কিত করতে চায়। দীনের দাঈ, আলেম, ছাত্র এবং শীর্ষ ব্যাক্তিদের সুনাম কলুষিত করতে চায়।

আল্লাহ ﷻ জেনে নেন, কারা মুমিনদের মধ্যে অন্যায়-অশ্লীলতা প্রচার করতে চায়। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> যারা পছন্দ করে যে ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। [সূরা নূর : ১৯]

তিন.

পরীক্ষার আরেকটি রহস্য হল আল্লাহ ﷻ-র পছন্দনীয় বান্দাদের গোনাহ মাফ করা। যাদের থেকে ভুল-ত্রুটি অনুচিত, তাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করা। আল্লাহ ﷻ পরীক্ষা দ্বারা তাদের সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহ! আমাদের সাদিকীনদের স্তর দান করো– যারা গোনাহ করে ক্ষমা চায়। নেয়ামত পেয়ে শোকরিয়া জ্ঞাপন করে। বিপদে সবর করে।

সাহাবায়ে কেরাম উসমান رضي الله عنه-কে বলেছিলেন, 'আপনি রাসূলের কাছে যান। রাসূল আপনার জন্য অনাগত বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতপ্রাপ্তির দোয়া করেছেন।'

উসমান رضي الله عنه বললেন, 'আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি।' [বুখারি : ৩৬৭৪]

ইবনে তাইমিয়া رحمه الله কারাভোগ করেছিলেন। কারাগারে নেয়ার পর যখন দরজা বন্ধ করা হল, তিনি তেলাওয়াত করলেন–

> অতঃপর উভয় দলে মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর। যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব। [সূরা হাদীদ : ১৩]

কারাভোগ করে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে আপনার?'

তিনি বললেন,

'আত্মারা মরে যায় ব্যাধিতে, জানে না সে কিসে কল্যাণ!
আত্মার অনুযোগ অবন্ধুরে, জীবনের সে তো এক বেইনসাফ!'

পরীক্ষা আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে বান্দার পাপমোচন। কাপড় থেকে ময়লা যেমন পরিষ্কার হয়, পরীক্ষা তেমনই বান্দার জীবনের ময়লাগুলোর পরিষ্করণ। পরীক্ষা দ্বারা অন্তর ধুয়ে যায়। জীবনের পথ-ঘাটে অনিবার্য সুনাম সুখ্যাতি এবং লৌকিকতার ময়লা দূর হয়ে যায়।

রাসূল ﷺ বলেন, 'মুমিনের বিষয়টি বিস্ময়কর। তার যাবতীয় ব্যাপারই তার জন্য কল্যাণকর। এ বৈশিষ্ট্য মুমিন ছাড়া আর কারো নেই। যদি তার সুখ-শান্তি আসে তবে সে শোকর আদায় করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। যদি দুঃখ মুসীবত আসে তবে সে সবর করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর।'

চার.

ইসলাম বিজয়ী। ইসলামি জীবন বিজয়ী। জীবনপথে অনেক বাধা-বিপত্তি ও জটিলতা থাকে, যার সম্মুখীন হয়ে মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। এমনও অনেক প্রেক্ষাপট জীবনে থাকে, যার রহস্য উন্মোচনে শয়তান সব দরজা-জানালা, সর্বদিক থেকে অপারগ হয়ে যায়।

> আমরা আমাদের এ সকল বিষয় যেন আল্লাহর কাছেই সমর্পণ করতে পারি। আল্লাহর কৌশল ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া আমাদের কোন ভরসা নেই। নূহ বলেছিলেন, 'আমি পরাজিত। আমায় সাহায্য কর। [সূরা কামার : ১০]

কবির ভাষায়–

ছেড়ে দাও সব উপায় অবলম্বন

এটাই তোমার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

পাঁচ.

পরীক্ষা দ্বারা ইসলামের শত্রু ও তাদের চক্রান্তের মুখোশ উন্মোচিত হয়। আমরা দেখতে পাই, তাদের চক্রান্ত একদিক থেকে হয় না, বরং হত্যা, জেল-জুলুম, দেশান্তর, সুনাম-সুখ্যাতিতে কালিমা লেপন, মিথ্যা অপবাদ সবকিছু দিয়ে তাদের চক্রান্ত অব্যাহত থাকে। পরিশেষে তাদের এসব চক্রান্ত বিফলে যায়।

> ফেনা তো শুকিয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। [সূরা রাদ : ১৭]

ছয়.

আল্লাহ ﷻ-র সাহায্যে বান্দা বিপদ থেকে উদ্ধার হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। হোঁচট সামলে নবউদ্যমে ঘুরে দাঁড়াবে। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত, তবে তারাও তোমাদের মতই আঘাতপ্রাপ্ত। এবং তোমরা আল্লাহর কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। [সূরা নিসা: ১০৪]

সাত.

বিপদের সাহায্য আল্লাহ ﷻ-র হাতে। মর্যাদা ও সম্মান তার ছায়ায়। সুতরাং বান্দা যখন বিপদে পরবে, আল্লাহর কাছে নত হবে। আল্লাহ ﷻ-র কাছে ঠিকানা খুঁজবে। তার সামনেই সমর্পিত হবে।

রাসূল ﷺ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما-কে উপদেশ দিয়ে বলেন–

> তুমি আল্লাহর বিধান রক্ষা করো, আল্লাহ তোমাকে সুরক্ষা দিবেন। তুমি আল্লাহর বিধান প্রতিপালন করো, আল্লাহকে তোমার কাছেই পাবে। তোমার কোন সাহায্যের কথা শুধু আল্লাহকেই বলো। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আল্লাহর কাছেই হাত তোলো। শোনো, পৃথিবীর সকল মানুষ তোমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হলেও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা তোমার কোন সাহায্য করতে পারবেনা। পৃথিবীর সকল মানুষ তোমার ক্ষতি করার জন্য প্রস্তুত হলেও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। মানুষের ভাগ্য সুস্থির, লিপিবদ্ধ। [প্রাগুক্ত]

আল্লাহর কসম! দুনিয়াবাসী একত্র হয়ে কারও বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেও যতক্ষণ আল্লাহ সাথে আছেন, কিছুই হওয়ার নয়।

দুনিয়াবাসী একত্র হয়ে কারও সাহায্য করলেও আল্লাহ যদি বিরুদ্ধে থাকেন, কোনই সাহায্য করতে পারবে না।

যে শক্তি কখনও পরাজিত হয় না, সে শক্তি আল্লাহর।

মানুষ মানুষের ভরসা ছেড়ে দিক। মানুষের ভরসা আল্লাহর উপরই থাক।

আট.

পরীক্ষা দ্বারা তাওহিদের সত্যতা যাচাই হয়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর চর্চা দ্বারা তাওহিদের সত্যতা প্রমাণিত হয়। মানুষের অন্তর্গত দৃঢ় সত্যতা বিপদে পড়ার আগে প্রকাশ পায় না। বিপদে পড়লে অন্তরের সত্যতা অনুযায়ী মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উচ্চারণ হয়। সঙ্কটে পড়লে তাওহীদের গভীরতা প্রকাশ পায়। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। [সূরা আনকাবূত : ৬৫]

এভাবে যে কোন বিপদ বান্দার উপর গড়ালেই সে নিজের তাওহীদকে একনিষ্ঠ করে নেয়।

আল্লাহ ﷻ আমাদের সকল বিপদে ধৈর্য ধারণ করার তাওফীক দিন।

দুখের পরে সুখ

বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লাহ ﷻ-র জন্য সকল প্রশংসা। সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসূল মোহাম্মদ, তার পরিবার ও সাহাবিদের জন্য দুরূদ ও সালাম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্লাহ ﷻ মানুষকে দুঃখ-কষ্ট দেন। সঙ্কটে মানুষের জীবনপথ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। দুঃসহনীয় হয়ে ওঠে জীবনের ভোগান্তি। আল্লাহ ﷻ-ই দুঃখ-কষ্টের পর বান্দার জন্য আয়োজন করেন সুখ ও হাসির। বান্দার জীবনপথ প্রশস্ত করে দেন। জীবনের ভোগান্তি, সঙ্কট ও সঙ্কীর্ণতা দূর করে দেন।

কাব ইবনে মালিক رضي الله عنه। তিনি পাপ করেছিলেন। প্রশস্ত পৃথিবী তার জন্য সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল। ভয়াবহ বিপদ নেমেছিল তার উপর। তিনি আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছেন। তাওবা করেছেন। আল্লাহ ﷻ তাকে ক্ষমা করেছেন। তার বিপদ সহজ করেছেন।

কাব ইবনে মালিক বলেন,

রাসূল ﷺ তাবুক যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তখন ছিল প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। তীব্র দাবদাহ গলে পড়ছে সূর্য।

রাসূল ﷺ বের হলেন। সাহাবাদের ডাকলেন। দশ হাজার সাহাবি বেরিয়ে এলেন। আল্লাহ ﷻ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন।

যুদ্ধে বেরুবার আগে রাসূল বাহিনী প্রস্তুত করছেন। যথেষ্ট পরিমাণ অর্থবল নেই। রাসূল মিম্বরে দাঁড়ালেন। সাহাবাদের দান করার জন্য আহ্বান জানালেন—

> কে এই কঠিন দিনের সেনাবাহিনী সাজিয়ে দিবে? তার জন্য জান্নাতের ঘোষণা! [বুখারি : ২৮৪৩]

উসমান رضي الله عنه দাঁড়ালেন। 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি এই কঠিন দিনের বাহিনী সাজিয়ে দিবো।'

উসমানের ঘোষণা শুনে রাসূলের দুই চোখে অশ্রু গড়াল। রাসূল তার জন্য দোয়া করে বললেন, 'আল্লাহ! উসমানের পূর্বাপর সব গোনাহ মাফ করো। আল্লাহ! তুমি তার উপর সন্তুষ্ট হও, আমিও তার উপর সন্তুষ্ট।' [আহমাদ : ১৬২৫৫]

দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। ভোরবেলা। রাসূল ﷺ যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। কজন সাহাবি দেখলেন, মদিনায় এখন ফল ঘরে তোলার সময়। তাছাড়া এই গরমে বের হওয়ার চেয়ে যাত্রাবিরতিই ভালো। তারা থেকে গেলেন।

যুদ্ধযাত্রা থেকে পিছনে থেকে গেলেন তিরাশিজন। তিনজন মুমিন। আশিজন মোনাফেক–

> আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে। [সূরা তাওবা : ৪৯]

গ্রীষ্মের গরম আর পিপাসা সাথে নিয়ে রাসূল সাহাবায়ে কেরামসহ পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলেন। সেই সফরের কষ্ট, ক্ষুধা, দুর্দশার তীব্ররূপ আল্লাহই ভালো জানেন।

মোনাফেক জিদ ইবনে কায়স রাসূলের কাছে আবেদন করল– 'আমি আপনার সাথে তাবুক যেতে চাচ্ছি না। আমাকে থেকে যাওয়ার অনুমতি দিন।'

রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন– 'কেন?'

সে বলল, 'আমি মহিলাদের প্রতি দুর্বল। হলুদাভ রোমীয় সুন্দরীদের দেখলে আমি ফেতনায় পড়ে যাব।'

জিদ ইবনে কায়স মিথ্যা বলেছিল।

> আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রাখ তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এভং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে। [সূরা তাওবা : ৪৯] [মাজমাউয যাওয়াইদ : ১১০৪৩]

মোনাফেকরা পরস্পর পরামর্শ করল– এই গরমে বের না হয়ে রাসূলকে সফর বিলম্ব করার প্রস্তাব দিলেই হয়।' আল্লাহ তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন–

বলুন, জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে ভয়াবহ। [সূরা তাওবা : ৮১]

কাব ইবনে মালিক ﵁ একনিষ্ঠ সত্য মুমিন। তিনি যুদ্ধ থেকে পিছনে রয়ে গেলেন। তার দুই স্ত্রী ছিল। একটি চালাঘরে তারা কাব বিন মালিকের জন্য বিছানা সাজাল। কাব সেখানে গেলেন। চালায় আঙ্গুর ঝুলছিল। পাকা পাকা আঙ্গুর। কাব বিন মালিক তা দেখে আভিভূত হলেন। সেখানে একটু বসলেন।

কাব পরদিন রাসূলের সাথে যুদ্ধযাত্রায় অংশগ্রহণ করার নিয়ত করলেন। এই তো তার ভুলের শুরু। আল্লাহ ﷻ বলেন–

মদিনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রাসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পিছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণ অধিক প্রিয় মনে করা। [সূরা তাওবা : ১২০]

তাইতো! রাসূল জিহাদে বের হবেন, আর কেউ পিছনে থেকে যাবে! কীভাবে সম্ভব!

রাসূল ﷺ চলে গেলেন। কাব ইবনে মালেক পরদিন রওয়ানা হওয়ার উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু শয়তান তাকে আজও বিরত রাখল।

রাসূল তাবুকের কাছাকাছি চলে গেলেন। প্রায় দশ হাজারের বিশাল বাহিনী নিয়ে একটি গাছের কাছে থামলেন। সাহাবাদের সাথে কথা বলছেন। যুদ্ধযাত্রায় এই প্রথম জিজ্ঞেস করলেন, 'কাব বিন মালিক কোথায়?'

বনি সালামার এক লোক, কাব ইবনে মালিকের আত্মীয়। আত্মীয় কখনও কখনও বিচ্ছুর মত হয়। কাবের এই আত্মীয়ও যেন তাই। সে কাবকে বাঁচানোর মত কথা বলল না। বরং বাড়িয়ে বলল, 'আল্লাহর রাসূল! সম্পদের ব্যস্ততা, ডোরাকাটা পোষাকের আকর্ষণ তাকে পিছিয়ে রেখেছে।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ তাকে হেফাযত করুন। না। আমি তার ব্যাপারে ভালোই বলছি। আমি তাকে ভালোই জানি। আল্লাহর কসম! তাকে একজন সত্য মুজাহিদ বলেই আমি জানি।'

এ কথা বলে রাসূল ﷺ চুপ হয়ে গেলেন। তার ব্যাপারে আর কোন কথা বললেন না।

রাসূল ﷺ গাছের নিচে বসে আছেন। দূর থেকে বাজপাখির গতিতে একজনকে আসতে দেখা যাচ্ছে। রাসূল ﷺ বললেন, 'ঐ আগন্তুক যেন আবু খায়সামা হয়।'

আগন্তুক কাছে এলেন। তিনি আবু খায়সামা। নিবেদিতপ্রাণ একজন মুজাহিদ।

রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু যর কোথায়?''

সাহাবিরা বললেন, 'তিনি পিছনে রয়ে গেছেন।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ তার মঙ্গল রাখলে সে আমাদের সাথে মিলিত হোক।'

আবু যর رضي الله عنه। গরীব একজন সাহাবি। ঈসা عليه السلام-র সাথে তার হাশর হবে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুনিয়াবিমুখ একজন সাহাবি। শীর্ণকায় একটি উট ছিল তার। তিনি আরোহণ করলে উট তার ভার বহন করতে পারত না। বসে যেত। আবু যর রাসূলের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তার সামানপত্র কাঁধে নিয়ে হেঁটে রওয়ানা করলেন।

রাসূল ﷺ সাহাবাদের সাথে তখনও গাছের নিচে বসে আছেন। ঐ দেখা যায়– দৃষ্টির শেষ প্রান্ত থেকে একজন লোক হেঁটে হেঁটে আসছে। রাসূল বললেন, 'আগন্তুক যেন আবু যর হয়।'

আগন্তুক কাছে আসলেন। তিনি আবু যর رضي الله عنه।

রাসূল ﷺ খুশি হলেন। বললেন, 'আবু যর, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। তুমি একত্ববাদী হয়ে জীবনযাপন কর, মৃত্যুবরণ কর, পুনরুত্থিত হও।'

কাব ইবনে মালিকসহ আরও দুজন, হেলাল ইবনে উমাইয়া, মুরারা ইবনে রাবি একনিষ্ঠ ঈমানদার ছিলেন। কিন্তু তিনজনই কোন কারণ ছাড়া যুদ্ধ থেকে পিছনে থেকে গেলেন।

যুদ্ধ থেকে পিছনে থেকে তিন সাহাবি খুব চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন, যে উদ্বিগ্নতার প্রকৃত মাত্রা আল্লাহই ভালো জানেন।

কাব ইবনে মালিক মদিনায় অবস্থান করছেন। রাসূল তখন যুদ্ধে। কাব বাজারে যাচ্ছেন, রাস্তাঘাটে বের হচ্ছেন। কেউ নেই। শুধু মোনাফিকরা আছে। বৃদ্ধ,

মহিলা ও শিশুরা আছে। আল্লাহ বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুদের যুদ্ধে না যাওয়ার বিধান রেখেছেন। কাব ইবনে মালিক অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন।

রাসূল ﷺ যুদ্ধ থেকে ফিরলেন। কাব ইবনে মালিক রাসূলকে কী বলবেন? রাসূলের সাথে কথাই বা বলবেন কীভাবে? তার যুদ্ধে না যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। মিথ্যা কথা বললেও আল্লাহ অহির মাধ্যমে রাসূলকে জানিয়ে দিবেন। সত্য বললেও ধ্বংস অনিবার্য।

কাব ইবনে মালিক রাসূলের সামনে গেলেন। তার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। তিনি এখন কী করবেন!

> আমি আমার দুঃখ অস্থিরতা আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি। [সূরা ইউসুফ : ৮৬]

কাব জানতেন, সত্য বলা ছাড়া আল্লাহ ও তার রাসূলের গোস্বা থেকে মুক্ত হতে পারবেন না।

রাসূল ﷺ যুদ্ধ থেকে ফিরে অযু করে মসজিদে গেলেন। দু'রাকাত সালাত পড়লেন। দীর্ঘ একমাস বা তারও চেয়ে বেশি সময় পর তিনি এখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত সাহাবিদের সালাম দিলেন। অভিভাদন ও কুশল বিনিময় করলেন।

কাব رضي الله عنه রাসূলের সামনে গেলেন। সালাম দিলেন। রাসূল ﷺ সালামের উত্তর দিয়েছেন কিনা, কাব তা বুঝেননি।

কাব রাসূলের সাথে মুসাফাহা করলেন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কাব! যুদ্ধে যাওনি যে!'

কাব বললেন, ' আল্লাহর রাসূল! আমি কবি। আমাকে ভাষার যাদু দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আপনি ছাড়া দুনিয়ার অন্য কারও সামনে বসলে যদি দেখি, কোন কথা বানিয়ে তার গোস্বা থেকে বাঁচতে পারবো, তাহলে তাই করতাম। কিন্তু সত্য কথায় আপনি রাগ হলেও আমি সত্য বলবো। এই আশায়– আজ আপনি রাগ হলেও কাল আপনি সন্তুষ্ট হবেন।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'ঠিক আছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার এবং তোমার দুই সাথির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত যেতে পার।'

কাব সেখান থেকে উঠে এলেন। তার ভিতর-বাহির অস্থির, ছটফট করছে। চোখে কিছু দেখছেন না। বনু সালামার এক আত্মীয়ের সাথে দেখা। তিনি কাবকে বললেন, 'আপনি ছাড়া যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা সকলেই ওযর ও নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। আপনিও তাই করতেন! ভালই হত!'

কাবের মনে হল তাই করা দরকার। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তাকে হেফাযত করলেন।

কাব বললেন, 'যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে আমার দশা হয়েছে, এমন আর কেউ আছে?'

: 'হাঁ, তোমার মত আরও দুজন আছেন। হেলাল ইবনে উমাইয়া এবং মুরারা ইবনে রাবি।'

: 'তাদের কাছে আমার পথের সন্ধান আছে।'

কাব ইবনে মালিক মসজিদ থেকে বের হলেন। রাসূল ﷺ মদিনার লোকদের, পুরুষ, মহিলা, শিশু সবাইকে জানিয়ে দিলেন, 'যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা তিনজন, কাব ইবনে মালিক, হেলাল ইবনে উমাইয়া, মুরারা ইবনে রাবির সাথে কেউ কথা বলবে না।'

রাসূল ﷺ সবাইকে তাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করলেন।

কাব ইবনে মালিকের পৃথিবী পরিবর্তন হয়ে গেল। আগের পৃথিবী আর নেই। আল্লাহর ভাষায়– 'প্রশস্ত পৃথিবী সঙ্কীর্ণ হয়ে এল।' তার চোখে শুধুই অন্ধকার ...

সাহাবায়ে কেরাম কাবের সাথে কথা বলছেন না।

কাব ঘরে এলেন। স্ত্রী খাবার তৈরি করছে, তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না। কাব খেতে বসলেন, স্ত্রী তার দিকে মুখ করছে না। স্ত্রী তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে চাচ্ছে! তাদের সম্পর্কে যোগ-বিয়োগ সব আল্লাহর জন্য। বন্ধুত্ব ভালোবাসা দূরত্ব দান বঞ্চিতকরণ সবই আল্লাহ ﷻ-র জন্য।

কাব স্ত্রীকে বললেন, 'পানি দাও।'

স্ত্রী পানি নিলেন। পাত্রে ঢাললেন। তার সামনে রাখলেন। তার দিকে একটুও মন দিলেন না। তিনি তো জিহাদ থেকে বিরত থেকেছেন! আল্লাহ-রাসূলের অবাধ্যতা করেছেন!

কাব বাজারে এলেন। কাউকে সালাম দিলেও কেউ তার সাথে কথা বলছেন না।

কাব দোকানে গেলেন। দোকানিকে বললেন, 'আমাকে কিশমিস দিন। খেজুর দিন। গোসত দিন।'

দোকানি বললেন, 'আপনার কাছে বিক্রি করবো না!'

বন্ধুদের কাছে গেলেন। বন্ধুরা তার জন্য ঘরের দরজা খুলছে না। তার সাথে কেউ দেখা দিচ্ছে না।

আবু কাতাদার বাড়ির গেট বন্ধ। কাব আবু কাতাদার সাথে কথা বলার জন্য দেয়াল বেয়ে উঠলেন। আবু কাতাদাকে ডেকে বললেন, 'দোহাই আল্লাহর! তুমি কি জান না, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসি!'

আবু কাতাদা কোন উত্তর দিলেন না।

কাব আবার ডেকে বললেন, 'আবু কাতাদা! দোহাই আল্লাহর! তুমি কি জান না, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসি!'

আবু কাতাদা কোন উত্তর দিলেন না।

কাব তৃতীয়বার কেঁদে কেঁদে আবু কাতাদাকে ডাকলেন।

আবু কাতাদা বললেন, 'আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন।'

যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা তিন সাহাবার চল্লিশ দিন কেটে গেল এভাবে। এবারে রাসূল তাদের কাছে সংবাদ পাঠালেন– 'তোমরা তোমাদের স্ত্রী থেকে দূরে থাক!'

জীবনের উপর সে কি ঝড়!

আল্লাহই ভালো জানেন, এ ঝড় কত ভয়াবহ! এ ঝড় কেমন প্রলয়ঙ্কারী!

একজন মানুষ– তার উপর আসমানওয়ালার রাগ! রাসূলের সম্পর্কোচ্ছেদ! সাহাবায়ে কেরামের কথাবর্জন! কেমন লাগছে তার কাছে! বেদনারা কী অনুভুতিতে বাস করে তার কাছে!

কোথায় তার জীবন!

কোথায় তার জীবন চলার উৎসাহ!

কোথায় তার সবর ও ধৈর্য!

হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলের কাছে আসলেন। 'আল্লাহর রাসূল! আমি কী করবো?'

: 'তুমি হেলালের কাছ থেকে দূরে থাক।'

: 'আল্লাহর রাসূল! হেলাল বয়োবৃদ্ধ। যেদিন সে জিহাদ থেকে পিছিয়ে ছিল, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সে কাঁদছে। নামমাত্র খাবার গ্রহণ করছে। আমাকে সঙ্গ ছাড়া তার কাছে থাকার অনুমতি দিন।'

কাব ইবনে মালিক ছিলেন সবচে যুবক। তিনজনের সর্বকনিষ্ঠ। তিনি বাজারে যাচ্ছেন, কেউ তার সাথে কথা বলছে না। সালাম দিচ্ছেন, কেউ উত্তর দিচ্ছে না। ক্রয় করবেন, কেউ বিক্রি করছে না।

একদিনের ঘটনা। কাব বাজারে গেলেন। শামের এক বস্ত্র ব্যবসায়ীর সাথে কাবের দেখা। গাসসান বাদশাহ তাকে কাবের কাছে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। রাসূলের সাথে কাবের সম্পর্ক আরও ছেদ করার ষড়যন্ত্রে লেখা চিঠি।

কাব চিঠি খুললেন। বাদশাহ লিখেছেন–

'তুমি অসম্মানের যোগ্য নও। শুনেছি, তোমার বন্ধু তোমাকে পরিহার করেছে। দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আমাদের সাথে এসো। আমরা তোমার সহমর্মী।'

কাব ভাবল, রাসূল আমাকে দূরে সড়িয়ে দিয়েছেন, তাই বলে আমি দীন ছেড়ে দিবো! ওদের সাথে মিলবো! এটি তো একটি পরীক্ষা!

কাব চিঠিটি চুলোয় ছুড়লেন। পুড়িয়ে ফেললেন।

পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হল। কাব ইবনে মালিক ঘরেই অবস্থান করছেন।

তিন সাহাবির সুবিস্তৃত পৃথিবী এতটুকুন হয়ে আছে। তিক্ততা, যন্ত্রণা, দুঃখ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কাটল তিন সাহাবির পঞ্চাশ দিনের জীবন। অতঃপর এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ! আসমানী ফয়সালার মাহেন্দ্রক্ষণ! দীর্ঘ যন্ত্রণার উপশম! অবর্ণনীয় দুঃখের ঐশি মোচন! পাপমোচন!

আল্লাহ ﷻ প্রথমে মোনাফেকদের ইঙ্গিত করে রাসূল ﷺ-কে বললেন–

> আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের। [সূরা তাওবা : ৪৩]

রাসূল! তারা আল্লাহর সাথে মিথ্যা আচরণ করেছে। শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করেছে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে। আপনি কেন তাদের ক্ষমা করলেন!

মোনাফেকরা ছিল মিথ্যুক। তিন সাহাবি ছিলেন সত্যবাদী। ঈমানে সত্য। অপরাধবোধেও সত্য। পঞ্চাশ দিনের অসহনীয় প্রায়শ্চিত্তের পর আল্লাহ ﷻ তাদের জন্য ঘোষণা দিলেন–

> এবং আল্লাহ ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকে, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়েছিল, জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, তারা উপলব্ধি করেছিল– আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন, যেন তারা তওবা করে। আল্লাহ ক্ষমাশীল। করুণাময়। [সূরা তওবা : ১১৮]

কাব ইবনে মালিক বাড়ির ছাদে ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাম ফিরাতেই দেখলেন– একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে তার দিকেই আসছে। আরও একজন দেখা যাচ্ছে পায়ে হেঁটে আসছে ঐ পাহাড়ের দিক থেকে। দুজনের আগমনেই খুশির আভাস।

দুজনই এসেছেন কাব ইবনে মালিককে সুসংবাদ শোনানোর জন্য। মুমিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল অপর ভাইকে খুশি করা। অপর ভাইয়ের কষ্টলাঘবের

সুসমাচার জানানো। খুশির কথা নিয়েই অপর ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া। এটি একটি ভালো কাজ।

দুজনই পাহাড়ের উপর থেকে ডাক দিয়ে বললেন, 'কাব! তোমার জন্য সুখবর! আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করেছেন। জন্মাবধি আজ তোমার শ্রেষ্ঠদিন। শুভসমাচার!'

এ কথা শুনে কাব ইবনে মালিক সেজদায় নুয়ে গেলেন। কৃতজ্ঞাবনত সেজদা।

রাসূল ﷺ-ও কোন সুসংবাদে কৃতজ্ঞতার সেজদা আদায় করতেন।

একদিন রাসূল ﷺ সাওয়ারি থেকে নেমে সেজদা আদায় করলেন। সঙ্গী সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

রাসূল ﷺ বললেন, "জিবরাঈল আমাকে মাত্রই সংবাদ দিলেন, আল্লাহ বলেছেন, 'কোন মুসলমান আপনার উপর একবার দুরূদ পড়লে আমি তার উপর দশবার দুরূদ পড়ি!" [আহমাদ : ১৫৯২৮]

রাসূলের জন্য এই সংবাদটি একটি নেয়ামত। রাসূল সেই নেয়ামতের সংবাদ পেয়ে সেজদা দিয়েছেন।

আলি رضي الله عنه এর পক্ষ থেকে ইয়ামান থেকে রাসূলের কাছে সুসংবাদ সম্বলিত একটি চিঠি আসল। হামদান গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। রাসূল ﷺ খুশি হলেন। আল্লাহর কাছে সেজদায় নুয়ে পড়লেন। বললেন, 'আসসালামু আলা হামদান।' 'হামদান গোত্রের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' [বায়হাকি : ৩৯৬৪]

সুসংবাদ এলে সেজদা দেয়া চাই। এই সেজদার জন্য অযু থাকা আবশ্যক নয়। বিশেষত দীনী বিষয়ে। পার্থিব বিষয়টি এক্ষেত্রে চলে আসে। তাই বলে এমন নয় যে– অনেকে পার্থিব বিষয়ে, চাকরি, পদ, বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদির সংবাদকেও জীবনের সফলতা মনে করে!

দীনী বিষয়ে অনায়াসেই সেজদা দিবে। অত হিসাব-নিকাশ নেই। আল্লাহ বলেন–

> হে মানবকুল তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের নিরাময়, হেদায়াত ও রহমত মুসলমানদের জন্য। বল, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবাণীতে। সুতরাং এরই

প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। এটিই উত্তম সেসব থেকে, যা সঞ্চয় করছ। [সূরা ইউনুস: ৫৭, ৫৮]

কাব ইবনে মালিক সুসংবাদ পেয়ে কৃতজ্ঞতার সেজদা আদায় করলেন। তার কাছে দুটি পরিধেয় কাপড় ছিল। সংবাদবাহীকে একটি উপহার দিলেন। কেউ কোন সুসংবাদ প্রদান করলেন তাকে কিছু উপহার দেয়া সাহাবিদের আদর্শ। পাথরের মত কঠিন শক্তপ্রাণ হওয়া উচিৎ নয়।

কাব ইবনে মালিক ﵁ মসজিদে গেলেন। সাহাবায়ে কেরাম বসে আছেন। পূর্ণিমার মত মধ্যমণি আছেন রাসূল ﷺ। কবি শাওকির ভাষায়–

তারা ঘিরে রাখে মধ্যমণিকে,

যেমন ধূসর আকাশ ঘিরে রাখে পূর্ণিমাকে।

যেমন সৈন্যরা ঘিরে থাকে পতপত পতাকাতলে।

সাহাবায়ে কেরাম যেন দুধেল আকাশ, জ্বলজ্বলে তারকাপুঞ্জ, তাদের মাঝে রাসূল হলেন পূর্ণিমার ভরা চাঁদ। সাহাবায়ে কেরাম হলেন সৈন্যদল। দলের শীর্ষপতাকা ঘিরে রেখেছেন। সেই শীর্ষপতাকা হলেন রাসূল ﷺ।

কাব ইবনে মালিক দেখলেন, রাসূলের চেহারায় চৌদ্দরাতের ভরা পূর্ণিমা চকচক করছে। রাসূল ﷺ কোন বিষয়ে আনন্দিত হলে তার চেহারায় সুখের রেখা ঝিলিক খেলত। আয়েশা ﵂ বলেন– "আমি রাসূলের আনন্দিত চেহারা দেখলে সুয়াইদ ইবনে কাহিল আলজাহিলীর কবিতা মনে হত–

'চেয়েছিনু তার চেহারায়, ললাটের রেখায়।

দেখেছিনু চাঁদ করে চকচক উজ্জ্বলতায়।"

রাসূল ﷺ তিন সাহাবির তওবা কবুল হওয়ায় যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন। তওবা এমন এক সম্পদ, দুনিয়ার কোন কিছু এর বিকল্প হয় না। রাজত্ব অট্টালিকা স্বর্ণ-রূপা কিছুই তওবার বিকল্প হয় না।

কাব মসজিদে প্রবেশ করলেন। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ﵁ কাবের সম্মানে এগিয়ে এলেন। সালাম দিলেন। মুসাফাহা করলেন।

প্রসঙ্গাত কারো আগমনে দাঁড়ানোর তিনটি উদ্দেশ্য হতে পারে।

এক. গৌরবদানমূলক।

দুই. বিনয়মূলক।

তিন. সহানুভূতিমূলক।

কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো নিষেধ। যেমন, কেউ বসে আছেন, তাকে সম্মান প্রদর্শন করে বা গৌরবদানের জন্য অনেকে দাঁড়িয়ে থাকে। এটি নিষেধ। আজমি ব্যক্তিরা তাদের রাজা-বাদশাহদের সাথে এসব আচরণ করে থাকে। ইমাম আহমদ এবং আবু দাউদ رحمه الله রাসূল ﷺ থেকে এ সংক্রান্ত নিষেধের কথা বর্ণনা করেন–

রাসূল বলেন–

لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا

> অনারব লোকেরা একে অপরের সম্মানার্থে যেভাবে দাঁড়ায় তোমরা সেভাবে দাঁড়াবে না। [আহমাদ : ২১৬৭৭]

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

> যার মনের অভিলাষ এই, মানুষ তার সম্মুখে মূর্তির ন্যায় দণ্ডায়মান থাকুক, সে যেন দোযখে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নেয়। [আহমাদ : ১৬৪৭৩]

কোন ব্যক্তি মসজিদে বসে কথা বলছে, তার দুইপাশে, সামনে-পিছে লোকজন দাঁড়িয়ে থেকে সম্মান ও গৌরবদান করছে, এই দাঁড়ানো শরিয়তে নিষিদ্ধ।

কারো সামনে বিনয় প্রকাশার্থে দাঁড়ানো, তার যথাযথ হক আদায় করার জন্য দাঁড়ানোতে সমস্যা নেই। অহঙ্কার গর্ব ও গৌরবদান ব্যতীত কোন মুসলমানের সামনে বিনয় প্রকাশ করে বরং দাঁড়ানোই উচিত।

একবার যায়দ ইবনে হারেসা رضي الله عنه রাসূলের সামনে আসলেন। রাসূল দাঁড়ালেন এবং তাকে চুমু খেলেন। [তিরমিযি : ২৭৩২]

ফাতেমা رضي الله عنها রাসূলের কাছে আসলে রাসূল দাঁড়াতেন। ফাতেমা স্নেহের চাদরে আলিঙ্গান করে চুমু খেয়ে নিজের জায়গায় বসাতেন।

রাসূল ﷺ যখন ফাতেমার কাছে আসতেন, ফাতেমা দাঁড়াতেন। সম্মানের বাহুডোরে আলিঙ্গান করে চুমু খেতেন। নিজের জায়গায় বসাতেন। [আবু দাউদ : ৫২১৭]

জাফর ইবনে আবু তালিব হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, "আমরা হাবশা থেকে রওয়ানা করে মদীনায় এসে পৌঁছলাম। তখন রাসূল আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমার সাথে আলিঙ্গান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'আমি বলতে পারছি না খায়বার বিজয় আমার কাছে বেশি আনন্দের, না জাফরের ফিরে আসা বেশি আনন্দের!" [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ২৭৯৪১]

জনৈক আলেম একটি মজলিসে আগমন করলেন। সেখানে একজন কবি ও সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। আলেমের আগমনে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। আলেম বললেন, 'এভাবে দাঁড়াবে না। এটি জায়েয নয়।'

কবি বললেন–

আল্লাহর কসম!

আপনার আগমনে বিনয় প্রকাশ করে দাঁড়ানো আমার হক।

হক আদায় না করা সরল পথ নয়।

আপনার আগমনে দাঁড়াবে না, এমন বিবেকমানও আছে কি!

কারো প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে দাঁড়ানো সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। যেমন কারো সাহায্যার্থে দাঁড়ানো, আগন্তুককে দরজা খুলে দেয়ার জন্য দাঁড়ানো।

আওস গোত্রের প্রধান সাদ ইবনে মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু। তার মৃত্যুতে আল্লাহ ﷻ-র আরশ কেঁপে উঠেছিল। [বুখারি : ৩৮০৩] সত্তর হাজার ফেরেশতা তাকে শেষ বিদায় জানিয়েছিল।

সাদ ইবনে মুয়ায বনি কোরায়যার ফয়সালার জন্য একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে রাসূলের কাছে আসলেন। তার আগমনে রাসূল আনসারদের বললেন, 'তোমাদের নেতার প্রতি দাঁড়িয়ে যাও।' [বুখারি : ৩০৪৩]

এভাবে কারও প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে দাঁড়ানো জায়েয।

কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাকে দেখে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এগিয়ে এলেন। মুহাজির সাহাবিদের মধ্যে তিনিই এগিয়ে এলেন। তালহার এই ইহসানের কথা কাব কখনও ভুলতে পারেন না।

ইহসান এমনই এক বিষয়, তা কখনও ভুলার নয়। একটি কালো কুকুরও যদি ইহসান করে, তাও উপকার বয়ে আনে।

মুগিরা ইবনে শোবা ﵁। খ্যাতনামা আমিরদের একজন। একদিন তিনি বাসভবনে অবস্থান করছেন। পাহারাদারকে বলে রাখলেন, 'এখন যেন কেউ আমার সাথে দেখা করতে না আসে।'

ঘটনাক্রমে পাহারাদারের এক বন্ধু মুগিরা ইবনে শোবার সাথে দেখা করতে এল। পাহারাদার তাকে মুগিরার কাছে নিয়ে গেলেন। মুগিরা পাহারদারকে বললেন, 'আমি তোমাকে নিষেধ করিনি– এখন যেন কেউ আমার সাথে দেখা না করে!'

পাহারাদার বললেন, 'এই লোকটি আমার বন্ধু। আমার উপর তার অনুগ্রহ আছে। আমি তাকে নিষেধ করতে পারিনি।'

মুগিরা বললেন, 'ভাল করেছ। আল্লাহ তোমার ভাল করুন। ইহসান ও অনুগ্রহ একটি কালো কুকুরেরও কল্যাণ বয়ে আনে।'

এক গ্রাম্য ব্যক্তি ইবনে আব্বাস ﵄-কে বলল, 'ইবনে আব্বাস! আমি আপনার উপর একটি অনুগহ করেছিলাম।' আপনার একটি উপকার করেছিলাম।

ইবনে আব্বাস ﵄ বললেন, 'কী উপকার করেছিলে?'

লোকটি বলল, 'আমি আপনাকে প্রথম হজ্জে সূর্যের আগুনে পুড়তে দেখে আমার কাপড় দিয়ে আপনার ছায়ার ব্যবস্থ করেছিলাম।'

ইবনে আব্বাস সাথে সাথে গোলামকে আদেশ দিলেন, 'গোলাম! এই লোককে একহাজার দিনার উপহার দাও। একটি কাপড় দাও। তার কোন দুর্বলতা থাকলে তা শোন।'

কবি বলেন–

ভাল কাজ বেঁচে থাকে দীর্ঘকাল।

সব পাথেয়র সর্বনিন্দ মন্দ কাজ।
কবি হাতিআ বলেন–

করলে ভালো কাজ হবে না শেষ তার প্রতিদান,

বান্দা ও আল্লাহর মাঝে ভালোই ভালো সবসময়।

কাব ﵁ রাসূল ﷺ-র সামনে আসলেন। রাসূল তাকে বললেন, 'সুসংবাদ হে কাব! আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করেছেন। জন্মাবধি আজকের দিনটি তোমার জন্য সবচে উৎকৃষ্ট।'

কাব বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! তাওবা কবুলের শোকরিয়া হিসেবে আমি আমার সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করতে চাই। আল্লাহ আমাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন। এটা আল্লাহর হক।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমার জন্য কিছু রেখো। ভালো হবে।' [বুখারি : ৪৪১৮]

রাসূল তাকে কিছু সম্পদ নিজের জন্য রাখতে বলেছেন। কারণ, কেউ যেন এ কথা না বোঝে, ইসলামে সম্পদ ব্যয় করা মুখ্য। অনেকে মনে করে, একটি দিনার দিরহামও অবশিষ্ট রাখবো না। তারা তাদের ওয়ারিসদের রিক্তহস্তে রেখে যায়। অথচ রাসূল বলেছেন, 'ওয়ারিসদের কারো কাছে হাত পাতার মত রিক্ত হস্তে রেখে যাওয়ার চেয়ে কিছু সম্পদসহ রেখে যাওয়া তোমার জন্য ভালো। [বুখারি : ১২৯৬]

কাব ﵁ এর তাওবা কবুল হয়েছে। আল্লাহ রহমত করেছেন। তিনি খুব খুশি। খুশি মনে ফিরে এলেন রাসূলের কাছ থেকে। ভয়াবহ দুর্বিপাকের পর এ যেন এক নতুন জীবন। আল্লাহ ﷻ তাকে বিপদ দেয়ার পর আল্লাহই তাকে মুক্তি দিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, 'এক কষ্ট দুই আরামকে পরাস্ত করতে পারে না।'

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তা কীভাবে?'

তিনি বললেন, "আল্লাহর বাণী– 'অতঃপর কষ্টের সাথে অবশ্যই আরাম রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে আরাম।' আয়াতে কষ্টের কথা একবার এসেছে। আরামের কথা এসেছে দুবার।"

আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী আয়াতে কষ্ট (আল-উসর) নির্দিষ্ট (মারিফা)। নির্দিষ্ট বস্তু একটিই হয়ে থাকে। কিন্তু আরাম (য়ুসরুন) অনির্দিষ্ট (নাকিরা)। অনির্দিষ্ট বস্তু একাধিক হতে পারে।

কোন ভয়াবহ বিপদের পড়লেও আল্লাহর কাছে হাত তোলা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। আল্লাহ ছাড়া বিপদ থেকে কেউ মুক্ত করতে পারে না।

> বল তো, কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে ডাকে! [নামল: ৬২]

> তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। [আনকাবূত: ৬৫]

প্রবাদ আছে, রশি খুব শক্ত হলে ছিড়ে যায়।

অর্থাৎ, বিপদ ভয়াবহ হয়ে আসলে আল্লাহ ﷻ তা সহজ করে দেন।

হাদিসের বার্তা

কাব ইবনে মালিকের ঘটনা আমাদের অনেক বার্তা দেয়। কিছু উল্লেখ করছি:

১. রাসূল ﷺ ভোরবেলা সফরে বের হতেন। এতে মুসলমানের জন্য বার্তা হল, যে কোন সফর ভোরবেলা, ফজরের পরপর করতে পারলে ভালো। রাসূল ইরশাদ করেন, 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্য ভোরবেলায় বরকত দান কর।' [আহমাদ : ১৫০১২]

২. সফর বৃহস্পতিবারে করা সুন্নত। কাব ইবনে মালিক رضي الله عنه বলেন, 'রাসূল বৃহস্পতিবারে সফর শুরু করেছিলেন।'

   রাসূল ﷺ অধিকাংশ সফর বৃহস্পতিবারে করতেন। ওলামায়ে কেরাম শুক্রবারে সফর করা অপছন্দ করেছেন। অনেকে বলেন, শুক্রবারে ফজরের পর সফর করা অপছন্দের নয়। জুমার প্রথম আযান হওয়ার পর সফর শুরু করা অপছন্দের।

   তবে উত্তম হল শুক্রবার সকল কাজ থেকে মুক্ত হয়ে কোথাও স্থির থাকা। ইবাদাত, গোসল, যিকির, কোরআন পাঠ ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকা। মনে রাখতে হবে, শুক্রবার হল মুমিনের ঈদ।

৩. সঙ্ঘবদ্ধ সফরের দলপতির উচিৎ– সকলের খোঁজ-খবর রাখা। রাসূল ﷺ তাবুকের কাছে যাত্রাবিরতি করে সাহাবিদের খোঁজ নিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কাব ইবনে মালিক কোথায়?'

বর্ণিত হয়েছে, 'তোমরা সকলেই রক্ষণাবেক্ষণকারী। তোমাদের প্রত্যককেই অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।' [বুখারি : ৮৯৩]

৪. কারো ব্যাপারে কিছু জানা থাকলে তা বলা উচিৎ। ওলামায়ে কেরাম ক্ষেত্র বিশেষ 'জারহ তাদীল' এর অনুমতি দিয়েছেন। তা গীবত হবে না। তবে এই 'জারহ তাদীল' অনুমোদিত স্থানগুলোতেই করা যাবে।

৫. হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ একটি বার্তা হল, অপর ভাইয়ের মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। কাব ইবনে মালিক رضي الله عنه-কে জনৈক ব্যক্তি মন্দ বললে মুযায رضي الله عنه কাবের মর্যাদা রক্ষায় মুখ খুললেন। মন্দ ব্যক্তকারীকে বললেন, 'তুমি অন্যায় বলেছ। আমাদের জানা মতে তিনি একজন মুজাহিদ। তিনি আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসেন।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'অপর মুসলিম ভাইয়ের মর্যাদা রক্ষাকারীকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব।' [আহমাদ : ২৭০৬২]

সুতরাং কোন মজলিস অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য অপমান ও মর্যাদাহানীমূলক কিছু শুনলে তার প্রতিবাদ করা উচিৎ। স্পষ্ট করে বলা উচিৎ, এটি ভুল। পাশাপাশি আক্রান্ত মুসলিম ভাইয়ের ভালো কিছু জানা থাকলে তা-ও ব্যক্ত করা উচিৎ।

৬. রাসূল ﷺ সফর থেকে ফিরে আগে মসজিদে গমন করতেন। দুরাকাত সালাত আদায় করতেন। আবু কাতাদা رضي الله عنه বর্ণনা করেন–

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দুরাকাত সালাত আদায় করার আগে যেন না বসে। [বুখারি : ৪৪৪]

৭. সফর থেকে ফিরে লোকদের নিয়ে একটু বসা। সালাম ও মতবিনিময় করা। এটি নববী আদর্শ।

৮. কারো ওযর-অপারগতা গ্রহণ করা। কেউ ওযর ও অপারগতা জানালে তা বাহ্যিক অবস্থার উপর বিবেচনা করা। এ কথা না বলা– সে ভিন্ন কিছু চেয়েছে, তার নিয়ত ভালো ছিল না, সে সত্য বলেনি ইত্যাদি।

৯. পাপাচারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা। হাসান বসরী বলেন, ‘কী আশ্চর্য! তাবুক যুদ্ধে পিছিয়ে থাকা তিন সাহাবি কোন রক্তপাত করেননি। কারো রাস্তা বন্ধ করেননি। কোন অনাচার করেননি। সম্পদ বিনষ্ট করেননি। তথাপি তারা কী প্রতিদান পেয়েছিল! তাহলে যারা কবীরা গোনাহয় লিপ্ত, অশ্লীলতায় লিপ্ত, তাদের সাথে কেমন আচরণ করা উচিৎ!’

পাপাচারীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বৈশিষ্ট্য। আর যে বিদয়াত প্রচার করে, তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা আবশ্যক।

তদ্রূপ অন্যান্য গোনাহয় লিপ্ত যেমন, মাদকাসক্ত, গান শ্রবণকারী, সুন্নতের বিরোধিতাকারীদের প্রাথমিক সতর্ক ও নসিহত করে তাদের সাথেও সম্পর্কচ্ছেদ করা উচিৎ।

পার্থিব কোন বিষয়ে কারো সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্কচ্ছেদ রাখা বৈধ নয়। রাসূল ﷺ বলেন –

তিন দিনের বেশি কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ রাখা মুসলমানের জন্য বৈধ নয়; দুজনের সাক্ষাৎ হলে পরস্পর মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের জন্য ভালো হল সালাম দিয়ে শুরু করা। [বুখারি : ৬০৭৭]

দীনী বিষয়ে অবাধ্যদের সাথে ভালো মনে হলে তাদের শিষ্টাচার শিখানো পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদ করা জরুরি। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, ‘সম্পর্কচ্ছেদের কারণে যদি অবাধ্যতা আরও বৃদ্ধি পায়, তাহলে সম্পর্কচ্ছেদ না করা চাই।

ফতোয়ায়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১০. এক মুসলমান অপর মুসলমানকে সুসংবাদ প্রদান করা। কারো সন্তান ভূমিষ্ট হল, ছেলে কোন বিপদ থেকে মুক্ত হল, তখন বাবা-মাকে সুসংবাদ প্রদান করা। কারো ব্যাপারে ভালো কিছু শুনলে, স্বপ্ন দেখলে তাকে সুখবর শোনানো।

হিংসুক ও বিদ্বেষপরায়ণ লোকেরা কারো ব্যাপারে ভালো কিছু প্রকাশ করে, অন্তরে তার ব্যাপারে মন্দ পোষে। মুসলিম ভাইয়ের ভালো কিছু দেখলে বা শুনলে তা গোপন রাখে। সম্মানহানীকর কিছু শুনলে তা কানে কানে প্রচার করে।

১১. সুসংবাদপ্রদানকারীকে কিছু হাদিয়া ও উপহার প্রদান করা। মুসলিম সবসময় সম্মানী। উদারহস্ত। দানশীল।

১২. একটি মুসলিম জীবনের সবচে শ্রেষ্ঠ দিন হল আল্লাহর কাছে তওবা কবুল হওয়ার দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবকে বলেছিলেন, 'সুসংবাদ হে কাব! আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করেছেন। জন্মাবধি আজকের দিনটি তোমার জন্য সবচে উৎকৃষ্ট।'

এটি কাবে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। এই দিন তার ইসলামের দিন। তাওবা কবুল হওয়ার দিন।

সারকথা

বিপদাপদে জীবন যতই দুর্বিষহ হোক, বিপদাপদ যতই ঘনীভূত হোক, এর থেকে মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ ﷻ।

ইবনুল জাওযি رحمه الله বলেন, রিযিক দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। বিপদ থেকে মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ ﷻ।

এটাই আহলে সুন্নাত ওয়ালজামাতের আকিদা। প্রগাঢ় বিশ্বাস।

সমাপ্ত

লেখক পরিচিতি

ড. আয়েয আল করনী ১৩৭৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৯ ইং সনে দক্ষিণ সৌদী আরবের কর্‌ন জেলার আশ-শুরাইহ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

অল্প বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআনের হিফজ সম্পন্ন করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন রিয়াদে। উচ্চতর পড়াশুনা করেন প্রাদেশিক শহর আবহায়। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত অধ্যয়নের পরিধি সুবিস্তৃত ও অতুলনীয়।

ড. আয়েয আল করনী এ পর্যন্ত বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে আত-তাফসীরুল মুয়াস্‌সার, আল-ফিকহুল মুয়াস্‌সার, আশিক, লা তাহযান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দীর্ঘ সাত বছর তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীসের উপর অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে দাওয়াত ইলাল্লাহই তাঁর প্রধানতম কাজ।

ড. করনী দাওয়াতের উদ্দেশ্যে লেখালেখি, বক্তৃতা-বিবৃতি ও গ্রন্থরচনার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার, গুগ্‌লপ্লাস ও ইউটিউব ইত্যাদিতেও সমানভাবে সক্রিয়। তাঁর বক্তৃতার ক্যাসেটের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

আমরা তাঁর নেক হায়াত কামনা করছি।

إحفظ الله يحفظك

باللغة البنغالية

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জীবন-সাফল্যের জন্য একটি সুসমৃদ্ধ নির্দেশনা দিয়েছেন– 'ইহফাযিল্লাহ, ইয়াহফাযকা'। 'তুমি আল্লাহর বিধান রক্ষা কর, আল্লাহ তোমার জীবনে সুরক্ষা দিবেন'।

কেয়ামত পর্যন্ত রাসুলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী সত্য, সুপ্রতিষ্ঠিত। জীবনের পরতে পরতে পরিলক্ষিত, বাস্তবায়িত। মুসলমানের অন্তরে অন্তরে প্রোথিত, অনুরণিত। এ যেন ঈমানদারের নির্বিঘ্ন জীবন বাঁচার অনাদি আশা, অপার প্রেরণা।

আল্লাহকে যে ভয় করবে, পরিশেষে সে প্রশংসিত হবে। সবল-দুর্বল সকলের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা পাবে। বিপদে আপদে যে আল্লাহকে ভুলে যাবে, সে যেন মনে রাখে, আল্লাহ ছাড়া অন্যসব সাহায্যকারী ব্যর্থ, অক্ষম। সুতরাং আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরো, পৃথিবীর সকল সাহায্যক্ষেত্র বিশ্বাসভঙ্গ করলেও আল্লাহ আছেন বিশ্বাসের স্তম্ভ, আল্লাহ আছেন সদা-সর্বত্র।